তারাশঙ্করের উপাদান ও ইঙ্গিত
প্রসারিত হচ্ছে যাঁর সক্ষম রচনায়
এই সময়ের সার্থক কথাকার
তপন বন্দ্যোপাধ্যায়
সমীপেষু

নিবেদন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক পটভূমি আমার পরিচিত ভূগোলের সমীপবর্তী। ছোট বেলা কেটেছে যে উষর-ধূসর-ধোঁয়াকালিময় পটভূমিতে তার রেলপথ-শিল্প-কারখানা-খনি মজুরদের চঞ্চলতা মনে পড়লে বুঝতে পারি ঐ ক্লান্ত মলিন জনতার মাঝখানে গোষ্ঠ-দামিনী-করালী-সিধু-রা রয়েছে। বনওয়ারীর আত্মসংরক্ষার চেষ্টা অবশ্য অনেক বড় একটি প্রবণতা। শিল্পায়নের বাধ্যতা আর স্নিগ্ধ শ্রীমণ্ডিত জীবন পরিধির দ্বন্দ্ব পৃথিবীর সর্বত্র। ভারতে এই দ্বন্দ্বের আড়ালে আছে আধ্যাত্মিক পরিসর। আমাদের দেশের জীবন-নীতি এই আধ্যাত্মিক পরিসরকে গভীর ও ব্যাপকভাবে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে। দেশ-সমাজ আর দেবতা এখানে একাকার। দেবতা অর্থাৎ প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক শক্তিকে প্রতীকে অনুবাদ করতে করতে চলার পথনির্দেশ। বিষয়টি অরণ্য-আদিম হলেও দেবতা আমাদের দেশ-কাল-সন্ততির সংস্পর্শে অচ্ছেদ্য ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে।

কাঞ্চা ইলাইয়া বা ওমপ্রকাশ বাল্মীকি-রা এই ঐতিহ্যের একালীন আপত্তিগুলিকে নথিভুক্ত করেছেন। কাঞ্চা লক্ষ করেছেন আমাদের দেশে বস্তুত দুই রকম জাতীয়তা বিদ্যমান। ১. গো কেন্দ্রিক আর ২. মহিষ-কেন্দ্রিক। ভগবতী মহিষাসুরমর্দিনী হয়েছেন এই দ্বন্দ্বের পটভূমিতে। ওমপ্রকাশের মতে মুন্সি প্রেমচাঁদের সাহিত্য বস্তুত উচ্চবর্ণের দৃষ্টিতে নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষকে দেখার করুণা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এও আসলে দলিত নিম্নবর্ণের আত্মপ্রকাশ ঘটাবার পরিসরকে আড়াল করা! পার্থ পোলকে নামক এক মারাঠী-দলিত তাঁর কবিতায় এই কথা জানিয়েছেন। ওরা আমার দারিদ্র্যটুকুই দেখেছে—আমার দারিদ্র্যের পরিসরে যে ভালোবাসার উজ্জ্বল পৃথিবী ছিল তা ওরা দেখেনি। ড. আম্বেদকর হলে বলতেন 'we are killing through kindness'. শিক্ষিত (পাশ্চাত্য প্রথা পদ্ধতি এবং দর্শনে—বলাই বাহুল্য) মানুষের চোখে দেখা এই সব আপত্তির পাশে ধ্রুপদি সাহিত্যের একটি মাত্রা আছে। সমাজ দেশ আর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেমিশে চমৎকার সব চরিত্র উঠে আসে। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' একটি আদর্শ-উদাহরণ হতে পারে। ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী আর ধর্মানুশাসকরা মহেশ-কে বাঁচতেই দিল না। তাকে তো বাঁচাবার চেষ্টা করল এক দরিদ্র মুসলমান—গফুর। উন্নয়নের সোজাপথ তার পক্ষে চটকলের শ্রমিক হয়ে যাওয়া। তবু সেই গফুর কিসের মায়ায় তার গরুটিকে কসাইদের বিক্রি না করে তার জীর্ণ মলিন জীবনের ঘেরাটোপে থেকে যেতে চায়? পাশ্চাত্য জীবন-নীতিতে এই মনস্তত্ত্বের উৎস খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তাই বনওয়ারী আর তার দেবতাকে বুঝে নেবার একটি পরিসর নিশ্চয় আমাদের সাহিত্যে থেকে গেছে। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা এই পরিসরটি ব্যাখ্যা করার উপায় খুঁজে পেয়েছে। ইলাইয়া বা বাল্মীকি এই ব্যাখ্যানকে এক কথায় উপেক্ষা করতে পারতেন না।

অধিকারের প্রত্যয় আর প্রতিবাদের উদ্যম আধুনিকতার পূর্বশর্ত। তাকে অস্বীকার করেন নি তারাশঙ্কর। করালীর মারফৎ এই জীবন-ভঙ্গিটি দেবতাকে প্রান্তিক করে আনে। দেবতার উদ্দেশ্যে বলি তার চোখে মাংস খাবার ব্যবস্থা মাত্র। ভাঁজো-র নাচ সাহেব মেমদের ডেকে এনে

উল্লাস ছাড়া কিছু নয়। রেনকোট পরা, কোট-প্যান্ট টুপিতে তাকে মূর্তিমান পাশ্চাত্যের অনুকরণই মনে হয়।

এরা সমর্থপঞ্চম। ভারতীয় সমাজ-শরীরে বর্ণময় যে বর্গ ব্যবস্থা—চতুরঙ্গ সেই আদল। এর সীমানায় আছে বৃহত্তম সংখ্যায় পঞ্চম-রা। বস্তুত পঞ্চম-রাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ধ্যানমূর্তিটি গড়ে তুলেছে। এদেশের ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষের ধারণা প্রকৃতির শক্তিকে প্রতীকে রূপান্তরিত করা ছাড়া কিছু নয়—আর তাইতো হিন্দুত্বের ভিত্তি। সব পঞ্চমই কিন্তু সমর্থ নয়। তাদের অনেকেই লোভে বা ভয়ে অত্যাচারের প্রতিষ্ঠার সমান্তরাল আকাঙ্ক্ষায় ধর্মত্যাগ করেছেন। সবাই সাহিত্যের গফুর বা সাহিত্য নির্মাণের কবীরের মতো ভারত-পথিক নয়। ফল : দেশমাতৃকার বুকে ছুরিকাঘাত—অন্যদেশ গঠনের ভয়ঙ্কর তৎপরতা। সমর্থপঞ্চমরা ক্রমে এদেশের ঐতিহ্যের ইতিকথাকে উপকথার খোলসে ধরে ভরে রেখেছে। এই প্রক্রিয়ার এক প্রান্তে পাশ্চাত্য মানবাধিকার প্রতিবাদ আর অন্যপ্রান্তে দেশী প্রকৃতি-পূজার উদ্যম ও মঙ্গলবোধ। মঙ্গল একক নয় সামাজিক। করালী যতই সমুজ্জ্বল হোক অন্য প্রান্তের বনওয়ারীকেও কম প্রাসঙ্গিক মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত করালী যে বন্যাবিধ্বস্ত হাঁসুলীবাঁকে ফিরে আসে তাতে একমাত্রিক পাশ্চাত্য ইতিহাসবোধ চমকিত হতে পারে—মনে হতে পারে এটি ইতিহাসের বাস্তবকে অতিক্রম করে গেল; তবে সমর্থপঞ্চমদের পদচারণা যারা বুঝবেন তারা নিশ্চয় ভারতআত্মার মর্ম এখানে দেখতে পাবেন।

তারাশঙ্কর সাহিত্যকে প্রায় তিন দশক ধরে বোঝার চেষ্টা করে আসছি। 'রত্নাবলী'-র সুনীল ভট্টাচার্য এবং সুমন চট্টোপাধ্যায় আমার প্রয়াসকে সম্মানিত করেছেন। *কবি* আর *রাধা*-র উপর আমার লেখা বই পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁরা। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ছড়ানো ছেটানো কিছু প্রবন্ধ একত্রিত করে একটি ছোট বই বের করেছেন অঞ্জলি পাবলিশার্স-এর শ্রীচয়ন চট্টোপাধ্যায়। 'অন্ধকারের অন্তরে' নামক সেই বইটিও পাঠক সমর্থন পেয়েছে। চয়ন বয়সে তরুণ। তাঁকেও শুভকামনা জানাচ্ছি। গত বৎসর লাভপুরে তারাশঙ্করের প্রয়াণ-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তারাশঙ্করের পৌত্র অধ্যাপক হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় সাহিত্যমোদী মহাদেব বসু, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এবং পার্বতীনাথ সেনগুপ্ত-দের সহযোগিতা-আতিথ্য এখনও অমলিন রয়েছে। এঁদের সান্নিধ্য ও নৈকট্য তো তারাশঙ্করের সাহিত্য পরিমণ্ডলের প্রতি নিবিড় আসক্তির ফলাফল। তবু, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালাম। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে অত্যন্ত বিচিত্র অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছি। কিছুতেই পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাঁদের যক্ষপুরীর কক্ষ অবারিত করলেন না। শ্রীমান নবগোপাল রায় বহু আয়াস সহ্য করে পুরোনো গ্রন্থাগার খুঁজে একজন পেশাদার লিপিকরের সন্ধান দিল। তার মারফৎ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পূর্ণ পাঠ অনুলিপি করিয়ে নিলাম। এশিয়াটিক সোসাইটির তরুণ গবেষক শ্রীমান নবগোপালকে শুভকামনা জানাচ্ছি—তার পরিত্রাতার ভূমিকায় আমার এই বই-এর পাঠ বুঝে নেবার চেষ্টা সফল হল। জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে তারাশঙ্কর-এর জীবৎকালে প্রকাশিত অন্যান্য পাঠগুলি দেখার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে আমার দুই গবেষক শ্রীমতী মীনাক্ষি কর্মকার আর শ্রীমান অজয় মণ্ডল। এদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতা জানাবার নয়। আর দুজনের কথা লিখব—জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম গ্রন্থাগারিক জি. কুমারাপ্পা আর আমার ছাত্রী শ্রীমতী নবনীতা গুহ। এদের চেষ্টা

প্রাতিষ্ঠানিক নীতি-নিয়মে কার্যকর হয়নি, তবে চেষ্টাটুকু ছিল আন্তরিক। সহধর্মিণী শ্রীমতী কৃষ্ণা বসুরায় স্বেচ্ছায় আমার পঠন-পাঠনের অবসরটুকু যথাসাধ্য নির্বিঘ্ন রাখেন—পুত্র শ্রীমান অনর্ঘও সহযোগিতা করে নানা ভাবে। অন্যথায় এরকম সারস্বত সাধনা করা সম্ভব ছিল না। এদের প্রতি শুভকামনা জানানো বাহুল্য। আমার এই বই যারা পড়বেন তাদের প্রতি অনুরোধ—বাজার-চলতি নোটবুকের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবে না পড়ে এটি আদ্যন্ত পড়বেন। তা না হলে এ-বইয়ের তাৎপর্য বুঝতে পারবেন না। শেষে লিখি তাঁদের কথা যাঁরা এ-বইয়ের অক্ষর সাজিয়েছেন, প্রুফ সংশোধন করেছেন, প্রুফ আদান-প্রদান করেছেন, আর বাঁধাই করেছেন যাঁরা। বস্তুত হিমশৈলের চূড়ার আড়ালে এই সব শ্রমসাধ্য কর্মসূচীর মধ্যেই আছে একটি নির্মাণ কর্মের প্রকৃত উৎস কথা।

অচিন্ত্য বিশ্বাস

সূচী

১

তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য পরিক্রমা

বাংলা সাহিত্যে যাঁদের 'তিন বন্দ্যোপাধ্যায়' বলা হয়—তারাশঙ্কর-মানিক ও বিভূতিভূষণ—সমাজ-ঘনিষ্ঠ উপন্যাস লিখেছেন। বিভূতিভূষণ জন্মেছেন আগে (১২.৯.১৮৯৪), তাঁর মৃত্যু সবার আগে (১.৯.১৯৫০) ; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মেছেন সবার পরে—২৯.৫.১৯০৮, মারা গেছেন তারাশঙ্করের বহু পূর্বে (৩.১২.১৯৫৬)। তারাশঙ্কর জন্মেছেন বিভূতিভূষণের একটু পরে—(২৭.৭.১৮৯৮) তাঁর মৃত্যু উক্ত তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সবার শেষে ১৪.৯.১৯৭১। এই তিন-বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছিলেন সবচেয়ে নীরব—সমাজ-বিবিক্ত আর মানিক ছিলেন সবচেয়ে আত্মসচেতন—সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উচ্চকণ্ঠ। তারাশঙ্কর সাহিত্যক্ষেত্রে অন্য দুই সাহিত্যিকের তুলনায় ছিলেন যথেষ্টই স্বতন্ত্র। সাহিত্য উপাদানের ভূগোলটি নজর করলে দেখা যাবে এই তিন ঔপন্যাসিকের পটভূমি বা অভিজ্ঞতার সীমানা কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। মানিকের উপন্যাসে খুব নিবিড় কোনো অভিজ্ঞতার ভূগোল সম্ভবত নেই। তবে মানিকের ছিল পূর্ববঙ্গের গ্রামদেশ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাঁর *পুতুল নাচের ইতিকথা* (১৯৩৬) আর *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬)-র পটভূমি নিশ্চিতভাবে পূর্ববঙ্গ। *পুতুল নাচের ইতিকথা*-র পটভূমি পূর্ববঙ্গ, সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। সন্দেহ নেই, *পদ্মানদীর মাঝি*-র পটভূমি সম্পর্কেও। আকুরটাকুর থেকে হোসেন মিঞার ময়না দ্বীপ পদ্মাতীরের গ্রামদেশ। গাওদিয়া নামের একটি গ্রাম মানিক জানতেন—ঢাকা-মানিকগঞ্জে তাঁর মাতুলালয় ছিল।

বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক-ভূগোল চীন-ইন্দোনেশিয়া এমনকি আফ্রিকার রহস্যময় অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকলেও এই অদেখা ভূগোলে তাঁর পদক্ষেপ—কিশোর-উপযোগী সাহিত্যের দিঙমণ্ডলেই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্যিক বীজতলা ইছামতী নদীর উভয় তীর। *ইছামতী* (১৯৪৯)-র সূচনাংশে এই অঞ্চল সম্পর্কে তাঁর লেখা কথাটুকু বেশ প্রাসঙ্গিক : 'ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্তত যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমীর-কামট-হাঙ্গর সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন্ সুঁদরি গরান গাছের জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোনো লোকই রাখে না।" (*ইছামতী*; মিত্র ও ঘোষ; দশম মুদ্রণ ; ১৪০৯ বঙ্গাব্দ)এই গ্রামদেশের কথাই বিভূতিভূষণের সাহিত্য ক্ষেত্রের মুখ্য বাচ্য। এই গ্রামদেশই তাঁর প্রেক্ষণবিন্দু, এখানকার 'সুখ-দুঃখের অলিখিত ইতিহাস'-ই তিনি লিখতে চান। 'মূক জনগণের ইতিহাস' তা। *পথের পাঁচালি* (১৯২৯)-ও অনুরূপ জীবন ভাষ্য। ডায়েরি জাতীয় রচনা *তৃণাঙ্কুর* *পথের পাঁচালী যেদিন প্রকাশ পেল লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ* : "আজ বেরুল।...আজ এই নির্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হল যে প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—ত্রিশ বৎসর পূর্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।"

আরণ্যক (১৯৩৯)-এ অবশ্য উক্ত স্বঘোষিত প্রেক্ষাপট ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে বাংলার পশ্চিম প্রান্তের মালভূমি অঞ্চল, অধুনা ঝাড়খণ্ড ও বিহারের আরণ্যক পরিবেশের কথা লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ। গ্রাম পত্তনের এক অসাধারণ কাহিনী—যাকে তিনি মিশিয়ে দিয়েছেন ভারত ইতিহাসের সুদূর অতীতের কাল প্রবাহের সঙ্গে। আর্য-ভারত তথা আগন্তুক-ভারত কেমন করে অনআর্য আদিবাসীর মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে উপস্থিত—লবটুলিয়া-ফুলকিয়া বইহার-মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট—যা মানুষের প্রয়োজনে বদলে যাচ্ছে জমি হাসিল করতে আসা এক প্রকৃতি-বিযুক্ত প্রকৃতি-বিমুগ্ধ নাগরিক রুচিশীল রোমান্টিক মানুষের চোখের সামনে; আরণ্যক শুধু সে কথা বলে না। আর্য-ভারত যেভাবে সমাজ গঠন করে, তপোবন-সংস্কৃতি, গ্রাম জীবনের সেই আদলের নামই তো 'আরণ্যক'! প্রকৃতি আর প্রকৃতি-লগ্ন নাগ-নিষাদ-পুলিন্দদের আদিভূমি সেই দেশ—খাণ্ডব দহনের পর সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাযাবর অর্ধভুক্ত দীর্ণ শীর্ণ সেই অগণিত দেশবাসীর হারিয়ে যাবার প্রতীক-কাহিনী *আরণ্যক*। বিভূতিভূষণের কালচেতনা এখানে সম্পূর্ণ নতুন এক বিষয় খুঁজে পেয়েছে। কিশোর-উপযোগী দুটি উপন্যাস আর *আরণ্যক*-এর ব্যতিক্রমটুকু বাদ দিলে বিভূতিভূষণ মধ্যবঙ্গের কথাকার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক-ভূগোল চঞ্চল নয়—প্রায় অপরিবর্তমান—নিশ্ছিদ্রভাবে রাঢ়বাংলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কয়লাকুঠির কথাকার শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় আর সরোজকুমার রায়চৌধুরীর কথা মনে রেখেও বলতে পারি, বাংলা কথা সাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্কর প্রথম আঞ্চলিকতার উপাদানকে সাহিত্যে আনলেন, সবথেকে জোরের সঙ্গে, সবথেকে আন্তরিকভাবে। রাঢ়, আরও ভালো করে ধরলে, উত্তর রাঢ়-ই তাঁর বিপুল সাহিত্যকীর্তির পশ্চাৎ-ভূমি। বাংলা কথাসাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে সবথেকে বেশি লিখেছেন তারাশঙ্কর, সবথেকে বেশিদিন ধরে লিখেছেন। বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, তারাশঙ্কর এই ভূগোল থেকে সরে এসে উপন্যাস লিখেছিলেন—কিন্তু সেই পরিবেশ পটভূমির বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রচনার মান ও শৈল্পিক উচ্চতা বজায় থাকে নি। কথাটি প্রণিধানযোগ্য বটে।

তাঁর লেখার বিষয় সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন এই উপাদান প্রত্যক্ষজ্ঞান-নির্ভর। তাঁর ভাষায় : 'আমার যেটুকু জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তার অধিকাংশই আমি অর্জন করেছি আমার সম্মুখে প্রবাহিত প্রত্যক্ষ জীবনের শোভাযাত্রা থেকে। সে শোভাযাত্রায় রাজা ছিল না, ধনী ছিল না, ছিল সাধারণ মানুষ, এদেশের এখানকার এই অঞ্চলের মানুষ।' ("রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী", ১৯৭১)।

পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বাস করার আগে পর্যন্ত তারাশঙ্কর যে জীবন পর্যবেক্ষণ করেছেন, বস্তুতপক্ষে তাঁর উপন্যাসের প্রধান অংশ জুড়ে রয়েছে সেই পর্যবেক্ষণের সৃজনশীল প্রকাশ। বহু উপন্যাসেই তারাশঙ্করের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। এইসব চরিত্রের রচনা-বৈশিষ্ট্য ও রূপায়ণ-প্রক্রিয়া পরে দেখানো যাবে। তারাশঙ্কর কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কিছুদিনের জন্য ভর্তি হন, তখন কলকাতায় মেসবাড়িতে থাকতেন। পরে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যুক্ত আছেন পুলিশের এই সন্দেহের ফলে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়া অগ্রসর হয় না। গ্রামে ফিরে গিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তারপর জেল থেকে বের হয়ে প্রধানত বীরভূম জেলার নানাপ্রান্তে মানবসেবার কাজ করেন। এই সময় তিনি কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। গান্ধীজির জীবন ও আদর্শ

তারাশঙ্করকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি ভোলেননি এই মহৎ জীবনাদর্শ—আর নিজেকে বেঁধেছেন এই আদর্শেরই ঘেরাটোপে। অবশ্য তারাশঙ্করের প্রথম জীবনের অবিসম্বাদী রাজনৈতিক আদর্শ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি* (১৯৩১ খ্রি.) তিনি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। বন্ধু-সম্পাদক-কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তিনি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেছিলেন একবার।

অল্প সময়ের জন্য আর একটি অন্যরকম রাজনীতির প্রবাহ তাঁর জীবনে এসেছিল 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এ তিনি যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে তৃতীয় বার্ষিক ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সম্মেলনের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে অনুষ্ঠিত মহম্মদ আলি পার্কের জনসভায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করে 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সামান্য সময়ে তারাশঙ্কর সাম্যবাদের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে গান্ধীবাদে মোটামুটি আস্থা বজায় রাখলেও এবং কংগ্রেসের সমর্থনে রাজ্যসভার সদস্য হলেও, সম্পূর্ণ দলীয় রাজনীতি তিনি করেননি। কংগ্রেসের এম. এল. সি. পদ থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন ১৯৫৫ নাগাদ। (সূত্র : হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় . "অন্তরঙ্গ পিতামহ", প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য* ; সাহিত্য অকাদেমি; নতুন দিল্লী, ২০০১; ৩০ পৃ.) তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি সাহিত্যিক। সেই কারণে রাজনীতি তাঁকে ছাড়েনি যেমন, তেমনি রাজনীতি তাঁকে গ্রাস করতেও পারেনি।

সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন তারাশঙ্কর। প্রথমদিকে কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতার একটি সঙ্কলনও প্রকাশিত হয়েছিল—'ত্রিপত্র' (তিন অধ্যায়ে লালকালিতে মুদ্রিত—১৯২৬), লিখেছিলেন কিছু মঞ্চসফল নাটক। *কালিন্দী*-র নাট্যরূপ (পশ্য : *আমার সাহিত্য জীবন*; দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭; ২৬৫ পৃ.) দেওয়া হয়; স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় সেই নাটক মঞ্চস্থ হয়। এরপর তিনি একাধিক নাটক রচনা করেন, সেগুলি মৌলিক নাটক হিসেবেই (অর্থাৎ প্রথমে নাটক হিসেবেই) লেখা। এগুলি যথাক্রমে :

১. দুই পুরুষ }	:	আষাঢ়, ১৩৪৯
২. পথের ডাকে }	:	ফাল্গুন, ১৩৪৯
৩. কালরাত্রি	:	১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
৪. চকমকি	:	১৩৫২
৫. দ্বীপান্তর	:	১৩৫২
৬. যুগবিপ্লব	:	শ্রাবণ, ১৩৫৮
৭. সংঘাত	:	জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯

বিশেষ করে প্রথমদিকের পুস্তক তালিকা লক্ষ করলে মনে হতেই পারে তারাশঙ্কর প্রথমদিকের সাহিত্য-জীবনে নাট্যকার হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হবার কথা ভেবেছিলেন। কবি বা নাট্যকার অবশ্য তারাশঙ্কর প্রতিভার আসল রূপ নয়। তাঁর জামাতা শান্তিশেখর মুখোপাধ্যায় ১৯৬২ সালে মারা গেলে সামান্য কিছুদিন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে তারাশঙ্কর লেখা ছেড়ে ছবি আঁকতে আর কাটুম-কুটুম জাতীয় পুতুল তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন। সেই শিল্পকৃতি যেমন তাঁর শিল্প প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় নয়, নাট্য ও কাব্যচর্চাও সেইরকম।

তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক। কথাসাহিত্যিক। উপন্যাস লেখার আগে তিনি লিখেছেন বেশ কিছু ছোটগল্প। তাঁর ছোটগল্পেও অনেক সমালোচক দেখেছেন ক্রনিকল্-এর ছাপ, টেল-ধর্মিতার লক্ষণ। এ-সব গল্পে ক্ষণিকের উদ্ভাস অপেক্ষা অনেক কালের ইঙ্গিত আর

ধারাবাহিক চিত্রপট আঁকা হয়। তাঁর ছোটগল্পের বিশ্লেষণ তাই। চমৎকার যুগান্তরের শব্দ-চিত্র হতে পারে। এইভাবে তাঁর ছোটগল্প অনেকটাই যেন সাধারণ ছোটগল্পের চেয়ে আরও একটু বড় ক্ষেত্র ছুঁয়ে থাকে। আরও একটু বড় ক্ষেত্রে প্রসারিত হতে চায়। তিনি নিজেও কিছু ছোটগল্পকে উপন্যাস হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এইরকম ঘটেছে। যেমন :

বীজগল্প	উপন্যাস
শশ্মানের পথে (কালিকলম, আশ্বিন ১৩৩৫)	চৈতালী ঘূর্ণি (১৩৩৮)
কবি (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৭)	কবি (ফাল্গুন (১৩৪৮)
রাইকমল (কল্লোল, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬)	রাইকমল
মালাচন্দন (উপাসনা, ফাল্গুন ১৩৩৮)	
না (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৫)	না
মা (পরিচয়, আষাঢ় ১৩৪৫)	কালিন্দী (ভাদ্র ১৩৬১)
বড় বৌ (উপাসনা, শ্রাবণ ১৩৩৮)	চাপাডাঙার বৌ (শ্রাবণ ১৩৬১)
ডাকহরকরা (প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪৩)	ডাকহরকরা (বৈশাখ ১৩৬৫)
সমুদ্রমন্থন (শারদীয়া, আনন্দবাজার, ১৩৪৩)	ধাত্রীদেবতা (১৩৪৫)

তাঁর ছোটগল্পের কিছু সঙ্কলন বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এরকম কিছু গল্পগ্রন্থের নাম ও প্রকাশকাল যথাক্রমে : *জলসাঘর* (শ্রাবণ, ১৩৪৪); *রসকলি* (বৈশাখ, ১৩৪৫); *তিন শূন্য* (১৬ এপ্রিল, ১৯৪১); *প্রতিধ্বনি* (২ এপ্রিল, ১৯৪৩); *বেদেনী* (আশ্বিন, ১৩৫০); *দিল্লিকা লাড্ডু* (১৩ নভেম্বর, ১৯৪৩); *যাদুকরী* (ফাল্গুন, ১৩৫০); *প্রসাদমালা* (১৩৫২); *হারানো সুর* (অগ্রহায়ণ, ১৩৫২); *ইমারত* (মাঘ, ১৩৫৩); *রামধনু* (বৈশাখ, ১৩৫৪); *শ্রীপঞ্চমী* (শ্রীপঞ্চমী, ১৩৫৪); *মাটি* (২৩ অক্টোবর, ১৯৫০); *শিলাসন* (মাঘ, ১৩৫৮); *কামধেনু* (৩০ ডিসেম্বর, ১৯৫৩); *কালাভং* (ভাদ্র, ১৩৬৩); বিষপাথর (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪); *মানুষের মন* (বৈশাখ, ১৩৬৫); *রবিবারের আসর* (শ্রাবণ, ১৩৬৫); *পৌষলক্ষ্মী* (১৯৬০); *আলোকাভিসার* (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭); *চিরন্তনী* (ফাল্গুন, ১৩৬৮); *অ্যাকসিডেন্ট* (বৈশাখ, ১৩৬৯); *তমসা* (বৈশাখ, ১৩৭০); *আয়না* (অগ্রহায়ণ, ১৩৭০); *চিন্ময়ী* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১); *একটি প্রেমের গল্প* (মাঘ, ১৩৭১); *তপোভঙ্গ* (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩; *দীপার প্রেম* (অগ্রহায়ণ, ১৩৭৩); *নারী রহস্যময়ী* (৮ শ্রাবণ, ১৩৭৪); *জায়া* (১৩৭৪); *পঞ্চকন্যা* (১৩৭৪); *শিবানীর অদৃষ্ট* (১৩৭৪); *গোবিন সিংয়ের ঘোড়া* (ফাল্গুন, ১৩৭৪); *এক পসলা বৃষ্টি* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৫); *মিছিল* (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬); *রূপসী বিহঙ্গিনী* (১৩৭৭)।

উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তারাশঙ্কর যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *জলসাঘর* রবীন্দ্রনাথকে ফিরে উপহার দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গিয়ে সে বই খুঁজে পাননি। সেকথা জানার পর তারাশঙ্কর আবার বইটি রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। (তথ্যসূত্র : *আমার সাহিত্য জীবন*; উক্ত; ১২০ পৃ.) কলকাতায় নাচের দল নিয়ে ফেরার পথে সেবার রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে *রাইকমল* উপন্যাস পড়ে রবীন্দ্রনাথ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ২৮ মাঘ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে লেখা সেই চিঠি পেয়ে তারাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথকে লেখেন : 'রাইকমল সম্পর্কে আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন কিনা জানি না। কারণ আমার সমসাময়িকরা আমার লেখাকে বলেন স্থূল।'

রবীন্দ্রনাথ এর জবাবে লিখেছিলেন : 'তোমার স্থূল দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা

সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবসত্যের কোমরবাঁধা ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যারা বাহাদুরি মনে করেন তুমি তাঁদের দলে নাম লেখাও নি এতে খুশি হয়েছি।' ২৮ ফাল্গুনে ১৩৪৩-এ লেখা এই চিঠিতে বাংলা ছোটগল্পের আদিশিল্পী রবীন্দ্রনাথ তারাশঙ্করের লেখার কাহিনী-মূল্য আর বাস্তবতার প্রশংসা করেছেন। 'জলসাঘর' গল্পটি তিনি পরে পড়েছিলেন। রানী চন্দকে তিনি বলেছিলেন : 'আমার খুব ভাল লাগে তারাশঙ্করের ছোটগল্প। তার ভিতরে আছে একটা স্মৃতি—যার সঙ্গে পূর্বেকার ওই যেমন জমিদারের ঘরে যা ঘটে থাকে শাসন, পালন, শোষণ দেখিয়েছে; খুব সত্য করে তুলেছে তার লেখা।' এই কথাগুলি সম্ভবত 'জলসাঘর' পড়ার পর বলা। আগেই লিখেছি তারাশঙ্কর জেনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঠানো 'জলসাঘর' খুঁজে পাননি—পুনরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ছলনাময়ী বের হবার পর তারাশঙ্কর তাঁকে দিয়ে এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উৎসাহিত করেন। 'তোমার মতো গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।' রবীন্দ্রনাথ এখানে কি নিজের লেখা গ্রামীণ জীবনের উপর ভিত্তি করে লেখা তাঁর ছোটগল্পগুলির কথা স্বেচ্ছায় ভুলেছেন? জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথের কথার ভাঁজে অন্য ইঙ্গিতও থাকতে পারে। তখনও পর্যন্ত রাঢ় বাংলার গ্রাম-সমাজের উপর ভিত্তি করে লেখা কথাসাহিত্য বাংলাসাহিত্যের অঙ্গনে যথাযোগ্য ভাবে উপস্থাপনা আমরা দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রধান পটভূমিও গ্রাম, তবে তা পদ্মাবিধৌত সজল পলিমাটির গ্রাম। তারাশঙ্করের প্রতিবেশ ভিন্ন। *ছলনাময়ী*-র 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগে। কোনো কোনো শিক্ষিত জনের মুখে অবশ্য 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পটি বিদেশের উইচক্র্যাফটের গল্প থেকে নেওয়া এরকম 'অভিমত' শুনে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন 'এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের দেশের সঙ্গে পরিচয় কত সঙ্কীর্ণ।' রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন, সুতরাং তাঁর শিল্পকৃতির উৎকর্ষ নিয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতেই পারি।

ছলনাময়ী-র পর *জলসাঘর* প্রকাশিত হয়। *জলসাঘর*-এর প্রথম সংস্করণে 'জলসাঘর' আর 'রায়বাড়ী' গল্পদুটির শিরোনাম ছিল 'জলসাঘর'। 'রায়বাড়ী' পৃথক গল্প। নায়ক রাবণেশ্বর রায়। একমাত্র পুত্র ও স্ত্রীর মৃত্যুর পর অত্যাচারী জমিদার রাবণেশ্বর সন্ন্যাস নেবার কথা ভাবে। সহসা ধেয়ে আসে প্রবল বন্যা। গ্রামের ভদ্রজনের কাছে খবর পাঠায় রাবণেশ্বর সকলে আসুক তার জলসাঘরে। গ্রামের বৃদ্ধ নবীন গাঙ্গুলির কন্যার বিবাহের দিন স্থির ছিল। জলমগ্ন গ্রাম। সন্ন্যাসের সংকল্প ভুলে রাবণেশ্বর জলসাঘরেই তার সেই কন্যার বিবাহের আয়োজন করে—নিজের কন্যারই যেন বিবাহ। এই গল্পের শেষে বৈরাগ্য নয় জীবনের সহজ স্বাভাবিক ছন্দে সাধারণের স্তরে নেমে আসার কথা বলা হয়েছে। রাবণেশ্বর-এর উপলব্ধির সঙ্গে সমালোচক জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য *প্রান্তিক*-এর ৬নং কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। (জগদীশ ভট্টাচার্য : *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ*; দ্বিতীয় খণ্ড; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ; ১৯৯৩; ভূমিকা, পনের পৃষ্ঠা) হতেও পারে, রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্করের জীবনবোধের বিনিময় হয়েছিল এই দুই রচনায়। তবে জগদীশবাবুর বক্তব্য মনে রেখেও তারাশঙ্করের পরম সুহৃদ কালিদাস রায়ের মন্তব্য আমাদের অনেক বেশি সত্যস্পর্শী মনে হয়। কালিদাস রায় লিখেছিলেন : 'রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সবচেয়ে কম তারাশঙ্করের উপর। আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে নিকটে বাস করেছেন ইনিই। কৃষ্টির তফাতে নয়, দৃষ্টির তফাতে গুরুশিষ্যের মধ্যে ঘটেছে মস্ত বড় ব্যবধান।' ('কথাসাহিত্য'; অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) জগদীশ বাবুর চেয়ে কালিদাস রায়েকেই সমর্থন

করতে ইচ্ছা জাগে আমাদের। তারাশঙ্করের প্রিয়তম কন্যা বুলু-র মৃত্যুর পর তিনি অত্যন্ত বেদনাপ্লুত হন। বেশ কিছুদিন অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনায় কাটান। বুলুর মৃত্যুর ন্যূনাধিক তিন বছর পর 'রায়বাড়ী' লেখা হয়।

তারাশঙ্করের বহু গল্পই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নির্যাস। তিনি দেশসেবা আর রাজনীতির সূত্রে প্রতিবেশ ও প্রতিবেশী জীবনকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। আবার জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র থাকায় তিনি দেখেছেন স্বশ্রেণীর ক্রমিক অবক্ষয়। দেখেছেন নায়েব, গোমস্তা, কারকুন, নগদী, লেঠেল, বেহারা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বহুবিচিত্র মানুষ। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ, মাতামহের অভিভাবকত্বে কিছুদিন থাকা আর পরে মা ও পিসিমা শৈলজার পরিচালনায় সংসার যাত্রা পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। দেখেছেন মা আর পিসিমার কাছে প্রার্থী ও আতুর-হিসাবে-আসা দরিদ্র গ্রামবাসী অন্ত্যজ নরনারীকে। উত্তর-জীবনে কংগ্রেস-রাজনীতি, বিশেষত গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, গ্রাম পুনর্গঠনের প্রয়াস, বিশেষত নগরায়ণের করাল গ্রাস ও গ্রামজীবনে পরিবর্তনকে ভালো ভাবে মেনে নিতে না পারা, চিরাচরিত গ্রাম্যব্যবস্থায় গণতন্ত্রীকরণের অবসর তথা পঞ্চায়েত, ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা ও পেশাগুলির চাপে চিরন্তন ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় ক্রমিক পরিবর্তন, পরিণতি লক্ষ করেছেন তিনি। এসব ঘটনা ও ভাবসংঘাত তাঁকে নিশ্চয় প্রভাবিত করেছে। রাজনীতির দীক্ষা ও জনসাধারণকে প্রাণ মন দিয়ে অনুভব করার অভিজ্ঞতা তাঁকে ক্বচিৎ কখনো আন্তর্জাতিক পরিবর্তন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করেছিল। 'শ্মশানের পথে' গল্পটিকে *চৈতালী ঘূর্ণি* উপন্যাসরূপে রচনার সময় এজন্যই হয়তো তিনি রুশবিপ্লবের পরিবর্তন সূত্র, সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর তীব্র আন্দোলন ও ভয়াবহভাবে অত্যাচারিত হবার বিষয়গুলির সঙ্গে খোদিত করেছেন। তাঁর মনে কিছুটা আশাও যেন সঞ্চারিত হয়েছিল। বিশ্বাস করেছিলেন তিনি—সার্বিক শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের মানবমুক্তির পথরেখা।

তারাশঙ্করের ছোটগল্পের কলা-সিদ্ধি বিষয়ে কেউ কেউ দ্বিধান্বিত। তার কারণ তারাশঙ্কর তাঁর গল্পের পটভূমিকে অনেকটাই ছড়িয়ে দেন অনন্ত প্রবাহের দিকে। সেখানে চকিত সমাপ্তি, আকস্মিক উন্মোচন অপেক্ষা জীবনের গভীর রহস্যের ছায়া অনেক বেশি মিলেমিশে থাকে। এই গভীরতা ও ব্যাপ্তির জন্য তারাশঙ্কর যেন ছোটগল্পের তুলনায় উপন্যাসের দিকেই স্বভাবত আক্ষিপ্ত। কোনো কোনো গল্পে অবশ্য তারাশঙ্করের শিল্প সার্থকতা যথেষ্ট। 'আখড়াইয়ের দীঘি', 'তারিণী মাঝি', 'নারী ও নাগিনী', 'বেদেনী', 'ডাইনী' কিংবা 'পৌষলক্ষ্মী'-র মতো আশ্চর্য কিছু শিল্প-সফল গল্প পড়লে তাই মনে হয়। গল্পগুলিতে আছে আঞ্চলিক উপাদানের সার্থক প্রয়োগ। বিশেষত 'আখড়াইয়ের দীঘি' বা 'তারিণী মাঝি' গল্পের ভিত্তি তারাশঙ্করের চোখে দেখা জগৎ। 'আখড়াইয়ের দীঘি'র আঞ্চলিকতা স্পষ্ট হয় কালী বাগ্দি-র মতো তথাকথিত অপরাধপ্রবণ বাগ্দি সমাজের বাস্তব পটভূমির কারণে। বাগ্দির মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার কারণ—আসামি কালী বাগ্দির জবানবন্দিতে বিবৃত : 'আমরা জাতে বাগ্দি আমরা এককালে নবাবের পল্টনে কাজ করতাম। আজও আমাদের কুলের গরম—লাঠির ঘায়ে, বুকের ছাতিতে। কোম্পানির আমলে পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকে এই আমাদের ব্যবসা।'

কৃষিকর্ম তারা করতে চায়নি, কারণ 'মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত।' অন্য চাকরিতেও তারা অখুশি কারণ নীচ কাজ করা,

গাড়ু বওয়া, মোট মাথায় করা, জুতো খোলা তাদের ভাল লাগে না। মুক্ত স্বাধীন লাঠিয়াল বৃত্তি তাদের প্রবৃত্তিকে প্রকট করেছে। কবি-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য লক্ষ করেছেন... 'প্রবৃত্তি বংশানুক্রমে ধারায় প্রবাহিত হয়ে একেবারে রক্তের মধ্যে মিশে গেলে তা যে কত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে তার প্রমাণ 'আখড়াইয়ের দীঘি' গল্পটি।' (*তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প* : জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি.; ষোড়শ মুদ্রণ; অগ্রহায়ণ ১৩৯৮; ভূমিকা—১৪ পৃ.) একথা সম্পূর্ণ স্বীকার্য নয়। তারাশঙ্করের অনেক গল্পেই এইরকম চরিত্র পাই। তাদের মধ্য দিয়ে রাঢ় বাংলার নিম্নবর্গের সব হারানোর বেদনাই প্রকাশ পেয়েছে।

'তারিণী মাঝি' গল্পের পটভূমি ময়ূরাক্ষী নদী। নদীতে বান এলেই তার পেশাগত নিশ্চয়তা। বালুকাময় নদীগর্ভে দশহরার পূজা দেবার সময় তাই তাকে দেখে লোকে সন্দেহ করে—'শালা, বানের লেগে পুজো দেয়।' নৌকা চালাবার মতো জল বারোমাস থাকে না যে নদীর, সেখানে মাঝির জীবন অনিশ্চিত। অথচ 'বান না এলে চাষ হবে কি করে?'— খরার আভাস আসার মধ্য দিয়ে এ-কাহিনীর অনিশ্চয়তা প্রসারিত মাঠ ছাড়িয়ে অন্য দিগন্ত ছুঁয়ে যায়। কৃষকরা আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে চলে যায় নগরের দিকে। মুচিরাও পালাতে থাকে। তারা রেখে যায় এক বৃদ্ধা হতভাগিনীকে— সে শৃগাল কুকুরের খাদ্য হয়। রুগ্ণ ছিল, তাকে বহন করা সম্ভব ছিল না—আসন্ন মন্বন্তরের করাল গ্রাসে তারা পলায়মান। এই ঘটনার পাশাপাশি তারিণী মাঝির একনিষ্ঠ প্রেম—স্ত্রী সুখীকে ঘিরে তার স্বপ্নচারিতাকে মনে হয় ব্যতিক্রম। বন্যায় সাঁতার না-জানা মহিলাকে বাঁচিয়ে সে লাভ করে ফাঁদি নথ, দান করে স্ত্রীকে। আর তাই স্ত্রীকে নিয়ে দুঃস্বপ্নের নগরের দিকে অভিসারে যেতে যেতেও ফিরে আসতে হয় তাকে। তারাশঙ্কর এই পরিস্থিতি বর্ণনায় নিপুণ পর্যবেক্ষণ ও জীবনশক্তির প্রমাণ রেখেছেন :

> তারিণী পুলকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, দেখেছিস, সুখী, দেখেছিস?
>
> সুখী বলিল, আমার মাথামুণ্ডু কি দেখব, বল?
>
> তারিণী বলিল, পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে ওপরের পানে চলল, জল এইবার হবে।
>
> সুখী দেখিল, সত্যই লক্ষ লক্ষ পিপীলিকা শ্রেণিবদ্ধ ভাবে প'ড়ো ঘরখানার দেওয়ালের উপরে উঠিয়া চলিয়াছে। মুখে তাহাদের সাদা সাদা ডিম।
>
> সুখী বলিল, তোমার যেমন—।
>
> তারিণী বলিল, ওরা ঠিক জানতে পারে, নিচে থাকলে যে জলে বাসা ভেসে যাবে। ইদিকে বাতাস কেমন বইছে, দেখেছিস? ঝাড়া পশ্চিম থেকে।
>
> আকাশের দিকে চাহিয়া সুখী বলিল, আকাশ তো ফটফটে- চকচক করছে।
>
> তারিণী চাহিয়া ছিল অন্য দিকে, সে বলিল, মেঘ আসতে কতক্ষণ? ওই দেখ্, কাকে কুটো তুলছে—বাসার ভাঙা-ফুটো সারবে। আজ এখানেই থাক সুখী, আর যাব না; দেখি মেঘের গতিক।
>
> খেয়া মাঝির পর্যবেক্ষণ ভুল হয় নাই......।

—তারিণী চেয়েছিল পিঁপড়ের মতো, কাকের মতো সুখীকে নিয়ে একটু একান্তে নিজস্ব পরিবেশে স্বপ্নাচ্ছন্ন গৃহকোণে থাকবে। তার জীবনকে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল জল। জল ছাড়া তার জীবিকাই অচল। কিন্তু ট্র্যাজেডি এই যে, জলেই ঘটল তার চরম পরিণতি। যে তারিণী জলমগ্ন অন্যের বধূকে উদ্ধার করে সেই তারিণী জলতলে সুখীকে

হত্যা করতে বাধ্য হল। অন্যথায় সে নিজেই মারা যেত। তারাশঙ্করের sense of tragedy এই গল্পে লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন তারিণী যে সুখীকে জলতলে হত্যা করে উঠে এল তার মধ্যে বিশেষ এক রকম জীবনসত্যই নাকি ব্যক্ত হয়েছে : 'যেন এই জড় বিশ্বে মন বলে কিছু নেই—আছে শুধু প্রাণ নিয়ত সংগ্রাম শুধু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার।' ("তারাশঙ্করের গল্প : শিল্প চেতনা।"—ক্ষেত্রগুপ্ত; *গল্পকার তারাশঙ্কর : প্রতিভা ও মূল্যায়ন*—গ্রন্থভুক্ত; সম্পাদক—তরুণকান্তি রায় : মনন প্রকাশন; নৈহাটি; ডিসেম্বর ১৯৮৫; পৃ. ৮)। আমরা এখানে ক্ষেত্রবাবুর ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারছি না। বস্তুত, জড় প্রকৃতির মতো বেঁচে থাকার আকুলতাই এ-গল্পে একমাত্র সত্য নয়, এ-গল্পে রয়েছে একটি মানুষের অনিশ্চিত পেশা আর সুখের প্রত্যাশার বিপ্রতীপতা। সে যা চায় আর সে যা পায় শুধু তার বিপ্রতীপতাই নয়, এখানে আছে যার জন্য চাওয়া তাকেই ধ্বংস করার বাধ্যতা। অ্যারিস্টটল-ব্যাখ্যাত Peripety-র এ এক চূড়ান্ত উদাহরণ।

'আখড়াইয়ের দীঘি'-তেও এই রকম বিপ্রতীপতা উপস্থিত । কালী বাগ্‌দির পেশা (বৃত্তি নয় দুর্বৃত্তি) পুত্রহত্যার মতো অপরাধের দিকে চলে গেল। কিন্তু সেখানেই কাহিনী শেষ হয় না। মেয়াদ কেটে যাবার পর কালী ফিরে এল পুত্রের মৃতদেহ খুঁজতে—আখড়াইয়ের দীঘিতে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরল সে। এই হত্যার আর হত্যার চক্রে একটি পেশার বৃত্ত সম্পূর্ণ হল কিনা বিবেচ্য। যদি তাই হয় doing আর মৃত্যু suffering-এর চূড়ান্ত হয়েছে কালী চরিত্রে। সেজন্যই এই কাহিনী অত্যন্ত উচ্চস্তরের বলেছি।

'অগ্রদানী' গল্পের পূর্ণ চক্রবর্তী লোভ আর বুভুক্ষার প্রতীক। তার নিজের পুত্রের পিণ্ড ভক্ষণ করেছে সে, এ-ঘটনার সঙ্গে *আরোগ্য নিকেতন*-এর জীবন মশায়ের পুত্রের মৃত্যুর ক্ষণ ঘোষণার সামান্য মিল আছে। মোট কথা আমাদের মতে, তারাশঙ্করের কিছু ছোটগল্পে জীবনের গভীর রহস্যময়তা আশ্চর্য লিপিকুশলতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

শৈলজানন্দ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনার দ্বারা অনেকটাই প্রাণিত হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। এই দুই আঞ্চলিক প্রান্তিক জীবন পরিধির সার্থক রূপকারের রচনা পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার সঙ্গে আঞ্চলিক উপাদান সংযোজন করলে তিনিও সার্থক সাহিত্যিক হতে পারেন। তেমন চেষ্টাই ঘটেছে তারাশঙ্করের গল্পে। তাঁর গল্প হয়েছে চরিত্রের চিত্রশালা। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, তারাশঙ্করের হাতে পুতুল নয় প্রতিমাই খেলে ভালো—তিনি সেই প্রতিমার শিল্পী। তারাশঙ্করের চরিত্রগুলি পুতুলের মতো অন্য-নিয়ন্ত্রিত নয়—স্বনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় উজ্জ্বল। সবাই অবশ্য প্রবৃত্তির চিরাচরিত বৃত্তটি ভাঙতে পারেনি।

'বাজীকর' বা 'ডাইনী', 'যাদুকরী' বা 'চোর' প্রভৃতি গল্পে গোষ্ঠী বা বর্গের কথা পাই। একইরকম উপাদান পাই 'খাজাঞ্চিবাবু' গল্পেও এর বেশিরভাগই আঞ্চলিক পটভূমির কাহিনী। 'যাদুকরী' বা 'বাজীকরী' গল্পে রাঢ় বাংলার নান্দনিক কাজকর্মে যুক্ত লোকায়ত জনগোষ্ঠীর সমগ্রতার রূপটি পাই। 'ডাইনী'-তে পাই ভাগ্যবিড়ম্বিত ডাইনি অপবাদ পাওয়া এক বাউরি মেয়ের কথা। একদিকে সমাজ তাকে ডাইনি বানচ্ছে, অন্যদিকে সে নিজেও সেই কুসংস্কারের ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে পড়েছে। নিম্নবর্গের মানুষের তথাকথিত অপরাধ-প্রবণতার ছবিটি একটু উল্টো দিক থেকে ধরেছেন তারাশঙ্কর তাঁর 'ব্যাঘ্রচর্ম' গল্পে। রতন হাড়ি অপরাধ করে না—আসপাশের অপরাধের ঘটনার সঙ্গে নিজে যুক্ত সে কথা বলে লোকের মনে ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার করে নিজেকে একটু ব্যতিক্রমী বলে জাহির করতে চায়। 'চোর' গল্পের মূল চরিত্র গৌর *কবি* উপন্যাসে নিতাই-য়ে কতকটা যেন বিস্তৃত রূপ

পেয়েছে। এরকম একটি শ্রেণী-চরিত্র ব্যক্তি চরিত্রে বিকশিত হয়েছে 'সুরতহাল রিপোর্ট'-শীর্ষক গল্পে। কড়ি বাউরি তার স্বামী যেন চুরি না করে বার বার সেই অনুরোধ করত। স্বামীর মৃত্যুর পর বাউরিদের পক্ষে অসম্ভব মনে হলেও এক ধরনের সতীত্বধর্ম আর সংস্বভাব রক্ষার চেষ্টা করেছে কড়ি বাউরি। অবশ্য কড়ির দুর্ভাগ্য তার অনন্য চরিত্র-মহত্ত্ব কেউ বোঝেনি। ভদ্রগোছের দাসী বৃত্তি ভ্রমর-স্বভাব ভদ্র সাধারণের অন্যায় ব্যবহারে বেদনা পেয়েছে কেবল। স্বজাতির দূষকেরা তার প্রতি দুর্ব্যবহার করলে সে তীব্র ধিক্কার দিত; অন্যপক্ষে 'ভদ্র' জনের অনুরূপ ব্যবহারে 'অঝোর ঝরে কাঁদত'। বৈধব্য-সংস্কার তো বাউরি-সমাজে প্রচলিত ছিল না। স্বভাবতই কড়ি উচ্চবর্গের বিধবা নারীদের আত্মসংযমকে অনুসরণ করছে—এই আত্মোন্নতিশীল মানসিক বৈশিষ্ট্য—সৃষ্টিছাড়া মনে হলেও হতে পারে, কিন্তু এভাবেই ভারতীয় সমাজে হিন্দুত্বের বিকাশ ঘটেছে। ধীরে ধীরে এই পথেই পশ্চাদ্‌পদ সমাজ হিন্দু হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। এই প্রবণতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ'-এর গল্পটির মতো মিল চোখ এড়ায় না। অভাগী আশা করেছিল তার মৃত্যুর পর উচ্চবর্গের বধূদের মতোই তার সৎকার করবে তার পুত্র। এক্ষেত্রে উচ্চবর্গের সংস্কৃতিকে অনুকরণের ভাবনা লক্ষ করা যায়। একে বলতে পারি 'Sanskritization'।

ছোটগল্পের প্রধান লক্ষণ বৃত্ত-আখ্যান সর্বদা ব্যবহার করেননি তারাশঙ্কর। সমালোচকরা তাই তাঁকে ছোটগল্পের শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট স্থূল বলে গণ্য করেছেন। তাঁর গল্প নাকি টেল-জাতীয়—এই তাঁদের নির্যাস কথা। তবু বৈচিত্র্যের দিক থেকে তারাশঙ্করের গল্পের তুলনা বাংলা সাহিত্যে নেই। এত বিচিত্র বিষয় নিয়ে গল্প তিনি লিখেছেন---সে-সব গল্পে এত ভিন্ন ভিন্ন রকম দৃষ্টিকোণ যে বিস্মিত হতে হয়।

কয়েকটি গল্পে না-মানুষী সম্পর্কের অসাধারণ প্রয়োগ ঘটিয়ে open ended গল্পের ভঙ্গি এনেছেন। এরকম গল্প 'নারী ও নাগিনী'। খোঁড়া শেখ বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল চরিত্র—ব্যতিক্রমী, স্বতন্ত্র, অদ্ভুত-স্বভাব একটি মানুষ। শরীরে কুৎসিত—ভালোবাসার শক্তিতে অনন্য। কেমন করে তার ভালবাসা আপতিত হল মানবী জোবেদা আর পোষা সাপিনীটির প্রতি তা মানব চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য। সাপিনীটিকে অলঙ্কার পরিয়ে সাধ মিটিয়ে ভালবাসত খোঁড়া শেখ। কিন্তু সেই নাগিনীর ছোবলে যখন জোবেদা মারা গেল তখন সাপিনীটিকে হত্যা করেনি সে—নিরুপায় এক মানুষ যেমন আর এক মানুষকে বলে, তেমনি করে বলেছে: 'শুধু তোর দোষ কি, মেয়ে জাতের স্বভাবই ওই। জোবেদাও তোকে দেখতে পারত না।' কবি-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য 'নারী ও নাগিনী' গল্পটিকে 'ঘৃণালজ্জাহীন জৈব আসক্তির' গল্প বলে শনাক্ত করেছেন। খোঁড়া শেখ ফকির হয়ে যাওয়ায় মনে হয় আসক্তিই শুধু নয়—নির্লিপ্ত বৈরাগ্যও দেখতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। পশুর প্রতি মানুষের জৈব আসক্তির বিপরীত একটি চিত্র আছে 'কালাপাহাড়' গল্পে। রংলাল আর কালাপাহাড় নামের মোষের গল্প। সম্পন্ন চাষির কৃষি-সহায়ক কুম্ভকর্ণ আর কালাপাহাড়—এই দুটি মোষকে নিয়ে সখ্যরসের করুণ কাহিনী কালাপাহাড়। জঙ্গলের বাঘের আক্রমণের মুখে পড়েছিল রংলাল কালাপাহাড় আর কুম্ভকর্ণ তাকে বাঁচায়। মারা যায় কুম্ভকর্ণ। মারা যায় চিতার আক্রমণ থেকে রংলালকে রক্ষা করতে গিয়ে। সে সময় তার 'চোখ হইতে দরদর ধারে জল গড়াইতেছে।'—লক্ষ করে রংলাল। কিন্তু কালাপাহাড়কে নিয়ে হল বিপদ। ওর জোড়া মেলে না। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কালাপাহাড়—'গরম' হয়ে পড়ে। একমাত্র রংলাল তাকে 'পরম স্নেহে' বুলিয়ে দেয় হাত। তখন সে শান্ত হয়। এভাবে চলতে পারে না। একটি

বাছুরকে তো মেরেই ফেলল। কালাপাহাড়কে পাইকারের কাছে বিক্রি করেও রেহাই নেই—ফিরে এল সে; পাইকার টাকা ফেরৎ নিয়ে গেল। কালাপাহাড়কে বিক্রি করা গেল না—রংলাল 'ফিরিল', 'হাসিতে হাসিতে'। অথচ হাটে যাবার সময় 'পথে সে অনেক কাঁদিল। এই হাট হইতেই কালাপাহাড়কে সে কিনিয়াছিল।' রংলালের ছেলে যশোদার কাছে এই হাসিকান্নার মূল্য নেই—সে 'লেখাপড়া জানা রোজগেরে ছেলে'; তাকে অমান্যও করা যায় না। সুতরাং কালাপাহাড়কে বিক্রি করা হল শহরের গো-হাটায়। বিক্রি করে ফিরল 'চোখ দিয়া জল' ফেলতে ফেলতে। আর সেই মোষ—পাগলের মতো রংলালকে খুঁজতে খুঁজতে শহরের পথে ছুটে ফিরল। কালাপাহাড়কে দেখে ভয়ে পালাচ্ছে সমস্ত লোক, পানের একটা দোকান ভেঙে ফেলার পর পুলিশ সাহেবের মোটরের ধাক্কা আর গুলিতে মারা গেল সে।

সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'বাংলা সাহিত্যে' কালাপাহাড়ের একটি মাত্র তুলনা শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' (উক্ত; ১১ পৃ.)। তারাশঙ্করের এই আশ্চর্য গল্পের মর্মোদ্ধারে এখানে সম্পাদক জগদীশ ব্যর্থ। 'মহেশ' একটি সার্থক গল্প সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা গল্প। তবে 'কালাপাহাড়'-এর সঙ্গে তুলনা চলে না। 'কুম্ভকর্ণ' আর 'কালাপাহাড়' কৃষি সভ্যতা বিকাশের এক জোড়া অনুগত সহায়ক জীব। এরা প্রতীক। এদের বাদ দিয়ে রংলালের কৃষিকর্ম সম্পূর্ণ হয় না। যশোদার জীবননীতি অর্থ-সচেতন; রংলাল তেমন নয়। কুম্ভকর্ণ-কালাপাহাড়ের সাহায্যে বন কেটে বসত আর আবাদ করেছে যে কৃষক, রংলাল তাদের প্রতিনিধি। বনের হিংস্র প্রাণীর আকস্মিক আক্রমণ থেকে রংলালকে বাঁচায় তারা—একে প্রতিবাৎসল্যের নিদর্শন বলতে পারি। আবার যে ভালবাসা তারা রংলালের কাছে পেয়েছে, তারও তুলনা নেই। অন্যপক্ষে অন্য পরিবেশে এই সম্পর্ক বদলে যায়। নগরজীবন বন্যজন্তুর চেয়ে ভয়াবহ হয়ে পড়ে। একজোড়া মোষের একটি চিতার থাবায়, অন্যটি অকরুণ শত্রুভাবাপন্ন পুলিশ সাহেবের গাড়ির ধাক্কায়, পিস্তলের গুলিতে মারা যায়। সভ্যতা বিকাশের আদিম আর আধুনিক ছকের মাঝখানে রাঢ়ের কৃষিজীবন—এই জীবন পরিবেশটি প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই তারাশঙ্কর এমন জীবন-সংবেদী গল্পটি লিখতে পেরেছেন। এ-গল্প নিছক ছোটগল্প নয়—তারাশঙ্করের জীবন-অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। আর গল্পটি বৃত্তধর্মীও নয়—open ended.

'মহেশ'-এর মৃত্যু গফুর আমিনকে চটকলের দিকে চলে যেতে বাধ্য করেছে। সেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিপাদ্য 'গো-ব্রাহ্মণ হিতায়' চিরন্তন সমাজব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছে। ব্রাহ্মণ জমিদার গো-সেবার যাবতীয় দায় চাপিয়ে দিয়েছে গো-খাদক বলে কথিত গরিব মুসলমান কৃষি শ্রমিক গফুরের ওপর। গ্রামীণ সভ্যতার প্রতিনিধি গফুর মহেশকে রক্ষা করতে চেয়েছে কারণ গো-সম্পদ আর গ্রামজীবন অভিন্ন। এসব কথা শরৎচন্দ্র স্পষ্ট করেননি। তবে 'মহেশ'-এর নিবিড় পাঠে তা স্পষ্ট হয়। সুতরাং 'মহেশ' আর 'কালাপাহাড়' তুলনীয় নয়—হয়তো বা পরিপূরক। কালের বিচারে 'কালাপাহাড়' পূর্ববর্তী সাংস্কৃতিক বাস্তবের প্রতিনিধি।

'সমুদ্রমন্থন' বা 'স্থলপদ্ম', 'ট্যারা' বা 'ইস্কাপন' তারাশঙ্করের নতুন নতুন মাত্রার ছোটগল্প। এগুলিতে কখনো সমাজ-পটভূমি স্পষ্ট। বিলীয়মান জমিদারি আভিজাত্যের প্রতিনিধি উমানাথ—মন্বন্তরের ক্লিষ্ট রিক্ত পরিস্থিতি তাকেও ছুঁয়েছে; প্রজার কাছে খাজনার অংশ ভিক্ষা করতে গেছে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে দেশের এক বিশিষ্ট দৃশ্য : 'গ্রাম প্রান্তের বাউড়ি পাড়াখানা জনশূন্য পরিত্যক্ত; অভাবের তাড়নায় বাউড়িরা দেশ ছাড়িয়েছে।'

ধাত্রী দেবতা-র নায়ক এইরকম পরিবেশেই দেখতে পেয়েছে 'বস্ত্রহীন নগ্নবক্ষে সন্তানের অক্ষয় অমৃতভাণ্ডার পয়োধর শূন্য' নারীদের। কিংবা তার অব্যবহিত পরের ভাবনা :

"আনন্দমঠের সেই মূর্তি— মা যাহা হইয়াছেন।

শিবনাথ নতমস্তকে ভাবিতে ভাবিতে সেখান হইতে ফিরিল, কেমন করিয়া, কোন্ সাধনায় মাকে আত্মস্থ করিয়া, 'মা যাহা হইবেন'—সেই মূর্তিতে প্রকটিত করা যায়। কোন্ সে মন্ত্র!" প্রসঙ্গত একটি কথা বলে নিই। ১৯৮৪ সালে *আনন্দমঠ*-প্রকাশের শতবর্ষ উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করি—উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। আলোচনা সভাব শেষে প্রবন্ধটি পাঠিয়ে দিই 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায়। ১৯৮৫-তে সে লেখাটি ছাপা হয়। বিষয়বস্তু ছিল *আনন্দমঠ* আর তারাশঙ্করের *ধাত্রী দেবতা*-র তুলনা। ২০০১-এ প্রকাশিত প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*—গ্রন্থে একই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ দেখলাম। এ সব বিষয়ে আলোচনা বিস্তারিত করার হেতু দেখি না। সচেতন পাঠকের বিবেচনার জন্য অপেক্ষা করাই ভালো।

'সমুদ্র মন্থন'-এর উমানাথ আর *ধাত্রীদেবতা*-র শিবনাথ তারাশঙ্করের আত্মপ্রক্ষেপ।

'স্থলপদ্ম'-এ আছে তারাশঙ্করের *ধাত্রীদেবতা*-র পটভূমিরই সামান্য বিশেষ চেহারা।— 'গ্রামের প্রান্তে পায়রা খুপির মত ছোট ছোট ঘর, চারিদিকে আবর্জনা—কালিপড়া হাঁড়ির গাদা, ছাইয়ের রাশ, দুর্গন্ধে বাতাস বিষের মত ভারী। অধিবাসীগুলা এই আবর্জনার মতই নোংরা, কালিমাখা হাঁড়িগুলার মতই গায়ের রং, দেহের কাঠামো খাপছাড়া রকমের দীর্ঘ, গায়ে মাংস নাই, মেয়েগুলারও তাই, তার ওপর শ্রীহীন সাজে আরও কুৎসিত দেখায়, মাথায় খাটো চুলের যোগান দিয়া বিড়ের মত প্রকাণ্ড খোঁপা—তাহাতে অগুণতি বেলকুঁড়ির সারি, পরনে বাহারে পাড় শাড়ী, কিন্তু ময়লা চিট, আর পরিবার সে কি ভঙ্গি! ছোটলোকের দল সব, সমাজে আবর্জনার সামিল, গ্রামের এক প্রান্তে আবর্জনার মতই পড়িয়া আছে।'

এই পরিবেশই তারাশঙ্করের আসল ক্ষেত্র। 'ইস্কাপন'-এর ক্ষেত্র মন্বন্তরের কলকাতা শহর। গ্রাম ছাড়া, প্রেমিকা 'পটলি'-র কাছে বঞ্চনা পাওয়া, সর্বরিক্ত ইস্কাপন ক্ষিতীশের ট্যাক্সি চালাত— কলকব্জা বুঝত ভাল। তবে সেই ট্যাক্সিও এখন অচল—পেট্রল অমিল। অকরুণ পৃথিবী তার সামনে—অত্যাচারে ক্লিষ্ট, শোষণে শুষ্ক সে—'ঘর কেড়ে নিয়েছে জমিদার, ট্যাক্সি বন্ধ হয়েছে, ইস্কাপনের কাজ গিয়েছে।' ভেবেছিল কাশী যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এ-আর-পি অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার হল। শহরের নানা প্রান্তে তখন 'দুঃস্থ মরণোন্মুখ ভিখিরী'তে ভরে গেছে। 'মড়া বয়েই পেট চলছে' তার। অনন্যোপায় ইস্কাপন—তার গাড়িটি 'যমের গাড়ি' হয়ে উঠল এইভাবে। [অচিন্ত্য বিশ্বাস : "মন্বন্তরের সঙ্কট ও তারাশঙ্করের ছোটগল্প" : 'তীব্র কুঠার', শারদ সংখ্যা; ১৪০০—ক্রোড়পত্র-তারাশঙ্কর]

'ট্যারা' গল্পটিতে এক অনাথ বাউরি কিশোরের সন্ন্যাসী হবার চেষ্টা ও পরিণতি দেখানো হয়েছে। ট্যারা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য : 'এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এমন বিশেষত্বহীন অবজ্ঞাত সংখ্যার হিসাব নাই। বর্ণ নাই, বৈচিত্র্য নাই, সমারোহ নাই, কিন্তু নিতান্ত নগণ্য পার্শ্বদৃশ্য। কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়া বিরাট নাটক হইবে অসম্পূর্ণ। তবু রঙ্গালয়ের ইতিকথার মধ্যে ইহাদের উল্লেখ থাকে না।'

সৈনিক-বৃত্তি ছেড়ে উত্তর ভারতের কোন অঞ্চল থেকে আসা এক সন্ন্যাসীর কাছে ট্যারা আর ভোলা—এই দুটি সেবকের আবির্ভাব হয়। শেষে সন্ন্যাসী মারা গেলে তার আসনে

গর্দিয়ান হয় ভোলা, কারণ যে ব্রাহ্মণ। ট্যারা ফিরে যায় গ্রামে—সেই বাউরি পাড়ায়, যেখান থেকে শুরু হয়েছিল তার অভিযান। (অচিন্ত্য বিশ্বাস : "সমুদ্র মন্থন ও নীলকণ্ঠ মানুষ-মানুষী"---*গল্পকার তারাশঙ্কর : প্রতিভা ও মূল্যায়ন* গ্রন্থভুক্ত। উক্ত ; ৯৫ পৃ.) 'স্বজাতির মধ্যে' তার 'মহাসমাদর' হয়েছে।

তারাশঙ্কর স্বশ্রেণীর কাহিনী অনেক লিখেছেন। এগুলির মধ্যে 'রায়বাড়ি'র কথা লিখেছি। আরও আছে; 'জলসাঘর' বা 'না'-এর এর মতো গল্প। 'সমুদ্রমন্থন' বা 'বোবাকান্না'-র মতো কাহিনীও। এসব গল্পেই পরিবর্তমানকাল, বিলীয়মান আভিজাত্য অদ্ভুত সংস্কারের বহুমুখী প্রভাবের চিত্র পাই। তারাশঙ্কর অবশ্য নিজের শ্রেণীকে সর্বদা সমর্থন করেননি। তিনি বহু সময়েই স্ব-শ্রেণীর ব্যবহার ও বিকৃত সংস্কারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেছেন।

তারাশঙ্করের ছোটগল্প তাঁর কথাশিল্পের দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব বা ঘটাকাশের মতো; আসল চিত্র বা রূপ তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাস রচনায় তারাশঙ্করের সিদ্ধির চাবি-কাঠি তার বিপুল অভিজ্ঞতার সীমানা। তিনি এই সীমানাকে পাঠকের সামনে রূপে রূপান্তরে তুলে ধরেছেন। আমরা এবার সেই বিশাল পটভূমির দিকে সামান্য নজর দেব। তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক প্রতিভা আমাদের বক্তব্য হলেও কখনো কখনো ছোটগল্পের আলোচনাতেও ফিরে আসতে হবে। কারণ তারাশঙ্করের কলমে বহু সময়েই এই দুই শিল্প সংরূপের স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়নি। তিনি মূলত ঔপন্যাসিক—আমাদের সিদ্ধান্ত এদিক থেকেও সমর্থিত হতে পারে।

তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাসগুলি আঞ্চলিক। কবি-সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন : 'আধুনিক যুগে আঞ্চলিক সাহিত্যের পথিকৃৎ হলেন শৈলজানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের আঞ্চলিক সাহিত্য ব্যাপকতা ও পূর্ণতা পেয়েছে । উত্তর-রাঢ়ের মাটি ও সমাজ ঐ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিশে তাঁর রচনায় অবিনশ্বর হয়ে উঠেছে।' (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প* : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা; দ্বাদশ মুদ্রণ; ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ; ভূমিকা-৬ পৃ.) জগদীশবাবু বোধহয় স্মরণ রেখেছেন তারাশঙ্করের *আমার সাহিত্য জীবন*-এর এই অংশ :

> 'সিউড়ীতে মশকের উপদ্রবের অবস্থাটা অন্ধের দিবারাত্রির মতো, ওর আর শীত-গ্রীষ্ম নাই। জেগে বসে বিড়ি খাই গুন গুন করে গান গাই। এমনি অবস্থায় হঠাৎ হাতড়ে মিলল একখানা মলাট ছেঁড়া "কালিকলম" পত্রিকা।
>
> আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র।
>
> "পোনাঘাট পেরিয়ে" লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।
>
> পড়ে গেলাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল। মশকের গানে বা দংশনেও কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারলে না।
>
> ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
>
> অদ্ভুত। বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়!'
>
> (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: "তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা"; *আমার সাহিত্য জীবন*, প্রথম খণ্ড; নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি., দ্বিতীয় সংস্করণ; কলকাতা; ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ ৩০২ পৃ.)

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের রচনার দ্বারা প্রাথমিকভাবে প্রভাবিত হলেও অচিরেই তারাশঙ্কর স্বপথে স্বকীয়ভাবেই হেঁটেছেন।

তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। শিশির বসু সম্পাদিত 'এক পয়সার শিশির' পত্রিকায় একটি উপন্যাস মুদ্রিত হয়। তারাশঙ্কর *আমার সাহিত্য-জীবন* রচনার সময় শিশির বসুর কাছেও পত্রিকাটি দেখতে পাননি। তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন : 'বইখানির নামও মনে নেই, তার কোনো চিহ্নও নেই।...তখনও নতুন যুগের রচনা পড়ে পথ পাইনি, শরৎচন্দ্রকে অক্ষমভাবে অনুকরণ করেছিলাম।' ('তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা'; উক্ত; ৩১৬ পৃ.) সে বইখানা পাওয়া যায়নি, সুতরাং তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস হিসাবে ধরতে হবে *চৈতালী ঘূর্ণি*-কে। ১৯৩১ সালে এই ছোট্ট উপন্যাস প্রকাশিত হয়। আঞ্চলিক উপাদান এ-উপন্যাসে স্পষ্ট হয়নি তবে মহৎ-ঔপন্যাসিকের ইঙ্গিত সেখানে হাজির। এ নিয়ে অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি। এটি ছোটগল্প 'শ্মশানের পথে'-র উপন্যাসরূপ হলেও *চৈতালী ঘূর্ণি* বড়জোর নভেলেট হতে পেরেছে—"উপন্যাসের বিস্তার আর চরিত্র বিন্যাসের প্রক্রিয়া এখানে নেই। 'চৈতালী ঘূর্ণি'-কে এক অর্থে ছোটগল্পের ধরনের রচনাই বলতে হয়। কিন্তু যে কোনো বড় শিল্পীর ক্ষেত্রেই যেমন হয়—*চৈতালী ঘূর্ণি*-তেই বোঝা যায় এই লেখক বড়লেখক হয়ে উঠবেন। ছোট ছোট আঁচড়ে তাই মহত্তের আভাস ও ইঙ্গিত।" [অচিন্ত্য বিশ্বাস : "অনাগত কালবৈশাখীর প্রার্থনা : তারাশঙ্করের 'চৈতালী ঘূর্ণি'': 'আজকের সভ্যতা'; ঢাকা, বাংলাদেশ; সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮]

চৈতালী ঘূর্ণি ছোট আকারের উপন্যাস। এতে আছে গ্রামীণ সামন্ততন্ত্র ও নাগরিক পুঁজিতন্ত্রের অমানুষিক শোষণ, শোষণে ক্লিষ্ট যাদের জীবন তেমনি এক দম্পতির সব হারাবার বেদনার চিত্র। তিনটি কারণে বলা যায় এই উপন্যাস তারাশঙ্করের পরবর্তী উপন্যাস সাহিত্যের ইঙ্গিতবহ

(১) এ-উপন্যাসের কালচেতনা গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে *চৈতালী ঘূর্ণি* রচিত। যোগী মোড়লের বৈঠকে রমাপতি মাস্টারের খবরের কাগজ পড়ার কথা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। বুড়া বিরক্ত হয়ে বলে—'কাপড় সস্তা কখন হবে তাই বলো হে মাস্টার?'—বস্তুত মারী মড়ক মন্বন্তর আর যুদ্ধ—তারাশঙ্করের উপন্যাস সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল পটচিত্র দেখা দিয়েছে, *চৈতালী ঘূর্ণি*-তে তার সূচনা ঘটেছে। শ্রমিকদের মধ্যে একই ভাবনা—'পোড়ার মুখোরা বলে আবার, যুদ্দু লেগেছে গো যুদ্দু লেগেছে।' সাবি বলে তার চোখের সামনে ন আনার কাপড় হয়েছে ন সিকে, দু-পয়সা ঝিঙের দাম হয়েছে দু'আনা।

(২) গ্রাম জীবনে শোষণের চিত্র হিসাবে *চৈতালী ঘূর্ণি* খুব বিস্তৃত নয় তবে ইঙ্গিতপূর্ণ। গোষ্ঠ-দামিনীর একমাত্র সন্তান এ উপন্যাসের শুরুতে মারা যায়। তার মৃত্যু গোষ্ঠ-দামিনীর প্রেম-পরিপূর্ণ জীবনের সব সাধ আহ্লাদ দেয় শেষ করে দেয়। সামান্য এক ফালি জমির ফসল যেমন তারা রক্ষা করতে পারে না—এই একমাত্র শিশুর মৃত্যুও তারা রোধ করতে পারেনি। এই ফসল ও সন্তানের মৃত্যুর চিত্রটির পাশাপাশি *চৈতালী ঘূর্ণি*-র মৌল কথাবস্তু হল শোষণের কার্যকারণটিকে স্পষ্ট করা।

গ্রাম ত্যাগ করে অনিবার্য ভাবে তারা এসে পড়ে শিল্প নগরে। সেখানে এসে একটি অন্য পরিবেশের সম্মুখীন হয়। সেখানে 'লোহার দোকান, শুধু ঝনঝন শব্দ, মাটির বুক ফালি করিয়া ফাঁড়িয়া ফেলিবার কত অস্ত্র', 'সব যেন তীক্ষ্ণ হিংস্র', 'সারি সারি কালো সুকঠিন লোহার লাইন, মাটির বুক চিরিয়া পাতা; লোহার বাঁধনে দুনিয়াটাকে বাঁধিবার কি সে উদগ্র চেষ্টা!' এইখানে নীতিভ্রষ্ট, সংস্কার ও সংস্কৃতিশূন্যতার মধ্যে শোষণের পরিস্থিতি আরও

গভীর ও ভয়ঙ্কর। শ্রমিকরা জমাট বস্তি করে শপথ নেয়—ধর্মঘট করে। তারাশঙ্কর দেখান গোষ্ঠ সেই আন্দোলনে আত্মবলি দেয়।

ভিতরের তত্ত্বটি এ-কাহিনী থেকে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়—গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো যাদের সম্পদ ও শিশুকে হরণ করে, ধনতান্ত্রিক কাঠামো তাদের সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দিল। নিরন্ন ব্যথিত শ্রমশীল মানুষের এইরকম অনিবার্য মৃত্যুর ভূমিকাই দেখাতে যান তারাশঙ্কর।

(৩) দামিনীর প্রতি সামান্য আকর্ষণ বোধ করে প্রতিবেশী সুবল। সুবলের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর ভবিষ্যৎ উপন্যাস জীবনের বেশ কিছু চরিত্রের ইঙ্গিত রেখে যান। সুবল বৈষ্ণব ভিক্ষুক, ভিক্ষার অন্ন থেকেই সামান্য পুঁজি গড়ে তোলে সে—হয়ে ওঠে মহাজন জাতীয় চরিত্র। গোষ্ঠ-দামিনীর জীবনের প্রতি লুব্ধ তার দৃষ্টি—কখনোই সীমানা ছাড়ায় না, কিন্তু দামিনী তাকে কোনোমতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না—সে ঠিক বোঝে সমস্ত ভালোমানুষীর আড়ালে সুবলের মধ্যে নীচ যৌনকাতর এক বিকৃত মানুষ রয়েছে। প্রবৃত্তির এইরকম প্রসাধন *চৈতালী ঘূর্ণি*-তে স্পষ্ট নয় তবে উপাদানটি পরবর্তী উপন্যাস সাহিত্যে আরও ভালভাবে প্রকাশিত।

রামভল্লা নামে একটি চরিত্র এনেছেন তারাশঙ্কর। অপরাধী ধরনের মানুষ। 'লোকে শুধু' তাদের 'ঘেন্না করে না, ভয়ও করে।'—জানে রামভল্লা। আরও জানে, 'ভদ্দর লোককে না মানলেই সে ডাকাত।' গোষ্ঠ বিরক্ত হয়ে তার সাহায্য চেয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মোহহীন, তথাকথিত অপরাধপ্রবণ এইরকম চরিত্র তারাশঙ্কর পরেও এনেছেন।

গভীর সত্যস্পর্শী সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বাস্তবকে অতিক্রম করে কাল্পনিক রোমান্টিক ভাবাদর্শকে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন নি *চৈতলী ঘূর্ণি*-তে। শ্রমিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শিবকালী বা সুরেনের মতো আদর্শবাদী ভদ্রলোকের নেতৃত্বই থেকে যায়। ফলে স্থায়ী শ্রমিক আর বাউরিদের মতো অস্থায়ী শ্রমিকদের স্বার্থের পার্থক্যও তারাশঙ্কর আনেন। সব মিলিয়ে এই উপন্যাসের শেষে তারাশঙ্কর যে কথা লিখেছেন—'চৈত্রের ঘূর্ণি হয়ত বা কালবৈশাখীর পূর্বাভাস', তা হয়ে ওঠে তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের পক্ষেও যেন অনেকটাই ভূমিকা স্বরূপ।

শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন যে সমাজবদলের অনিবার্য ভূমিকা হিসাবে উপস্থিত হতে চলেছে তারাশঙ্কর সেকথা মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠ করে জেনেছেন এমন নয়। পুথিগত মার্কসবাদের দীক্ষা না থাকলেও সমাজ-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ছিলেন তারাশঙ্কর, তাই বুঝতে পেরেছিলেন জগতের গতি কোন্ পথে। *আমার সাহিত্য জীবন*-এর অংশ তারই নির্দেশক :

> 'হাজার হাজার বৎসর ধরে মানুষের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝেছিলাম। উনিশশো যোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষের মধ্যে ঘুরে এইটুকু বুঝেছিলাম যে, সে দিন আসতে আর দেরি হবে না। রুশ বিপ্লব সেই দিনের উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকার গুমোটের মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে; এর জন্য মার্কসবাদ পড়তে হয়নি আমাকে।' [*আমার সাহিত্য জীবন*; উক্ত; ৩৬৩ পৃ.]

অবশ্য 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর সভাপতি হিসাবে সামান্য কিছুদিন থাকা ও জ্ঞাতসারে সেই সংগঠনের উপযোগী সাহিত্য-কর্ম উপহার দেওয়ার পর্বটি অতি সংক্ষিপ্ত। তবু এই পর্বে রচিত তারাশঙ্করের সাহিত্যের সঙ্গেই বিশেষভাবে *চৈতালী ঘূর্ণি*-র সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে পারে।

'তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর' শীর্ষক প্রবন্ধে গোপাল হালদার এই পর্বে লেখা *অভিযান* নামে একটি উপন্যাসের কথা লিখেছেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই উপন্যাসটির জন্য তারাশঙ্কর কোনো পারিশ্রমিক নেননি। (গোপাল হালদার : 'তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর' : 'কালি ও কলম', অগ্রহায়ণ; ১৩৭৮) তিন বা চারশ টাকা তাঁরা দিতে চেয়েছিলেন—তারাশঙ্কর নেননি। পরামর্শ দিয়েছেন ''টাকাটা রাখুন। ওটা আমার হয়ে 'পরিচয়'-এ জমা দেবেন—পত্রিকাটি ভাল করে চালান্।'' (ঐ) পুস্তকাকারে বের হবার পর (পৌষ ১৩৫৩) উপন্যাসটি উৎসর্গ করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। উপন্যাসে খেটে খাওয়া মানুষ গিরবরজা গ্রামের ছত্রী মোটর ড্রাইভার নরসিং-এর প্রেম জীবনের কথা তুলে ধরেছেন লেখক। জান্‌কী তার স্ত্রী, মেরী নীলিমা দাস তার স্বপ্নের নায়িকা। জান্‌কী মারা যাবার পর কট্‌কি নামের এক নারীর আদিম জৈবিক আকর্ষণ ঘিরে তার জীবন কাটতে থাকে। শ্রমজীবী মানুষের কথার চেয়ে এ-কাহিনী হয়ে উঠেছে শ্রমজীবী নারসিং-এর ব্যক্তিগত প্রেমপ্রীতি আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা।

১৩৫০-এ 'শারদীয় আনন্দবাজার'-এ প্রকাশিত *মন্বন্তর*-এর পটভূমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৪৪-এর জানুয়ারিতে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় *মন্বন্তর* আরো বড় হয়। এ-উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি কলকাতাবাসী—অভিজাত সমাজ থেকে স্খলিত অবক্ষয়িত মানুষ। চেতনার এক উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে স্বশ্রেণীকে ঘৃণা ও জগৎ-পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা এসময় কলকাতা শহরকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন সেই সময়ের দলিল। সুখময় চক্রবর্তী কলকাতা শহরে পঞ্চাশ বিঘে জমির ওপর গড়েছিল বস্তি। সেখানকার আদায় থেকে চলত তার বংশধরদের জীবন। দশকাঠা জমির ওপর বিশাল দোমহলা বাড়ি। 'পৃথিবীর প্রকাণ্ড বাড়িগুলির মধ্যে ওই একই নাটকের অভিনয় চলছে'—অনুভব করে এই উপন্যাসের নায়ক, নতুন দিনের মানুষ—কানাই চক্রবর্তী। দেখে সে তার আশেপাশের সব কিছু দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। রায়বাহাদুরের বাড়ি ছেলে পড়িয়ে, তাদের ছেলের পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ার পুরস্কার হিসাবে একশোটা টাকা পায় সে। সেই টাকার সংবাদ জানার পর তার বাড়ির প্রতিটি মানুষের লোভী নীচ ও কদর্য রূপটি দেখতে পায়। রাত্রে দেখে তার বাবা ঐ টাকায় গোপনে মদ মাংস খাচ্ছে—মা পবিবেশন করছে। তৎক্ষণাৎ ঘর ছাড়ল সে। কানাইয়ের সঙ্গী জুটল গীতা। গীতা তার বোন উমার বন্ধু।

গীতাও একটি অভিজাত পরিবারের মেয়ে। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য এখন দেউলিয়া। তার স্ত্রী সরোজিনী। এক ঘটকী-রূপিণী মহিলা (বামুন দিদি)-র চক্রান্তে গীতা ধর্ষিতা হয় বি. মুখার্জী পরিবারের অমলের দ্বারা। লাঞ্ছিতা গীতার সঙ্গে নাটকীয় সাক্ষাৎ ঘটে কানাইয়ের। দু'জনে যোগ দেয় কমিউনিস্ট দলে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দলের গোষ্ঠীর নেতা বিজয়দার ভাষায় 'এই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে মানুষের মহামন্বন্তর।' ক্রমশ কানাই সম্পর্কিত হয় উকিল দেবপ্রসাদ সেনের কন্যা নীলার সঙ্গে। নীলার চোখে পিতার কদর্য মনটি ধরা পড়ে নাট্যশালায়, যেদিন স্টুয়ার্ট আর ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে নাটক দেখছিল নীলা। প্রগতিশীল পিতা তাকে কদর্য ইঙ্গিত করে। নীলা ভাই নেপীকে নিয়ে চলে আসে পার্টির আশ্রয়ে। এইভাবে চারের দশকের কলকাতা শহরে কিছু উচ্চবর্গের যুবক-যুবতী তাদের স্বশ্রেণীর প্রতি তীব্র ঘৃণাকে নির্ভর করে নতুন সমাজ গড়ার কথা ভেবে গড়ে তোলে সর্বহারাদের সমাজ—কমিউন। জানা যায়, গীতাকে লাঞ্ছনা করেছে যে অমল—সে শহরের কালোবাজারিদের মধ্যে সবচেয়ে বড়, যাদের গুদামের চাবি হারিয়ে গেলে কলকাতা খেতে পাবে না, তাদের

বাড়ির ছেলে! এই সমস্ত ঘটনার জাল বুনে তারাশঙ্কর *মন্বন্তর*-এ এনেছেন শ্রেণী-সংঘাতের পরিস্থিতি। গোষ্ঠের মতো শ্রমিক না থাকায় এ-উপন্যাসে যথাযথ শ্রেণী সংগ্রামের রূপায়ণ হয়নি; বস্তুত *মন্বন্তর* হয়ে পড়েছে কয়েকটি উৎকেন্দ্রিক ঐতিহ্যচ্যুত নরনারীর মন দেওয়া নেওয়ার-খেলা। গীতাকে সহানুভূতি দেখিয়ে ভালোবাসার অভিনয় করে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় কানাই; মনে মনে সে ভালোবাসে নীলা সেনকেই—আর নীলা সেনও কানাইকে মন দিয়ে রেখেছিল। সুতরাং গীতা এই সত্য জানার পর কানাইকে নীলার জন্য ত্যাগ করে। যে ঘটনার ব্যাপ্তি হতে পারত আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের বাস্তব চিত্র তাকে রম্য উপাদানে মুড়ে দিয়ে তারাশঙ্কর উপন্যাসটির সম্ভাবনা নষ্ট করে ফেলেছেন। এ যেন রবীন্দ্রনাথের *চার অধ্যায়* বা শরৎচন্দ্রের *পথের দাবি*-র মতো রাজনীতির সংস্পর্শে আসা সমাজ ও পরিবার-বিচ্ছিন্ন মানুষের মন দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী। অবশ্য *মন্বন্তর*-কে বলতে হয় বেশ উন্নত ধরনের রচনা। রাজনীতি খুব স্পষ্ট না হলেও চার দশকের কলকাতার রোমান্টিক বিপ্লব-বিলাসী যুবক-যুবতীদের ছবি হিসাবে এর কিছু কাল-চিহ্নিত মূল্য আছে। বাংলার নগর-কেন্দ্রিক সাম্যবাদী আন্দোলন সে সময় এব চেয়ে অনা কিছু ছিল কিনা সে প্রশ্নে নাই বা গেলাম।

কালিন্দী রচনার প্রেরণায় বাম আন্দোলন নেই। এই উপন্যাসে আছে কালি তথা কালিন্দী নদীতে চর জেগে ওঠা, আদিবাসী সমাজের এক দল সরল মানুষের জমি তৈরি করা—সোনার ফসল ফলানো আর সেই চরের দখল নিয়ে জমিদারদের দুই শরিক—রামেশ্বর ও ইন্দ্র রায়েব রেষারেষি। সাঁওতাল সমাজের চোখে রামেশ্বরের ছোট ছেলে অহীন্দ্রকে 'রাঙাবাবু' বলে দেখা আর তার মধ্যে তাব পূর্বপুরুষ 'রাঙাঠাকুর' কে দেখতে পাওয়ার মধ্যে উপন্যাসে আর একটা জট তৈরি করেন ঔপন্যাসিক। এখানে তারাশঙ্কর সামান্য তথ্যের ভুল করেছেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও মুণ্ডা বিদ্রোহের মধ্যে গোলমাল ঘটে গেছে, তাছাড়া সাঁওতাল বিদ্রোহে কোনো ব্রাহ্মণ জমিদারের অংশ নেওয়া—'রাঙাঠাকুর'-এর মতো হয়ে ওঠা ছিল অসম্ভব, অনৈতিহাসিক ব্যাপার। কালিন্দীর চর সাঁওতালদের চোখে 'রাঙাবাবুর চর' হওয়াটাও রীতিমত আকস্মিক ঘটনা। উপন্যাসের ন্যায়ে একে স্পষ্ট স্বীকার করা চলে না। (অচিন্ত্য বিশ্বাস : "অন্ধকারের অন্তরে", 'পরিচয়', তারাশঙ্কর বিশেষ সংখ্যা ১৪০৪ বঙ্গাব্দ আর অচিন্ত্য বিশ্বাস : "আর এক আরম্ভের ভূমিকা" : ধ্রুব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, রত্নাবলী; কলকাতা; ১৯৯৯; পশ্য) শুনেছি, এই আলোচনা দেখে তারাশঙ্কর-অনুরাগী কেউ কেউ সামান্য ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। এর প্রতিক্রিয়া জানানোর কোনো হেতু দেখিনা। বস্তুত আমরা এই তথ্য বিভ্রান্তির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের উপন্যাসটির অভ্যন্তরীণ ন্যায়কে চঞ্চল করার চেষ্টা করিনি। অর্থাৎ আমরা কোনো নেতিমূলক দৃষ্টিতে ঐ প্রবন্ধের যুক্তি উত্থাপন করিনি। আমাদের বক্তব্য, তারাশঙ্কর ইতিহাসের সরল রেখাটি সর্বত্র মেনে চলেন নি। আমাদের কথা শুধু এইটুকু। বস্তুতপক্ষে উপন্যাস-শিল্পে কল্পনা আর সত্য মিলে মিশেই থাকে—কিন্তু কল্পনাকে বাস্তবস্মত এবং ইতিহাস-নিষ্ঠ হতে হবে। ইতিহাসকে আমরা কোনো তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখতে চাইছি না এখানে। যেরকম দৃষ্টিতে দর্শনের অধ্যাপক বিশিষ্ট গল্পকার হাসান আজিজুল হক লিখেছেন—'সময়ের অচলতা বা ইতিহাস হীনতাকেই কি তারাশঙ্কর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' বা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে দেখাতে চেয়েছিলেন? না, জীবনের অজেয়তা বর্ণাঢ্যতা প্রবলতা ? বলতে চেয়েছিলেন কি জীবনের জন্য ইতিহাস নিষ্প্রয়োজন?'

("তারাশঙ্কর : জীবনের গাঢ় সমাচার" ; প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*-গ্রন্থভুক্ত; উক্ত: ৯৭ পৃ.) যাইহোক কালিন্দীর ইতিহাস বিভ্রান্তিতে নিষ্ঠার তেমন প্রমাণ নেই। এর পরও যদি কেউ মনে করেন ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে আমার কলম শাসন করার এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করেছে—আমি নাচার।

কালিন্দী উপন্যাসে দুটি জমিদার পরিবারের পারস্পরিক রেষারেষিতে চাষি প্রজাদের যুক্ত হয়ে পড়া, পাড়ার পরিবেশকে নিম্নরুচির কথাবার্তা চালাচালিতে পর্যবসিত করা, বিমাতার মান রক্ষার্থে মহীন্দ্রের মানুষ খুন; শেষে জেল যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা রয়েছে। রামেশ্বর এ-উপন্যাসে প্রতীকি চরিত্র। তার অন্ধকার বাস জমিদার পরিবারের অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য স্বেচ্ছা-আত্মনিগ্রহ। এ মূলত মনস্তাত্ত্বিক আত্ম-নিপীড়নের মতো। *কালিন্দী* উপন্যাসের শেষে রামেশ্বর শুনতে পায় তার ছোট ছেলে অহীন্দ্রও জেলে গিয়েছে। অপরাধ—কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামি অহীন্দ্র। যে ব্যবস্থার সে ফসল সেই ব্যবস্থারই বিরুদ্ধাচরণ করতে চেয়েছে সে। অনেকটা যেন *মন্বন্তর*-এর চরিত্রগুলির মতোই। রামেশ্বর বোধ করে তার যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অপরাধের—তার শুধু নয় তার শ্রেণীর—আজ প্রায়শ্চিত্ত হল। খেয়াল হল তার—আর তার হাতে সেই গলিত কুষ্ঠের ছোঁয়া নেই। মহীন্দ্রের আত্মশুদ্ধি পরিবারের ভেতরকার দম্ভ অহঙ্কারকে দূর করেছে—অহীন্দ্রের আত্মত্যাগ শ্রেণীগতভাবে অন্যায় আচরণের সমস্ত দোষ স্খালন করেছে। সুতরাং রামেশ্বর এবার আলোয় এসে দাঁড়াবে—এক যুগ পার করে! এরপরও তারাশঙ্কর সম্পর্কে বামপন্থী কট্টর রাজনৈতিক সমালোচনা তিনি বিলীয়মান. সামন্ততন্ত্রের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টির অতীতচারী সাহিত্যিক! কালিদাস রায়ের বিশ্লেষণ মনে পড়ছে আমাদের।—কালিদাস রায় লিখেছেন এক 'অসম্যকদর্শী সমালোচক' নাকি তাঁকে বলেছিলেন—যে Feudal system মানব সমাজের কলঙ্ক, সেই Feudal system দেশ হতে চলে যাচ্ছে বলে তারাশঙ্করের দুঃখের অবধি নেই।' ('কথা সাহিত্য'; অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮) কথাটি সত্য হলে *কালিন্দী*-র রামেশ্বর রায়কে ভাবা যায় না।

ইন্দ্র রায় আর যোগেশ মজুমদার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র। *কালিন্দী*-র চরের দখল নিয়ে ইন্দ্র রায়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ বদলে যায় মহীন্দ্র কয়েদ হবার পর। এতদিন চরের অধিকার নিয়ে অহীন্দ্র-মহীন্দ্রদের বিরুদ্ধে তার যাবতীয় চেষ্টা বদলে গেল। ইন্দ্র রায়ের আসল লড়াই শুরু হল চর-পত্তনি নেওয়া চিনি কলের মালিক শিল্পপতি বিমল মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এই কাজে ইন্দ্র রায় রামেশ্বররা সফল হয়নি। বিমল মুখার্জি কালিন্দীর চর সম্পূর্ণ দখল করেছে। কমলমাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালদের একাংশ চলে গেছে ময়ূরাক্ষীর চরে নতুন করে জমি গড়ে তোলার আশায়। আবার তারা অন্য কোনো জমিদার 'রাঙাবাবু' কিংবা শিল্পপতি মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা উৎখাত হবে নিশ্চয়। সাঁওতালদের অন্যদল চূড়া মাঝির নেতৃত্বে শিল্প- শ্রমিক হবার দিকে এক ধাপ এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের এই অংশে সংঘাত সামান্য জীবন্ত মনে হয়। জীবন্ত অর্থাৎ বাস্তবের মাটি ছোঁয়া। কমল মাঝি আর সারি—এই দুই চরিত্র *কালিন্দী* উপন্যাসে বিশিষ্ট। কমল মাঝি রাঙাবাবুকে আবিষ্কার করে—অহীন্দ্রের ওপর তার অসীম নির্ভরতা আদিবাসী সমাজের সারল্য আর সহজ-জীবনবোধের পরিচয় বহন করে। সারি অপূর্ব লাবণ্যময়ী উচ্ছল প্রাণবন্ত এক নারী। সাঁওতাল সমাজের তরুণীদলের সে নেত্রী। তার এক প্রেমিকও ছিল। কিন্তু বিমল মুখোপাধ্যায় তাকে নির্লজ্জভাবে ভোগ করে—তিমিঙ্গিল সত্তা তার, ধনগর্বী

শিল্পপতির মতোই কালিন্দীর চরটিই গ্রাস করে না, তাদের সবথেকে প্রাণবন্ত নারীটিকেও নিঃশেষে শোষণ করে আখের ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলে।

কালিন্দী-তে নায়ক অহীন্দ্র তার স্বশ্রেণীর অন্যায় অপরাধ সম্পর্কে সচেতন। তার উপর প্রুঁধো ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকের প্রভাব পড়েছে। মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ তার বাড়তে থাকে। তবে গোটা উপন্যাস এইসব সূত্রে বাস্তবকে খুব বেশি নিয়ন্ত্রিত করেনি। ফলে এসব প্রসঙ্গ অনেকটাই তাত্ত্বিকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

'কালিন্দী'তে আদিবাসী জীবনের ছবিটি খুব স্পষ্ট নয়। এই পর্যায়ে তারাশঙ্কর আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন। *তামস তপস্যা* (১৯৫২), *জঙ্গলগড়* (১৯৬৪) আর *অরণ্যবহ্নি* (১৯৬৬)। *অরণ্যবহ্নি* সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর লেখা। *জঙ্গলগড়* একটু ভিন্ন স্বাদের রচনা। এখানে রোমান্স ইতিহাস আর আদিবাসী সমাজ থেকে হিন্দুসমাজের দিকে আকৃষ্ট হওয়া নিম্নবর্গের মানুষের সামাজিক সত্য অত্যন্ত সার্থকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। জঙ্গলগড়-এ দলুই সর্দার দলপৎ সিংহের কন্যা রুক্মিণী আর রাণা মাধব সিংহকে ঘিরে রোমাণ্টিক কাহিনী লিখেছেন তারাশঙ্কর। নবাব আমলে মুসলমানরা আদিবাসী অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে আর ঝাড়খণ্ড ছত্রিশগড় অঞ্চলের আদিবাসীদের সংগঠিত করছে কুমার অর্জুন সিংহ। মীর হাবিবের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। একসময় দলপতিরা তাদের উপবীত ত্যাগ করে আগুন জ্বেলে শপথ নেয়—আবার তারা বিধর্মী মুক্ত করবে দেশ। কুমার অর্জুন সিংহের ও আদিবাসী কন্যা ঝুমঝুমির প্রেম ও পরিণয়, শঙ্কর ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে ব্রাত্যত্ব মোচন আর ঝুমঝুমির অপরাজিত নামগ্রহণ ও রানি হওয়ার কাহিনী—*জঙ্গলগড়*। কল্পনার সীমা এখানে বাস্তবের ক্ষেত্রকে সামান্য স্পর্শ করেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য তারাশঙ্কর আদিবাসী সমাজের হিন্দুসমাজভুক্ত হবার প্রক্রিয়া হিসাবে তাঁর নিজস্ব মানস-প্রকল্পকেই স্থান দিয়েছেন। অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস একে sanskritization' বলেছেন। হিন্দু সমাজপদ্ধতিকে স্বীকার করে নেওয়া। অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু একে 'ট্রাইবাল অ্যাবসর্পসান ইন হিন্দুইজম' বলে চিহ্নিত করেছেন।

তামস তপস্যা-য় প্রক্রিয়াটি আরও স্পষ্ট। ১৯৪৮ সালে, সদ্য স্বাধীন ভারতবর্ষে নিম্নবর্গের মানুষদের সমাজে স্থান দেবার কথা ভেবেছেন তারাশঙ্কর। *তামস তপস্যা*-য় তারই প্রকাশ। এক ময়রার পুত্র পানু। আকস্মিকভাবে একটি খুন হয়, অত্যাচার শুরু হয় পুলিশের। ঘটনাচক্রে পানু পালাতে থাকে। যেতে যেতে সে পৌঁছে যায় এক আদিবাসী পরিবারের আবেষ্টনীতে। যাযাবর তারা। অরণ্য আদিম। কিশোর পানুর পূর্বসংস্কার সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। ধীরে ধীরে পানু আদিবাসী এক পরিবারে ঢুকে পড়ে; রুক্মিণী নামের মেয়েটির সঙ্গে তার প্রেম ও উদ্দাম জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। পরে নানা ঘটনার আবর্তনে যাযাবর পানু পথ চলতে চলতে ঘি বিক্রি করতে করতে খুঁজে পায় দিদি চারুকে। চারুর ঘরে সামান্য সময় আশ্রয় পেলেও অসংস্কৃত পানু সেখানে থাকতে পারে না। জাত হারানো এক রুক্ষ মানুষ পানু। অনন্ত পথ চলা তার। প্রথমে এক গোপের গোচারণ ও আনুষঙ্গিক কাজে সাহায্য করতে থাকে সে। সেখানে বোবা যশোদার সঙ্গে প্রেম হয়। রুক্ষস্বভাব বলশালী গোপের সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে যশোদাকে নিয়ে পালায় দূরে। যশোদা আর সে আগুন ধরিয়ে দেয় ঐ জেদি অসংস্কৃত গোপের গৃহে। এরপর কিছুদিন রাজিয়া নামে ভিখারিণি তবে ভদ্রলোকের সংস্কার ও রীতি প্রকরণ জানা নারীর সঙ্গে সম্পর্ক আর তাকেও নিতান্ত আদিম উপায়ে বিবাহ করে পানু। যশোদা ক্ষুণ্ণ হয়—আত্মহত্যা করে। তবে পানুর

সংসার থেকে একদিন রাজিয়া পালায়। আবার তাকে ফিরিয়ে আনে পানু, বোঝে রাজিয়া—পানু তাকে ভালবাসে। রাজিয়ার মাধ্যমে সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হলেও—নিতান্ত ব্রাত্য জীবন পানুর। অবিন্যস্ত অনিশ্চিতভাবে চলতে থাকে। জমিদারের একটি বাছুরের পা ভেঙে দেয় পানু। তারপর জমিদারের লোকজন তার ওপর অসম্ভব অত্যাচার করে। বাছুরটি-র পা ভেঙে দেবার পর পানুর জীবনে প্রথম অনুশোচনা দেখা যায়। এই গো-ব্রাহ্মণ হিতায় হিন্দু সমাজের ফ্রেমটি এখানে আড়াল করতে পারেন না তারাশঙ্করও। চানও না সম্ভবত। এই অনুশোচনা বাড়তে থাকলে চূড়ান্ত হয় রাজবালা তথা রাজিয়ার আত্মহননে। আর একটি ঘটনা এই উপন্যাসে খুব গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন তারাশঙ্কর। 'নমোনারায়ণ বাবা' নামে এক পশ্চিমা সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটে গ্রামান্তরে। সকলকে নিয়ে বন্যারোধের চেষ্টা করে সেই সন্ন্যাসী—'সক্ষম চাষী চইতে হাড়ী, বাউড়ী, ডোম সকলেই কোদাল ধরিবে, যেসব জাতির মেয়েরা মজুর খাটে তাহারা ঝুড়ি বহিবে, এবং সৎ জাতিরা—ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিরা (যদৃ.) চাল দিবেন; ক্ষেতের তরকারি দিবেন, সামর্থ্য যাঁহাদের আছে তাঁহারা নগদ টাকাও কিছু দিবেন—এই ব্যবস্থা হইয়াছে।'

এই সমবায় উদ্যোগে পানু যুক্ত হয় নি; সমাজে তার ভরসা নেই। অথচ তাকে যখন চরম অত্যাচার করতে এল জমিদার তখন 'নমোনারায়ণ বাবা'ই মাঝখানে দাঁড়ায়। রুক্ষ-স্বভাব পানুর মন বদলাতে পারেনি বলে রাজিয়া আত্মহত্যা করেছে। আব তার মৃত্যু পানুকে মর্মঘাতী বেদনায় পরিশুদ্ধ করেছে। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন, নমোনারায়ণ বাবার কাছে অশ্রুসজল পানুর অনুমতি প্রার্থনা, সে তার স্ত্রী রাজবালার স্মৃতিতে একটি বেদী নির্মাণ করতে চায়। পানুর জাতিত্ব থেকে পতন আর জাতি ফিরে পাবার উদ্যোগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনা, তবে এই কাল্পনিক ঘটনার সংস্থাপনে তারাশঙ্কর বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ কাঠামোটিকে চমৎকার প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তি নয় সমাজ, আদর্শ নয় সংস্কার, বিপ্লব নয় ক্রমিক পরিবর্তন এই সমাজের আদর্শ কাঠামো। তারাশঙ্করের ভাষা : 'সংসারের ঘটনার কঠিন আঘাত অতি সাধারণ একটি ময়রার ছেলেকে একটা অরণ্যবাসে পাঠাইয়াছিল। সহস্র বৎসরের অতীত সেখানকার অন্ধকারের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া লুকাইয়াছিল।...আবার সংসারের বিচিত্র আঘাতে তাহার বুকেব অন্ধকার মোচন করিয়া আলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। আজ সে বর্তমানের মানুষ হইয়া বহুসহস্র বৎসরের আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সমাজের বহুর মধ্যে অতি সাধারণ নগণ্য একজন হইয়া মিশাইয়া হারাইয়া গেল—রঙের বাটিতে এক ফোঁটা রঙের মত।' আদর্শায়িত বলে মনে হলেও তারাশঙ্করের এই নিদান একান্তই আরোপিত বলে মনে করি না। ভারতের সর্বত্র নিম্নবর্গের এই ক্রমিক আত্মোন্নয়নের ধারাবাহিকতা। একে উপন্যাসের কাহিনী কাঠামোতে ধরার মধ্যে তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সক্ষমতার পরিচয় বিধৃত আছে।

তামস তপস্যা তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাস নয়, তবে ভাবনার দিক থেকে বিচার করলে এ-উপন্যাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সমাজ সত্যের বিবেচনায় *তামস তপস্যা* ভারতীয় জাতি বর্ণ বিভক্ত সমাজের অন্তর্বাস্তবের আশ্চর্য উদাহরণ। একথা ঠিক, তারাশঙ্করের রচনায় উচ্চবর্ণের দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রকাশিত। তবে একথাও সমানভাবে সত্য, প্রত্যেক সমাজেই সাধারণ সদস্যদের মেনে চলতে হয় কিছু বিধি বিধান। সেদিক থেকে বিচার করলে *তামস তপস্যা*-র পানুর সংস্কার ও বিনয় অস্বাভাবিক নয়। এ-উপন্যাসে চোখে দেখা বাস্তবের ছবি আঁকেননি তবে এখানে আছে তারাশঙ্করের সুগভীর সমাজ চেতনার

প্রকাশ। পানু কোনো ব্যক্তি নয়—সমাজ-শরীরের একটি একক। ভারতবর্ষের সনাতন জীবন পরিক্রমায় এই ইতিহাস চলমান—এর আভাস দেওয়া কম শক্তির পরিচায়ক নয়।

সর্বক্ষণের লেখক হিসাবে পেশাগ্রহণ, কলকাতা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস আর পত্রপত্রিকা প্রকাশকদের নিয়মিত তাগিদে কিছু লেখা হয়েছে সেগুলি উপন্যাস হিসাবে মোটেই উৎকর্ষের পরিচয় দেয় না। কৃতী সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিকই লিখেছেন—রাঢ়ের সীমানা ছাড়িয়ে তারাশঙ্কর তাঁর ঔপন্যাসিক সিদ্ধির উচ্চতা থেকে নেমে এসেছেন। সামান্য কিছুক্ষেত্রে ভাবের একটি রেখা বা দীপ্তি এইসব উপন্যাসের প্রাপ্তি। *বিপাশা* (১৩৬৪) উপন্যাসে শরদিন্দুর নাস্তিবাদী সেবা ও সন্ন্যাসধর্ম কিংবা *বসন্ত রাগ* (১৩৭১ অগ্রহায়ণ) উপন্যাসে দক্ষিণ ভারতের পটভূমিতে এক অস্পৃশ্য কন্যা লক্ষার সঙ্গে সঙ্গীতসাধক এক নিরাসক্ত ব্রাহ্মণ রঙ্গনাথের রোমান্টিক প্রেম ; দিল্লির পটভূমিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী *গন্না বেগম* (১৩৭২ আষাঢ়) উপন্যাসে বাইজি চরিত্র সুরাইয়া কিংবা গন্নাবেগম, সুকদেব আচার্য কিংবা পিয়ারাবাবার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। অভিজ্ঞতার সীমানা অতিক্রম করে তারাশঙ্কর এসব ক্ষেত্রে নিজের লেখনীর সম্মান রক্ষা করতে পারেননি। একইভাবে দিল্লি প্রবাসের অভিজ্ঞতায় লেখা ডায়েরিধর্মী উপন্যাস *যতিভঙ্গ* (১৩৬৯)-এর কথা লিখতে পারি। এই উপন্যাসে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে জাঠ নারী রৌশন-এর কথা; লেখক তারাশঙ্করের কলকাতায় আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনী *মহানগরী* (আষাঢ় ১৩৭৩; 'সাতরং' পত্রিকায় ১৩৭১-এর শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত); চিত্রশিল্পী শিবনাথ আর নীরার প্রেমোপাখ্যান *মহাশ্বেতা* (১৩৬৭ আষাঢ়); যুদ্ধফেরৎ প্রবীর মৃত বন্ধু রতন রূপে রতনের অন্ধ মা ও স্ত্রীকে ছলনা করতে আসা কাহিনীর মনস্তাত্ত্বিকতায় গড়ে তোলা *উত্তরায়ণ* (১৯৫৮)। (পাঠক নিশ্চয় অবগত আছেন, এ-উপন্যাসের কাহিনী জগদীশচন্দ্র গুপ্তের *অসাধু সিদ্ধার্থ*-র অনুরূপ-রতনের স্ত্রী আরতি এই ছলনা বুঝতে পারে) যাত্রা দলের মানুষজনকে নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস *মঞ্জরী অপেরা* (১৩৭১ *বৈশাখ*)-য় গোরাবাবুর সঙ্গে মঞ্জরীর সমাজ-স্বীকৃতিহীন প্রেম ইত্যাদি ও লোকমনোরঞ্জক উপাদানসমূহ তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের মধ্যস্তরের উপন্যাসে উপজীব্য হতে দেখা যায়। দুটি বিচ্ছিন্ন কাহিনী—যথাক্রমে, বাংলাদেশ-স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্বে পাকিস্তানী বাহিনী দ্বারা লাঞ্ছিতা *একটি কালো মেয়ের কথা* আর কলকাতা-কাটোয়ার গ্রাম সর্বানন্দপুর-আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলের পটভূমিতে রচিত কাহিনী *সুতপার তপস্যা*-কে একমলাটে '১৯৭১' শিরোনামে রাখা তথাকথিত উপন্যাস—এই পর্যায়ের। —এইসব রচনা খুব স্মরণীয় হয়নি।

প্রস্তুতিপর্বেও তারাশঙ্কর এরকম কিছু রচনার উপহার দিয়েছেন। বর্ধমান থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে রাখা পটভূমিতে *নবদিগন্ত* মধ্যপর্বের রচনা (১৩৪০); 'উপাসনা' পত্রিকায় মুদ্রিত (বৈশাখ-পৌষ ১৩৩৯) *যোগ বিয়োগ*-এর এক নতুন রূপ *নীলকণ্ঠ* (১৩৪০) কিংবা 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় মুদ্রিত *বেনের বেসাতি* (বৈশাখ-চৈত্র ১৩৪০)-র নতুন নামে মুদ্রিত রূপ *প্রেম ও প্রয়োজন* (১৩৪২); দ্বিতীয় উপন্যাস *পাষাণপুরী* (১৩৪০) এই রকম রচনা। *পাষাণ পুরী*-র সামান্য স্বাতন্ত্র্য আছে। চোখে-দেখা মানুষ কালী কর্মকার খুনী। স্ত্রী বাসিনীকে উত্যক্ত করায় প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণকে খুন করে জেলে শাস্তিভোগ করছে। বলে নিই এই জেলেই তারাশঙ্কর কিছুকাল কারাবাস করেছিলেন। নিতান্ত নকশা-জাতীয় এই লেখায় এসেছে বহু চরিত্র। সাইদ, গৌর, কেষ্ট, চৈতন্য, গোঁসাই, সুরেশ বা নরু। নরু গান্ধীবাদী। জেলের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশনে প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই উপন্যাসে

সাধারণভাবে জেলের ভেতরের মানুষগুলি এক ধরনের অবক্ষয়ের শিকার। এই মনস্তাত্ত্বিক সংবাদটুকু এই রচনার বৈশিষ্ট্য। কারা-সাহিত্য হিসাবে একে গণনা করতে হয়। বড় পরিকল্পনার অঙ্গ *পদচিহ্ন* (বৈশাখ ১৩৫৭) গোপীচন্দ্র চরিত্রের চোখে-দেখা গ্রাম সম্পর্কিত। নবগ্রাম ছেড়ে চলে যায় গোপীচন্দ্র। ফিরে আসে অর্থবান হয়ে। কিন্তু চারপাশে বিচিত্র কূপমণ্ডূক মানুষ—কেউ মদ্যপ খল আবার কেউ কেউ তাকে সাহায্য করে। এই পরিস্থিতিতে লেখা উপন্যাসটির গুরুত্ব তারাশঙ্করের উপন্যাস ধারায় তেমন নাই।

বারাঙ্গনাদের জীবন, অপরাধীদের স্তরে নেমে-যাওয়া মানুষের ছবি সামান্য কিছু লেখা তারাশঙ্কর দরদ দিয়ে লিখেছেন। এই পর্যায়ের লেখা *নিশিপদ্ম* ও *ফরিয়াদ*। এসময় উপন্যাসের পাশাপাশি চলচ্চিত্রও শিল্পীকে হাতছানি দিচ্ছে। তিনি যেন চলচ্চিত্ররূপটি আগাম প্রত্যক্ষ করেই এই উপন্যাস দুটি লিখেছেন। *নিশিপদ্ম* উপন্যাসে তারাশঙ্কর ক্রনিক্‌ল-এর ধর্ম আরোপ করেছেন। রামবাগানে জন্ম যাদের সেই কাঞ্চনমালা আর চম্পকমালার কাহিনী লিখতে লিখতে তারাশঙ্কর চলে গেছেন কাঞ্চনমালার কন্যা মুক্তামালার কাহিনীতে। কাঞ্চনমালার স্মৃতিতে বালবিধবা ব্রাহ্মণীর অধঃপতিত জীবন আর তাদের কীর্তনওয়ালি হিসাবে জনপ্রিয় হওয়ার কথা এই রচনার প্রথম পর্ব। নাটক করতে যায় কাঞ্চনমালা আর চম্পকমালা। সেখান থেকে কয়লাখনি অঞ্চলের রাজা আর কুমার বাহাদুরের মাধ্যমে লালপাহাড়ী চলে যাওয়ার কাহিনী, জীবন-বিরক্ত ভূদেব বোস-এর সঙ্গে কাঞ্চনমালার প্রেম ও একত্রবাস স্মৃতিকথার ঢংয়ে উপস্থাপিত করেছেন তারাশঙ্কর। কাহিনীর দ্বিতীয় অংশে মুক্তামালার নার্সের পেশাগ্রহণ ও ডাক্তার অরুণ গাঙ্গুলীর সঙ্গে সম্পর্কের কথা এবং পরে অভিনেত্রী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বর্ণিত হয়েছে। ভূদেব বসু কাঞ্চনমালাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি, অরুণ গাঙ্গুলীও মুক্তামালাকে বিবাহ করেনি। পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা হিসাবে *নিশিপদ্ম* শরৎচন্দ্রীয় ভাবাদর্শের প্রসার বলে গণ্য হতে পারে।

ফরিয়াদ তারাশঙ্করের শেষ উপন্যাস (প্রকাশ ১ বৈশাখ, ১৩৭৮)। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬০ এই কালপরিধির মধ্যে এ-উপন্যাসের কাহিনী বিধৃত। সুধাংশুবাবু দাঙ্গার কলকাতায় পালাতে পালাতে গণিকা চাঁপার বাসায় উপস্থিত হয়। সেখানে চাঁপার সঙ্গে পরিচয় হলে জানতে পারে চাঁপার ভাগ্যহীন জীবন-কথা। তার বাবা শিবেন ভট্টাচার্য, স্বামী প্রণব চক্রবর্তী। শিবেন চাঁপাকে বিক্রি করে দেয় ব্যবসায়ী বরেন মল্লিকের কাছে। নিত্য অত্যাচার আর ত্রাসের মধ্যে বড় হয় চাঁপার পুত্র নীলু। এই অবস্থায় নীলুর অপরাধী হয়ে পড়া বিচিত্র নয়। নীলু হত্যা করে বরেন মল্লিককে। নগরজীবনের ট্র্যাজিডি তারাশঙ্করের লেখায় অতিনাটকীয় ভাবালুতায় পর্যবসিত হয়।

শেষের দিকে একটি বিপুলায়তন গ্রন্থ লিখেছেন তারাশঙ্কর। সে বোধহয় পাশ্চাত্য সাগা ধরনের রচনার কথা ভেবেই লেখা। *কীর্তিহাটের কড়চা* তারাশঙ্করের দীর্ঘতম উপন্যাস। সাধারণত উপন্যসে থাকে একটি বীজগল্প—এটা তারাশঙ্করের কথাশিল্পের বৈশিষ্ট্য। *কীর্তিহাটের কড়চা*-য় আছে বীজ উপন্যাস! *জবানবন্দী* (১৯৫৮) নামে 'উল্টোরথ' শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাসটিকে বিপুলায়তন কড়চায় পরিণত করেছেন তিনি। সুরেশ্বরের জবানীতে এক বিশাল পটভূমিতে একটি ধনাঢ্য অভিজাত জমিদার পরিবারের কাহিনী বলেছেন তারাশঙ্কর। কল্পনার ব্যাপ্তি আছে তাছাড়া, এ-লেখা শেষ করার মধ্যে আছে মহৎ সক্ষমতার পরিচয়। শিল্প নৈপুণ্যে না হোক, এই সক্ষমতায় লেখকের স্মরণযোগ্যতা কিছুটা

গড়ে ওঠে নিশ্চয়। লর্ড ক্লাইভ, রিপন, কার্জন, ওয়েলেসলি, ডালহৌসি, ওয়ারেন হেস্টিংস, ফাদার লঙ প্রভৃতি চরিত্রের পাশাপাশি বাংলার নবজাগরণের খ্যাতকীর্তি যুগপুরুষ রাজা নবকৃষ্ণ দেব, রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাণী রাসমণি, রাজেন মল্লিক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ, গিরিশ ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রমেশচন্দ্র দত্ত, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, যামিনী রায় কিংবা রাজনীতিবিদ লর্ড ডাফরিন, হিউম, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার; এম. এন. রায়, সহজানন্দ সরস্বতী, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র রায়, সর্দার প্যাটেল বা মাতঙ্গিনী হাজরা প্রভৃতি এমনকি তাঁর সমসাময়িক খ্যাতিমান সাংবাদিক সত্যেন্দ্র মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ আর সমালোচক-অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদারের উল্লেখ করেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাসের পটভূমি ১৭৯৯ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত। 'সুরেশ্বরের নীল রক্তে গেরুয়া রং' ধরে যাওয়ার কাহিনীই *কীর্তিহাটের কড়চা*—বলেছেন সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার। গলসওয়ার্দির *ফোরসাইট সাগা*-র সঙ্গে তুলনা করা হলেও এই উপন্যাস তারাশঙ্করের অবসিত-প্রায় প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে। পটভূমি কলকাতা হওয়ায় আঞ্চলিক সাহিত্যের কথাকার তারাশঙ্করকে তেমনভাবে পাওয়া যায় না *কীর্তিহাটের কড়চা*-য়।

শেষপর্বে দুটি ছোটগল্পের উপন্যাস-রূপ দিয়েছেন তারাশঙ্কর—সে দুটি কাহিনী সিনেমা মাধ্যমে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। এ দুটি যথাক্রমে *ডাকহরকরা* (১৩৬৫, বৈশাখ) এবং *না* (১৩৬৭ অগ্রহায়ণ)। 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্তিক ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত *ডাকহরকরা*-য় দীনু রানার আর তার পুত্র নিতাইকে ঘিরে নাটকীয় বিষাদমধুর একটি কাহিনী রচনা করেছেন। *ডাকহরকরা* দীনুর চরিত্রনির্ভর রাঢ়-বাংলার পটভূমিতে রচিত উপন্যাসিকা—নভেলেট। এই সূত্রে বলে নিই, ছোট আকারের উপন্যাসে তারাশঙ্কর খুব আগ্রহ বা উৎসাহ বোধ করতেন না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের *দুই বোন*, *মালঞ্চ*, *চতুরঙ্গ*, বা *চার অধ্যায়* এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *রামের সুমতি*, *দেবদাস*, *পরিণীতা* বা *বৈকুণ্ঠের উইল*-এর মতো উপন্যাসেই নাকি বাঙালি জীবনের অনতিবিস্তৃত আপাত জটিলতাহীন বাস্তব যথাযথভাবে ধরা পড়েছে—তবু, তারাশঙ্করের প্রবণতা এই প্রস্তাবকে অস্বীকার করে। প্রতিভার স্বক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এই নিম্নবর্ণের আদর্শনিষ্ঠ মানুষটির সততা ও কর্তব্যপরায়ণতার ছবি এঁকেছেন। উপন্যাসটির মধ্যে কয়েকটি বাউল-ধর্মী গান যোজনা করেছেন লেখক। তাতে দীনুর বিষণ্ণ পরিণতি আরও নাটকীয় আবেগে মথিত হয়েছে। *না* ছোটগল্পাকারে প্রকাশ পায় 'প্রবাসী', আশ্বিন ১৩৪৫ সংখ্যায়। উপন্যাসাকারে ১৩৬৭ অগ্রহায়ণে প্রকাশ করার সময় নতুন কোনো মৌলিক বক্তব্য বা বিষয় সন্নিবেশিত হয়নি। শিকারী অনন্ত গুলি করে সম্পর্কিত ভ্রাতৃকল্প কালীনাথকে হত্যা করেছে। সাক্ষ্য প্রদানের সময় সমস্ত জানা সত্ত্বেও কালীনাথের স্ত্রী একটি মাত্র শব্দে অনন্তকে ক্ষমা করে দেয়—'না'। একটি মাত্র শব্দে কালীনাথের স্ত্রী তার যাবতীয় বেদনা ও ঘৃণা প্রকাশ করেছে। এই কাহিনীর বর্ধিত রূপ উপন্যাস হিসাবে সার্থক হতে পারেনি।

তারাশঙ্কর দুটি ছোট অতিজনপ্রিয় উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁর পরিণত সাহিত্য-পর্বে। এ দুটি রচনা যথাক্রমে *বিচারক* (শ্রাবণ ১৩৬৩) এবং *সপ্তপদী* (১৩৬৪)। *বিচারক* মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। বিচারক জ্ঞানেন্দ্রনাথ খগেন হত্যার মামলায় খুনী নগেনকে শাস্তি দিতে চায়। নগেন খগেনকে জলমগ্ন অবস্থায় খুন করেছে। বাড়ি ফিরে তার ভেতরে এক গভীর অপরাধবোধ জেগে ওঠে। প্রথমা স্ত্রী সুমতি আগুনে পুড়ে মরেছিল, সে হয়তো জ্ঞানেন্দ্রনাথের ইচ্ছাকৃত গাফিলতিতেই! সুমতি আর তার সম্পর্কিত বোন সুরমার প্রণয় ঈর্ষাই কি এজন্য দায়ী নয়? সুরমাকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। এ-উপন্যাসকে কোনো কোনো সমালোচক সঠিকভাবেই 'ডিভাইন জাস্টিস' এবং মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী বলে শনাক্ত করেছেন। লেখকের মানবচরিত্রজ্ঞান এখানে স্পষ্ট ও সার্থকভাবে প্রকাশিত।

সপ্তপদী অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। মাত্র দু'বছরে এ-উপন্যাসের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো সমালোচক এ-উপন্যাস সম্পর্কে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, কেউ কেউ তো এটি নোবেল পুরস্কার পাবার যোগ্য রচনাও বলতে চান (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয়, *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাবলী*, ১৬শ খণ্ড; দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ; মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা; "গ্রন্থপরিচয়" অংশ, ৪৩৯ পৃ.) যাই হোক, *সপ্তপদী*-তে আছে জীবনের গভীর ট্র্যাজিডির গূঢ় বেদনার নাটকীয় প্রকাশ। এই বেদনার উৎসে আছে মানবজীবনের প্রধান কতকগুলি উপাদান---ধর্ম, ঈশ্বর, প্রেম ইত্যাদি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্ব। হিন্দু ও খ্রিস্টধর্মের টানাপোড়েনে এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি বেদনা বিধুর হয়েছে। আর আছে Peripety র আশ্চর্য কুশলী প্রয়োগ। নাটক চর্চায় তারাশঙ্কর অনেক সময় ব্যয় করেছেন, সেই ব্যয় যে অকারণ হয়নি তা বোঝা যায় এইসব রচনায়। রীণা ব্রাউন আর তার ধাত্রী মাতা কুন্তীর কাহিনী একদিকে আর কৃষ্ণেন্দুর কাহিনী আরেক দিকে। রীণাকে লাভ করার জন্য কৃষ্ণেন্দু ধর্ম ত্যাগ করে---খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। তবুও রীণাকে পায় না। রীণা তাকে বলে আমাকে লাভ করতে তুমি ধর্ম ত্যাগ করেছ, এমন হতে পারে আরও সুন্দরী কোনো নারীর জন্য তুমি আমাকেও ত্যাগ করবে! রীণার প্রত্যাখ্যানটি খানিকটা অতিনাটকীয় আর উদ্ভট মনে হয়। রীণা নিশ্চয় কৃষ্ণেন্দুকে কখনই ভালোবাসে নি। ভালোবাসলে এ কথা বলতে পারত না। রীণাকে না পেয়ে কৃষ্ণেন্দু পাদরি কৃষ্ণস্বামী হয়ে সেবাব্রত গ্রহণ করে চলে যায় দূর মফঃস্বলে। রীণার জীবন-কথা উন্মোচিত হয়। রীণা কোনো বিদেশী খ্রিস্টানের অবৈধ সন্তান। কুন্তী তার জননী। আর রীণাকে ছোটবেলায় যীশু ও মেরীর ছবি দেওয়া হলেও তাকে কেউ সঠিকভাবে খ্রিস্টান করেনি। রীণার পরিচয় সে হিদেন---জারজ। এই কথা জানার পর রীণা স্বেচ্ছাচারী হয়েছে। তার নিজের শরীরটিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছে। মার্কিন সৈনিক তাকে নষ্ট করেছে---রিক্ত নিঃস্ব করে রেখে গেছে। তারাশঙ্কর যখন ছাত্র বয়সে বউবাজারের মেস বাড়িতে থাকতেন, তখন প্রতিবেশী এক ফিরিঙ্গি তরুণী আর এক বৃদ্ধার ঝগড়া বিবাদ দেখতেন প্রায়ই। সেই ছবি রূপান্তরিত হয়ে এখানে চলে এসে থাকবে। আত্মজৈবনিক উপাদান সামান্য থাকলেও, এসব অভিজ্ঞতা খুব কাজে আসেনি এ-উপন্যাসিকায়। আসলে কলকাতা শহর---ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, ব্রিটিশ শাসন, খ্রিস্টধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের যোগ আছে। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে খ্রিস্টধর্ম প্রচার ও ইঙ্গবঙ্গ সমাজের পরিচয় আনতে চেয়েছেন। মধুসূদনের জীবনের ক্ষীণ ছায়াপাতও এখানে ঘটে থাকবে। বেশ কিছুদিন পর রীণার সঙ্গে কৃষ্ণেন্দুর দেখা হয়। দুজনের পথ তখন ভিন্ন। জীবনের গভীর রহস্যময় প্রেমের আকাঙ্ক্ষা ও

অপূর্ণতার বোধ এই চরিত্র দুটিকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। চলচ্চিত্রায়িত হবার পর *সপ্তপদী*-র জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। সমাজের বুনট এই রচনায় খুবই আলগা। কখনো কখনো তারাশঙ্করের রচনা বলে মনেই হয়না একে। *বিচারক* আর *সপ্তপদী*—নাগরিক তারাশঙ্করের রচনা।

একটি চড়ুইপাখী ও কালো মেয়ে উপন্যাসটিও নাগরিক লেখকের রসবৈচিত্র্য সৃজনের প্রয়াসে লেখা। 'সাতরং' পত্রিকার নববর্ষ সংখ্যা (১৩৭০)-য় প্রকাশিত এই রচনা সত্যজিৎ রায়কে উৎসর্গ করা। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে নায়কের সামান্য মিল আছে নামে (আনন্দ রায়) আর পরিচয়ে—আনন্দ পিতৃহারা হয় শৈশবে। তাছাড়া দু'জনেই শিল্পী। আনন্দ দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে জনপ্রিয় হয়। এ যেন বাংলাদেশের 'শিল্পগুরু' জয়নাল আবেদিনের স্মৃতি। এই উপন্যাসের সামান্য স্বতন্ত্র মূল্য আছে। এ-উপন্যাসের নায়িকা শ্যামলীকে আনন্দ মনে মনে সুকৃষ্ণা বলে ডাকে। কালো সে। তার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর এক অন্য ধরনের নন্দনতত্ত্ব উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন। আনন্দের মুখে আঁচড়ে দেয় একদিন এক চড়ুই পাখি; তার মুখের ক্ষতচিহ্নে সেবার পরশ দেয় শ্যামলী। তার মুখটি সুন্দর নয় অথচ আনন্দের মন্দ লাগে না। আনন্দের মানসিক অভিব্যক্তিতে এরকম একটি ছোট্ট মুহূর্তে আসে রবীন্দ্রনাথের গানের কলি : গান সে গাইতে পারে না। তবুও মৌজের মুখে—বেশ গলা ছেড়েই গান ধরেছিল—

কালো তা সে যতই কালো হোক--
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ!

কিছুক্ষণ পর মনে পড়েছিল—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে। কালো কেশ রাঙা কুসুম—না : তারাশঙ্কর এখানে ফেল। হয়নি।'

এই ভাবনার মধ্যে শ্যামলীব উপস্থিতি; তার সহানুভূতিমাখা কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গে ('ইস্ আপনার চোখ থেকে রক্ত পড়ছে যে!') মনের মধ্যে এক অনির্বচনীয় উত্তেজনা বোধ করে আনন্দ। 'সে মৃদুস্বরে পাখীটাকে বলেছিল—Ask your God to bless her—not me. She is—কালো? তা সে যতই কালো হোক—আমি দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ!'—বস্তুত এই অভিনব নান্দনিক বোধটির সূত্রে তারাশঙ্কর *কবি*-র কবিয়াল শিল্পী নিতাই আর আনন্দকে মিলিয়ে দিয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক চেতনা-প্রবাহমূলকতা (Stream of Consciousness) প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্যামলীরও 'কবি বইটা পড়তে ভালো লাগে। তার কারণ কবির নায়িকা ঠাকুরঝি তারই মতো কালো মেয়ে।' আফ্রিকার উগাণ্ডার কবি ওকিতে পি-বিতেক-এর 'Song of Lowinow'-তে এইরকম একটি সমান্তরাল নন্দনতাত্ত্বিকতা সংযোগও হয়েছে। কালো সেখানেও পাশ্চাত্যের সৌন্দর্যবোধের সমান্তরাল একটি স্বতন্ত্র চেতনা হয়ে উঠেছে।

চাঁপাডাঙার বৌ বা *যোগভ্রষ্ট* তারাশঙ্করের প্রধান উপন্যাস নয়, তবে এ দুটি রচনার অন্যরকম সার্থকতা কিছু আছ। *চাঁপাডাঙার বৌ* তারাশঙ্করের উপন্যাসের পটভূমির সাধারণ অভিজ্ঞতার সীমাকে ছুঁয়েই উপস্থিত। এই উপন্যাসের পটভূমি রাঢ়বঙ্গ। বীরভূম সন্নিহিত রাঢ় নয়—হুগলি, আরও সঠিকভাবে বললে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চল। 'চাঁপাডাঙার মণ্ডল বাড়ির সংসার তরণী' চলছে কাদম্বিনী নামের কর্ণধার-এর সক্রিয়তায়। কাদম্বিনী বড় বৌ। উপন্যাসটির আদিরূপ যখন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপাসনা' পত্রিকায় শ্রাবণ ১৩৩৮-এ গল্পাকারে ছাপা হয় তখন এটির নাম ছিল 'বড় বৌ'। মণ্ডল বাড়ির বড় বৌ

কাদম্বিনী-র স্বামী সেতাব, দেবর মহাতাপকে নিয়ে একটি সম্পর্কের ত্রিভুজ রচনা করেছেন তারাশঙ্কর। মহাতাপ যখন ছোট তখন কাদম্বিনী পরিবারে আসে। দেবর-বৌদির সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ অপত্য-স্নেহের রং লাগে। কাদম্বিনী বন্ধ্যা হওয়ায় সন্তান স্নেহে মহাতাপকে আরও গভীর ভাবে আঁকড়ে ধরে। মহাতাপ বড় হয়—তখন তার সঙ্গে সম্পর্কটি আর সহজ ভাবে দেখতে পারে না কৃপণস্বভাব সেতাব এমনকি ছোট বৌ মানদাও। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাত *চাঁপাডাঙার বৌ* উপন্যাসে নতুন নতুন মাত্রা নিয়ে এসেছে। গ্রাম সমাজের বুনট কিছুটা থাকলেও এ-রচনায় তারাশঙ্কর খুব বেশি আঞ্চলিক সংস্কৃতির মাত্রা যুক্ত করতে পারেননি। একেবারে নিজস্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র উত্তর রাঢ় ছাড়া অন্য অঞ্চলের মধ্যবিত্ত সমাজ তারাশঙ্করের উপন্যাসে যখন এসেছে—তখন আঞ্চলিক সংস্কৃতির মাত্রা খুব স্পষ্ট গাঢ় রঙে আঁকা মনে হয়।

যোগভ্রষ্ট উপন্যাসে সুদর্শনের আত্মোপলব্ধির প্রয়াস দেখানো হয়েছে;—একটি গূঢ় আধ্যাত্মিক প্রশ্ন, মানুষ কি বানরের সন্তান, তা যদি না হয় আমরা কোথা থেকে এলাম?—এই প্রশ্নই তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। 'উল্টোরথ' পত্রিকায় ১৩৬৬-এর শারদসংখ্যায় প্রকাশিত এই উপন্যাসের নাম ছিল 'যবনিকা'। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় (১৩৬৭) নাম বদল করা হয়। রহস্য রোমাঞ্চের ইশারা আড়ালে রেখে সুদর্শন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাতে লেখক মনোযোগ দেন। *যোগভ্রষ্ট*-এ আছে এক আধ্যাত্মিক পথিকের জীবনজিজ্ঞাসা, উত্তর না পাওয়ার পর যথেচ্ছাচার আর অধঃপতনের ছবি। সুদর্শনের সঙ্গে দেখা যায় ডেটিন্যু ধীরেনবাবুর। ধীরেন তাকে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পরিচিত করায়। ধীরেনের কথা, দলের আদর্শে ঈশ্বর নেই তবে নেতৃত্বের গড়া নিয়ম মানতে হয়। সুদর্শন এ-আদর্শও মানেনি। তার মনে হয় 'এক পুজো ছেড়ে অন্য পুজো'-র দিকে ঝোঁকার কোনো মানে নেই। কোনো সুস্থিত আদর্শে বিশ্বাস না থাকলে যা হয়—সুদর্শন হয়ে ওঠে পরম স্বেচ্ছাচারী। এমনকি খুন করতেও তার দ্বিধা হয় না। রাধামূর্তি ভেঙ্গে তার সোনা আত্মসাৎ করতে তার মনে কোনো পাপবোধ হয় না। বিহারের ভূমিকম্পের বর্ণনায় তারাশঙ্কর মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন। শেষ পর্যন্ত সুদর্শন যতিজীবন থেকে সাধারণ কামনা বাসনার জীবনে প্রবেশ করতে চায়। তখনও তার প্রশ্নের রহস্যভেদ হয়নি—তখনও তার জিজ্ঞাসা—আমরা কোথা থেকে এসেছি?

নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৯৫২) তারাশঙ্করের বিচিত্র জীবনদৃষ্টি ও কল্পনার পারঙ্গম সৃষ্টিশীল উপন্যাস। এ-উপন্যাসের পটভূমি কিছুটা বাস্তব, কিছুটা কাল্পনিক। উত্তর রাঢ়-এর গঙ্গার চর সাঁতালি এ-উপন্যাসের পটভূমি। জল-জঙ্গলের দেশ—কখনো থাকে জলের নীচে কখনো কুমারী মৃত্তিকার মতো জেগে ওঠে মাটি। সেখানে গোপদের গোপালনের সাময়িক সুরাহা হয়, অন্য অংশে বেদেরা এসে বসবাস করে। বেদেদের সমাজ নিয়েই তারাশঙ্কর গড়ে তোলেন আশ্চর্য কল্পনার অধিজগৎ—*নাগিনী কন্যার কাহিনী*-কে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক পুরাকথা বা নৃতত্ত্বের (Literary Anthropology) ফল হিসাবে গণ্য করতে হয়। অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত মনে করেন—'অজস্র আদিম সংস্কার এবং অলৌকিকে প্রমাবিহীন প্রতীতি এই গল্পের পাত্র পাত্রীদের মধ্যে 'মিথো ম্যানিয়া' সৃষ্টি করেছে'। ("সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব ও তারাশঙ্কর", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* সম্পাদক : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়; রত্নাবলী; কলকাতা; ১৯৯৯ খ্রি. ৫২৫ পৃ.) বেদে সমাজ অর্ধ যাযাবর। তারা সাময়িকভাবে গঙ্গার চরে আসে, বাকি সময় ঘুরে ফেরে দেশে দেশে। সাপ খেলা দেখানো,

বিষ নামানো, লোকের ঘরে লুকোনো সাপ খুঁজে বের করা, বিষ বিক্রি—এসবই তাদের জীবিকার উপায়। এই সমাজে প্রচলিত এক বিচিত্র রীতি প্রকরণ বা ritual আর তার সমর্থনে গড়ে ওঠা মৌখিক পরম্পরায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত পুরাকথা অনুসারে সমাজের নেত্রীত্ব এক নারী থেকে অন্য নারীতে বর্তাতে চায়, নেতৃত্বও এক শিরবেদে থেকে অন্য শিরবেদেতে চলতে থাকে। এই অবিস্মরণীয় উচ্চ কল্পনার দ্বারা তারাশঙ্কর স্পর্শ করেন বাংলার মনসামঙ্গল কাব্যধারার নির্যাস—সেই সঙ্গে নারী-প্রধান সমাজ (matrilineal society) আর পুরুষ-প্রধান সমাজ (patriarchal society)-এর দ্বন্দ্ব-কাঠামোও যুক্ত হয়ে পড়ে। নেতা তাদের মহাদেব-এর নব রূপ, নেত্রী মনসার প্রতিরূপ। এই রূপায়ণের আড়ালে আছে সূক্ষ্ম যৌন মনস্তত্ত্বের গূঢ় খেলা। নাগিনীকন্যা-র শরীরে 'চাঁপা ফুলের বাস' পাওয়া গেলে বুঝতে হবে তার নেতৃত্ব দানের দৈবী (divine) ক্ষমতা নিঃশেষিত। শিরবেদে তখন তাকে আর নাগিনী কন্যা বলে স্বীকার করে না। এইরকম নাগিনী কন্যার দুই প্রজন্মের ইতিবৃত্ত নিয়ে রচিত *নাগিনী কন্যার কাহিনী*। শবলার তপশ্চর্যায় ছেদ পড়েছে তার ব্যক্তিগত প্রেমাকাঙ্ক্ষার জাগরণে। শেষ পর্যন্ত এক মুসলমান বেদেকে ভালবেসে দলত্যাগ করেছে সে। পরবর্তী নাগিনী কন্যা পিঙ্গলা; পিঙ্গলা নাগুঠাকুরকে ভালোবাসে। কিন্তু শিরবেদে তা হতে দিতে চায় না। পিঙ্গলাকে নাগদংশনে প্রাণ দিতে হয়। এখানে পুরাকথার বাস্তব ছিন্ন হয়ে বের হয় মনস্তত্ত্বসম্মত বাস্তবের আলো অন্ধকার। ক্ষুব্ধ নাগুঠাকুর সাঁতালি গ্রাম থেকে বেদেদের উৎখাত করে—হত্যা করে নাগদংশনের আসল কারণ শিরবেদেকে। প্রেম-প্রতিহিংসা-ঈর্ষা-সংস্কার-অবদমন, পুরাকথা ও লোকধর্মের বিচিত্র মিশ্রণে গড়ে উঠেছে *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র আখ্যান-বিন্যাস। এ-উপন্যাসের বাস্তবতা সীমিত, কল্পনা সুবিস্তৃত। কখনো কখনো তারাশঙ্করের মিথ (myth) নির্মাণ, মনে হয় আপতিক, তা যেন কষ্ট-কল্পনার পর্যায়ে পড়ে। যে জীবন-বাস্তবে তারা বাস করে আর যে অনিশ্চয়তার সঙ্গে তারা নিত্য পরিচিত—সেখানে কোন্ গূঢ় সূত্রে এই বিকৃত যৌন অবদমন ও শুচিতার বোধটুকু ধর্মের আবরণে গড়ে উঠল তা ভেদ করতে ঔপন্যাসিক ব্যর্থ হয়েছেন। তবে মহাকাব্যিক উপাদান ব্যবহারের ক্ষমতায় তারাশঙ্করের লেখনী এখানে অনেকটাই শিল্পসফল। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৫১) উপন্যাসে চেনা ভূগোলে হেঁটেছেন তারাশঙ্কর—এর মূল সমস্যা ছিল মৃত্তিকা-লগ্ন। কিন্তু *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র ভূগোলে আছে কৃত্রিম নির্মাণের ছাপ। অথচ *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র সম্ভবনা ছিল যথেষ্ট। এখানে যাযাবর, অর্ধ-যাযাবর (nomadic) পশুচারক ও পশুপালক দুটি জনগোষ্ঠীকে এক অনিশ্চত ভূগোলে এনে ফেলেছেন তারাশঙ্কর। এই ভূগোলের প্রেক্ষাপটটি যেমন অনিশ্চিয়তার সংকট- লগ্নের সঙ্গে, জল ও মাটির মেলামেশা পরিবেশের এক রহস্যময় আবেষ্টনী রচনা করেছে—তেমনি এর নরনারীদের জীবনে, প্রেম-প্রীতি-রিরংসা ও আরণ্যক উপাদানের সঙ্গে মিশে আছে তাদের যৌন আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তির নানা অভিমুখ। প্রায়ই তা অবদমিত এবং স্বভাবতই বিভিন্ন দিকে গতিশীল। এই ভাঙ্গাগড়ার মাঝখানে আছে দেবতাদের স্বর্গ আর মর্ত্যলোকের গতায়াত। শিরবেদের মধ্যে মহাদেব আর নাগিনী কন্যার মধ্যে মনসা অবতীর্ণ হচ্ছেন—এই ধারাবাহিকতা সমাজটিতে divine-এর আলো ফেলে; অন্যপক্ষে তাদের সেই দৈবী সত্তা থেকে অধঃপতিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা পড়ে যায় অতল আরণ্যক আদিমতাপূর্ণ অন্ধকারে। জীবন তখন দৈব নয়—আদিম, মানবিক। এই যাতায়াতটিকে আংশিক ভাবে হলেও নিয়ন্ত্রণ করেছে বাংলার আদি-পুরাকথা মনসামঙ্গল। মনসামঙ্গলে শিবের স্খলিত বীর্য

থেকে স্বয়ম্ভূ-প্রায় দেবী মনসা—যখন তাঁর পিতার পুষ্পবাড়িতে ভ্রমণ করছেন, শিব তাঁকে কামনা করেছেন। এই কামনা আমাদের জীবন অভিজ্ঞতার আদিকথার ইঙ্গিত বহন করে। ফ্রয়েড এর নাম দিয়েছেন ইলেক্‌ট্রা-কমপ্লেক্স।

আমাদের পুরাকথায় শিবের মধ্যেও অবদমনের উপাদান কিছু ছিল। অন্তত মনসামঙ্গল তার সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলা পুরাকথার নির্মাণ ও বিনির্মাণের ছকে *নাগিনী কন্যার কাহিনী* অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক সাহিত্যিক নির্মাণ হয়ে উঠতে পারত। তবে তারাশঙ্কর তেমন প্রযত্ন করেননি। কল্পনা তাঁর বস্তুনিষ্ঠা ও সমাজবোধকে আশ্রয় করেনি। করলে বাংলা সাহিত্য একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রচনা উপহার পেত। প্রসঙ্গক্রমে একটি সংবাদ প্রদান করছি। এক সময় (১৯৬৯) 'দেশ' পত্রিকার কোন ফিচার লেখক অভিযোগ করেন—'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে তারাশঙ্কর উৎকল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। চন্দ্রবোড়া সাপ শিস দেয় না, বেদেনীদের শরীর থেকে চাঁপা ফুলের 'বাস' ছড়ায় না। উত্তররাঢ়ের বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ একটি চমৎকার রচনায় জানাচ্ছেন : 'আমাদের উত্তররাঢ়ে চন্দ্রবোড়া সাপের শিস দেওয়ার কথা খুবই চালু। কাঁটালি চাঁপার গন্ধের গল্পও চালু।' [''মাননীয় তারাশঙ্কর সমীপেষু'' : প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত : *তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*; উক্ত; ১০৭-১০৮ পৃ.]

নাগিনী কন্যার কাহিনী-র মতো কল্পনাপ্রধান রচনা নয় *সন্দীপন পাঠশালা* বা *আরোগ্য নিকেতন* উপন্যাস; তবু এ-দুটি রচনাতেও তারাশঙ্কর তাঁর ঔপন্যাসিক সিদ্ধির উচ্চতম বিন্দুটি ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। যাদের নিয়ে লিখছেন কিংবা যা নিয়ে লিখছেন তার সবটাই জানা থাকতেই হবে এমন নয়, তবে তারাশঙ্করের লেখার ধরনটা যেহেতু বাস্তব নির্ভর তাই এখানে ফাঁক থাকলে কিছু না কিছু অসঙ্গতি দেখা দেয়। *সন্দীপন পাঠশালা* (১৯৪৬) তেমনি রচনা। এর নায়ক সীতারাম গ্রামীণ পাঠশালায় শিক্ষক। পারিবারিক বৃত্তি ত্যাগ করে শিক্ষালাভ আর শিক্ষাদানের বৃত্তি গ্রহণের মধ্য দিয়ে সীতারামের সাফল্য ব্যর্থতা, সমাজ থেকে বিচ্যুতি ও আনুষঙ্গিক এ-উপন্যাসের মর্মবস্তু। শারদীয় 'কৃষক' পত্রিকায় প্রকাশকালে এর নাম 'উদয়াস্ত' (১৩৫২), পরে বিশেষত তৃতীয় সংস্করণে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। চলচ্চিত্রায়িত *সন্দীপন পাঠশালা* দেখে বাংলার একটি সম্প্রদায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। হাওড়ার একটি ব্যায়াম সঙ্ঘের অনুষ্ঠান শেষে তারাশঙ্করের ওপর প্রবল ক্রোধে আক্রমণ সংগঠিত হয়। তারাশঙ্কর তাঁর ওপর হামলার (১০.৪.১৯৪৯) জন্য কাউকে দোষ দেননি, বরং *আমার সাহিত্য জীবন* গ্রন্থে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বলছেন : 'এই ভ্রান্তি রূপিণী মহাশক্তির প্রকাশের বিচিত্র রূপ আমার একবার দেখবার একটি যোগ এসেছিল জীবনে।...প্রথমেই বলব যে, ভ্রান্তির সূত্রপাত করেছিলাম আমিই। কারণ বাংলার অন্যতম প্রগতিশীল মাহিষ্য সম্প্রদায় ও চাষী-কৈবর্ত যে এক সম্প্রদায় তা ঠিক জানতাম না।' [উক্ত; ২ খণ্ড; ১৭৮-৭৯ পৃ.]।

এই তথ্যটুকু না-জানা কিন্তু তেমন কোনো দোষ নয়। তাছাড়া হাওড়া হুগলি মেদিনীপুর অঞ্চলের চাষি কৈবর্ত নাম ত্যাগ করে 'মাহিষ্য' নাম গ্রহণের আন্দোলন সম্পর্কে তারাশঙ্করের না-জানার কারণে হাওড়া জেলায় যে বিপত্তি ঘটেছিল তা আদৌ সাহিত্যিক কোনো বিতর্ক নয়। তারাশঙ্কর এখানে রাজনৈতিক ডামাডোলে পড়েছিলেন বলাই বাহুল্য। আর তা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমাদের গণ-শিক্ষার অভাব, আদর্শগত পার্থক্য ও মতান্তরকে সহজে স্বীকার করতে না পারার ধারাবাহিকতা—'জাত'-নীতির বিকৃতির এই

কদর্য রূপগুলি তারাশঙ্করকে কেন, যে-কোনো সচেতন পাঠককে মর্মাহত করে। পাশাপাশি M.N. Srinivas যাকে বলেন 'Sanskritization' মাহিষ্য আন্দোলনে তার উপাদান ছিল, আর ছিল উন্মত্ত modernism—যার বিকৃতিতে সক্রোধে উদ্যত হয়েছিল কিছু মানুষ। লেখককে শারীরিক ভাবে আঘাত করে করে লেখনীর শক্তিকে খর্ব করা যায় না—তা তারা জানতেন না। এই মূঢ়তার ক্ষমা নেই। আর একটি কথা—হাওড়া-হুগলি-মেদিনীপুরের আত্মোন্নতিশীল মাহিষ্যদের সঙ্গে বীরভূমের চাষা কৈবর্তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারেই তুলনা করা চলে না। মাহিষ্যদের অবস্থা বীরভূমসহ উত্তরাঞ্চল এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তুলনীয়ও নয়।

সীতারাম চরিত্রে তারাশঙ্কর কর্তব্যনিষ্ঠার এক পরম প্রশান্ত মূর্তি দেখিয়েছেন। শিক্ষাদাতা এই আদর্শ মানুষটির জীবনে ক্রমাগত আঘাত আসতে থাকে। চোখ প্রায় নষ্ট হয়ে যায়, স্ত্রী গত হয়, একমাত্র কন্যা বিধবা হয়ে আসে তারই আশ্রয়ে। তবু তার সাফল্যের দিকচিহ্ন হয়ে ওঠে জনপ্রিয় সাহিত্যিক ধীরানন্দ যখন তাকে প্রণাম করে দাঁড়ায়, কিংবা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ডেকে এনে সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করে। কৃষ্ণ বলরামের শিশু শিক্ষার ক্ষেত্র ছিল 'সন্দীপন মুনির আশ্রম। তারাশঙ্করের আদর্শবাদী মন সেই মুনির তপোবন স্মরণ করেই সন্দীপন পাঠশালা'-র নামটুকু ভেবেছে। এই কাহিনীতে তাই মানব সত্যের অভাব নেই। সন্দীপন অর্থাৎ আলোকিত করার প্রক্রিয়া। সীতারামের বিদ্যালয় নিশ্চয় সেই আলোকবর্তিকাটিকেও ছুঁয়ে আছে। পুরাণ আর আভিধানিক অর্থ-তাৎপর্য এই উপন্যাসের নামকরণকে বেশ সার্থকতা দিয়েছে। বাণী রায় একটি আশ্চর্য সংবাদ দিয়েছেন, যা তারাশঙ্করের উচ্চ কল্পনা আর ঔপন্যাসিক প্রতিভার পরিচয় স্পষ্ট করে। জন সেজ (John Sedge)-এর একটি উপন্যাসের সঙ্গে তিনি *সন্দীপন পাঠশালা*-র মিল দেখিয়েছেন। সে লেখার নাম 'The Townsman'। জোনাথন নামক স্কুল শিক্ষককে নিয়ে লেখা 'দি টাউনসম্যান'। জোনাথনের পিতা ক্লাইভ সীতারামের পিতা 'রমানাথের মত গজ গজ করে' তার শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য। জোনাথনের জীবনে জুডি নামক নারীর আসা ও ব্যর্থ প্রেমের অনুরূপ ঘটনা সীতারামের জীবনেও আছে; জোনাথনের সম্বর্ধনা সভায় মেয়র এসে ভাষণ দেয়—ধীরানন্দ আহূত সম্বর্ধনা সভায় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের বক্তৃতাও অনুরূপ। বাণী রায় ঠিকই লিখেছেন, তারাশঙ্কর এই অল্পখ্যাত উপন্যাসটি পড়েছিলেন এরকম সন্দেহ তাঁর নেই; তাঁর কথা : 'আমার বিস্ময়বোধ হয়েছিল পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই ভাষার সম্পূর্ণ পৃথক দুই লেখকের চেতনার মিল দেখে।'

আরোগ্য নিকেতন মৃত্যুচেতনার উপন্যাস। 'সঞ্জীবন ফার্মাসী' নাম দিয়ে 'আনন্দবাজার' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পাবার পর এই উপন্যাসে নানা পরিবর্তন করেছেন তারাশঙ্কর। জীবনবন্ধু দত্ত তথা জীবন মশায় আর তার পিতা জগবন্ধুর পেশা কবিরাজি। জগবন্ধু ডাক্তারি পড়তে চেয়েও পারেনি। জীবনমশায় তার সমস্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে মৃত্যুকে অনুমান করতে পারে—নাড়ি টিপে বলে দিতে পারে মৃত্যুর আগমন ধ্বনির পূর্ব সঙ্কেত। গোটা উপন্যাস যেন মৃত্যুর সঙ্গে বোঝাপড়া করা একজন মানুষের সংগ্রামী সত্তার ছবি। পুত্র বনবিহারী তথা বনু-র মৃত্যুক্ষণ জানতে পেরে ঘোষণা করে জীবন মশায়। মৃত্যুর সেই অনিবার্য উপস্থিতি লক্ষ করে তার নির্বেদ জন্মায়, তীর্থদর্শনে বের হয় জীবন। কিশোর নামক সমাজ-সেবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় জীবনের। ফিরে আসে আবার চেনা পটভূমিতে। পরাণ কাহারের নাড়ি ধরে কলেরার মহামারীতে সেবাব্রতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ

হয় জীবন। এ-উপন্যাসের প্রকৃত নায়িকা পিঙ্গলকেশিনী মৃত্যু—শ্রীকুমার বন্দ্যাপাধ্যায়ের বিশ্লেষণটি স্বীকার্য। মৃত্যুর অপেক্ষায় জীবনের এই অপেক্ষাতুর শান্ত ভাবে বসে থাকা বাংলা উপন্যাসে শান্ত বিষাদের অপরূপ রস-সঞ্চারী রচনা। উদার গম্ভীর এর রচনারীতি। তাঁর উপলব্ধি : 'চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি মৃত্যু পাপের বিচার করে না; সে আসে ক্ষয়ের পথে। ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব। তবু আজ আমি বারবার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামীর জীবনে ক্ষয় প্রবল হলেও যেন তোমার পুণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।' জীবনমশায় শশী ডাক্তারের মতো 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের ভাড়া করা সৈনিক' নয় (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় *পুতুল নাচের ইতিকথা*-য় যেমন লেখেন), তবে তার উপলব্ধি অনেক বস্তুনিষ্ঠ। বইটি রবীন্দ্র পুরস্কার আর সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়। তার পরই 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৬৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় *আরোগ্য নিকেতন*-এর তীব্র নেতিবাচক সমালোচনা বের হয়। 'পরিচয়' তখন গোপাল হালদার আর ননী ভৌমিকের সম্পাদনায় প্রকাশ পাচ্ছে। পূর্ণেন্দু কুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি, চিকিৎসাবিদ্যার দৃষ্টিতে দেখালেন *আরোগ্য নিকেতন* কতখানি অবৈজ্ঞানিক! সীমান্ত সেন (নিশ্চয়ই ছদ্মনামের আড়ালে থাকা কোনো মার্কসবাদী) লিখলেন *আরোগ্য নিকেতন* নাকি 'কুসংস্কারকে প্রশ্রয়' দিয়েছে—স্বভাবতই এটি 'প্রতিক্রিয়াশীল রচনা'। (পশ্য : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : 'তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন ও পরিণতি' ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালেব দৃষ্টিতে*, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ৬৫৭ পৃ.) ভাবতে কষ্ট হয় এরকম একটি একদেশদর্শী সংগঠনের কাছাকাছি এসেছিলেন তারাশঙ্কর—তাঁর জীবনের একটি পর্বে!

তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসাবে *আগুন* (১৯৩৭) উল্লেখযোগ্য। এ-উপন্যাস যেন বঙ্কিমচন্দ্রের *কমলাকান্তের দপ্তর*-এর ধর্মবহ্নি-কামবহ্নি জাতীয় তত্ত্বের কাহিনীগত রূপায়ণ। 'কালপুরুষ' নাম দিয়ে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পায় (৯ শ্রাবণ ১৩৪৩ থেকে ২১ কার্তিক ১৩৪৩) এই উপন্যাস। প্রথমে তারাশঙ্কর ভেবেছিলেন, এর পরিবর্ত-নাম হবে 'বহ্নি'। উপন্যাসের শেষ কিস্তি প্রকাশের পর তারাশঙ্করের সংযোজন ছিল : ''প্রয়োজনবোধে কালপুরুষ নাম পরিবর্তন করিয়া 'বহ্নি' নামেই উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।''

অবশ্য সে প্রস্তাব পাল্টে পুস্তকাকারে প্রকাশ কালে নাম হয় 'আগুন'। অর্থ অবশ্য একই থাকে। চন্দ্রনাথ আর হীরু—সহপাঠী দুজনের ভাবজগতের দ্বৈত এই উপন্যাসে প্রকট। চন্দ্রনাথের দাদা নিশানাথও কম আকর্ষণীয় নয়। নিশানাথ সংসার জীবনেই সন্ন্যাসীর মতো কাটায়, তার মধ্যে ধর্মের আগুন দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। হীরুতে কামনার আগুন সঞ্চারিত। তার জীবন কামনা-মদির যাযাবরী মুক্তকেশীকে ঘিরে সেই কামনা-বাসনা চরিতার্থ হতে চায়। প্রধান চরিত্র নায়ক চন্দ্রনাথের লক্ষ্য যশ। কপর্দকহীন অবস্থা থেকে, জনমজুর থেকে মহাযুদ্ধের সৈনিক চন্দ্রনাথ চলেছে একাকী আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তার সঙ্গে ছিল একটি ছড়ি। যুদ্ধান্তে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করতে করতে ছড়িটা সে হারিয়ে ফেলে। তারপর সেটি ফিরে পাওয়ার সূত্রে পরিচয় হয় পাঞ্জাবী ললনা মীরার সঙ্গে। মীরাকে বিয়ে করার জন্য শিখ ধর্ম গ্রহণ করে চন্দ্রনাথ। তারপর বিপুল বৈভবের মালিক হয়ে গড়ে তোলে কারখানা। দেউলিয়া হয়ে যেতেও ভয় নেই; ততদিনে কারখানায় তার নাম যুক্ত হয়ে গেছে—দেনার দায়ে হাত বদল হোক ক্ষতি কি, নামটা থেকে যাবে! চন্দ্রনাথ মীরার সন্তানের নাম জিঞ্জির।

যার জীবন একক যশোলিপ্সু—তার কাছে সন্তান তো শিকল তথা জিঞ্জিরই! তাত্ত্বিকতা এই উপন্যাসকে অবাস্তব করেছে—এ মন্তব্য সমালোচক শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র ভট্টচার্যের। তাঁর মতটি আমরা সমর্থন করি।

এইবার তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার সীমায় রচিত উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। এইগুলিকে আমাদের মনে হয় তাঁর প্রতিভার প্রকৃত অসামান্য অবদান। বাংলা উপন্যাসের যে ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে আছে সেই আঞ্চলিকতার ভাষ্যকার হিসাবে তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ রচনা কোন্‌টি? *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* বা *গণদেবতা* এ-নিয়ে সমালোচক মহলে দ্বিধা থাকতে পারে। বস্তুত দুটি রচনার প্রেক্ষণ-বিন্দু সামান্য পৃথক। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় আছে সেই সব মানুষের কথা—যারা সভ্যতার পিলসুজ; *গণদেবতা*-য় এই বর্গের মানুষও আছে আবার যারা সভ্যতার রথের চাকায় পিষ্ট হয়না টেনে নিয়ে যায় রথটি তাদের, কিংবা যে দেবতার জন্য ঘোষণা মন্দ্রিত হয় আধুনিকতার নান্দীপাঠে সেই জনতা-নিবিড় সম্মিলিত প্রজাপুঞ্জের কাহিনীও আছে। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় আছে কাহারদের কথা। আমাদের এই বই, সে উপন্যাস নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্যই পরিকল্পিত সুতরাং এই উপন্যাস নিয়ে সামান্য কথাই এই পর্যায়ে লিখব আমরা। প্রাথমিকভাবে *গণদেবতা*-র দেবু ঘোষ সদ্‌গোপ সমাজের প্রতিনিধি কিন্তু তার নেতৃত্ব ধরে আছে গ্রাম-সমাজের সমস্ত অংশকেই। কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া—এই পঞ্চগ্রামের মানব সম্পদের পুনর্গঠন আর গ্রামদেশ জেগে ওঠার মহৎ কাহিনীর এক অংশ আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমান্তরাল। অন্যপক্ষে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র কাহিনী তাদের নিয়ে যারা সংসার যাত্রায় ব্রাত্য আর মন্ত্রহীন। তারাশঙ্করের প্রতিভা এই ব্রাত্য অবজ্ঞাত মানব সম্পদের তরঙ্গভঙ্গটি দেখাবার মতো সর্বদর্শিতার ক্ষমতায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান মনে হয়েছে। সামান্য কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা উঠে যে আসে না তা নয়—তবু *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* কেবল তারাশঙ্কর সাহিত্যে নয় বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এক নতুন বাঁকের সন্ধান দেয়। এর কারণ নিহিত রয়েছে এক সুগভীর কালচেতনায়—তার পরিচয় না পেলে হাঁসুলীবাঁকের মহত্ত্বটি যথাযথ বোঝা যাবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আর তিরিশের দশকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা পশ্চাদপদ অবতলবর্তী সামাজিক গোষ্ঠীগুলির আত্মমর্যাদার আন্দোলনের সূত্রে হাঁসুলীবাঁকের নান্দনিক পটভূমিটি শনাক্ত করা যায় : 'বনওয়ারী আর করালী—দুজনেই কাহার সমাজের দুটি প্রবণতার প্রতীক। বনওয়ারীর তুলনায় করালী অনেকটাই যেন জাতি-ভেদাত্মক সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছে; যদিও স্ব-সমাজের যথাযোগ্য নেতৃত্ব বনওয়ারীর আয়ত্তেই থেকে গেছে, কারণ ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন আসে অতি ধীরে ধীরে। বনওয়ারীর আকাঙ্ক্ষাও সমাজ বদলের, কিন্তু ততটাই বদল তাঁর অভিপ্রেত যতটা হলে সমাজের মূল ভিত্তিটি অটুট থাকে।' [অচিন্ত্য বিশ্বাস : "প্রতিহত মনুষ্যত্ব, প্রবহমান কাল ও হাঁসুলীবাঁকের কালো মানুষেরা" : *প্রসঙ্গ হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*; রবিন পাল, নিমাই দাস, অনিল রায় সম্পাদিত; চ্যাটার্জি পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, ১৭১ পৃ.]

বনওয়ারীর নেতৃত্বে কাহাররা যখন ঠিক করল সদ্‌গোপদের এঁটো আর তারা পরিষ্কার করবে না—মরা কুকুর বেড়াল ফেলাও বন্ধ করল, তখন ঘোষদের বড়কর্তা ডেকে বলে বনওয়ারীকে : 'গলায় তোরা পৈতে নে, বুঝলি?...কাহারেরা আর কাহার নাই, বামুন। তা

পৈতে নিক কাহারেরা। শেষে একেবারে ক্ষেপে গিয়ে বললেন—এঁটো ভাত খাবে না, নেমন্তন্ন নেই। জুতো না খেয়ে সব মাথায় উঠেছে।'

এই সংঘাত বাইরের। অভ্যন্তরীণ সংঘাতও আছে। করালী তাই তার নির্দেশ পাঠিয়েছিল কাহার সমাজের মাতব্বর বনওয়ারীকে : 'ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। যে কাহার পরের এঁটো খাবে, সে পতিত।'—নতুন এই চেতনার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা এনেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আর তারও অন্তরালবর্তী কারণ হল রেললাইন।

রেললাইন পত্তন রাঢ় বাংলার পৃষ্ঠভূমিতে এনেছে সীমাহীন পরিবর্তন। রেলপথের অভিঘাত কাহার সমাজে ভয়াবহ প্রাণঘাতী—বিশেষত তাদের সংস্কৃতির দিক থেকে দেখলে তো বটেই। রেলপথ চন্দনপুরে যৎকিঞ্চিৎ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও চঞ্চলতা নিয়ে এল—নগরায়ণ (Urbanisation)-এর সীমিত সুযোগ ঘটাল। গ্রামের কাহার মেয়েরা সেখানে গিয়ে জাতহারা-কুলহারা-সমাজহারা হতে থাকল। অন্যপক্ষে কাহারদের পদাতিক জীবন পালকি বেহারার পেশাতেও এল দোলা। করালীর শক্তি নিহিত আছে এই রেল লাইনে। এখানে সে জীবনযাপনের উপযোগী পেশায় যুক্ত হয়। এখানেই পায় সে নতুন নতুন সংবাদ যা এক হিসাবে শক্তিই। নতুন সময়ের সঙ্গে information-এর শক্তি আসলে যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে মিলেমিশে আসে। এ হল প্রাকৃতিক শক্তির সমান্তরাল নতুন এক ব্যবস্থার শক্তি।

উপন্যাসের এক পাশে রেলপথ তার গতি আধুনিকতার দিকে, অন্য পাশে বাঁক নেওয়া কোপাই নদী—কাহার-কন্যার মতোই তার উপস্থিতি; প্রাকৃতিক অরণ্য আদিম তার রূপ 'হড়পা বান' আসে সহসা আর বদলে দেয় সমাজের বুনট। নীলকুঠি ধ্বংস হয়—আটপৌরে আর কোশকেঁধে কাহাররা বদলে দেয় সমাজের বুনট। নীলকুঠি ধ্বংস হয়—আটপৌরে আর কোশকেঁধে কাহাররা বদলে ফেলে জীবনের ছন্দ; কেউ হয় কৃষক, কেউ অপরাধী। আছে কালারুদ্র—তার আসনও কোপাইয়ের তীরে। একবার এক প্রবল ঝড়ের সংবাদ সেই কালারুদ্রের আশ্রিত গাছের ওপরে বসে দিয়েছিল করালী। শহরের টেলিগ্রাফ এসেছে। তার সেই খবর দেবার প্রতীকী ঘটনাটি বিশ্লেষণ করেছি অন্যত্র : 'করালীর মারফৎ হাঁসুলীবাঁকে এসেছে নতুন নতুন উপকরণ বা উপাদান-নির্ভর সংবাদ। আদ্যিকালের শিমুল বৃক্ষ বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়', সেখানে চেপেছে করালী! পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে—হো—! ডাকছে। কাকে ডাকছে?

—হো—ব্যানোকাকা—! হো—! হো—!......ঝড়—ঝড়......চন্দনপুরে খবর এসেছে তারে। ঝড়ের মতো করালীর মারফৎ ঝড়ের খবর পেয়ে কাহারকুল স্বভাবতঃই সন্ত্রস্ত। সে ঝড়ই বা কম কিসে, যা এল করালীর মারফৎ?' ["প্রতিহত মনুষ্যত্ব প্রবহমান কাল ও হাঁসুলীবাঁকের কালো মানুষেরা": উক্ত; ১৭২-১৭৩ পৃ.]

অর্থাৎ আমরা লক্ষ করেছি *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* উপন্যাসের দুটি সীমা—প্রথম রেলপথ আর দ্বিতীয় হাঁসুলীর মতো বাঁক নেওয়া কোপাই নদী। আধুনিকতা আর অতীত-মুখিনতা, বাস্তব আর আদর্শ, আলো আর অন্ধকার—বিচিত্র দ্বান্দ্বিকতায় এই দুই পথের ইশারায় উপন্যাসের মানুষগুলি হয়েছে দিশাহারা।

লোকউৎসব, বিশেষ অনুষ্ঠান করে কর্তাবাবার পূজা সংগঠন—কর্তার আশ্রিত চন্দ্রবোড়া সাপকে হত্যা করার অপরাধের কলুষমোচন, আনন্দ উৎসব, ব্রত গীত, ছড়া, ভাষ্যে

উপকথার এক পরিমণ্ডল—যেন ফেলে দেওয়া কোনো জীবনের টুকরো, যেন হারিয়ে যাওয়া কোনো কালখণ্ড, সব এনে উপুড় করেছেন তারাশঙ্কর। উপন্যাস শেষ হবার সময় সহসা একটি বিনিময়ের সংবাদ পাই। তখন কর্তাবাবার গাছটি পড়ে আছে—বনওয়ারী ভূপতিত। পরম পলাতক, পাগল আর নসুবালা গান গায় জংশন স্টেশনে :

পাগল পায়—

যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশের হয় বাঁশি
বাঁশ বাদির বাঁশিগুলি তাই তো ভালোবাসি।

নসু নাচতে নাচতেই গান ধরে।

বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার কুলের পিতা
বাঁশ বনেতে থাকত অজগরো চিতা।

সুচাঁদ কাহারনী, এই উপন্যাসের আদি-কথক—প্রকৃত Narrator, সে টানা উপকথা শোনায় : 'শ্রোতারা কেউ শোনে গোড়াটা, কেউ মাঝখানটা, কেউবা শেষটা। অর্থাৎ খানিকটা শোনে, তারপর উঠে চলে যায়। বুড়ী আপন মনেই বলে যায়। গল্প শেষ ক'রে বলে—বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে...নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে, তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত। তাতো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই এ উপকথার শেষ। তবে পার তো নিকে রেখো।'

—তারাশঙ্কর কি সুচাঁদের উদ্দিষ্ট সেই হৃদয়বান শ্রোতা? যিনি লিখে রেখেছেন আর উপহার দিয়েছেন উপকথার ঔপন্যাসিক narration? শুধু বিষয় হিসাবে নয়, *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র রচনারীতিও উৎকৃষ্ট।

করালী ফিরে এসেছে হাঁসুলীবাঁকে—একি সমাজতত্ত্বের সত্য? নাকি মহাত্মাজীর গ্রাম স্বরাজের স্বপ্নদেখা তারাশঙ্করের ইচ্ছাপূরণ? এ-নিয়ে সামান্য আলোচনা করা চলে। পত্রিকায় প্রকাশ পাবার পর মুগ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি সাহিত্য-সমালোচকরা যতটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এই বইটি দেখেছিলেন—কিছুদিন পর ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক সংঘের সংশ্রব ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র নেতিবাচক সমালোচনা করেছিলেন এঁরা। এ-নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। যাঁরাই তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, তাঁরাই বলতে চান—করালীর সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নষ্ট করেছেন তারাশঙ্কর। এ-নিয়ে আমাদের মত তাঁদের সঙ্গে মিলবে না। বস্তুত করালী সঠিক অর্থে শিল্পশ্রমিক হতে পারেনি। মার্কসীয় দর্শনে যাকে বলা হয় সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত, করালী তা হতে পারেনি। তারাশঙ্কর তেমন চানও নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তরঙ্গও সাময়িক। সুতরাং করালীর গ্রামে ফেরা খুব অবাস্তব নয়। করালীর যৌনজীবনে গ্রাম সমাজের আকর্ষণ ধরা পড়ে। পাখী আর সুবাসী দু'জনকেই সে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে লাভ করে। তাকে বনওয়ারী ভেবেছিল কাহার কুলের প্রহ্লাদ—মেয়েরা ভাবত কলির কেষ্ট। সুতরাং করালীর পিছুটান অসম্ভব নয় মোটেই। যাইহোক ইতিহাসের গঙ্গায় করালীদের চেষ্টায় উপকথার কোপাইকে মেলানো কতটা সম্ভব হবে জানি না—সেই ঘটনাও উপন্যাসের মূল প্রসঙ্গে সম্ভবত আরোপিত, তবু যা পেলাম, বনওয়ারী-করালীর সংঘর্ষে টানটান কাহার সমাজের গোষ্ঠী (Clan) ভেঙে জাতি (Caste) আর জাতি ভেঙে ব্যক্তি (Individual) বা শ্রেণী (Class) হবার ইতিহাসে—তার নিরিখে

হাঁসুলীবাঁক বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী উপন্যাস সন্দেহ নেই। এখনকার ইতিহাসবোধ—নিম্নবর্গের ইতিহাসবোধ, তারাশঙ্কর ক্রান্তদর্শী, তাই অনুমান করে লিখে গিয়েছেন। নতুবা, এই নবতরঙ্গ ইদানীং ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি ও রাজনীতির বাস্তব। তারাশঙ্কর মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছেন বলেই এমনটি পেরেছেন।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র নসুবালা খুবই অদ্ভুত চরিত্র। তার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর বহু প্রাচীন সমাজের নপুংসক-পৌরোহিত্যের বাস্তবকে এনে থাকতে পারেন। এ-বিষয়ে অধ্যাপক সুজিৎ চৌধুরী তাঁর *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* শীর্ষক গ্রন্থে কিছু তথ্য বিচার করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণই শোনাই : 'নপুংসক পুরোহিতদের উৎস প্রসঙ্গে কর্নেলের এবং প্রাচীন ক্রীটে পুরুষ পুরোহিতদের নারীবেশ ধারণ সম্পর্কে বর্ণনা মিলিয়ে দেখলে পুরোহিতবৃত্তির বিবর্তন সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মানো সম্ভব। এর মধ্যেও একটা প্যাটার্নের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যে প্যাটার্নের অজ্ঞাত অংশের ওপর আলোকপাত করতে... বিকল্প হিসেবে পুরুষ ওঝার উদ্ভব সংক্রান্ত তথ্য...আমাদের কাজে লাগে। ছকটাকে এভাবে সাজানো যায় : আদি পর্যায়ে নারী-পুরোহিত, মধ্য পর্যায়ে নপুংসক পুরোহিত এবং শেষ পর্যায়ে নারী-বেশধারী পুরুষ পুরোহিত।' [সুজিৎ চৌধুরী : "বৃহন্নলা : উৎস এবং পটভূমি"—প্রবন্ধ; *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য ; কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* ; প্যাপিরাস; কলকাতা; মে; ১৯৯০; ৬৭ পৃ.]

নসুবালার বিবাহ অনুষ্ঠানে নেতৃত্বদান, দূর দূরান্তরে যাওয়া, লোক-উৎসবে আসল নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা এবং হাঁসুলীবাঁকের সাংস্কৃতিক ধারা বহনের অত্যুগ্র আগ্রহ থেকে এইরকম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। অন্য কোনো উপাদান তাতে মিলেমিশে থাকতেও পারে। এ-নিয়ে এত কথা লেখাব একটি কারণ তারাশঙ্কর নসুবালা বা নসুরামকে নিয়ে আর একটি উপন্যাস লিখেছেন পরিণত বয়সে। সে লেখার নাম *শুকসারী কথা*। ভাদ্র ১৩৭৪-এ প্রকাশিত সেই লেখাটি অন্যথায় খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নয়। নতুন যুগের মেয়ে সীমাকে অনেকটাই নতুন ও সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হয় বটে। আসল কথা চন্দনপুরে নসুরাম ঘর বেঁধেছে ফটিক দাসের সঙ্গে। ফুল্লরা দেবী তার কাছে আদার বুড়ী। টুসু গেয়ে ভিক্ষা করে দিন কাটে তাদের। ফটিক দাস পুতুল বানায়। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন 'শুকসারী কথা'—'তারাশঙ্করের...হাঁসুলী বাঁকের উপকথারই সম্প্রসারণ।' ঠিক সম্প্রসারণ হয়তো নয়, তবে নসুবালা চরিত্রের পরিণতির সংবাদ হিসাবেই এই রচনাটির আলোচনা চলতে পারে। নতুবা *শুকসারী কথা* ভিন্ন মাত্রার উপন্যাস। পুরুষে পুরুষে বিবাহ কোনো যথার্থ উত্তরাধিকারের ভূমিকা নয়। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-ও রাঢ় সমাজের এমন কথা তুলে ধরে যার কোনো অনুরণন দেখা যায়নি। একটি বিচিত্র আদিম মৌলিক চমকপ্রদ সংস্কৃতির এরকম অসহায় পতন ও নিশ্চিহ্ন হওয়ার মধ্য দিয়েই জেগে উঠেছে আমাদের দেশের আধুনিকতা। আজকের সমাজে বনওয়ারীদের পাওয়া যাবে না কিন্তু করালীদের নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে।

হাঁসুলীবাঁকের ইতিহাস যেমন নিচুতলার সংবাদ—যে সংবাদ আমাদের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয় *গণদেবতা* তেমন নয়। *গণদেবতা* আমাদের দেশ কাল সন্ততির চলিষ্ণু ধারাবাহিকতার ইতিহাসকে মাঝখান থেকে দেখতে চেয়েছে। উচ্চবর্ণ নয় গণদেবতার নায়ক মধ্যস্তরের মানুষ—সদ্‌গোপ সমাজভুক্ত দেবু ঘোষ। একই সমাজের দুটি অভিব্যক্তি—ছিরু পাল আর দেবু ঘোষ। আত্মকেন্দ্রিক আর পরার্থপর, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক, জৈবিক আর

মানবিক তারা। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গণদেবতায় পৌরাণিক দেবতা নেই—আছে অনিরুদ্ধ, পাতু, শ্রীহরি, দুর্গা, দেবু, পদ্ম। এরা দেবতা নয়, মানুষ।' *গণদেবতা* আসলে চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ জীবনের টানাপোড়েনকে তুলে এনেছে। এই টানাপোড়েন নানামুখী। গ্রামীণ জীবনের টানাপোড়েন নানামুখী। গ্রামীণ institution হিসাবে চণ্ডীমণ্ডপ এখন আর আগেকার উচ্চ অমোঘ অবস্থায় নেই। নতুন নতুন তরঙ্গ আসছে। আমার একটি লেখায় বিশ্লেষণ করেছি :

'কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া—এই পঞ্চগ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল বিচিত্র এক বিপর্যয়। বদলে যাচ্ছিল পটভূমি আর যে-সব উপাদান গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানকে ধরে রাখে, স্থিতাবস্থা দান করে, সেই ভাবাদর্শ। সকলেই যে যার বর্ণগত অবস্থান থেকে সরে আসছেন ; জাতিগত পেশা বৃত্তি যাচ্ছে বদলে। নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার—সবাই বাৎসরিক ধানের বন্দোবস্তে খুশি থাকতে পারেননি—সকলেই বলেছেন নতুন এক বাজারি অর্থনীতির কথা।' (অচিন্ত্য বিশ্বাস : "আর এক আরম্ভের ভূমিকা তারাশঙ্কর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গেক মানুষ"। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* ; উক্ত; ১৮২ পৃ.] নতুন অর্থনীতির চাপে পিষ্ট নিম্নবর্গের মানুষ—*গণদেবতা* উপন্যাসে তাদের কথাও আছে। আছে দুর্গার কথা—যার ওপর ভদ্রলোকদের কুনজর কেবল শোষণের কথাই বলে না, বলে যৌন শোষণ (sexploitation)-এর ধারণার কথাও।

গণদেবতা-র পটভূমি বিশাল—এ 'ব্যক্তিহীন গণজীবনের শোভাযাত্রা' হয়ে উঠেছে কিনা, বাংলা ভাষায় সীমিত সংখ্যক মহাকাব্যিক উপন্যাসের একটি হয়ে উঠেছে কিনা সে প্রশ্ন এখানে তোলা অবান্তর। অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় দেখেছেন এ-উপন্যাসের গঠন অনেকটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের মতো। লক্ষ করেছেন এ-উপন্যাসে নেই কোনো কেন্দ্রীয় আখ্যান—প্রাচীন অশ্বত্থ গাছে যেমন মূল কাণ্ড যায় হারিয়ে। ভারতবর্ষে ধারাবাহিকভাবে যখন প্রকাশ পায় ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ থেকে, তখন এর নাম ছিল 'চণ্ডীমণ্ডপ'। পরে উপন্যাস হিসাবে 'গণদেবতা' নামটাই গৃহীত হয়। ভাবা হয়েছিল এ হল উপন্যাসের প্রথম ভাগ। গোটা উপন্যাসের নাম হবে 'পঞ্চগ্রাম'। দু'বছরের সামান্য কম সময় ধরে বই প্রকাশ পায়। ২০ কার্তিক ১৩৪৯ গ্রন্থাকারে *গণদেবতা* প্রকাশিত হয়। কিস্তিবন্দি লেখায় এসেছিল শিথিলতা। গ্রন্থপ্রকাশের সময় তারাশঙ্কর অনেক পরিবর্তন করেছিলেন। তবু যেন এ উপন্যাসে কোনো নির্দিষ্ট অবয়ব গড়ে ওঠেনি। 'দেশ' পত্রিকায় গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরে লেখা হয় বিস্তৃত সমালোচনা। আলোচক লেখেন *গণদেবতা* তারাশঙ্করের 'সৃষ্টি অনুকৃতি নয়'। [দেশ; ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৯]

গণদেবতা-র পরের অংশও (*পঞ্চগ্রাম*) 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ পায়। *গণদেবতা* আর *পঞ্চগ্রাম* মিলিয়ে একটি মহৎ উপন্যাস গড়ে উঠেছে। বীরভূমের গ্রাম সমাজ—আসলে যার বিন্দুতে ভারতবর্ষের গ্রাম জীবনের চিরকালীন সত্যসিন্ধুকেই উপহার দিয়েছেন তারাশঙ্কর। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন—'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে গোটা সমাজ অবয়ব পেয়েছে।' ['সাহিত্য ও সংস্কৃতি'—তারাশঙ্কর সংখ্যা; বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯]

গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের আসল সিদ্ধি এর বাস্তবতা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নির্ভরতা। তারাশঙ্কর দাবি করেছেন 'যাহার কথা কথকতা করিয়াছি—তাহার বাস্তব রূপ সম্বন্ধে আমার দাবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার; বিশ্লেষণে মতান্তর ঘটিতে পারে।' বাস্তবের পাশাপাশি

আদর্শ সন্ধানও তারাশঙ্করের অভীষ্ট। তিনি খুঁজেছেন মানুষের সমাজজীবনে স্থিতি সাম্য নীতির শুদ্ধি। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

> 'শুধু ময়ূরাক্ষী চরের এই দেবু-স্বর্ণের সংসারেরই ছবি নয় ওটা। আমি সারা দেশের সম্বন্ধে ঐ কল্যাণের কথা, —ঐ শ্রীর কথাই ভেবেছি।' [হরপ্রসাদ মিত্র : *তারাশঙ্কর* ; কলকাতা: আষাঢ় ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ]

তারাশঙ্করের আদর্শের ভার বহন করেছে তাঁর দৃষ্ট দেবু পণ্ডিত বা দেবু ঘোষ। তার উচ্চ আদর্শের উৎস সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও উপন্যাসের নায়ক হিসাবে সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলার মধ্যস্তরের জাতিসংস্থান সদ্‌গোপ। তারা কৃষক আর আত্মোন্নয়নশীল। ধর্ম সমাজ সংস্কৃতি সব ক্ষেত্রেই তাদের আত্মোন্নয়নশীলতার ভিত্তি ব্রাহ্মণ্যসমাজেরও তাদের ভাবাদর্শকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে নিহিত। ফলে তারা ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিকতার সঙ্গে সমন্বয়শীল একটি আদানপ্রদান তৈরি করেছে। *Social Mobility in Bengal* গ্রন্থে অধ্যাপক হিতেশরঞ্জন সান্যাল দেখিয়েছেন বাংলার দেব মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সদ্‌গোপ-তিলি-মাহিষ্য প্রভৃতি মধ্যস্তরের জাতিগোষ্ঠীর ভূমিকা যথেষ্ট বেশি। দেবু ঘোষের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পিছনে এই সাংস্কৃতিক প্রবণতার পরিচয় প্রসারিত হয়ে থাকবে।

গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম-এর একটি বীজগল্প আছে। *বেদেনী* গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত 'পিতাপুত্র'। ন্যায়রত্ন তার পুত্রকে পুরোনো ধারায় শিক্ষা দিতে পারেননি। পিতা-পুত্রে চরম বিচ্ছেদ হলেও পৌত্রকে ইংরেজি শিক্ষার দিকে ঠেলে দিতে পেরেছে ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্নকে ঘিরে *গণদেবতা* উপন্যাসে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠার বাসনা প্রকট। *তারাশঙ্করের প্রিয়গল্প* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন তিনি, 'পিতাপুত্র' গল্প সম্পর্কে :

> 'এ দেশের সমাজ ব্রাহ্মণই গঠন করেছে—সমাজকে সংস্কৃতিকে বহু বিপদ, বহু দুর্যোগ, বহু বিবর্তন ও বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছে; বিশ শতাব্দীর ভাব বিপ্লবেও এদেশের নেতৃত্ব করেছে ব্রাহ্মণ। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীতে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে গ্রাম্য সমাজে এখনও এই ব্রাহ্মণ বর্তমান রয়েছেন।...জন্মগত জাতি প্রধান বর্ণাশ্রম ধর্ম উঠে গেলেও কর্মগত ব্রাহ্মণ প্রাধান্য থাকবেই। এই ন্যায়রত্ন চরিত্র সেই কারণেই পরবর্তীকালে আমার বৃহৎ রচনার কেন্দ্রে প্রায় প্রাণশক্তির মত আবির্ভূত হয়েছে। গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে।...বৃহতের বীজ হিসাবে এই গল্পটি আমার প্রিয় গল্প।' [১৯৬০ আশ্বিন]

তারাশঙ্করের তত্ত্বভাবনা এই ব্যাখ্যানের দ্বারা সামান্য স্পষ্ট হয় বটে তবে তা প্রাচীন ভারতের স্মার্ত পণ্ডিতদের তুলনায় খুব অভিনব কিছু নয়। এই তত্ত্ব কাঠামো কতকটা ভারতীয় বাস্তবকে স্পর্শ করে থাকলেও সামান্য অতিক্রম করেই গেছে—ফলে গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম শেষপর্যন্ত আদর্শায়িত (idealised) রয়ে গেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যে একে উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করতে সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত—(তাঁর ভাষা : 'অনেক সময় মনে হয়, তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন; তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি।' *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*; উক্ত; ৫৫৯ পৃ.)—তা নিছক অকারণ নয়।

গণদেবতা আর *পঞ্চগ্রাম*-এর মুখ্য ঘটনাবৃত্তকে পাঁচটি বর্গে বিভক্ত করা চলে :

(১) জমিদারি ব্যবস্থার অবক্ষয়—দ্বারিক চৌধুরী এই বর্গের প্রধান ভূমিকায় অবস্থিত। অবক্ষয়িত হলেও তার চরিত্রগৌরব বর্তমান। শান্তভাবেই বাস্তবকে স্বীকার করে নেবার ঔদার্য তার ছিল।

(২) গ্রাম সমাজে ছিরু পালের মতো অর্থনৈতিক শক্তির উত্থান। আভিজাত্য নয়—সদ্য-

লব্ধ অর্থশক্তির অহঙ্কারে তার দাপট সর্বত্র। সংস্কারহীন, যে-কোনো অন্যায়ে পারদর্শী সে; বিন্দুমাত্র পাপবোধ-শূন্য।

(৩) গ্রাম-সমাজে দেবু পণ্ডিতের আবির্ভাব। এই চরিত্রের ন্যায় নীতি আদর্শের উৎস সম্ভবত তারাশঙ্করের কল্পনাই। তবে সকলেই সুখী হোক— গ্রামের প্রতিষ্ঠান ফিরে পাক মর্যাদা, মধ্যবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকের এই শুভ চেতনা, ব্রাহ্মণ্য আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়েই ভারতের সনাতন আদর্শটি টিকে থাকে— সেকথা বলাই বাহুল্য। দেবু পণ্ডিত বিদ্রোহী বা বিপ্লবী নয়, আমাদের ভারতীয় সমাজকাঠামোর নিহিত সংরক্ষিণী শক্তির *বিশশতকীয় অভিব্যক্তি।*

(৪) মহাগ্রামের মহামহোপাধ্যায় শিবশেখরেশ্বর ন্যায়রত্নের চরিত্রগৌরবের প্রতিষ্ঠা। এক্ষেত্রে সনাতনী আদর্শকে তারাশঙ্কর স্মরণ করতে চান। কেন, তা তাঁর উদ্ধৃত মন্তব্যে দেখিয়েছি। বস্তুত এই অংশ বা বর্গের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক উপরিতলগত নয়, একেবারে আন্তরিক। তারাশঙ্কর তেমন করেই দেখাতে চান। তিনি সেই ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সমর্থন করেন।

(৫) নিম্নবর্গের মানুষ। এদের দুটি অংশ—ক. হিন্দুভাবাপন্ন যারা, তারা অধিকার-বঞ্চিত মানহারা মানব সম্পদ। খ. মুসলমান সমাজ। *পঞ্চগ্রাম*-এর মুসলমান সমাজকে খানিকটা আত্মপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তারাশঙ্কর। তাদের মধ্যে দেশজ ধারা কেমন করে রয়ে গেছে তারও পরিচয় দিয়েছেন। এদের সকলকে নিশ্চয় নিম্নবর্গের অন্তর্গত করে ভাবা যায় না। বীরভূম জেলার রাজনগর-ইলাম বাজার-আহম্মদনগর প্রভৃতি অঞ্চলে উত্তর ভারতের বনেদি মুসলমান পরিবারের আনাগোনা ছিল। এরা বীরভূমের মুসলমান সমাজের অভিজাত সাংস্কৃতিক আদর্শটি তৈরি করেছেন। এদের কিছুতেই নিম্নবর্গ বলা যাবে না। নিম্নবর্গ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ধর্মান্তরিত মুসলমানদের। দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধ সংস্কৃতির আবহে থাকার ফলে যারা নিম্নবর্গের দিকে অভিসারিত হতে বাধ্য হয়েছেন তাদের একাংশ মুসলমান হয়েছেন। তারাশঙ্কর লক্ষ করেছেন—ধর্মান্তরিত হবার পর তাদের আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়েছে। অন্যরকম ছবিও থাকা সম্ভব। এদের একাংশ হিন্দু সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। ১৯৭০ সালে মে মাসের শেষ দিকে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের সঙ্গে তারাশঙ্করের কথাবার্তা হয়েছিল। দুজনেই উত্তররাঢ়ের মানুষ। সিরাজ বলেছিলেন, তাঁর দেখা 'হিন্দু জমিদারদের বহু মহালে মুসলিম প্রজারা গোমাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল।' (''মাননীয় তারাশঙ্কর সমীপেষু''; প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য সম্পাদিত *তারাশঙ্কর ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য* ; উক্ত ১১১ পৃ.) *গণদেবতা*-য় এরাও আছেন, আছেন ইরসাদের মতো নেতা, দৌলত শেখের মতো ধনাঢ্য জমিদার হয়ে আসা মানুষের ভূমিকার পাশাপাশি রহম শেখ-ষষ্ঠী কিঙ্কর বাবুদের দ্বন্দ্ব সংঘাত। সব মিলিয়ে এক বর্ণাঢ্য মানবসমাজ ধারা।

এই পঞ্চবর্গের মধ্যে ৫/ক অংশটি *গণদেবতা*-য় প্রাধান্য পায়নি। প্রধান হয়েছে ন্যায়রত্নের বাড়ির রথযাত্রার ডাক। তারাশঙ্কর লিখেছেন : 'একটা দূরাগত ঢাকের শব্দ কানে আসিয়া ঢুকিল, দেবু সচেতন হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। মহাগ্রামের ঢাকের শব্দ, ন্যায়রত্নের বাড়িতে রথযাত্রা। ঠাকুর বোধ হয় রথে চড়িলেন। রথ হয়তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের পথ ধরিয়া সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।' এখানেই *গণদেবতা* শেষ। তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন—'লেখা শেষ করে কেঁদেছিলাম।' তিনি দেখেছেন মানবমূর্তি ভেদ করে দেবতা কেমন করে উদ্ভাসিত হয়।

বহু সম্মান বহু পুরস্কার লাভ করেছেন তিনি। *আরোগ্য নিকেতন*-এর জন্য রবীন্দ্র

পুরস্কার আর অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন। পেয়েছেন *গণদেবতা*-এর জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। তবে আমাদের মনে হয় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাঁর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র জন্য—'শরৎচন্দ্র পদক ও পুরস্কার' লাভ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পুরস্কার *হাঁসুলীবাঁক* গ্রন্থ আকারে প্রকাশের আগেই দেওয়া হয়েছে। এর চেয়ে বড় সম্মান হয় না। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রদানের সময় তারাশঙ্করের *গণদেবতা* সম্পর্কে যে কথা তাঁরা বলেছেন তা তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক-সিদ্ধির মূল সূত্রগুলি ধরে আছে :

> 'Ganadevata is a prose-epic depicted the transitional period in the life of rural India when traditional calture values and economic strurcture move shaken to roots in the wake of the onset of industrial revolution, occasioning channges in life's pattern and furnishing new contexts for expression of human emotions.' [১৫. ১২. ১৯৬৭]

গণদেবতা তারাশঙ্করের সবচেয়ে খ্যাতি-পাওয়া উপন্যাস। শিল্পকর্ম হিসাবেও অত্যুন্নত।

গণদেবতা-র দেশচেতনার সঙ্গে পূর্ববর্তী একটি উপন্যাসের সম্পর্ক রচনা করা যায়। *ধাত্রীদেবতা* (১৩৪৬)। *ধাত্রীদেবতা* তারাশঙ্করের প্রথম বিশিষ্ট উপন্যাস। *ধাত্রীদেবতা*-তেই তারাশঙ্করের দেশচেতনার সূচনা। *ধাত্রীদেবতা*-য় শিবনাথ চরিত্রের আড়ালে তারাশঙ্করের আত্মপ্রকাশ। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-ধৃত দেশচেতনার প্রসারিত উপস্থিতি লক্ষ করেছি। এনিয়ে কিছু কথা সামান্য আগে উল্লেখ করেছি।

এই উপন্যাসে জেল-ফেরৎ শিবনাথের দেশ পুনর্গঠিনের উদ্যোগ তারাশঙ্করের উপন্যাস সাহিত্যের একটি পরিচিত প্যাটার্ন গড়ে তুলেছে। একসময় ডোমের মেয়েকে ঘিরে শিবনাথ সম্পর্কে যেমন কুৎসা রটেছিল তাতে মনে হয় এটিও তারাশঙ্করের উপন্যাসের একটি পরিচিত ছক। বাস্তব কোনো ভিত্তি থাকাও হয়তো সম্ভব এ-ঘটনার। দেবু পণ্ডিতের সঙ্গে মুচির মেয়ে দুর্গাকে ঘিরে এইরকম কুৎসা রটনা হয়েছিল। দেবুর দেশ পুনর্গঠন প্রয়াস আর করালীর *হাঁসুলীবাঁকে* ফিরে এসে বালি পরিষ্কারের সক্রিয়তায় শিবনাথের ভাবনারই প্রসার লক্ষ করি। 'জমিদারের মেয়ে' নাম দিয়ে 'বঙ্গশ্রী'তে আংশিক ভাবে প্রকাশের সময় না হোক, 'শনিবারের চিঠি'-তে প্রকাশের সময় আমরা দেখেছি তারাশঙ্কর তাঁর ঔপন্যাসিক দৃষ্টিভঙ্গিটি আয়ত্ত করেছেন। আত্মজৈবনিক এই উপন্যাস—তারাশঙ্করের মহৎ কথাসাহিত্যের ভূমিকা হিসাবে গণ্য করা যায়। গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে শিবনাথ অনুভব করেছে :

> সহসা একটা সোঁ সোঁ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথায় এ শব্দ উঠিতেছে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীর মনঃসংযোগ করিয়া সে আবিষ্কার করিল, শব্দ উঠিতেছে জমিতে, অনাবৃষ্টিতে রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে জমির জল শুকাইয়া যাইতেছে, মাটি ফাটিতেছে।
>
> উঃ, তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে! চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হ্যাঁ কথাই তো কহিতেছেন। সে যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল মৃত্তিকার আবরণ তলে ধাত্রীদেবতাকে। [২৫ পরিচ্ছেদ]

—একটু আবেগমথিত মনে হলেও এই স্থায়ী বোধই তারাশঙ্করের সাহিত্যের অন্যতম প্রাপ্তি। তারাশঙ্করের প্রধান চরিত্রগুলি এজন্যই ফিরে ফিরে আসে তাদের ধাত্রীদেবতার কাছে। *ধাত্রী দেবতা*-য় আছে দেশচেতনার পরাকাষ্ঠা। দেশহীন মানুষ—পশুস্বভাব। দেশ শুধু মাটি নয়, মানুষ আর সংস্কৃতি। দেশচেতনায় আর আছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার— সেবাধর্ম। শিবনাথ

এই জন্যই তার আসপাশের জনসম্পদকে পরিবর্তিত করতে চায়। আর আছে নগর ও গ্রামের দ্বন্দ্ব। দেশকে শোষণ করে সম্পদকে শোষণ করে সম্পদকে যারা চালান করে—খনি কারখানায় লাগায়, তাদের উৎকেন্দ্রিকতা, বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘাতে যাবার যে দুঃসাহস তাকে তারাশঙ্কর খুব সমর্থন করেন নি। তাঁর লেখায় শেষ অবধি অন্ত্যোদয়ের কর্মসূচী আর সত্যাগ্রহ, অসহযোগ আন্দোলনের সমুদ্র তরঙ্গ প্রধান হয়ে ওঠে। শেষ অবধি আদর্শরক্ষা করেই শিবনাথ শৈলজা আর উমার স্নেহ শ্রদ্ধা পায়। উপন্যাসের এই পরিণতি নিশ্চয় আদর্শায়িত। তবে সুন্দর।

রাইকমল উপন্যাসের একত্র অজয়-বিধৌত রাঢ়ভূমির মাটি থেকে বাঁশির শব্দ শোনার কথা বলেছিল মোড়ল—'বাঁশি?...কেউ বলে বাজত, কেউ বলে আজও বাজে, তা আমি শুনিনি।' মোড়ল না শুনলেও তারাশঙ্কর শুনেছেন। 'মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদমতলিতে'। বৈষ্ণব সংস্কৃতির এই উৎসক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সহজ সাধনা-র ধারা লক্ষ করেছেন তারাশঙ্কর। রসিকদাস, রাইকমল, রঞ্জনকে ঘিরে রোমান্টিক প্রেমাবর্তে তারাশঙ্কর *রাইকমল* উপন্যাসটিকে রহস্যমণ্ডিত আধ্যাত্মিক রসে জারিত করেছেন। রঞ্জনকে বিয়ে করার আগে কমলিনীকে বৈষ্ণব সংস্কারবশে মালা বদল করতে হল 'বগ বাবাজী' বা রসিকদাসের সঙ্গে। আর ব্যক্তিপ্রেম আধ্যাত্মিকপ্রেম একাকার হল কমলিনীর রাই-রূপিণী হবার মধ্যে। তাত্ত্বিকতা এই উপন্যসের দোষ, আবার সেখানেই এর জোর। তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'রাইকমলের প্রেমের মালা মানুষের গলায় পৌঁছোয় না, পৌঁছোয় নিত্যলীলারত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির গলায়।' *রাইকমল* পড়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হন। তিনি গল্পটিতে 'রচনার রস' আর 'জোর' দেখেছিলেন। শিশির ভাদুড়ী এই কাহিনী নিয়ে নাটক করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। 'রাইকমল' উপন্যাসে দুটি ছোটগল্পের উপাদান মিশ্রিত হয়েছে—'মালাচন্দন' ('উপাসনা'—ফাল্গুন, ১৩৩৮) আর 'রাইকমল' ('কল্লোল'—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)। গল্পাংশ যাই হোক, বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতির উপাদানের ব্যবহার হিসাবেই এই উপন্যাস তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের অন্যতম মৌলিক বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাইকমল উপন্যাসে বৈষ্ণব সমাজকে সম্পূর্ণ ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে তা বলব না। এ-উপন্যাসের বৈষ্ণব সমাজ যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্য যেন শৈথিল্যের পরিচয় দিয়েছে। কমলিনীকে আবিষ্কার করে রঞ্জন—বহুদিন পর—জয়দেব-কেন্দুলীর মেলার যাত্রী হয়ে। তারপর তার আশ্রমে যায় রাইকমল—গিয়ে দেখে সেখানে আছে অন্য এক নারী। তার নাম পরী। কমলিনী-রঞ্জনের বাল্যকালের সঙ্গিনী। কিন্তু একী চেহারা হয়েছে তার! মনে পড়ে কমলিনীর, রসিকদাসকে নিয়ে চলে আসার পর রঞ্জন পরীকে সাধন সঙ্গিনী করেছিল। আজ পরীর যৌবন শুষ্ক। মৃত্যু আসন্ন। পরীর মৃত্যু আর কমলের রঞ্জনের আশ্রমে সঙ্গী হিসাবে যোগ দান একই সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বলে মনে হয়। এরপর কমল লক্ষ করে হঠাৎ একদিন—তার চেয়ে তরুণী আর এক বৈষ্ণবী এল রঞ্জনের সঙ্গে। নতুন 'সাধন সঙ্গিনী'। কমলের কাছে জবাবদিহি করতে চায় রঞ্জন : 'বৈষ্ণবের সাধনা—রাধারাণীর কল্পনা—যৌবন রূপ', আর তাই দরকার নতুন 'সেবা দাসী'র! পরীর কথা মনে পড়ে কমলের। পরিণতির অনিবার্যতা মনে রেখেই চিরকালের জন্য বেরিয়ে পড়ে সে, পথে। গান গায়—রূপ লাগি আঁখি জুড়ে গুণে মন ভোর।...

বাইরে থেকে যত রোমান্টিক মনে হোক, এই নির্লজ্জ কামুকতাকে ধর্মসাধনা বলে চালানো, নারী-দেহকে একই সঙ্গে সাধনার সোপান আর কামতৃপ্তির আগার বলে দেখার

'সহজ'-সাধনা বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ হয়। বাংলার সহজ সাধনাও নির্লজ্জ কামুতকাকে প্রশ্রয় দেয় না। লালন সাঁই-এর জীবন অনুসরণ করলে তার প্রমাণ মেলে। চণ্ডীদাস-রামীর কিংবদন্তিও ঘন ঘন সঙ্গিনী বদলের কথা বলে না। বস্তুত তারাশঙ্কর এখানে বৈষ্ণবদের দেখছেন বাইরে থেকে। মনে হয় তারাশঙ্কর খুব গভীরভাবে বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে দেখেননি—দেখলে আরোপ সাধনা, অবতার-অবতারী তত্ত্বের অন্যরূপ দেখতে পেতাম হয়তো-বা তাঁর রচনায়। মাতৃবিয়োগের পর বৃদ্ধ রসিকদাসকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করার সময় রসিকদাস তাকে বলে এখন তার যৌবন অবসিত। কমলের সঙ্গী রঞ্জনের ক্রমাগত সঙ্গীবদলের কাহিনী পড়তে পড়তে মনে প্রশ্ন জাগে রঞ্জনের যৌবন কি নিত্যকালের সম্পদ? এই সূত্রে তাত্ত্বিকতা প্রশ্রয় পেলেও উপন্যাসের কাঠামোর যথেষ্টই ক্ষতি হয়—বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হয় অনেকখানি। *রাইকমল*-এর ত্রুটি এখানে।

স্বর্গমর্ত একই রকম উপন্যাস। ১৯৫৪-এ প্রকাশিত এই রচনায় বাগ্‌দি সমাজের বাস্তব জীবনবিন্যাস তুলে ধরা হয়েছে। আর রয়েছে কেঁদুলীর মেলায় বৈষ্ণব সমাজের অনুপুঙ্খ বিবরণ। বৈষ্ণবধর্ম বাংলার নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষদের রোমান্টিক-প্রণয় পিপাসা চরিতার্থ করার ক্ষেত্র—তারাশঙ্কর তাই এই পরিমণ্ডলে বারবার ফিরে এসেছেন। *স্বর্গমর্তে* অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পেয়েছে বাৎসল্যরসের সাধনা। বাস্তবের অভিঘাতে সেই সাধনার আদর্শ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। কমলের মতো ভিখারি না হয়ে এ-উপন্যাসের নায়িকা চলে গেছে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে। তার ছেলে চলে গেছে মোটরগাড়ির যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজে! বাংলার বৈষ্ণবতা কেমন করে নাগরিক অভিঘাতে ভেঙে গেল, *স্বর্গমর্ত* তার বিবরণ। বলতে পারতাম রাঢ়ের বৈষ্ণব সাধনার শেষ আর্তনাদ—final cry।

রাধা (১৩৬৪) উপন্যাসে ইতিহাস আর বৈষ্ণব সংস্কৃতি এক সঙ্গে দেখেছেন তারাশঙ্কর। বিলীয়মান মুসলমান যুগ আর আসন্নমান বিদেশী বণিকরাজ—এই সন্ধিক্ষণে বাংলার ধর্ম চেতনার বহস্যময় আবর্তে নরনারীর বেদনা ও পরিণতি দেখানোর উপন্যাস *রাধা* কৃষ্ণদাসী আর রমণদাস সরকারের সম্পর্ক এখানে বাধ্য এক নারীর ওপর বৈশ্যশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার নামান্তর—কৃষ্ণদাসী গণিকার মতো হয়ে গেছে। তবু তার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক আকুলতা প্রকাশ করেছেন লেখক—মানবিক মূল্যে তার গুরুত্ব রয়েছে। উদাসীন রাঢ়ের পটভূমিতে কয়ো বৈরাগী চরিত্রটি মানিয়ে গেছে। এই রকম আরও চরিত্র তারাশঙ্কর অঙ্কন করেছেন। রাঢ় বাংলার রুক্ষ ভূমিখণ্ডে তারা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয়—বিভিন্নভাবে গণ মানুষকে শিল্পের স্পর্শ দানই তাদের লক্ষ্য। অবশ্য কয়ো কুরূপের সীমা। গোবিন্দমোহিনীর প্রতি তার অবচেতন অবদমিত আকর্ষণ—বর্গির হাঙ্গামায় প্রবল অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যুবরণ বাংলার ইতিহাসের একটি খণ্ড। *রাইকমল*-এ যেমন, *রাধা*-তেও তেমনি—বৈষ্ণব সমাজ সংস্কৃতির বহুমাত্রিক উপকরণ সাধ্যমতো সার্থকভাবে উপস্থাপন করলেন তারাশঙ্কর। *রাধা*-য় উপরন্তু পাওয়া গেল ইতিহাস ও ভূগোলের পটভূমি। ইতিহাস—বর্গির হাঙ্গামা, আলিবর্দি খাঁর শাসনকাল। ভূগোল—কেন্দুলীর দক্ষিণে শ্যামরূপার গড়। তারাশঙ্কর এই নতুন ভূগোলে খুঁজে এনেছেন রোমান্টিক কল্পনার উদার বিস্তার। ইসলামবাজার অঞ্চলের গালাশিল্প—ধর্মঠাকুরের উপাসকদের সঙ্গে শ্যামসাধক ইছাই ঘোষের শক্তি পরীক্ষার পুরাকথা-লালিত স্মৃতিচিত্র এখানে একাকার। আর আছে মুলুকের আনন্দ চন্দ্র—খুশটিকরীর পীর হজরত হোসেনের কাহিনী কিংবদন্তি। মাধনানন্দ এ-উপন্যাসে বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। মাধবানন্দ স্বকীয়া-মতের পক্ষপাতী। তাঁর মত, কৃষ্ণ প্রবর্তিত মহাভারত

বা গীতার শিক্ষা তাকে পরকীয়া-সাধনা-বিলাসী বলে গ্রহণ করতে বলছে না। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণ স্বকীয়-সঙ্গিনীর সঙ্গে কৃষ্ণের শক্তি বা বীর্যের সাধনা। বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ*-এর সঙ্গে মাধবানন্দের মঠের খানিকটা মিলও পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠানেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বীজাকারে উপস্থিত। মাধবানন্দ কেশবানন্দের সক্রিয়তা—বর্গির হাঙ্গামা নিরোধের চেষ্টা, বিকৃত বৈষ্ণব পাষণ্ডদের দমন, আনন্দচন্দ্র স্বামীর সঙ্গে আলাপ, মন্দার যাত্রা—যুদ্ধে অংশগ্রহণ, ইত্যাদি থেকে মনেই হয় *আনন্দমঠ*-এর ছায়া *রাধা*-য় গাঢ় হয়ে পড়েছে। বিশেষত *আনন্দমঠ*-এর সন্ন্যাসী দল—সন্তানরা পরকীয়া ভাবনাকে অস্বীকার করেছে। 'অপ্রাকৃত' বৈষ্ণব ধর্মে তারা অবিশ্বাসী! উপন্যাসের কৃষ্ণদাসী-গোবিন্দ মোহিনীকে নিয়ে কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের গীত শুনিয়ে আসে মাধবানন্দদের। তবে মাধবানন্দ তাকে শ্রদ্ধা করেন না। কৃষ্ণদাসীর রাধাভাবের সাধনা মাধবানন্দের কাছে বিকৃতি ছাড়া কিছুই নয়। সে-বিকৃতির এক মুখ বৈষ্ণব ধর্মের সহজিয়া আউল কর্তাভজা সখী-ভেকী ইত্যাদি অপ-সাম্প্রদয়িক দলগুলির আচরণ। আর এক মুখ রয়েছে মনস্তত্ত্বে। কৃষ্ণদাসীর উন্মত্ততা এই দ্বিতীয় ধারণার ফল বলেই মনে হয়।

মাধবানন্দ যেভাবেই দেখুন, কৃষ্ণদাসীর মেয়ে গোবিন্দমোহিনী তেমনভাবে দেখেনি। কিশোরী গোবিন্দমোহিনী সরল ভাবেই মাধবানন্দকে কৃষ্ণরূপে ভজনা করেছে। তার সেই নিষ্কলুষ সেবাপরায়ণ দিব্য ভাবটি অস্বীকার করতে পারে জগতে এমন অভিমানী পুরুষ কে? মাধবানন্দ তাই কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেননি তার সেই বিকচোন্মুখ লাবণ্যময়ী ব্রীড়াশীলা গোবিন্দমোহিনী যখন নতুন রূপ নিয়ে আসে তার সামনে—যখন মাধবানন্দ শত্রুপক্ষের অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত—নিজের দলভুক্ত ক্ষমতালিপ্সু পশুশক্তির দলনে পিষ্ট আহত সর্ব রিক্ত। বাঁশরীওয়ালী প্যারী-র রূপ ধরে গোবিন্দমোহিনী আজ মাধবানন্দকে বাঁচিয়ে তুলল। তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল নতুন এক রাধাভাব। একটু উদ্ধার করি; বাঁশরীওয়ালী প্যারী-র উক্তি : 'আমার মধ্যে তারা শক্তি দেখে রাধাভাবের ছায়া; আমার সাধনাও সেই রাধাভবের।' [পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

মাধবানন্দ যখন জানতে চান সিদ্ধি পেয়েছে কিনা, বাঁশরীওয়ালী ওরফে গোবিন্দ মোহিনী বলে : 'সিদ্ধি কাকে বলে জানি না গোঁসাই, তবে আনন্দ পেয়েছি।' [ঐ]

ষোল বছর ধরে 'যৌবন-রূপের পূর্ণকুম্ভ কাঁখে' ফিরেছে সেই নারী। তাকে দেহ-সর্বস্ব বলা যায় না। তাই সেই নিষ্পাপ রাধাভাবের কাছে পরাস্ত মাধবানন্দ। তার সঙ্গে মৃত্যুত্তীর্ণ মহামিলন ঘটল বাঁশরীওয়ালী প্যারীর। সেই অপরূপ মিলনের বর্ণনা *রাধা* উপন্যাসের উচ্চমার্গীয় রসরূপ বলে মনে হয়। মাধবানন্দের মন থেকে সমস্ত আবরণ যখন খুলে গেল তখন তার আকুল আহ্বান :

'তুমি রাধা—আমার রাধা।'

এই মিস্টিক উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তারাশঙ্করের বৈষ্ণব সংস্কৃতি পরিক্রমা শেষ হয়। *রাইকমল*-এ যা ছিল আংশিক—*রাধা*-য় তা পূর্ণ বিকশিত।

ইতিহাসের আলো অন্ধকার, রাজশক্তির প্রতিস্পর্ধী সন্ন্যাসীদলের আদর্শবাদ, সংগ্রামী প্রত্যয়, ধর্ম রাজ্য প্রতিস্থাপনের চেষ্টা আর ব্যক্তি হৃদয়ের প্রেম-অপ্রেমের দ্বৈরথ—*রাধা*-কে রোমান্স হিসাবে প্রতিষ্ঠা যতটা দিয়েছে, ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে ততটা প্রতিষ্ঠা নিশ্চয় দেয়নি। তবে বাংলার অবতলবর্তী সমাজ-শরীরে যুগ যুগ ধরে চলে আসা নর-নারীর সাধন পদ্ধতিতে যে মাত্রায় তারাশঙ্কর *রাধা*-য় ধরেছেন, তার তুলনা খুব বেশি নেই! তারাশঙ্করের

সাহিত্যে—বাংলা সাহিত্যেও। *রাধা* বা *রাইকমল* বৈষ্ণব সংস্কৃতির আংশিক ও বিশিষ্ট দিক কিছু উপস্থাপন করার চেষ্টা করলেও *কবি* (১৯৪৪) উপন্যাসে এটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। *কবি* উপন্যাসে তারাশঙ্করের রাঢ়বাংলার পটভূমির মাত্রা, বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে অধিগত করার মাত্রা, নিম্নবর্গের নায়ক সন্ধানের মাত্রা একাকার হয়ে গেছে। *কবি* সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তী উচ্ছ্বসিত ছিলেন। তাঁর মতে 'বইখানি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার উপযুক্ত।' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করেরর নীলসরস্বতী"; 'পরিচয়'—তারাশঙ্কর সংখ্যা; মে-জুলাই ১৯৮৮) কথাটি অতিশয়ন বা উচ্ছ্বাস মনে হয়েছে সরোজবাবুর। আমরা তা মনে করিনা। কবি কেবল তারাশঙ্করের নয়—বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সেরা উপন্যাস। উপন্যাসটির নায়ক নিতাইকে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার দুঃখ সহ্য করার অপার শক্তিধর বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে নিতাইয়ের সাধনা বাংলার চিরন্তন সহজিয়া সাধনা—'ইহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়, ইহার পথ বাঙালী আপনার অনুভূতি—অর্থাৎ, নিজ অন্তরের ক্ষুধা অনুযায়ী আপনি খুঁজিয়া লয়। ইহারই নাম "সহজিয়া"—বাঙালীই এই মন্ত্রের আদি সাধক। সে কেমন সাধনা, এ গল্পের ঐ 'কবিয়াল' নায়ক তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।'... মোহিতলাল লিখেছেন এই সাধনা—শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, 'বেদান্তী' নয়—এ নিছক বাঙালির সাধনা।

কবি-র নায়ক নিতাই ডোম সমাজের। তবে কবিয়ালির প্রতি তার সুতীব্র আবেগ ঘন টান—বাংলার সাধারণ কৃষক খেটে-খাওয়া মানুষ যে কবিগানকে ঘিরে ধীরে ধীরে ভারত আত্মার পরিচয় লাভ করছে—পুরাণকথা সম্পর্কে অবগত হচ্ছে, নিতাই তার সঙ্গে যুক্ত। এভাবেই সৃজনশীলতা আর মনন বাংলার নিম্নশ্রেণীর মানুষের ওপর চুঁইয়ে পড়ে। নিতাই কবিয়ালের জীবনান্ত আসক্তি কবিগানে যুক্ত হয়েছে। এজন্য তার জাতিগত বৃত্তি তার পছন্দ হয়নি—দুর্বৃত্তিও সে প্রাপ্ত নীতিবোধ দ্বারা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছে, ফলে গ্রাম-পরিবার-পরিজন-সমাজ তাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। শেষ অবধি তাকে দাঁড়াতে হয়েছে পথের প্রান্তে। রেললাইনের কুলিগ্যাঙে করালীর মতো নয়। রাজা পয়েন্টসম্যানের সহযোগিতায় রেল স্টেশনে মুটে হয়ে কালপাত করেছে সে। এখানে তার দেখা হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। ঠাকুরঝির কাছে নিত্য চায়ের দুধ আর প্রশংসা পেয়ে ধন্য কবিয়াল। ঝুমুর দলের স্বৈরিণী বসনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে নিতাইয়ের ভাগ্য পরিবর্তিত হল। ঝুমুর দলেই নাম লেখাল সে। এরপর এক আশ্চর্য জীবন সাধনা তার—প্রেম ও কামনায় মাখামাখি, সার্থকতা আর ব্যর্থতায় মোড়া, আনন্দ আর বেদনায় মেশানো এই প্রান্তিক মানুষদের কথা *কবি* উপন্যাসটিকে সার্থক করেছে। বাংলা সাহিত্যে নৈতিক সংঘর্ষমান এমন একটি ট্রাজিক নায়ক আর দ্বিতীয় নেই।

কবি উপন্যাসের কিছু গান বাংলাসাহিত্যে অন্যভাবে, স্বতন্ত্র সঙ্গীত-বাণী হিসাবেও স্মরণীয়। '*কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে*' কিংবা অবিস্মরণীয় সে বেদনাময় জীবন-উদ্ভাসিত করা মন্তব্য : 'জীবন এত ছোট ক্যানে'! ঠাকুরঝি ভিন্ন জাতের মেয়ে—তার ছিল সংসার। তার ঘর ভাঙতে চায়নি নিতাই। আর শেষ পর্যন্ত ঠাকুরঝি পাগল হয়ে গেছে। অন্যদিকে ঘর সংসারহীন বাধা বন্ধনহীন সংস্কারবিহীন বসন—তার অনিবার্য পরিণতি ব্যাধি এসে তাকে চিরকালের মতো নিয়ে গেছে জীবনতীর্থের ওপারে। মৃত্যুর আগে ঈশ্বরের নাম নিতে পরামর্শ দিয়েছিল নিতাই—তার পরামর্শে দলিত ভুজঙ্গীর মতো রেগে বলেছে বসন : না। ঈশ্বর তো তার কোনো আশাই পূরণ করেন নি। জীবন নাট্যের একপাশে উন্মাদিনী ঠাকুরঝি আর অন্য পাশে স্বৈরিণী স্বেচ্ছাচারিতার

সীমা বসন—মাঝখানে নিতাই; তারাশঙ্কর এই উপন্যাসটির মারফৎ রাঢ়বঙ্গের প্রান্তিক জনজীবনের আন্তরিক চিত্র অঙ্কনের মধ্যে এই অপূর্ব উপন্যাসের সাহিত্যিক-ভাষ্যটি গড়েছেন।

আমরা তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য পরিক্রমা করলাম। দেখলাম রাঢ় দেশের জন্মগ্রামের ধাত্রীদেবতাকে খুঁজতে গিয়েই তারাশঙ্করের লেখনী প্রকৃত আসল স্ফূর্তি পেয়েছে। এই সন্ধানের ফসল হিসাবেই তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিকে দেখতে হবে—তাঁর *গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম* এই সন্ধানের একটি দিক হলে অন্য দিকটি ধরা আছে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* বা *কবি*-তে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* আর *আরোগ্য নিকেতন*-এ, *সন্দীপন পাঠশালা* বা *কালিন্দী*-তে এক ধরনের রূপ নির্মাণ ও জীবনজিজ্ঞাসা তিনি উপস্থাপিত করেছেন। চারটি উপন্যাসেই তারাশঙ্কর স্বকীয় স্বরাট স্পন্দমান কালপ্রবাহ আর বিবর্তমান পটে মানুষ এখানে খুঁজে পেতে চেয়েছে নিজেকে। কবি-র নিতাই আর হাঁসুলীবাঁকের করালীর সাধনা এইভাবে একটি অবয়ব পায়; দেবু পণ্ডিত বা শিবনাথের জিজ্ঞাসার তারা মাটিমাখা রূপ। হাঁসুলীবাঁকের উপকথা এই পর্যায়ে আর একটু স্বতন্ত্র। রাঢ় বাংলার সমাজ-শরীরে অস্পৃশ্য-সমাজবহির্ভূত যে সমস্ত মানুষের পেশা বৃত্তি ঠিক সমাজ অন্তর্গত থাকে নি; যারা নানা রকম অপরাধ প্রবণ পেশা অবলম্বন করে সমাজের বহির্বৃত্তে অবস্থান করেছিল—তারাশঙ্করের উপন্যাসে তারা ধীরে ধীরে সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করছে—উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য তো তাই। এদিক থেকে দেখলে বর্ণাশ্রম ধর্মের চতুরঙ্গে যারা নেই—যারা অন্ত্যজ—শূদ্র ও অস্পৃশ্য (উচ্চবর্ণের সেবা করার অধিকারও যাদের নেই!) তাদের সমর্থ আত্মোন্নয়নই *কবি* আর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথার* প্রকৃত তাৎপর্য। *কবি*-র নিতাইয়ের অভিযান একক *হাঁসুলীবাঁকের উপকথার* নায়ক বনওয়ারী প্রতিনায়ক করালীর অভিযান গোটা শ্রেণীর। তাদের জন্য উপযুক্ত একটি অভিধা আমাদের—সমর্থ-পঞ্চম। চার বর্ণের বাইরে ছিল তারা, কিন্তু আধুনিকতার পরিবেশ, সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা, হিন্দু সমাজের নমনীয় ভাবাদর্শে তারা পঞ্চম হয়ে থাকে নি, তাদের সামর্থ্য অনন্য। তারাশঙ্করের জীবনভাষ্য এক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজপদ্ধতিকে যথার্থ বিশ্লেষণে সার্থক সন্দেহ নেই। গণতন্ত্রের নতুন বাস্তবতার পটভূমি, পঞ্চায়েত-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের নব্য রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এই সমর্থ-পঞ্চমদের ভূমিকা উত্তরোত্তর পরীক্ষিত হচ্ছে—হবে।

২

তারাশঙ্করের সাহিত্যিক-ভূগোল ও হাঁসুলীবাঁকের উপকথা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যে ভৌগোলিক পটভূমিকে তাঁর সাহিত্যের মূল ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, সবাই জানি—সেটি হল উত্তররাঢ়। দক্ষিণে বর্ধমান জেলার অজয় নদী, পূর্বে ভাগীরথী নদী ও মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী-নদীর পশ্চিম-পার, নদীয়া জেলা। উত্তরে গঙ্গা—রাজমহল পাহাড়, পশ্চিমে ঝাড়খণ্ডের মালভূমি অঞ্চল। দুমকা সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি অঞ্চল—অনুর্বর একটি অঞ্চল, জঙ্গল মহাল। বীরভূম-এর সাধারণ ভূ-প্রকৃতি ঝাড়খণ্ডের মতোই। গঙ্গা-ভাগীরথীর দিকে প্রবাহিত কয়েকটি ছোট-বড় নদ-নদী বীরভূমে পলি ফেলে কোথাও কোথাও মৃত্তিকা কথঞ্চিৎ উর্বর করেছে—কোথাও অবশ্য আরণ্যক বা অহল্যা-ভূমি। ঢেউ খেলানো—খোয়াই টাঁড় বা পাথরে পূর্ণ মাটির দেশ। ময়ূরাক্ষী-কোপাই-ব্রাহ্মণী-অজয় প্রভৃতি নদীর ধারা—সবই দক্ষিণ বা পূর্ব-বাহিনী।

তারশঙ্করের ভৌগোলিক পটভূমিতে পাচ্ছি আরও কিছু নদী। যথা :

(১) **বাঁশলৈ** : মুরারই-কে দক্ষিণে রেখে পূর্ববাহিনী নদী। বিপ্রনন্দী গ্রামের একটু আগে উত্তর-পূর্বে বাঁক নিয়ে চলে গেছে রাজগাঁও-কে বাঁদিকে রেখে—গঙ্গায় মিশেছে।

(২) **পাগলা** : মুরারই-এর সামান্য দক্ষিণে উদ্ভূত। পাইকরকে ডানদিকে রেখে উত্তর পূর্বে গিয়ে বিপ্রনন্দী পার হয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে ক্রমে উত্তর-পূর্ব আর দক্ষিণ-পূর্বে গিয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে।

(৩) **তুপিত** : নলহাটির দক্ষিণে পূর্ববাহিনী। ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় আরও এক-আধটি কূলপ্রবাহ এর সঙ্গে মিশেছে। কিছু দূর গিয়ে এই নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে ব্রাহ্মণী নদীর প্রবাহ।

(৪) **ব্রাহ্মণী** : ঝাড়খণ্ড থেকে উদ্ভূত এই নদী পূর্ববাহিনী। সাদিনপুর রেলস্টেশনের একটু উত্তরে উত্তর-পূর্ববাহিনী হয়ে তুপিতের সঙ্গে মিলিত হয়ে বুজুঙ্গা-ভদ্রপুরের মাঝখান দিয়ে চাঁদপাড়ার পূর্বে গিয়ে দ্বারকা নদীতে মিশে গেছে।

(৫) **দ্বারকা** : ঝাড়খণ্ডে উদ্ভূত মহম্মদবাজারের উত্তরে আর মকদুমপুর-এর দক্ষিণে বীরভূমে প্রবেশ করেছে। প্রবেশমুখে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী দ্বারকা একটু পরে গদাধরপুর রেলস্টেশনের উত্তর দিকে উত্তর-পূর্বে প্রবাহিত হয়ে কানাচি-নারগ্রাম ছুঁয়ে বসোয়ার পর মুর্শিদাবাদে গেছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে তুপিত-ব্রাহ্মণীর ধারা রামপুরহাটের পূর্বে মারগ্রামে দ্বারকা-ব্রাহ্মণীর মোহনা।

(৬) **ময়ূরাক্ষী** : ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা থেকে এসেছে এই জলধারা। উৎস দেওঘরের সন্নিকট ত্রিকূট পাহাড়ের ঝর্ণাধারা। মহম্মদবাজারের পর তিলপাড়া বাঁধ। অনতিদূরে সিউড়ি। সাঁইথিয়া অবধি ময়ূরাক্ষী শুধু পূর্ববাহিনী—বড় চড়া ফেলে চলে গেছে। সাঁইথিয়া পার হয়ে সামান্য উত্তরে গিয়ে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী ময়ূরাক্ষীর উত্তরে দুনা দক্ষিণে গণটিয়া। এরপর মুর্শিদাবাদ জেলায় মালিহাটির উত্তরে সামান্য উত্তর-পূর্বে যাত্রা করে হিজলবিল ছুঁয়ে দক্ষিণবাহিনী ময়ূরাক্ষী উদ্ধারণপুরের সামান্য আগে ভাগীরথীতে মিশেছে। ময়ূরাক্ষী প্রায় আড়াআড়িভাবে বীরভূমকে দুই ভাগে ভাগ করেছে।

(৭) **বক্রেশ্বর** : রাজনগরের দক্ষিণ তাঁতিপাড়ার পশ্চিমে বীরভূম জেলার পশ্চিমপ্রান্ত থেকে উদ্ভূত বক্রেশ্বর দক্ষিণ-পূর্বে চিনপাই হয়ে সোজা পূর্বে আহম্মদপুরের দক্ষিণে ব্যাসপুরের উত্তরে লাভপুরের পূর্বে গিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় ময়ূরাক্ষী নদীতে মিশেছে। বক্রেশ্বর তীর্থ এর তীরবর্তী।

(৮) **কোপাই** : পাঁচড়ার একটু উত্তরে ঝাড়খণ্ড থেকে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী কোপাই। খণ্ডগ্রাম জাহানাবাদ হয়ে শান্তিনিকেতনের পরে সামান্য উত্তরে বেঁকে কোপাই মহিষাদল ছুঁয়ে বক্রেশ্বরের সঙ্গে মিশেছে লাভপুরের সামান্য দক্ষিণে।

এছাড়া তারাশঙ্করের ভৌগোলিক পরিসীমাটি বুঝে নেবার জন্য আমাদের প্রয়োজন আরও কিছু তথ্যসূত্র। যেমন, বীরভূমের আরও কয়েকটি নদীর নাম—

(৯) বন্দর; (১০) কানা ; (১১) হিঙ্গলা; (১২) চন্দ্রভাঙ্গা; (১৩) কুশকর্ণিকা; (১৪) মণিকর্ণিকা; (১৫) পলাশী ; (১৬) গম্ভীরা; (১৭) কৈ; (১৮) সুরবসি ; (১৯) মারভাঙ্গা ; ২০. ভুলকা।

কোপাই নদীর নামান্তর কোপাই এবং শান।

মুণ্ডারি ভাষায় বীর শব্দের অর্থ বনভূমি। বীরভূম সম্ভবত অরণ্যময় বলেই অনুরূপ নাম। বীরভূম নিয়ে সামান্য কিছু কিংবদন্তিও আছে। শ্রীপাট মুলুকের সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় এরকম কিছু কিংবদন্তি জানিয়েছেন। সেই সব কিংবদন্তির উৎস কতদূর সত্যস্পর্শী বলা সম্ভব নয়। কয়েকটি নমুনা দিলাম—

১. বীর নামক কৌমের অধিবসতি হিসাবেই 'বীরভূম' নাম।

২. বীর গোস্বামী (সুপুরের)-র নাম থেকে বীরভূম হয়েছে।

৩. বীরাচারী তান্ত্রিকদের সাধনভূমি হিসাবে বীরভূম হয়েছে।

[পশ্য : সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় : *বীরভূমকে জানুন* ; প্রত্নপ্রদীপ, শ্রীপাট মুলুক, বীরভূম, ১৪০০ বঙ্গাব্দ ; ১ পৃ.]

মুণ্ডারি 'বীর' শব্দের সঙ্গে ভূমি যোগ করে বীরভূমি—এও একটি লোক নিরুক্তি হওয়া সম্ভব। মতটি প্রথম প্রচার করেন সম্ভবত বিনয় ঘোষ। বন্য বরাহকে মুণ্ডারিতে 'বীরকেরা' বলা হয়। ("Village Nomenclature of the Ranchi District" প্রবন্ধ : P. Ponethe S. J. রচিত: *Cultural Chotanagpur : Unity in Diversity*; গ্রন্থভুক্ত। 47 পৃ.) বাংলার পশ্চিম আর অধুনা ঝাড়খণ্ডের পূর্বে বেশ কয়েকটি অঞ্চল ভূম-অন্তক নামের। সবগুলিতেই তৎসম শব্দ—মল্লভূম, সেনভূম, মানভূম, ধলভূম, শিখরভূম, বড়াভূম ইত্যাদি। সুতরাং 'বীর' শব্দটি অকস্মাৎ এসে পড়া অসম্ভব না হলেও একটু আকস্মিক বলেই মনে করি। বর্ধমান জেলার পশ্চিমে অজয়ের তীরে আছে বীরকুলটি গ্রাম। বনভূমি কাছাকাছি নেই। একসময় ছিল কিনা জানা যায় না।

'কুলপঞ্জিকা'তে একটি অর্বাচীন শ্লোক মিলেছে। 'কুলপঞ্জিকা'টি সংকলন করেছেন মহেশ্বর। শ্লোকটির একটি পদ পাচ্ছি না।

বীরাভূ ঃ কামকোটী স্যাৎ প্রাচ্যাগঙ্গা জলান্বিতা।
আরণ্যকং প্রতীচ্যাঞ্চ দেশোদার্ষদ উত্তরে।
বিন্ধ্য পাদোদ্ভবা নদ্যাঃ দক্ষিণে বহবঃ স্থিতাঃ॥

অর্থাৎ, উত্তরে যার দার্ষদ বা কঙ্করময় ভূভাগ, পশ্চিমে অরণ্যভূমি, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত হতে উদ্ভবা বহু নদী আর গঙ্গা—এই হল বীরভূমের চতুঃসীমা। বীরভূমকে 'কামকোটী' বলা

হয়েছে এই শ্লোকে। কামকোটা খুব সম্ভব তারাপীঠের নির্দেশক। তারাপীঠে একসময় বীরাচারী তান্ত্রিকদের উপস্থিতি থাকা অসম্ভব ছিল না। তাই বীরভূম বীরাচারীদের ভূমি হলেও হতে পারে। সমগ্র বীরভূমে বেশ কয়েকটি শক্তি-পীঠের সন্ধান মেলে। এগুলির মধ্যে বক্রেশ্বর-নলহাটী-নন্দীগ্রাম (সাঁইথিয়ার নিকটবর্তী) লাভপুর-কঙ্কালীতলা-ইটাগুা ও দণ্ডেশ্বরী প্রধান।

বীরভূমে একদা বৌদ্ধ ধর্মের প্রাবল্য ছিল। পাল রাজাদের সময় বীরভূমে যথেষ্ট বড় বড় গ্রাম মন্দির পুষ্করিণীর ইতিহাস পাওয়া যায়। ধর্মপূজার ইতিহাস জড়িয়ে আছে বীরভূমের বৌদ্ধ সংস্কৃতির সঙ্গে। অনেকেই এরকম একটি মত পোষণ করেছেন। বীরভূমের ক্ষেত্রসমীক্ষক-গবেষক হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের লেখা সামান্য উল্লেখ করছি। 'শিব ও নারায়ণের সঙ্গে বৌদ্ধ শূন্যরূপকে মিলাইয়া রামাই পণ্ডিত ধর্মরাজ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন।' (শুভশ্রী'-সাহিত্য সংকলনে ১৩৭৯ অন্তর্গত প্রবন্ধ—"মঙ্গল গান") হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ধারণা ছিল বীরভূম তথা রাঢ় দেশে নিম্নবর্গের বহু মানুষ ক্রমে স্থানীয় শাসনকর্তাদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এরা ডোম-বাগদি-বাউরি প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ জাতি। ইংরেজরা আসার পর নতুন ভাবে জমিদারি পত্তন হল। এদের কর্মচ্যুত হতে হল। কেউ কেউ কৃষিকর্মে যুক্ত হলেও অনেকে অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠল। তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে এদের সামাজিকীকরণের প্রয়াস ও কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ পাই। হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি মধ্যস্তরের জাতি-গোষ্ঠীর কথা লিখেছেন—যেমন, 'তিলি তাম্বুলী, মালী, গোপ্, নাপিত, গোছালী, চিটে, পিটে, কামার, এই নয় জাতি আমার।'—এই প্রবাদে ধরা আছে নব শাখের কথা। হিন্দু ধর্মের নব শাখা এরা। তিলি-রা বণিক, তাম্বুলী পান-বিক্রেতা, মালী মালাকার, গোপদের দুটি অংশ—সৎগোপ আর পল্লব গোপ, নাপিত অর্থাৎ ক্ষৌরকার, গোছালি—বারুজীবী, বারুই—পানের চাষি, চিটে—মোদক ময়রা, পিটে—কুমোর আর কামার—কর্মকার। এরা ছিলেন 'বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী'। সিদ্ধল গ্রামবাসী ভট্ট ভবদেব এদের হিন্দু সমাজের অন্তর্গত করেছিলেন—'পুরোহিত দান পূর্বক'। (পশ্য: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় *গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি*, ১৯৯৯ সংস্করণ, পুস্তক বিপণি; কলকাতা ; প্রথম প্রকাশ—১৯৭২; ২১পৃ.) সিদ্ধল গ্রাম বর্তমানে শীতল গ্রাম। বীরভূমে বাংলার জনজাতি সমূহের আলোড়ন বিলোড়নের ইতিহাস স্পষ্ট অনুভব করা যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের ভূগোল প্রধানত বীরভূম। অন্যভাবে বলা যায় বর্ধমানের সামান্য কিছুটা অঞ্চল (খড়ি নদী পর্যন্ত—অজয়ের দক্ষিণে, সেন পাহাড়ী আর উদ্ধারণপুরের ঘাট অবধি, অর্থাৎ কাটোয়া পর্যন্ত) আর মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা-ভাগীরথীর পশ্চিমাংশ নিয়ে তারশঙ্করের সাহিত্য-ক্ষেত্রটি গড়ে উঠেছে।

তারশঙ্করের বীরভূম—জেলা বীরভূম থেকে সামান্য বড়। বিনয় ঘোষ বীরভূম জেলা গড়ে ওঠার—ভাঙা-গড়া, গ্রহণ-বর্জনের একটি তথ্যানুসন্ধান করেছেন। একসময় যাকে 'কঙ্ক গ্রামভুক্তি' বলা হত —ক্রমে তাই বীরভূম জেলায় পরিণত। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করার পর বীরভূমের অন্তর্গত ছিল সাঁওতাল পরগণা ও বিষ্ণুপুর বর্ধমানেরও কতকাংশ। ১৭৯৩ সালের একটা সময় মুর্শিদাবাদের ২৫০-টি গ্রাম বীরভূমে যুক্ত হয়। ১৭৯৯ সালে অধুনা পুরুলিয়ার পঞ্চকোট-ঝালদা অঞ্চলও ছিল জিলা বীরভূম। ১৮০৬ সালে বীরভূম জেলা সংকুচিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করে। (পশ্য: বিনয় ঘোষ: *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* ; প্রথম খণ্ড; প্রকাশ ভবন; কলকাতা; ১৯৭৬ ; এক খণ্ডে প্রথম

সংস্করণ বের হয় ১৯৫৭; ৮৭-৮৯ পৃ.)। ১৮৪৯-৫২ নাগাদ ক্যাপটেন শেরউইল বীরভূমের চৌহদ্দি তাঁর মানচিত্রে যেমন এঁকেছিলেন তাতে দেখা যায় বীরভূম তখন অনেকটাই আজকের রূপ পেয়েছিল। এই জেলার পূর্বে মুর্শিদাবাদ, উত্তরে ভাগলপুর, দক্ষিণে বর্ধমান-পুরুলিয়া আর পশ্চিমে রামগড় ও মুঙ্গের। জেলাটি ছোট নাহলেও মাঝারি। ত্রিভুজাকৃতি। ক্রমশ নিচের অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে প্রসারিত।

জেলাটির প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমশ পূর্বদিকে ঢালু। পশ্চিমে পাহাড়—ছোটনাগপুর। পূর্বে গঙ্গা। অনেকগুলি নদী (নাম আগে লিখেছি) এই জেলার মাটিকে উর্বর করেছে। সাঁওতাল পরগনা থেকে দক্ষিণবাহিনী বরাকর জেলাটিকে ছোটনাগপুর মালভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে ('The valley of the Barakar separates the south-west of the district from the Chota-Nagpur plateau'—এল. এস. এস. ও'ম্যালি : *Bengal District Gazetteers*. Santal Parganas. দিল্লী-১৯৯৯ ; প্রথম সংস্করণ ১৯১০ ; ৭ পৃ.) রাজমহল থেকে মূলত দক্ষিণমুখী ভাগীরথী-র দিকে এই অঞ্চল থেকে প্রবাহিত অজস্র ছোট বড় নদী প্রবাহ এসেছে—'The streamas which rise with in the Rajmahal Hills' এসে মিশেছে গঙ্গায় (join the Ganges after it has made its great curve southwards below Sahibganj') হঠাৎ আসে বন্যা. তারাশঙ্কর যাকে বলেন 'হড়পা বান' ওম্যালির ভাষ্যে তা হল 'rapid torrents. impassable owing to the velocity of the current'. গ্রীষ্মে এই জলধারাগুলি থাকে শীর্ণ—'in the hot season they are reduced to a mere thread of water not more than 2 feet deep : with a gentle stream trickling through the sand.' তারাশঙ্কর কোপাই সম্পর্কে লিখেছেন বন্যার দু-চার দিন পর 'আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুল-কুল শব্দ করে বয়ে যায়।' [১ ম পর্ব/ এক-পরিচ্ছদ]

ওম্যালি সাঁওতাল পরগনার জেলা বিবরণে বীরভূম দিয়ে প্রবাহিত নদীগুলির কথা লিখেছেন। এগুলির মধ্যে গুমালি বীরভূম ছুঁয়ে যায় নি। বাঁশলই নদীর উৎস গোদ্দা-মহকুমার বাঁশ পাহাড়। (ম্যালি : ১১ পৃ.)। ব্রাহ্মণীর উৎস দুমকা-মহকুমার দুধুয়া-পাহাড়। এরপর ফাড়াশিমুল, শঙ্করা হয়ে, ঝিলিমিলি-মোসনিয়া-পার হয়ে দাঁড়ি-মৌলেশ্বর হয়ে বীরভূমে প্রবেশ করেছে ব্রাহ্মণী। ময়ূরাক্ষীর উৎস দেওঘর মহকুমার উত্তর-পূর্বে ত্রিকূট তথা তিউর পাহাড়। সাঁওতাল পরগণায় এর নাম 'মোর'। দেওঘর-দুমকা-কুমারবাঁদ হয়ে আমজোড়া-মহকুমা পার করে মোর এসে পড়েছে বীরভূম জেলায়। ভুড়ভুড়ি তিপরা আর পুসারো নামের ছোট ছোট তিনটি উপনদী এর সঙ্গে মিশেছে ইতিপূর্বে। এছাড়া ভামরি আর নুনবিল-এর কথাও লিখতে পারি—আছে সিংরো-র মতো উপনদী। অজয় নদের উৎস মুঙ্গের জেলায়। দেওঘর-মহকুমায় সাঁওতাল পরগনা হয়ে সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত অজয়ে মিশেছে—পশ্চিম থেকে আসা পাথরো (সারাথ-এর কাছে), জয়ন্তী প্রভৃতি উপনদী। কুশবেদিয়া-মিহিজাম-আফজলপুর হয়ে এসেছে বর্ধমান-বীরভূমের সীমানায়। (পশ্য : ওম্যালি-উক্ত গ্রন্থ : ১২পৃ.) বীরভূম-বর্ধমানের সীমানা বরাবর অজয় চলেছে পূর্বে। কাটোয়ায় মিশেছে ভাগীরথীর সঙ্গে। কাটোয়া-উদ্ধারণপুরের ঘাট তারশঙ্করের ভূগোলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তারশঙ্করের ভৌগোলিক সীমানাতেই বাস করেন। তাঁর মতে তারাশঙ্করের সাহিত্যিক ভূগোল শুধু বীরভূম নয়—সামান্য বড়ো। কারণ—'সেটি বীরভূম-রাঢ় মুর্শিদাবাদ সংলগ্ন বর্ধমানের কিয়দংশ, যে-অংশটি অজয় নদের উত্তর তীরবর্তী।..... এখান থেকে উত্তরে কিছুদূর এগিয়ে গেলে রাঢ়-মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ

অঞ্চল এবং সেখানে সমৃদ্ধ গ্রাম সালার' (এই গ্রাম নিয়ে *ভুবনপুরের হাট* লিখেছেন তারাশঙ্কর) আর আছে 'বীরভূম-মুর্শিদাবাদ সীমানায় গনুটিয়া গ্রাম'। মোটকথা সিরাজের সিদ্ধান্ত : তারাশঙ্কর 'শুধু বীরভূমের নন, রাঢ়-মুর্শিদাবাদ এবং বর্ধমানের উত্তরাংশ অজয় নদীর উত্তর তীরের একটি বিস্তৃত অঞ্চলের রূপকার।' (''মাননীয় তারশঙ্কর সমীপেষু''; উল্লেখিত গ্রন্থ; ১০৫ পৃ .) সিরাজের প্রদত্ত মানচিত্র নজর করলে তারাশঙ্কর-সাহিত্যের যে বীরভূম-অতিরিক্ত পটভূমিটি পাওয়া যায় তার মধ্যে মূল এলাকা ও চিহ্নগুলি উল্লেখ করা যাক।

(১) **রাঢ় মুর্শিদাবাদ** : নিমতিতা, আজিমগঞ্জ, নগর, খাগড়াঘাট, গোকর্ণ, খড়গ্রাম, কান্দি, মালিহাটি—ইত্যাদি জনপদ।

(২) **বর্ধমান** : উদ্ধারণপুর শ্মশানঘাট।

(৩) **বিল অঞ্চল ● বিশেষ মাঠ ইত্যাদি** : নগর-খড়গ্রামের মধ্যবর্তী *বরমলাগের মাঠ* ; কান্দি-গোকর্ণের মধ্যবর্তী *হিজল বিল* ; কুলির উত্তরে *আখড়াই দিঘি* ; লাভপুরের সোজা পূর্বে—বর্ধমান জেলার *লাঙ্গলহাটার বিল*।

(৪) **পথ চিহ্ন** : মঙ্গলকোট থেকে সোজা উত্তরে যাওয়ার বাদশাহী সড়ক।

অন্যান্য মানচিত্র খেয়াল করলে এই বীরভূম-অতিরিক্ত অংশটির চিত্র আর একটু স্পষ্ট হতে পারে। ফরাক্কার দক্ষিণে তিলডাঙা, জাফরগঞ্জ, ধুলিয়ান, নিমতিতা, জঙ্গিপুর, রঘুনাথ গঞ্জ, মণ্ডলপুর, মীর্জাপুর গণকর, সকাকোটনা, মনিগ্রাম, মোরগ্রাম, সাগরদীঘি, বড়ালা, আজিমগঞ্জ, পঞ্চগ্রাম, নবগ্রাম, ঝিলি, সেরপুর, পারোলিয়া, গোকর্ণ, খড়গ্রাম, কান্দি, পাঁচথুপি, বরওয়ান, ভরতপুর, সালু বা সালার।—এই অঞ্চলের সবটাই তারশঙ্কর চিনতেন? হতেও পারে। অজয়ের উত্তরে বর্ধমান জেলার অংশটুকু অবশ্য তারাশঙ্করের উপন্যাস-সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এখানে কেতুগ্রাম, রামজীবনপুর, নিরোল আর গঙ্গাটিকুরি—এই অঞ্চলগুলির কথা নিশ্চয় লিখতে পারি। কেন্দুলীর দক্ষিণে ঢেকুর—শ্যামরূপের গড়ের কথা আছে *রাধা* উপন্যাসে।

সিরাজ লিখেছেন তারশঙ্কর টমাস হার্ডির মতো 'নিজে মানচিত্র এঁকে তাঁর অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন নি। 'অঞ্চলের আঞ্চলিকতা থেকে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন।' বিষয়টি বোঝাবার জন্য একটি স্মৃতি-চিহ্নিত ঘটনা উল্লেখ করেছেন সিরাজ। তখন কলকাতায় তারশঙ্করের বাস্তবতাবোধ নিয়ে বিতর্ক চলছে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় চন্দ্রবোড়ার শিস আর *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র 'বেদেনীর শরীরে কাটালিচাঁপার গন্ধ' বের হওয়া অবাস্তব—এই অভিযোগ উঠেছিল 'দেশ' পত্রিকায়। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজও তারাশঙ্করের সাহিত্যিক ভূগোলের মানুষ, মুর্শিদাবাদের গোকর্ণ-এর কাছে খোশবাসপুর তাঁর জন্ম গ্রাম। তিনি জানেন ঐ অঞ্চলের লোকমানস। তাই চিঠি লিখেছিলেন—'দেশে'র ঐ 'ফিচার লেখকে'র বিপক্ষে। ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে 'আঞ্চলিকতা' বিষয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। তারাশঙ্কর ব্যক্তিগতভাবে সৈয়দ মুস্তাফাকে ডেকেছিলেন সেই সভায়। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সিরাজকে সভার মধ্যেই বলেছিলেন—'কী করেছিস? তারশঙ্কর তখন থেকে সিরাজ সিরাজ করে অস্থির।' মূল বক্তা ছিলেন অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর ভেবেছিলেন সিরাজ তাঁর লেখার ভুল ধরার ব্যাপারটিকে আর একপ্রস্থ আপত্তি করবেন। উত্তেজিত তারাশঙ্কর—'সিরাজ আমার অঞ্চল চেনে। এবার সে বলবে, আমি ঠিক লিখেছি, না ভুল লিখেছি।' সিরাজ বলতে উঠেছিলেন—উপস্থিত

সাহিত্যিকরা তির্যক মন্তব্যও করেছিলেন। কিন্তু সিরাজ 'চন্দ্রবোড়া সাপের শিস' কিংবা নাগিনী কন্যার শরীরে 'কাঁটালি চাঁপার গন্ধ' নিয়ে গড়ে-ওঠা প্রাচীন মিথগুলির কথা' 'ভুলে' গিয়েছিলেন। ফলে তারাশঙ্কর সামান্য আশাহত হয়েছিলেন। সিরাজ ঐদিন বলেছিলেন, আঞ্চলিক পটভূমিতে গড়ে উঠলেও কেমন করে সাহিত্য 'আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে' উঠে যায়। 'আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে মুখর' ছিলেন সেদিন। ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৯ রবিবার সন্তোষ কুমার ঘোষ, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় লিখলেন একটি লেখা—'অঞ্চলেতে বেঁধে রাখিব'। এখানে সাহিত্যে প্রযুক্ত আঞ্চলিকতার ভৌগোলিক সত্য আর সাহিত্যের চিরন্তন সত্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে। সিরাজ সেইরকম একটি মত পোষণ করেন। তাঁর অভিযোগ—'আঞ্চলিকতা ছায়ার মতো আপনাকে আজীবন অনুসরণ করেছে। আপনি নিজেও কি বারবার পিছু ফিরে আপনার সৃষ্টির উপাদান প্রসঙ্গে সেই আঞ্চলিকতার জিনিসটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন নি?' বস্তুত, তারশঙ্কর-সাহিত্যের এই 'ছায়া' তাঁর সাহিত্যকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ভূগোলটি তাঁর উপন্যাসকে যে ঘেরাটোপ দিয়েছে—তার তুলনা বাংলা সাহিত্যে আর নেই।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-তে তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপাদান সবথেকে গাঢ় হয়ে বর্ণাঢ্য হয়েছে। মাটি ও মানুষের এমন নিবিড় সম্পর্ক তারশঙ্কর আর রচনা করেছেন কিনা জানি না। *ধাত্রীদেবতা* বা *গণদেবতা* উচ্চ ও মধ্য-বর্গের মানুষদের নিয়ে লেখা। সর্বভারতীয় রাজনীতি আর সংস্কৃতি সেখানে গভীর ছায়া ফেলেছে। *কবি* - *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে আছে রাঢ় বাংলার নিম্নবর্গের সাংস্কৃতিক উপাদান। *কবি*-র নায়ক ব্যক্তিগতভাবে তার সামাজিক পটভূমিটি অস্বীকার করে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রবেশের তীব্র আগ্রহ বোধ করে—কবিয়ালির বৃত্তি গ্রহণ করেছে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র মানুষগুলি সমাজের মূল পটভূমির বাইরে অর্ধ-যাযাবর, অতীত সংস্কৃতির পুরাকথার দ্বারা শাসিত তাদের মন। সর্পকেন্দ্রিক পুরাকথা আর কৃত্য তাদের জীবনে এনেছে রহস্যময় আদিমতা। তার সঙ্গে মিলেছে মানবসমাজের আদি এক রহস্য—যৌনতা, পিতৃ কল্প পুরুষের কন্যাকল্প সত্তার সঙ্গে আবেগাত্মক সম্পর্কের পুরাণপ্রসঙ্গ, একে ইদিপাস-কমপ্লেক্স বলে সনাক্ত করেছেন ফ্রয়েড। আর আছে পরিবার গড়ে ওঠার আদি রূপের ইঙ্গিত। মাতৃতান্ত্রিক বা মাতৃপ্রধান সমাজের সঙ্গে পিতৃপ্রধান সমাজকে নির্দিষ্টতা দেবার ইঙ্গিতে *নাগিনী কন্যার কাহিনী* অসাধারণ এক নির্মিতি হয়ে উঠেছে। তবু, ঐ উপন্যাসে সেই রাঢ় বাংলার মাটি ও মানুষের যুগলবন্দি—তারাশঙ্করের রচনার আসল সার্থকতার, প্রত্যয়ের এই পটভূমি না থাকায় এটিকেও রাঢ়বাংলার প্রকৃত উচ্চারণ বলে মনে হয় না।

কালিন্দী-তে আছে উচ্চবর্গের জমিদার পুঁজিপতি আর কৃষিশ্রমিক—যারা কুমারী মৃত্তিকার ঘুম ভাঙায়—চরের মাটিতে কৃষি-সংস্কৃতি গড়ে তোলে। রাঢ় বাংলার গ্রাম সমাজের এই দুই প্রান্ত। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে কৃষি সংস্কৃতির সমাধিতে গড়ে দিয়েছেন শিল্পায়নের সম্ভাবনা। আর ঐ মূক-প্রতিবাদহীন-পরাজিত শ্রমিক বাহিনী—যারা রাতারাতি রাঙাবাবুর চর পার হয়ে চলে যায় মৌরাখির চরের দিকে। এর মধ্যবর্তী সেই শ্রেণীর মানুষরা ঐ উপন্যাসে বেশি নেই—যারা আদিবাসী নয়, জমিদার নয়, শিল্পপতি নয়—যারা আদতে রাঢ়ের কৃষকবর্গ। *ধাত্রীদেবতা*-র শিবনাথ এই কৃষকদের আত্মোন্নয়নের চেষ্টা করেছে—তবে তাদের ভিতর থেকে একটি অফুরান শক্তির উপস্থিতি লক্ষিত হয়। সে শক্তির প্রাবল্য *ধাত্রী দেবতা*-য় নেই। এই শক্তি কৃষিকে ধর্মের পর্যায়ে উন্নীত করে—যে-কোনো সম্পর্ককে পারিবারিক

সম্পর্কের মায়ায় জড়ায়, গ্রাম জীবনের চারপাশে একটি শক্তির অদৃশ্য বিন্যাস গড়ে তোলে অপ্রতিরোধ্য একটি প্রহরা—তা অতিক্রম করার শক্তি অর্জন করা প্রায় অসম্ভব মনে হয়। তারাশঙ্কর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এই শক্তিটিকে যেভাবে দেখিয়েছেন—তেমন করে আর অন্য কোথাও দেখাননি। এই শক্তির দুটি প্রান্ত—দৈব রহস্যময় প্রান্তে আছেন কর্তাবাবা। আর বাস্তব মৃত্তিকা-লগ্ন প্রান্তে আছে কর্তাবাবার সচল প্রতিনিধি—কোশকেঁধে কাহার সমাজের মাতব্বর বনওয়ারী। বস্তুত *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* যে নিছক উপকথা না থেকে রাঢ়বাংলার সত্য ইতিহাস হতে পেরেছে তার কারণ এর চতুরঙ্গ বাস্তবতার বুনট। একটু ছক-বন্দি করি আমাদের চিন্তাকে।
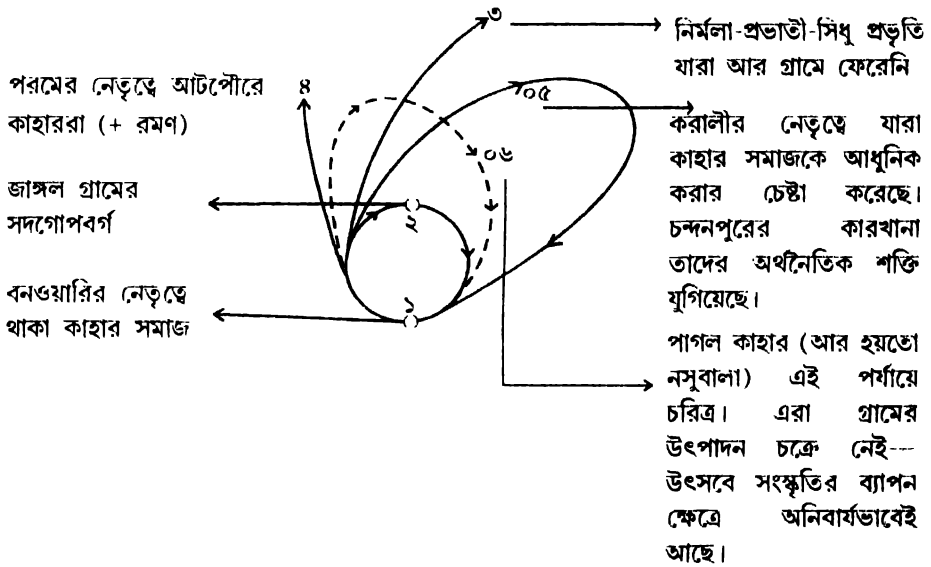
হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় (এখন থেকে কখনো শুধু 'হাঁসুলীবাঁক') উক্ত ১ এবং ২ নং স্তরের আদান-প্রদানের বিশ্বস্ত একটি কথাচিত্র উপহার দিয়েছেন তারাশঙ্কর। ৩নং বর্গে আছে সেই মেয়েরা যারা চিরকালের জন্য কাহার সমাজের অভিকর্ষের সীমানা অতিক্রম করে গেছে। ৪-নং বর্গে দুজন শেষ পর্যন্ত অভিকর্ষ-সীমা অতিক্রম করেছে—পরম আর রমণ। পরম কাহার সমাজের বিলীয়মান প্রাকৃত বীরত্বের শেষ প্রতিনিধি—যে কিছুতেই কৃষকের বৃত্তির বাঁধনে আবর্তিত হয় নি। রমণ এই বীরযুগের ব্যঙ্গ চিত্র। বনওয়ারীর কাছে আত্মসমর্পণ করেও চুরি ছাড়তে পারে নি—শেষ পর্যন্ত গোসম্পদ বিক্রি করে সেও হাঁসুলী বাঁকের অভিকর্ষ বা মধ্যাকর্ষণ এড়িয়েছে। চলে গেছে কাটোয়ায়। ভিক্ষুকের বৃত্তি নিয়েছে। ৫-ম-বর্গে করালী আর তার সঙ্গীদল। সামন্ততন্ত্রের কঠিন অদৃশ্য কিন্তু অনিবার্য বৃত্তটি অস্বীকার করে তাদের দৃপ্ত পদ সঞ্চার। কাহার সমাজকে যা ভিতর ও বাইরে থেকে সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে। ৬ষ্ঠ পর্যায়ে পাগল কাহার আর তার নারীকেশী পুরুষ-সঙ্গী—নরীস্বভাব নসুরাম। এরা হাঁসুলীবাঁকের উৎপাদন-চক্রের কেউ নয়—কিন্তু উৎসব সংস্কৃতির প্রত্যেকটি পর্বে এদের সানুরাগ রসময় আশ্চর্য উপস্থিতি।

বলেছি, বুনটটি আসলে চতুরঙ্গ। নিচের ছকটিতে তার স্পষ্ট রূপে দেখালাম।

২ জাঙ্গলের প্রভু — অত্যাচারী শোষক সামন্তপ্রভু	৩ চন্দনপুরের ব্যবসায়ী, রেল কারখানা উড়োজাহাজের আস্তাবল
১ কোশকেঁধে কাহার দল	৪ আটপৌরেদের পরম আর কোশকেঁধেদের করালী

বস্তুত ২ আর ৩ হল উচ্চ বর্গের মানুষের আর ১ আর ৪ নিম্নবর্গের । ২ আর ৩-এর মানুষগুলির সম্পর্ক প্রায়ই অ-বৈরীমূলক—পরস্পরকে সহযোগিতা করে তারা। মাইতো ঘোষের বন্ধুরা কলকাতা থেকে যুদ্ধভীত হয়ে আসে—বড়ো ঘোষ ইউনিয়ান বোর্ডের সদস্য, রেশনের জিনিসপত্র বিতরণ করার নামে গায়েব করেন—আর লালমুখো সাহেবদের সঙ্গে কথা কইতে বসে যান। বিশেষত সায়েবডাঙার জমি সেলামি দিয়ে নেবেন তারাই। ১ আর ৪-এর সম্পর্ক তেমন অ-বৈরীমূলক নয়। তারাশঙ্কর পরমের সঙ্গে বনওয়ারীর এবং বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর নির্ণায়ক যুদ্ধের যে বিবরণ দিয়েছেন, তাতে বিষয়টি স্পষ্ট। এই চারটি বর্গের টানা-পোড়েন দিয়ে হাঁসুলীবাঁকের আঞ্চলিক পটভূমিটি গড়ে উঠেছে। ঐ হয়েছে মাটি আর মানুষের বিশ্বস্ত দলিল। সে মাটি মানচিত্রের বাইরে নয়। সেই মানুষ মাটিকে ভালোবাসে। কোপাই—যার দোয়েম বা পলেন জমির ধাত্রী তাকে জননী বলে গণ্য করে। এই আঞ্চলিক পটভূমির সিদ্ধি তারাশঙ্করের অন্য উপন্যাসে নেই।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র মূল গভীর ও ব্যাপক পটভূমি বাঁশবাদির নীল বাঁধ-সংলগ্ন কাহার পল্লী। এখান থেকে জাঙলে—সামান্য উত্তর-পশ্চিমে হেঁটে যায় তারা—যে যার মনিবের অধীনে কাজ করে। জাঙল—কাহারদের চোখেই দেখা। ফলে তা চলচ্চিত্রের ভাষায় কখনো fade in কখনো fade out হয়েছে। আর আছে চন্দনপুর (কাহারদের উচ্চারণে 'চন্নপুর')—রেলপথের পাশে গড়ে ওঠা একটি গঞ্জশহর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মানচিত্রে যা ভীমের বেটা ঘটোৎকচের মতো বেড়ে উঠছে! এটিও কাহারদের চোখে দেখা। কোপাই-এর পুলে শব্দ ওঠে রেলের—সুচাঁদ কাহারনির মনে হয় ব্রজের বাঁশি! ট্রেন যায় আসে—তাকেই কাহারদের জীবনচক্র আবর্তনের ঘড়ি বলে মনে হয় কোঁশকেঁধেদের। এই শব্দ ও দ্রুততার অভিঘাতে হাঁসুলীবাঁক শেষ হয়ে গেল।

হাঁসুলীবাঁকের আসপাশের কথা সামান্যই লিখেছেন তারাশঙ্কর। *গণদেবতা*-র মতো *পঞ্চগ্রাম* নয়—তারাশঙ্করের ভাষ্যে এসেছে কাহারদের দুটি পাড়া আর জাঙল, বড়জোর চন্দনপুরের ডিসট্যান্ট সিগন্যাল। ওখানে রেলগাড়ি আসে যায়। কোঁশকেঁধেদের অভিভাবক-দেবতা কর্তাবাবার নির্দেশ—ঐ সিগন্যাল হল তাদের জীবনের সীমানা। ওর ওপাশে কেউ যেন না

যায়। গেলে সে হবে পতিত—অথবা ধর্মত্যাগী—স্বজনদ্বেষী—কাহার কুলের প্রহ্লাদ। তবুও সামান্য কয়েকটি দূরবর্তী স্থান হাঁসুলীবাঁকের ভাষ্যে—সাহিত্যিক ভূগোলে উপস্থিত যেমন :

(১) গোয়ালপাড়া ; (২) রাণীগ্রাম ; (৩) ঘোষগ্রাম ;

(৪) নন্দীপুর ; (৫) কর্মমাঠ ; (৬) মিত্রগোপালপুর ; (৭) কাঁদড়া ;

(৮) কাটোয়া ; (৯) বাকুল ; (১০) কান্দি ; (১১) সাইথিয়া।

প্রথম পাঁচটি গ্রামের কথা তারশঙ্করের বর্ণনায় শুধুমাত্র উচ্চারিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে গোয়ালপাড়া আর ঘোষগ্রাম একই গ্রাম হলেও হতে পারে। মিত্রগোপালপুরে কাহাররা পালকি বহনের জন্য গিয়েছিল— কোশকেঁধেরা। পরমের নেতৃত্বে আটপৌরের দল নিয়ে গেছে রাইবেঁশে নাচ করতে। রেল বা সড়কপথে সেখানে যাওয়া যায় না। তাই চন্দনপুরের বাবুদের পালকি নিয়ে সেখানে যাওয়া ; বিয়ের পর বড় একখানা মাছ সিধা নিয়ে বাবুদের বাড়ি পালকি ফেরৎ দেওয়া—এই ছিল কাহারদের দায়িত্ব। মাঝে মাঝে উঁচু জাতের লোকদের কাঁধে নিয়ে যায় তারা—উদ্ধারণপুরের শ্মশানে—'জ্ঞানগঙ্গা'-র জন্যে। একবার বনওয়ারী আর পাগল এরকম জ্ঞানগঙ্গা সেরে ফেরার পথে কাঁদড়ায় দেখা পেয়েছিল এক সাধু বৈষ্ণবের। বেঁচে থাকার ইচ্ছা অবসিত—মৃত্যু আসন্ন জেনে পুণ্য প্রবাহের উদ্দেশ্যে অশক্ত শরীরে চলেছেন। গোপালীবালা আর কালোশশীর অতৃপ্ত আত্মা তার চারপাশে বনওয়ারীর এই ভয় ছিল। বিশেষ করে কালোশশীর মৃত্যু আর তার আগে পরমের সঙ্গে তীব্র প্রাণান্তকর নির্ণায়ক যুদ্ধে অংশ নিয়ে বনওয়ারীর ভয় বাড়ে। তখন গোপালীবালা বেঁচে বনওয়ারী স্থির করে বাকুলের শ্মশানকালীর কাছে ভয়নিবারক তাবিজ আনবে। গিয়েছিল সেখানে। বাকুলের এই লোকদেবীর সঙ্গে কর্তাবাবার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা ঠিক জানি না। রাঢ় বাংলায় অধিকাংশ লোকদেবীর পুরুষ সঙ্গী বা ভৈরব থাকেন—পুরুষ দেবতাদেরও থাকেন কামিন্যা। যাই হোক বনওয়ারী বাকুলের 'জাগ্রত' শ্মশানকালীব কাছে মানত যা করেছে — তা কাউকে প্রকাশ করে নি, শেষ পর্যন্ত কর্তাবাবার থানে এসে সেই কবচ ব্যবহার করেছে। কান্দির কথা আছে নয়ানের কত্তাবাবার 'তাই' হবার পর। 'তাই' অর্থাৎ প্রেতযোনি প্রাপ্ত অশুভ আত্মা। নয়ানের কত্তামা-কে নানাভাবে সাহায্য করত সেই 'তাই'। তারপর এক 'আস পুন্নিমে'-র দিনে কাঁদির আজবাড়িতে খুব 'ধুম'-এর সময় ছেলে মেয়েদের সাধ হল সন্দেশ খাবে। নয়ানের বাবার বাবা 'আমাই' এর পর তার 'ক্ষ্যমতা' দেখিয়েছিল। 'লুচি-পুরি-মিষ্টি-মোণ্ডা-মেঠাই' 'এক চ্যাঙড়ি' পেয়েছিল তারা! (চতুর্থ পর্ব ; দুই-পরিচ্ছেদ) সাঁইথিয়া-র উল্লেখ আছে নসুর বলা আশ্চর্য খবরে—ময়ূরাক্ষীর ধারে সেইখানে 'উড়োজাহাজ মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে পড়েছে'। | পঞ্চম পর্ব ; চার-পরিচ্ছেদ |।

উপন্যাসের শুরুতেই চন্দ্রবোড়ার শিস দেবার খবর শুনে পূর্ববঙ্গের দারোগাবাবু বলেছিলেন 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস।' এর পর তারাশঙ্করের ভাষ্যে এসেছে পূর্ববঙ্গের বিবরণ। জাঙলের ঘোষ-দের যে ছেলে কলকাতায় থেকে ব্যবসা করে তার চোখে দেখা সেই নদীমাতৃক দেশ। নদী যেখানে 'সবুজ মাঠের মধ্যে ছল ছলিয়ে' যায়—অজস্র নদীর ধারা 'থৈ-থৈ করছে', 'থমথম করছে'। 'আঠারো বাঁকি' 'তিরিশ বাঁকি' বিশাল বিস্তৃত সেই জলধারা। নদী থেকে ক্ষীণতর ধারা—খাল। 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ও-দেশের ছোট নৌকাগুলি এদেশের গরুর গাড়ির মত।' চলে যায়—ফসল-হাটবাজারের বেসাতি-আত্মীয় কুটমবাড়ির যাত্রী 'মেলা-খেলায়' যাওয়া 'ইয়ার বন্ধুর দল'—সেসব নৌকায় করে আসে যায়। 'ঘোষের ছেলে শতমুখে সে দেশের কথা' বলে শেষ করতে পারে না। এই

প্রতিতুলনাটি আসলে হাঁসুলীবাঁকের কড়া ধাতটি স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে বলা অধিক হবে। 'হাঁসুলীবাঁকের দেশ আলাদা।'—এই হল তারাশঙ্করের উপলক্ষ।

দ্বিতীয় পর্বের এক পরিচ্ছেদে সুচাঁদের মুখে পুরোনো দিনের পুথি-সাহিত্যের দিগ্‌বন্দনার মতো নানা দেবতার দোহাই আছে। আছে কাহারদের কত্তাবাবা, জাঙলের 'কালরুদ্দু', 'মনসা', 'চন্ননপুরের চণ্ডী'র কথা। আর আছে 'বাকুলের বুড়ীকালী' আর 'বেলে-র ধম্মরাজ'-এর কথা। বাকুলের বুড়ীকালী শ্মশানকালী নিশ্চয় ; বেলের ধর্মরাজ আসলে বেলিয়া গ্রামের ধর্মরাজ। [সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় : বীরভূমকে জানুন ; ৪৯ পৃ.]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ধীরে ধীরে উপন্যাসে স্পষ্ট হয়েছে। একসময় যা ছিল উপেক্ষার বিষয় ক্রমে তা হয়েছে অপ্রতিরোধ্য। তৃতীয় পর্বের দুই পরিচ্ছেদে আছে আরও দূরবর্তী জগতের ছবি—'কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে' তার উল্লেখ আর 'রেঙুনে'র কথা 'জাপুনি'-দের আসার কথা বলা হচ্ছে। যুদ্ধের এই বাস্তবতা হাঁসুলীবাঁককে
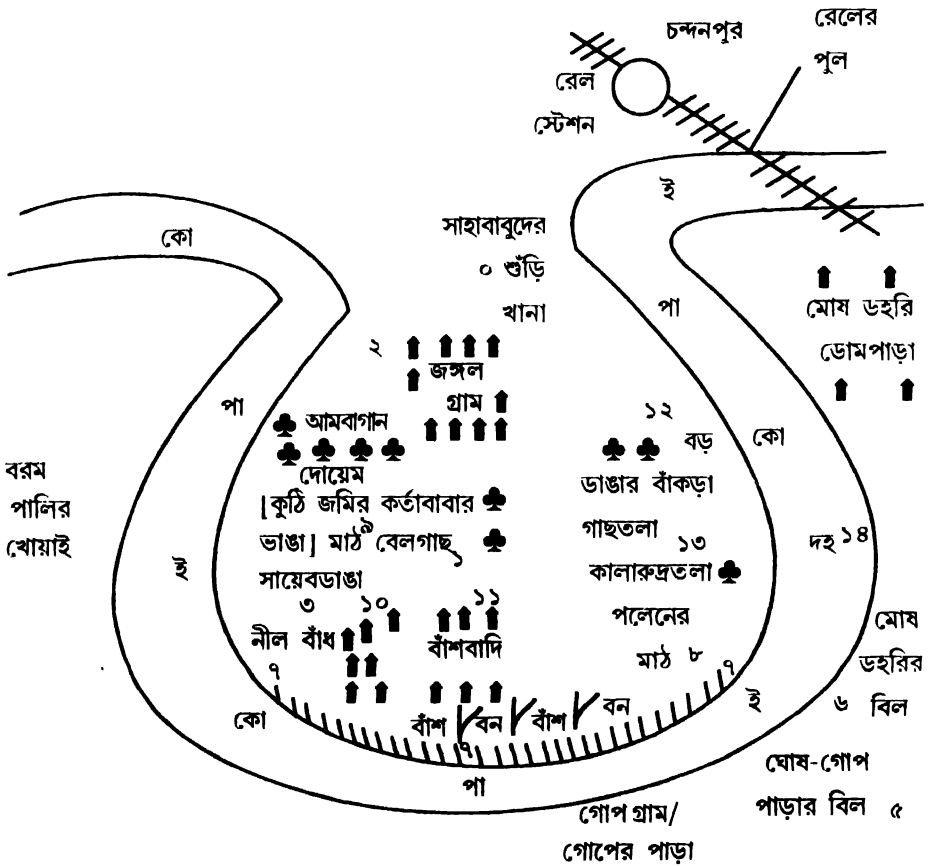
চিরকালের জন্য বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিল। শেষ ধাক্কাটি অবশ্য প্রাকৃতিক। ১৩৫০-এর মহাপ্লাবন। তারশঙ্করের ভাষা :.....'উপকথা নয়, ইতিহাসের কথা।....দামোদরের অজয়ের ময়ূরাক্ষীর কোপাইয়ের বন্যায় শুধু রেল-লাইন ভাসে নি, হাঁসুলী বাঁকের মত অগণিত

স্থানের উপকথার পটভূমি ভেসে গিয়েছে, পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।' (শেষ পর্ব)। বস্তুত হাঁসুলীবাঁকের ভূগোলটি এই সব নিকট ও দূরের গ্রাম-শহরের কথাকে একটা পাশে সরিয়ে যেন নিজস্ব নির্মাণ হিসাবেই গড়ে উঠেছে। অনেক অগণিত স্থানের উপকথার একটির পটভূমিতেই চোখ ফেলেছেন তারশঙ্কর। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যটিকে অস্বীকার বা আড়াল করে—তা কেমন করে অঞ্চলকে অতিক্রম করে সর্বভূমিক সাহিত্য হয়ে উঠেছে, এসব নিয়ে চর্চা করলে বস্তুত দূরবীনকে উল্টে ধরা হয় বলেই মনে হয়।

হাঁসুলীবাঁকের একটি মানচিত্র রচনা করা দরকার। এটি তারশঙ্করের অভাবনীয় কল্পনার নির্মাণ—সম্পূর্ণ বাস্তব না হওয়াই সম্ভব। আগে দেখাই :

১. কর্তার বেলগাছ [চতুর্থ পর্ব/১ম পরিচ্ছেদ]
২. আমবাগান [পঞ্চম পর্ব/৪র্থ পরিচ্ছেদ]
৩. সায়েব ডাঙা [চতুর্থ পর্ব/১ম পরিচ্ছেদ ;পঞ্চমপর্ব/৪র্থ পরিচ্ছেদ]
৪. বরম পালির খোয়াই [পঞ্চম পর্ব/৪র্থ পরিচ্ছেদ]
৫. ঘোষ গোপ পাড়ার বিল [চতুর্থ পর্ব/২য় পরিচ্ছেদ]
৬. ঘোষ ডহরির বিল [দ্বিতীয় পর্ব/৩য় পরিচ্ছেদ]
৭. কোপাইয়ের বাঁধ [দ্বিতীয় পর্ব/৯ম পরিচ্ছেদ]
৮. পলেনের জমি [তৃতীয় পর্ব/৩য় পরিচ্ছেদ]
৯. দোয়েম জমির মাঠ [দ্বিতীয় পর্ব/৫ম পরিচ্ছেদ]
১০. আটপৌরে পাড়া।
১১. কোঁশকেঁধেদের পাড়া
১২. এই গাছের কাছে পরম আর করালীর সঙ্গে তীব্র সংঘাত হয়েছে বনওয়ারীর।
১৩. কালারুদ্রতলা, এর শিকড় বাকড় ছড়ানো ছিল দহের কাছে।
১৪. কালীদহ—এখানে মারা গেছে কালোশশী।

কোপাই নদীর ক্ষীণ প্রবাহটি বাঁশবাদি কাহারপাড়া আর জাঙলকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দেয় নি। তার কারণ হাঁসের গলার মতো, মেয়েদের অলঙ্কার হাঁসুলীর মতো বাঁক নেওয়া এই নদী প্রবাহের সম্ভাব্য ভাঙন-কূলকে বাঁধ দিয়ে আড়াল করতে চেয়েছে স্থানীয় মানুষ। মাঝে মাঝে বাঁধ সংস্কারের কথাও ভেবেছে তারা। জাঙলের সদগোপরাও তাতে উৎসাহ দেখিয়েছে। ব্রিটিশ শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই চেষ্টা সহজ হয় নি। সাহেবরা বাঁধ দেবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছে। বনওয়ারীর সন্দেহ করালীই এর মূলে। বড় ঘোষ অবশ্য তেমন ভাবেন নি। ৭ নং নদীর বাঁধটি ছিল আদিম ধরনের। উড়োজাহাজের আস্তাবল গড়ছে যারা তারা চাইছে পাম্প বসিয়ে জল লুণ্ঠন করতে। সভ্যতা বিকাশের এই নতুন যান্ত্রিক পরিস্থিতির সঙ্গে তারাশঙ্কর তাঁর উপকথার মানুষদের সম্পর্কিত করতে চান নি। উপন্যাসের শেষপর্বে কাহারপাড়ার 'ডাকাবুকো' করালী যখন বলে 'নতুন কাহারপাড়া হবে। নতুন বাঁধ দেব।'— তখন সেই অভাবনীয় পরিস্থিতির ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়। কাহারদের এই নতুন পরিবেশ তারাশঙ্কর উপন্যাসে আনেন নি—আনা সম্ভব ছিল না। উপন্যাসের ভূগোলে তার কোনো স্থান নেই।

চতুর্থ-পর্বে এক-পরিচ্ছেদে আছে কর্তার বেলগাছটির কথা। এর ভিতটি 'বিলাতী মাটি' *দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিল বনওয়ারী। একটু উঁচু জায়গা —সেখান থেকে* 'প্রসন্ন দৃষ্টি' *মেলে*

চারপাশ তাকিয়ে দেখেন তিনি। পশ্চিমে 'দোয়েম জমি'র মাঠ—কুঠি ডাঙা তথা সায়েব ডাঙা। নীলকুঠির পরিত্যক্ত ভাঙা চোরা সামান্য স্মৃতি এখানে। দক্ষিণে পশ্চিম থেকে ক্রমশ 'নীল বাঁধ' স্বচ্ছ—স্নিগ্ধ জলের বড় পুকুর। একদা এখানে সাহেব-মেমরা স্বল্প বাসে (বা নগ্ন হয়েই) স্নান করত। তার পর আটপৌরেদের কয়েক ঘর। সামান্য পূর্বে বাঁশবাদি গ্রাম—স্বতন্ত্র গ্রাম না হোক কাহারদের পাড়া। কর্তাবাবার পূর্বে 'পলেনের মাঠ'। পলেন জমি—উর্বর। দোয়েম জমিও—তবে নীলকুঠি অঞ্চলের সায়েবডাঙার জমি তত উর্বর নয়। বহুদিনের পরিত্যক্ত পতিত জমি। এর উত্তরে নীলকরদেরই আবাদ আমবাগান। তারপর কর্তাবাবার স্থানটির সোজা উত্তরে জাঙল গ্রাম। তার পূর্ব প্রান্তে জাঙলের ধর্মঠাকুরের ক্ষেত্র—কোপাইয়ের পাড়। এখানে কালারুদ্দুতলা। তাঁর চড়ক গাছটি দহে জল শয়ানে থাকে, বার্ষিক উৎসবের সময় তুলে আনা হয়।

জাঙলকে বাঁদিকে রেখে উত্তরে পায়ে চলা পথ। চলে গেছে চন্দনপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত। ওখানে কোপাই নদীর উপর রেল পুল আর চন্দনপুরের কুলিগ্যাঙে যারা কাজ করে, যারা বাবুদের বাড়িতে 'পাটকাম' করে তারা যাতায়াত করে। যাত্রা পথে জাঙলের উত্তর- পূর্ব প্রান্তে সাহাবাবুদের পানশালা—শুঁড়িখানা। সেখান থেকে সামান্য দক্ষিণে হাঁটলেই ঝাকড়া একটি গাছ। বড়ডাঙার ঝাকড়া গাছটির তলে কাহাররা এসে বসে কখনো। তাদের উপকথার বিখ্যাত সব দ্বন্দ্বযুদ্ধ এখানেই সংগঠিত হয়েছে। কালারুদ্রতলার পাশের বিশাল গাছটি (শিমুল গাছ)-র শিকড় ছড়িয়ে গেছে কালিদহের পশ্চিম তীরেও।

গোটা অঞ্চলটি বেড় দিয়ে চলে গেছে কোপাই নদী। একটি হাঁসুলীরবাঁক গড়ে উঠেছে সেখানে—প্রকৃতি আর মানুষের আশ্চর্য এক খেলাঘর। বাঁক। সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিতে এর কালের মাত্রা নিশ্চয় আছে। অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম*-এও আছে এমনি একটি বাঁক। সামান্য উল্লেখ করছি।

> —'অনেক দূর পাল্লার পথ বাহিয়া ইঁহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লী-রমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটি ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক—কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলয়াকৃতি।' ['তিতাস একটি নদীর নাম'; *অদ্বৈত রচনা সমগ্র*; অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত; দেজ, ২০০০ খ্রি ; কলকাতা ; ৩৯৯ পৃ.]

—এই বাঁক শুধু ভূগোলের নয়—জীবন প্রবাহের। শুধু নদী নয়—এই প্রবাহ জীবন নাট্যের অভ্রান্ত সঙ্কেতের মতো মনে হয়।

দক্ষিণের কোপাইয়ের বাঁধ, যার কথা পাই দ্বিতীয় পর্বের নয়-পরিচ্ছেদে, তার উত্তরে বাঁশবন—এই বাঁশবন যেন বাঁশবাদি গ্রামের চার পাশে অন্ধকার ঘনিয়ে তোলা রহস্যের বেড়া। এই বাঁশবনে কাহাররা অল্পবিস্তর নিজস্ব এলাকা বেছে নেয়। বাঁশ বিক্রি করে। এখানেও অবশ্য জাঙলের মনিবদের এক্তিয়ার কিছু না কিছু থাকেই। এই *বাঁশবনের ঘন অন্ধকার বেড়া হাঁসুলীবাঁকের কাহার জীবনের পক্ষে একটি রহস্যঘনত্ব* দান করেছে। এই অন্ধকার যদি না থাকে—আলোর অসহ্য আঘাত তাদের কাছে অকল্পনীয় বোধ হয়। বনওয়ারী মৃত্যুর মুখোমুখি তেমনি আলোর অভিঘাতে চমকে উঠেছে।

কোপাইয়ের বাঁদিকের জনপদটুকুই হাঁসুলীবাঁকের বাচ্য। তার কথাই তারাশঙ্কর লিখেছেন।

অন্য পাড়ে আছে কিছু কিছু গ্রাম বা অঞ্চল। একেবারে পশ্চিমে 'বরম পালির খোয়াই'। খোয়াই—উঁচু নিচু অনুর্বর ঢেউ খেলানো জমি। পূর্বদিকে মোষডহরি—ডোমপাড়া। তাদের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক ছিল কাহারদের। তাদের বাড়ি ঘরও চিনত। জলস্তম্ভ যখন পশ্চিম থেকে এসে হাঁসুলীবাঁকের সমস্ত ফসল নষ্ট করে চলে গেল পূর্ব দিকে—সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল রামকালী ডোমের ভিটে, তা শনাক্ত করল বনওয়ারী। তবে কিসের পাপে এই দুর্গতি—তা স্থির করতে পারল না। (পঞ্চম পর্ব/চার পরিচ্ছেদ) ডোমপাড়ার দক্ষিণে মোষডহরির বিল। তার দক্ষিণে ঘোষ-গোপপাড়ার বিল। এর দক্ষিণে গোপগ্রাম বা গোপের পাড়া। হাঁসুলীবাঁকের বনওয়ারীকে গোপগ্রামের মহাশয়রা চেনেন। চন্দনপুরের দত্ত বাবুর কাছে ধারে কাপড় কেনার সময় তার প্রশংসা করেছেন এক গোপ-মহাশয়। এইভাবে হাঁসুলীবাঁকের আঞ্চলিক পরিধিটি গড়ে উঠেছে। বৃক্ষলতা-প্রাণী আর জনসম্পদ—জল-মাটিতে মিশে থাকা এক বিশিষ্ট ও বিচিত্র মানুষ এরা। জীবনের সরল ভাষ্য অপেক্ষা বৃত্তাকার আবর্তনই তার লক্ষ্য যেন—কর্তাবাবার চক্র যেমন ঘুরছে তেমনি, বাঁক নিয়ে প্রায় চক্রাকারে কোপাই যেভাবে প্রবাহিত হয় অনেকটাই যেন তেমনি।

উক্ত ভৌগোলিক পটভূমিটি তারশঙ্কর-এর উপন্যাস সাহিত্যের মর্মবিন্দু। সামগ্রিকভাবে মুর্শিদাবাদের রাঢ় অঞ্চল, বর্ধমান জেলার অজয়-সন্নিহিত অঞ্চল, বিশেষত কাটোয়ার নিকটবর্তী অজয়ের উত্তরাঞ্চল আর বীরভূম জেলার অধিকাংশ অঞ্চল তাঁর সাহিত্য-ভূগোলের বৃত্ত হলে হাঁসুলীবাঁককে বলতে হবে বৃত্তের ভিতর কেন্দ্র-ছোঁয়া আর একটি বৃত্ত।

৩

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : আখ্যানের ইঙ্গিত

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা একটি দীর্ঘ উপন্যাস। কোনো কোনো সময় মনে হয় আট কাহার পল্লীর কয়েক প্রজন্মের কাহিনী। সাগা (saga) জাতীয় কাহিনী হয়তো বা। সুচাঁদ এই দীর্ঘ প্রজন্ম-প্রলম্বিত কথার সূত্রপাত করে। তার বাবার বাবা আর বনওয়ারীর কর্তাবাবা একই মানুষ ছিলেন। সুতরাং বনওয়ারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুব দূরের নয়। অন্যদিকে সুচাঁদের নাতনী পাখির সূত্রে করালী তার নাতিন-জামাই। বনওয়ারী সুচাঁদকে বলে পিসিমা। বসন কার বোন তাহলে। বসনও ব্যানো দাদা বলেই ডাকে তাকে। সেইসূত্রে করালী বনওয়ারীকে এখন 'মামা' বলে ডাকে। আগে বলত 'কাকা'। রতনের পুত্র মাথলা, তার বড় পুত্রকে সাপে কামড়েছে। অন্য পুত্র টেবা। কালোশশী বনওয়ারীর প্রেমিকা। তার এক অনাম্নী বোনের সঙ্গে রমণ কাহারের বিয়ে হয়েছে। রমণের শ্যালিকার কন্যা সুবাসী। সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ের মাধ্যমে কোশবেঁধে আর আটপৌরেদের ঐক্য সম্ভাবিত হয়েছে। এ সমস্তের দ্বারা তৈরি হতে থাকে এক একটি প্রজন্ম-প্রলম্বিত কাহিনীর ছক।
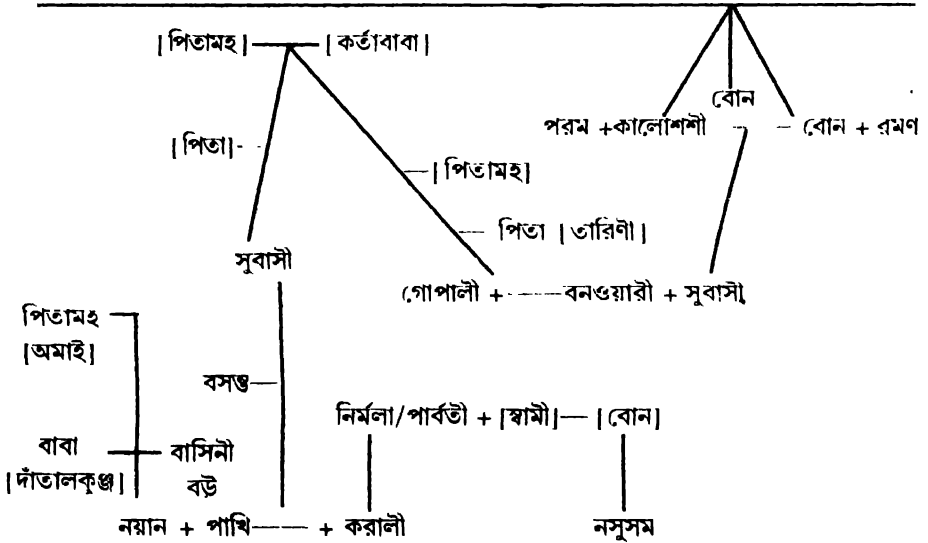
নসুরামকে করালীর পিসতুতো ভাই বলা হয়েছে উপন্যাসে। শুধু কি তাই, করালীর প্রথম বিয়ে ভেঙে যাবার পর নসুরাম বা নসুবালাই হয়েছিল তার ঘরের ঘরনি! বনওয়ারী ঘোষদের বাড়িতে কিভাবে কোন সূত্রে কাজ করছে? তার পিতা তারিণী। কেমন করে একটি বানভাসি কাঠের টুকরোকে ঢেঁকি গড়ে তা দিয়েছিল অভাবী পরিবারটিকে, কেমন করে জড়িয়ে যায় আত্মীয়-প্রতিম সম্পর্ক—তার বিবরণ আছে উপন্যাসে। সুতরাং প্রজন্ম প্রলম্বিত কাহিনী হিসাবেই যেন হাঁসুলীবাঁক পরিকল্পিত হয়েছে।

দুই প্রজন্মের দ্বন্দ্ব আমাদের মৌলিক সাহিত্যের উৎস কথা। টাইটানদের সঙ্গে পিতৃ-

প্রতিম সত্তার দ্বন্দ্ব আর আমাদের মহাকাব্যে আছে একই রকম দ্বান্দ্বিকতার ছক। এর দুটি মূল ব্যাখ্যান। দুটি ব্যাখ্যানই সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের। আদি সম্পর্কে আদি মাতার প্রতি পুত্রের, পিতার প্রতি কন্যা প্রতিম সত্তার আকর্ষণ লক্ষ করেন ফ্রয়েড। এভাবেই দুই প্রজন্মের সংঘাত ঘনিয়ে ওঠে। ফ্রয়েড-ভাষিত 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' প্রথম আর 'ইলেকট্রা কমপ্লেক্স' দ্বিতীয় দ্বন্দ্বের মূল রহস্য ভেদ করে। এর সঙ্গে ফ্রয়েডীয় অবচেতন মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপস্থিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি ফ্রয়েডের নৃতাত্ত্বিক-বিশ্লেষণের মারফৎ লভ্য। এই ধারায় প্রথম রচনা *Totem & Taboo*, আর আছে তাঁর *Mases and Monotheism*. *টোটেম ও ট্যাবু* গ্রন্থে ফ্রয়েড দেখিয়েছেন কেমন করে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে—নরনারীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের আড়ালে কাজ করে অবদমন—অজাচার-কে নিয়ন্ত্রণের চাপ কেমন করে জন্ম দেয় আসক্তি আর আপত্তির উভবলিতা (ambivalance)। *Moses and Monotheism* গ্রন্থে ফ্রয়েড দেখিয়েছেন আদিম সমাজে 'horde' তথা বিবাহ-প্রথা প্রচলনের পূর্বে পুরুষ-প্রধানের অধিকারে নারীদলের বিচরণ ও পাশবিক অনাচার কেমন করে অবদান-নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরি করে। তারাশঙ্কর এই বই পড়েছিলেন? না পড়াই সম্ভব। তবু, তাঁর বিবরণ পড়ে চমকে উঠতে হয়।

তৃতীয় পর্বের তিন পরিচ্ছেদে আছে : 'সাধারণ হনুমানের দলে থাকে বিশ-পঞ্চাশটা হনুমতী, তাদের দলপতি থাকে এক বিরাট হনুমান, কাহারেরা বলে গাঁদা-হনুমান।' এর নেতৃত্বে—স্বৈরাচারী ব্যবস্থায় চলে গোটা দল। 'দলের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষ হনুমান নেই। দলের প্রতিটি হনুমতী প্রসব করে তার সন্তান। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে।' প্রসব হবার পর সন্তান 'হনুমতী হলে থাকবে, হনুমান হলে সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ নখে বাচ্চাটাকে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেঁড়ে ফেলবে।' স্বৈরাচারী পিতৃকল্প এই শক্তি। অন্ধ যৌন কাতর আর অসূয়ক। লিখেছেন তারাশঙ্কর—'পুরুষ-সন্তান হলেই হনুমতী পালায়। এখানে ওখানে লুকিয়ে থেকে সন্তানকে খানিকটা বড় করে ওই সন্ন্যেসীর দলে সমর্পণ করে আবার ফিরে আসে নিজের দলে। সন্ন্যেসীর দলের দলপতির সঙ্গে মধ্যে মধ্যে এই দলের দলপতির যুদ্ধ বাধে। ভীষণ যুদ্ধ।' সে এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। পিতৃকল্প হনুমানের 'একজন হার না-মানা অথবা না-মরা পর্যন্ত' যুদ্ধ শেষ হয় না। নাগাড়ে তিন চারদিন চলে সেই ভয়াবহ যুদ্ধ। ফলে বাড়ির চাল নষ্ট হতে বাধ্য। কিন্তু 'এর উপায় নাই, প্রতিবিধান নাই।' মাইতো ঘোষ আধুনিক মানুষ—বন্দুক দিয়ে তাড়াতে চেয়েছিলেন। 'কিন্তু বাড়ির লোক গ্রামের লোক দেয় নাই। হনুমান—বীর হনুমান—রামচন্দ্রের বাহন'।

ফ্রয়েড সংগৃহীত তথ্য থেকে একই রকম পরিস্থিতির পরিচয় পাই। শেষ পর্যন্ত দুই প্রজন্মের পুরুষ বীরদের যুদ্ধে একধরনের সন্ধি-বিগ্রহের ভূমিকায় আসেন আদি জননীরা। তারা পিতৃকল্প প্রতীক তথা টোটেমের হত্যার ব্যবস্থা করেন। এর ফলে সারা বৎসর যা শ্রদ্ধার ভয়ের বস্তু—আদিম সমাজ তাকে বলি দেয় বার্ষিক উৎসবের সময়। এইভাবে জড়িয়ে যায় বীর হনুমানের মতো অজস্র প্রতীক—যাদের হত্যা করার ক্ষেত্রে গড়ে ওঠে নিষেধাজ্ঞা। এই নিষেধ আর বার্ষিক উৎসবে ছাগ সহ বিভিন্ন প্রাণীর হত্যা আসলে 'হোর্ড' ভেঙে পরিবার গঠনের ইতিহাসটি ব্যক্ত করে। প্রকৃতিলগ্ন কাহিনীর এমন উদাহরণ—নৃতত্ত্বের এমন চমৎকার সাহিত্যিক নিদর্শন বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় নেই। একটু ভুল করলাম। তৃতীয় নেই। দ্বিতীয় উদাহরণটি তারাশঙ্করের *নাগিনী কন্যার কাহিনী*। আর একটি উদাহরণ মনে পড়ছে—বনফুলের *স্থাবর*। তবে *স্থাবর*-এর আখ্যান বড়ই দুর্বল।

হাঁসুলীবাঁকের আখ্যান বিশ্লেষণের আরও অনেক দিগন্ত তৈরি হতে পারে। সেগুলি সন্ধান করার আগে নেওয়া দরকার কাহিনীর সারমর্ম উপস্থাপনের অবসর। উপন্যাসটির সর্বশেষ যে সংস্করণ তারাশঙ্করের জীবৎকালে প্রকাশিত হয় সেটি হল অষ্টম সংস্করণ। অষ্টম সংস্করণের পরিচ্ছেদ বিন্যাস অবলম্বনে আমরা এই অধ্যায়টিতে হাঁসুলীবাঁকের কাহিনী বিচার-বিশ্লেষণ করছি।

হাঁসুলীবাঁকের পর্বসংখ্যা ৬। 'শেষ পর্ব' সংখ্যাচিহ্নিত নয়। প্রথম পর্বে ৫টি, দ্বিতীয় পর্বে ৯টি, তৃতীয় পর্বে ৫টি, চতুর্থ পর্বে ২টি, পঞ্চম পর্বে ৮টি আর শেষ পর্বে কোন পরিচ্ছেদ নেই। শেষ পর্বকে একটি পরিচ্ছেদ ধরতে হয়। অর্থাৎ মোট ৩০টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এই মহাকাব্যোপম উপন্যাস। মহাকাব্যে যেমন বৃহৎ মহৎ কোন শক্তি বা প্রবণতার নির্বাচন ঘটে—এখানেও সেরকমই হয়েছে। যাবতীয় গৌরব নিয়ে, বৈচিত্র্য নিয়ে জীবনের এক বর্ণাঢ্য চকমিলান সৌধটি কোন মায়ায় যেন হারিয়ে গেল। সামন্ততন্ত্রের এমন বিস্তৃত ও সম্যক বিবরণ পাঠককে বিহ্বল করে। উপন্যাস পাঠের শেষে জাগে নির্বেদ। এই শান্তিরস মহাকাব্যের প্রাণ।

ক্রমান্বয়ে কেমন করে এই রস পরিণতি ঘটল তার একটু বিচার করার প্রয়োজন বোধ করছি।

প্রথম পর্ব। এক পরিচ্ছেদ।। হাঁসুলীবাঁকে শোনা গেল রহস্যময় শিস। কেউ ভাবল এ হল অঙের খেলার ইঙ্গিত। পরে বোঝা গেল কারণ। নদীর ধারে বাস ভাবনা বারোমাস— সে তো পূর্ববঙ্গের সত্য। সুতরাং এই মাটির বৈশিষ্ট্য নিয়েও কিছু বর্ণনা দিলেন তারাশঙ্কর তথা উপন্যাসের কথক। আসরে নিমতেলে পানু বলল তার জরিমানা স্বরূপ চৌধুরীদের দেওয়া পাঁঠাটি খুঁতো ছিল। পানু অনুরোধ করেছিল, জমিদার পরিবারের যুবক সদস্যদের—এমনি খেয়ে নেবেন, বলি যেন না দেওয়া হয়। এবারকার কর্তার বার্ষিক পুজো প্রথমেই সেই খুঁতো পাঁঠাটি পড়ল। মজলিশের সিদ্ধান্ত কর্তাবাবাই চলে যাচ্ছেন—যাবার আগে কাহারদের জানান দিচ্ছেন। সুচাঁদ গোটা ব্যাখ্যাটা করল—উপস্থিত সবাই অজ্ঞাত আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। সুচাঁদ সামান্য বলল কাহারদের আদি কথা। নীলকর সাহেবদের কেমন করে কোপাইতে ভাসিয়ে দেওয়া হল আর কেমন করে চৌধুরীরা হলেন কাহারদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা—সেই কাহিনী। কাহারদের উপকথা। মজলিশের সবাই হঠাৎ দেখল কালুয়া নামক কুকুরটি ডাকতে ডাকতে চলেছে। তার পিছনে ডাকাবুকো করালী। শেষে গোঙাতে গোঙাতে কুকুর ফিরে এল! চোখ বেরিয়ে পড়েছে। অদ্ভুত কাণ্ড কুকুরটি মারা পড়ল অচিরে। উপস্থিত কাহাররা স্থির করল কর্তাবাবা তার খড়ম সুদ্ধ পা দিয়ে কুকুরটিকে দিয়েছেন চাপ।

দুই পরিচ্ছেদ।। সুচাঁদের পরামর্শ কর্তাকে ক্রোধ নিবারণের জন্য পুজো দিতে হবে। মাতব্বর বনওয়ারী রাজি। উপরন্তু মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে 'বু বু' করে উঠেছিল বনওয়ারী। পুজোর খবর দিতে আটপৌরেদের ওখানে গেল বনওয়ারী। অছিলাও সম্ভবত। আটপৌরেদের মোড়ল পরমের স্ত্রী কালোশশীর সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক। বনওয়ারী এ ব্যাপারটি অবদমন করতে চায়—মাতব্বর হিসাবে। অন্যথায় অঙের কথা নিয়ে কথা বলতে মেয়েরাও মোটেই রাখঢাক করে না কাহার সমাজে। নয়ানের বউ আঠারো বছরের পাখি ডাকাবুকো করালীকে ভালোবাসে—স্পষ্ট ঘোষণা করতে কোনো লজ্জা নেই তার। বনওয়ারী দেখল কুকুরটাকে সমাধি দেবার উদ্যোগ করছে করালী। চন্দনপুরে কাজ করে, সব কিছুই যেন নতুন—বনওয়ারী গেছে কুঠিডাঙার জমির বন্দোবস্ত করার জন্য। চন্দনপুরের বাবুরা

কুঠিডাঙার জমি বিলি করছেন। পরম একখণ্ড পেয়েছে। বনওয়ারীরও আশা তারও সায়েবডাঙা তথা কুঠিডাঙার একফালি জমি চাই। সহসা বাঁশবনে আগুনের আভাস। করালী শুকনো পাতা-পুতো জড়িয়ে আগুন ও ধোঁয়া দিয়েছে। আশ্চর্য! ওই আগুনে পুড়ে মরল বৃহৎ একটি চন্দ্রবোড়া। শিস দেওয়ার রহস্য ভেদ হল। করালী সাপটিকে তার কুকুর হত্যার কারণ বলে চিহ্নিত করল। আর বনওয়ারীর সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা হল। করালী বলল কর্তাই পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে। পাখি তাকে মৃদু ধমক দিল. লঘুগুরু জ্ঞান নেই!

তিন পরিচ্ছেদ।। সাপটি নিয়ে করালী তার দল নিয়ে শুরু করল হৈ চৈ। ইচ্ছা এটি বেঁধে নিয়ে যায় চন্দনপুরে—কিন্তু গ্রামের নিয়ম এরকম কিছু হলে শিকার নিয়ে রাখতে হবে মাতব্বরের উঠোনে। বনওয়ারীর উঠোনে নিল না সাপ। নিজের ওখানে রাখল। বনওয়ারী সস্নেহে মেনেও নিল। তারপর সাপ দেখতে এলেন মাইতো ঘোষ। এই মেজো ঘোষের কাছেই কাজ করত করালী। কিন্তু সাপতো আসলে কর্তাবাবার বাহন—চকিত বিশ্লেষণ সুচাঁদের। তারপর ভয়তরাসের ব্যাপ্তি। করালীর ক্ষোভ। সাপ নিয়ে যদি যেতে পারে—সাহেবরা পুরস্কার দেবে নিশ্চয়। সুচাঁদের কথায় কাহার পাড়ার ভয়। বসন্তর কথা সামান্য বলে নিলেন লেখক। তারপর সবাইকে সচকিত করে মাইতো ঘোষ এলেন। জনতা দুভাগ হয়ে সামন্ত প্রভুর উপস্থিতিকে যেন স্বীকার করে নিল।

চার পরিচ্ছেদ।। মাইতো ঘোষকে করালী শ্রদ্ধা করে না। তার প্রতি রুষ্ট সে। চন্দনপুরে সে গেছে ঘোষের জন্যই। আর তার মায়ের জন্য লজ্জা তার। বেদনা। চন্দনপুরে তার মা কাজ করতে যেত। চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। তখন তার বয়স বেশি নয়।

মাইতো ঘোষের অধীনে কাজ করার সময় একবার চন্দনপুরের রেল স্টেশনে পার্শেল এসেছিল। যেই পার্শেলে ছিল সুস্বাদু আম। স্টেশন মাস্টারের মেয়ে জেদ ধরে আম খাবে। মালিকের জিনিস—নিজের মনে করে দিয়েছিল সাহস করে। এক রেলকর্মীও দাবি করে আমের। তারপর সে তাকেও একফালি খাইয়েছিল। মাইতো তার মুখ শুঁকে বুঝে প্রবল প্রহার করেন। চিরকালের জন্য ঘোষ বাড়ির কাজ ছাড়ে করালী। স্টেশন মাস্টার তাকে কুলি-গ্যাঙে কাজ করে দিয়েছে। এই ঘটনা মনে পড়ল।

মাইতো অবশ্য আজ একটু তারিফ করলেন তার। পুরস্কার দিলেন একটা সিকি। একটু ক্ষোভের ভাব দেখিয়ে সেই সিকি করালী গুঁজে রাখল তার ট্যাঁকে।

সাপ নিয়ে তরুণ বন্ধুদের সঙ্গে চলল করালী। চন্দনপুরের দিকে। সহসা বনওয়ারী নিষেধ করল। থামতে বাধ্য হল করালী। সাপ ফিরে এল। সাপটি দাহ করতে হবে। গোটা কাহারপাড়াকে চান করতে হবে।

পাঁচ পরিচ্ছেদ।। কর্তার পুজোর আয়োজন হল। অপরাধ ক্ষালনের পুজো। খুঁতো পাঁঠা দেবার অপরাধ, বাহন হত্যার অপরাধ। করালী এল। তার বলি নিতে বারণ করল পানু। করালী হাঁসগুলির গলা টেনে ছিঁড়ল, তার কথা—মাংস খাওয়া তার উদ্দেশ্য—বলি পুজো উপলক্ষ। কর্তা বাবা যাক না যাক তার কিছু যায় আসেনা।

বলি পাঠিয়েছিল কালোশশী। পরমকে না বলে। পরম কিন্তু বুঝে ফেলেছে। তারপর কালোশশীকে পিটিয়েছে। সন্ধ্যায় কর্তার কাছে মাতব্বর বনওয়ারী প্রদীপ ধুপধুনো নিয়ে গেল। সেখানে কালোশশী! প্রদীপ নিবিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে! দেখে ফেলল নিমতেলে পানু। কর্তার সামনে কালোশশীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অপরাধ কেউ জানবে না—ভেবেছিল বনওয়ারী। কোনক্রমে কালোশশীকে নিবৃত্ত করে প্রদীপ জ্বেলে ধুপধুনো দিয়ে এল।

সন্ধ্যায় সুচাঁদ বলতে লাগল কর্তাবাবুর কথা—অন্যান্য উপকথা। করালী স্বতন্ত্র আসর বসিয়েছে। শোনা যাচ্ছে হৈ চৈ। দারোগাবাবু এলেন। মজলিশ শশব্যস্ত। শোনা গেল করালী সাপের ভয় থেকে গ্রাম অঞ্চলকে মুক্তি দিয়েছে—সরকার তাকে পুরস্কার দেবে। একথা শোনা মাত্র আসর ছেড়ে তীরের বেগে পাখি গেল করালীর উদ্দেশ্যে!

পাখির স্বামী—হাঁপানীর রুগী নয়ান। তাদের ঘরভাঙা গুষ্টি। পিতা দাঁতাল কুঞ্জ নেই। ঘরভাঙারা একদা কাহারদের মাতব্বর ছিল। আজ নয়ান বনওয়ারীর কাছে বিচারপ্রার্থী। কাহার পাড়ার রীতি অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ না হলে দ্বিতীয় বিবাহ অসম্ভব। বনওয়ারী করালীকে শাসন করার উদ্দেশ্যে গেল। করালীর ভিটে শুনশান কেউ কোথাও নেই।

দ্বিতীয় পর্ব। এক পরিচ্ছেদ।। নয়ান অভিযোগ জানাতে আসে। বনওয়ারী নেই। বনওয়ারী যাবে মাইতো ঘোষের সঙ্গে। রতন প্রহ্লাদ বনওয়ারী—যে যার মনিবের কথা সামান্য বলল। রতনের মনিব হেপো মণ্ডল বদরাগী। অত্যাচারী। অবশ্য তারা স্নেহও করে। বিপদে আপদে দেখে। পানুর মনিব অমন না—ভয়ঙ্কর ধূর্ত। পানু তার আলু লুকিয়ে রেখেছিল। নরেন্দ্র মণ্ডল, লগন্দ ঠিক বুঝেছে। পেরিয়ে যায় ট্রেন। জলখাবারের সময় হয়েছে। পানুর রাগ, তার বউটা আড়চোখে ঘোমটায় আড়াল থেকে করালীকে দেখে বলে সন্দেহজনিত ক্ষোভ।

দুই পরিচ্ছেদ।। বনওয়ারী মাইতো ঘোষের বিছানা পত্তর নিয়ে গেল ট্রেন ধরাতে। সময় বেশি ছিল না। বনওয়ারী বলে পারল। পদাতিক তারা বাহক— ঘোড়া গোত্র। মাইতো ঘোষ দিলেন দুআনা বকশিস। চন্দনপুরে বোন সিধুর কাছে গেল সে। সিধু এখন গোষ্ঠীর বাইরে। তার অধঃপতন হয়েছে। তবু বনওয়ারীকে দেখে খাতির করল। চন্দনপুরের রেলের আবাসে থাকে সিধু। দিল সামান্য পাকা মদ। বনওয়ারী করালীর ওখানেও গেল। তাকে নিয়ে দারোগার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। এখানে করালী-পাখির সঙ্গে কথা হল। তাদের ব্যবহারে বেশ খুশি বনওয়ারী। নয়ানের সঙ্গে পাখির বিবাহ-বিচ্ছেদ করে করালীর সঙ্গে বিয়ের অনুমতি দিয়েই ফেলল। দারোগা বাবুর কাছে করালীকে সনাক্ত করানোর জন্য যেতে হবে।

তিন পরিচ্ছেদ।। দারোগার কাছে করালীকে পরিচয় করিয়ে বনওয়ারী গেল চন্দনপুরের বাবুদের কাছে। জমি তার সামান্য চাই। ঘোষপাড়ার এক ভদ্রলোক তার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে প্রশংসা করল। ফেরার পথে শেয়ালের হাত থেকে ছাগল রক্ষার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ পরামর্শ প্রদান। তারপর করালীর সঙ্গে লেগে গেল পাখির দ্বিতীয় বিয়ের আনন্দে। সবাই অবাক হল করালীর সাজ পোশাক দেখে।

করালীর দল সামান্য করে বাড়ছে। রতনের পুত্র বিদ্রোহী। আরও অনেকে তার দিকে ঝুঁকেছে।

নয়ানের মা সকলকে অভিশাপ দিতে থাকে। বনওয়ারী অপরাধ বোধ করে। কর্তা বাবার থানে গিয়ে দাঁড়ায়। ভাবে পাঁচ কুড়ি গুনতে গুনতে যদি বেল খসে পড়ে বুঝতে হবে কর্তা তার অপরাধ মার্জনা করেছেন। পাঁচ কুড়ি গোনা শেষ। বেল পড়ল না।

বনওয়ারী বিয়ের আসরে মদ খেয়ে বাজনদারদের সঙ্গে তাল কাটা ছড়া বলতে লাগল। গোটা পাড়া পরম আনন্দে মেতেছে। হঠাৎ হেসে উঠল কে! চাপা হাসি। কালোশশী। বনওয়ারী তীব্র আসক্তি বোধ করে। কিন্তু তার ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে না।

চার পরিচ্ছেদ।। গুড় তৈরি হবে। বনওয়ারী ওস্তাদ। তাছাড়া সৎ বলে তাকে সবাই

পছন্দ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। বনওয়ারী মনে করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা। তবে কাহারদের তত ভয়ের কি আছে। ভাবে বনওয়ারী। ঘেঁটু গানের কথা ভাবতে থাকে তারা। আটপৌরেরা নাকি নতুন গান বেঁধেছে! বনওয়ারী এগিয়ে গেল—শুনতে কি আছে আটপৌরেদের নতুন গানে।

পাঁচ পরিচ্ছেদ॥ গান শুনে বনওয়ারী অবাক। এ গান তাকে নিয়ে—তার ভালোবাসার জন কালোশশীকে নিয়ে। সেই সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ নেবানো, কর্তাবাবার সামনে অন্যায় পাপাচার।

কোশকেঁধে আর আটপৌরে—কাহারদের দুই গোষ্ঠী। কি করে হল এই বিভাজন। একসময় তারা সাহেবদের পাল্‌কি বহন করত—অন্যরা ছিল সব সময়ের কর্মী—অষ্টপ্রহরী। পরে চৌধুরীদের আমলে পাল্‌কি বহনের তত দরকার থাকল না। ফলে তারা হল রীতিমতো শ্রমিক। আটপৌরেরাও বৃত্তি হারাল। তবে তারা বশ মানল না উঁচু জাতের। ডাকাতি-রাহাজানি-চুরি হল তাদের বৃত্তি। সংখ্যা কম। কিন্তু সবাইকার নাম আছে থানায়। দাগি আসামী সব।

বনওয়ারী শাল থেকে বের হয়ে কর্তাবাবার কাছে আর একবার অপরাধ স্বীকার করল।

ছয় পরিচ্ছেদ॥ ঝগড়া তাদের জীবনের নিত্য সঙ্গী। আজ ঝগড়া তীব্র। নয়ান নাকি পাখির নাক কেটে নেবার চেষ্টা করেছে। নসু তাই হৈচৈ করছে ছড়া কাটছে। করালী নয়ানের ওপর অসম্ভব অত্যাচার করেছে।

ঘরভাঙাদের হাতেই ছিল কাহারদের নেতৃত্ব। তাদের ঘরের চাল কখনো পুরো করা যেত না। অঘটন ঘটতই। পরে নিজেরাই খানিকটা চালায় পুরোপুরি খড় দিত না। নয়ানের মা বনওয়ারীর সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক ছিল সুচাঁদ সে কথা বলল হঠাৎ। বনওয়ারী নয়ানের মা বাসিনী বৌকে সম্ভব মতো সান্ত্বনা দিল।

সহসা নেমে এল বৃষ্টি। নয়ানের মা উল্লসিত। কিন্তু 'শালে' বৃষ্টি হলে যে গুড় নষ্ট হয়ে যাবে। কিংকর্তব্য বিমূঢ় সবাই। হেঁদো মণ্ডল ছাতা নিয়ে এসে কী যে করবে ঠিক করতে পারে না। এমন সময় করালী তেরপলের জামা পরে ত্রাণকর্তার মতো হাজির। রেল কোম্পানির তেরপল—এনে দিল। তাকে দেখে—ত্রিপল দেখে হেঁদো পরম আহ্লাদিত। গান বেঁধেছে নিমতেলে বনওয়ারী বুঝে ফেলেছে। তবে সে কিছুতেই স্বীকার করে না।

এদিকে হেদো মণ্ডল করালীকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করেছে। সেটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করল করালী। বনওয়ারীর কথা ভেবেই দিয়েছে তেরপল। নইলে হেদো মণ্ডলকে বিপদোদ্ধারের ব্যবস্থা করত না সে। 'বেটা' শুনে খুবই ক্ষুব্ধ সে। আসলে হেদো মণ্ডল কোনো কাহারের কাছে এরকম প্রতিবাদ আসতে পারে ভাবে নি।

সাত পরিচ্ছেদ॥ সায়েবডাঙায় বিনা সেলামিতে জমি পেল বনওয়ারী। তার শ্রমিকদের অন্যতম সুচাঁদ। যত কাজ তার চেয়ে বেশি গল্প। হেদো মণ্ডলের কাছে এগিয়ে কথা বলে। সদ্‌গোপরা আধা বাবু হয়েছে। তারা আর নিজের হাতে চাষ করে না। এ বাবুগিরি অবশ্য হেদো মণ্ডলের ভালো লাগে না। তার ইচ্ছা এখনো নিজে চাষ করে। কিন্তু সমাজ স্বগোষ্ঠীর আপত্তি। সুচাঁদকে বলল—কাহাররাও আগের মতো মরা কুকুর বেড়াল ফেলে না—নর্দমা সাফ করে না। সুতরাং তারাও বাবু হচ্ছে।

সেলামি দিয়ে জমি নিয়েছে সদগোপরা। লাগিয়েছে সাঁওতাল শ্রমিক। তারা গাঁইতি শাবল দিয়ে দ্রুত চাষ করছে। জমি খুবই শক্ত। বনওয়ারীর অত টাকার জোর নেই—তার

হয়ে বেগার শ্রম দেয় কাহাররা। হঠাৎ শাবল লাগল বনওয়ারীর মাথায়। বসুমতী রক্ত নিয়েছে। ভালো লক্ষণ। হেদোও বলল।

করালীর বাড়িতে সামান্য কথা। পাখির সঙ্গে। করালী তার জন্য রেল কোম্পানির গাইতি নিয়ে এসেছে। খুশি বনওয়ারী। তার মনে হল করালী যদি তার পুত্র হত। পানাকে শাস্তি দেবার জন্য মনে মনে প্রস্তুত বনওয়ারী।

আট পরিচ্ছেদ।। চড়ক আসন্ন। কাহারদের মৌখিক পরম্পরা—বাণ গোঁসাইয়ের গল্প। ছোট জাতরা হাত-পা কাটা বাণগোসাঁইয়ের স্মরণে বাণে চড়ে—পাটায় শোয়। এবার বনওয়ারী পাটভক্ত্যা হবে বলে ঘোষণা করল। গ্রামে সমাজের মধ্যে তার সম্মান বেড়ে গেল।

পানুর ত্রুটি খুঁজে পেয়েছে বনওয়ারী। পানু মোড়লের কাছে নয়ানের বাঁশঝাড় নিজের বলে বিক্রি করেছে।

কালোশশীর সঙ্গে দেখা। খবর পেল বনওয়ারী। করালী পরমের লাঠির আখড়ায় গেছে। সন্ত্রস্ত বনওয়ারী। এভাবে একটু একটু করে অপরাধের দিকে টেনে নামাতে পারে। করালীকে সাবধান করতে হবে।

নয় পরিচ্ছেদ॥ আট পৌরে-কোশকেঁধেদের বিভাজনের আরও কিছু খবর। মন্বন্তরা অর্থাৎ প্রলয়ঙ্কর বন্যার খবর বলল সুচাঁদ। সেবার কাহাররা চাষি হল। আটপৌরে থেকে গেল পুরোনো পেশায়।

করালীর কাছে পাওয়া গেল নতুন খবর : মুসলমান খালাসিরা হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেছে। তাই তারা মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা করেছে। বনওয়ারী করালীকে বলল সে যেন আর পরমের আখড়ায় না যায়। পাড়ার সুনাম রাখতেই তো গিয়েছিল! করালীকে বুঝিয়ে বলল বনওয়ারী। করালী মেনে নিল।

নিমতেলে পানুকে পাকু মোড়লের কাছে পাওয়া তথ্য দিয়ে কৌশলে শাসন করল বনওয়ারী। পানু ইনিয়ে বিনিয়ে যা বলল তা শোষিত কাহারদের সকলেরই মনের কথা। যাইহোক পানু বুঝল কেন বনওয়ারী তাকে এসব কথা বলছে।

পাটভক্ত্যা হবার কথা সমাজের কাছে অনুমোদন করিয়ে নিল বনওয়ারী। তার নেতৃত্ব সমাজে সর্বাতিশায়ী হয়ে উঠল যেন।

তৃতীয় পর্ব। এক পরিচ্ছেদ॥ বনওয়ারী পাটভক্ত্যা। উৎসব জমে উঠেছে। করালী বেশ উৎসাহী। সুচাঁদ উপকথার সাহায্যে যথাসম্ভব আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরি করল। করালীর উদ্যোগ আধুনিক—সাজসজ্জা—সিগারেট। সুচাঁদ কিন্তু চিরকালের রোমাঞ্চ রহস্যের কাহিনীতে দ্রবিত করে সবাইকে।

বনওয়ারীর স্থলে পরিবর্তিত মোড়ল সাময়িকভাবে প্রহ্লাদ। তার কাছে অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে আসে সুচাঁদ সে কার কাছে থাকবে! বনওয়ারী পাটায় শুয়ে এই সমস্যার কথা শোনে মজাও পায়। তবে পাটায় চড়ে সাধারণ জীবনের সমস্যার কথা ভাবতে নেই। করালী এসে সুচাঁদকে পাঁজা কোলা করে নিয়ে যায়। তার বাড়িতেই থাকুক সুচাঁদ।

বাসিনী বউ এই উৎসবের দিনেও তীব্র অভিশাপ দিয়ে চলেছে। বনওয়ারী শুনতে পায়। শঙ্কিত বনওয়ারী। অজানা অনাগত ভবিষ্যতের জন্য শঙ্কা।

দুই পরিচ্ছেদ॥ সময় এল ঘর ছাইবার। এসময় বনওয়ারীর সঙ্গে কাহারদের দল নিজেদের ঘর ছাইবার পর মাইতো ঘোষের বাংলা বাড়ির চাল ছাইছে। কলকাতা থেকে মাইতো ঘোষের বন্ধুরা আসবে—তারা থাকবে। যুদ্ধে কলকাতায় বোমার আতঙ্ক—তাই।

বনওয়ারীর জমিতে মাটি কাটা চলছে। রাত্রে বনওয়ারী মনে করছে সাপটা আসলে কর্তাবাবার বাহন—এ ব্যাখ্যা মানে না করালী। নতুন সময় পরিবেশ। রেলপত্তনের সময়—এরকম প্রচুর সাপ নানা জায়গায় পাওয়া গেছে।

গ্রামে এল পাগল। নন্দীর বেশে। তার উপস্থিতি গ্রামকে মাতিয়ে দিল। নসুরামের সঙ্গে সামান্য উপহাসের সম্পর্ক তার। পাগল তার কাছে 'রবশ্যাষে'। নসুরামকে বিয়ে করবে—পাগলের সহাস্য প্রস্তাব। পাগল গ্রামের কাজকর্ম—বিশেষত কৃষিকর্মে থাকে না। আনন্দ উৎসবের সময় এসে হাজির হয়। স্ত্রী নেই এক কন্যা দূরে বিয়ে দিয়েছে। মাথলা—রতনের পুত্র। তার মনিব তাকে চরম লাঞ্ছনা করছে। হিসাব মেটানোর কথা বলতে অদ্ভুত আচরণ করল—পাওনা আছে! পাওনাই যদি থাকবে হিসাব শোধ হল কিভাবে? করালী তাকে টাকা দিল— ও যেন মনিবের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়।

পাগল কাহারদের আগেকার কথা—রামায়ণ কথা শোনায়। বিশ্বযুদ্ধ নয় সে যুদ্ধই বা কম কিসে।

তিন পরিচ্ছেদ।। ঘর ছাওয়ার সময় পাগল যোগ দেয়। গাঁদা হনুমান এসে চাল তছনছ করে যায়। মাইতো ঘোষ বন্দুক দিয়ে হনুমানের হামলা নিবারণ করতে যান—পারেন না। পাগল আসায় বনওয়ারীর উৎসাহ। মাথলা-নটবর-ফড়িং-হেবো—তরুণ কাহাররা করালীর দলে যোগ দিয়েছে! বনওয়ারীর অনুরোধে পাগল গান গাইল। চন্দনপুরে কারখানায় যাওয়া নিষেধ কেন সে বিষয়ে গান। গান আর কাজ চলছে এমন সময় প্রবল শিলাবৃষ্টি।

করালী কর্তাবাবার আশ্রিত শিমূল বৃক্ষের উপর উঠে সবাইকে হাঁক দেয়—চন্দনপুরে খবর এসেছে প্রবল ঝড় আসছে। বনওয়ারী তাকিয়ে দেখল বায়ুকোণ থেকে আসছে শিলাবৃষ্টির মেঘ।

ঝড় বৃষ্টি এসে কাহার পাড়ার ছেলেমেয়েরা বন-বাদাড়ে ডাল-পাতাগুলো কুড়োতে যায়। বড়রা ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগে।

বাসিনী বউ নাচছে আর অভিশাপ দিচ্ছে। করালীর বাড়ির চাল উড়ে গেল। সবার ধারণা কর্তার বাহন হত্যার শাস্তি।

চার পরিচ্ছেদ।। মিত্র গোপালপুরে পাল্‌কি আর রায়বেঁশে-র দল নিয়ে যেতে হবে। আমন্ত্রণ পেয়ে বনওয়ারী সচেষ্ট হল। নসুবালা সবার আগে সেজে গুজে তৈরি। চলল মিত্র গোপালপুর। পরম্পরা রায়বেঁশে নাচবে। বনওয়ারী তার বাড়িতে গিয়ে দেখে কালোশশী সেখানে উপস্থিত। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাতাল অবস্থায় এল পরম। তার কথা রহস্যময়—একদিন শক্তি পরীক্ষা হবে, এরকম ভাব।

সবাই গেছে। করালী উড়ে যাওয়া চাল মেরামত করবে না আর। এবার বানাবে কোঠাবাড়ি। ধার নিয়েছে রেলপথের মহাজনের কাছে। বসনকে সব শুনিয়েছে—ধার শোধের রীতি নিয়ম। বসন তাজ্জব। এরকম রীতি গ্রাম দেশে ছিলনা। নতুন রীতির সঙ্গে পরিচয় হল তার। সুচাঁদ-বসন তবু কোঠাবাড়ির পক্ষে নয়। যা কোনদিন কেউ করেনি! সুচাঁদের মত—কর্তাবাবার নিষেধ আছে। বসনও নিষেধ করছে—মাতব্বরের অনুমতি না নিয়ে একাজ করা যাবে না। করালী আত্মগর্বী—মানবে না কিছু। শিমুল গাছে আবার উঠে প্রমাণ করল—মানে না কিছুই।

পাঁচ পরিচ্ছেদ।। মিত্রগোপালপুর থেকে পাল্‌কি বয়ে বনওয়ারী-পাগলদের মনে এল

পুরোনো দিনের আনন্দ। পাল্‌কি ফেরৎ দিয়ে এল চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ি। মিত্র গোপালপুরের বাবুরা মাছ পাঠিয়েছেন চন্দনপুরে। তারা পেল বেশ কিছু পাওনা বকশিস—মদের মূল্য। গ্রামের বাইরে সাহা বাবুদের শুঁড়িখানা। সেখানে নানান জাতের সঙ্গে মদ্যপান। কে কার পাশে বসেছে—এ নিয়ে পরমদের সঙ্গে একটু ঝগড়া হল। ফেরার পথে পরম বনওয়ারীকে ডেকে নিল। বাকিরা এগিয়ে গেল। পাড়ার মেয়েদের প্রাপ্য মদ পাঠানো হল।

ঝাকড়া গাছতলায় পরম বনওয়ারীর মধ্যে শুরু হল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব। যেন দুটি বীর হনুমান প্রাণান্তকর লড়াই করছে। পরম যাতে লাঠি নিয়ে না লড়ে বনওয়ারী সেই চেষ্টা করল। হাতাহাতিতে বনওয়ারীর কাছে পরম পরাস্ত হল। রক্তাক্ত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকল।

রক্তাক্ত বনওয়ারী গেল পরমের বাড়ি। কালোশশীর কাছে। কালোশশী তাকে ইঙ্গিতে নিয়ে গেল বাইরে। বনওয়ারী আজ উদ্দাম। গ্রামেও উৎসব পরিবেশ। কোপাইয়ের জলে রক্ত ধুয়ে যাক। চাঁদনী রাত। কালোশশী গাইল গান। হঠাৎ এল পরম। টলতে টলতে। তাকে দেখে বনওয়ারী জলে ডুব দিল। কালোশশী ছুটতে লাগল। দহের কাছে কর্তার শিমূল গাছের শিকড় ধরে উঠবার চেষ্টা করছে এমন সময় কর্তার আশ্রিত সাপের কামড়েই সম্ভবত কালো বউ মারা গেল। জলে পড়ল। কালিদহে ডুবে গেল যেন। পরম পালিয়ে গেল নদী পেরিয়ে—চিরকালের জন্য।

বনওয়ারী স্থির ধারণা কালোবউকে পাপের শাস্তি দিলেন কর্তা।

চতুর্থ পর্ব। এক *পরিচ্ছেদ*।। পাগল বনওয়ারীকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। পাগল গাছে চড়ে দেখেছে সব। বনওয়ারীকে শিখিয়ে দিল। গ্রামে এসে কালোশশীর কথা বলল না কিছু। থানা পুলিশ হবে। তারা গিয়েছিল জাঙলের দিকে। পরদিন কালোশশীর দেহ কালিদহে ভেসে উঠল। বনওয়ারীর জ্বর হল। করালী কোঠাবাড়ি করবেই। কারো নিষেধ মানছে না। সে এখন যুদ্ধের চাকরি করছে। মাস মাইনে পায়।

পনের দিন ভুগে বনওয়ারী কর্তার কাছে গেল। পিছন পিছন গেল বসন। যে করেই হোক করালীকে নিরস্ত করতে হবে—কোঠাবাড়ি যেন কিছুতেই না করে।

রমণের সঙ্গে দেখা। পলাতক পরম। তার স্থলে মাতব্বর রমণ। তার ইচ্ছা আটপৌরেরা বনওয়ারীকে মেনে নিক। বনওয়ারীর নেতৃত্বে দু দল এক হোক। রমণের আরো ইচ্ছা পরম যে জমিটুকু নিয়েছিল—তা হোক তার বা সমগ্র আটপৌরে দলের নামে। বনওয়ারীর অনুরোধ বাবুরা রাখবেন। বনওয়ারী খুশি।

ফেরার সময় ছোট্ট একটি ঘূর্ণী ঝড়। ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল পরমের বাড়ির দিকে। কালোশশী সম্ভবত ইশারা করে ডেকে গেল। বনওয়ারীর তেমনি মনে হল।

দুই *পরিচ্ছেদ*।। আগা সাহেব। কাবুলিওয়ালা। কাহাররা তাদের দেখেই ভয় পায়। করালী তাকে ধরল। শাসাল খুব। পাগল তার কাছে ধার করেছিল। আগা সাহেবকে দেখেই ভয়ে পালাচ্ছিল। করালী তাকে বলল জোর জুলুম চলবে না। এর আগে চন্দনপুরে যেমন শাসন করেছিল তেমনি করবে। পাগল ধার শোধ করল। করালী তার পাওনা নিয়ে নেবে আগার কাছে।

ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে হাঁসুলীবাঁকের কাহাররা। তার কিছু বিবরণ। বনওয়ারীর স্থির ধারণা কালোশশী প্রেত হয়েছে। ভয় পেয়েছে—স্বপ্নে দেখা দিয়েছে কালোশশী। বাকুলের শ্মশানকালীর কবচ ধারণ করবে। যাবার পথে করালীর বাড়ি তৈরি দেখল বনওয়ারী। করালী নেই। বনওয়ারীর আদেশ—বন্ধ করো কাজ।

মাইতো ঘোষের ছেলের অন্নপ্রাশন। কাহাররা যেন যায়। তাদের আলাদা নিমন্ত্রণ করতে হয়না। তারা যায়—এঁটো ফেলে। করালী অবশ্য এরকম নিমন্ত্রণ মানে না। তার মতে সদ্‌গোপ মনিবদের এঁটো খেলে জাত যায়।

ঘোষ বাড়ি থেকে ফেরার পথে সহসা সুবাসীকে দেখে অবাক হয় বনওয়ারী। গায়ের রং সামান্য মাজা—চাল চলন একেবারে কালোশশীর মতো। রমণের শ্যালিকার মেয়ে—কালোশশীর বোনঝি।

চৌধুরীর চাকরান প্রজা করালী। কোঠাবাড়ি করছে। সুতরাং তাদের প্রাপ্য চাই নবীন মাহিন্দারকে দিয়ে সেই দাবি পাঠালো চৌধুরী। করালী আইনের কথা বলে ফেরৎ পাঠাল তাকে। বনওয়ারী এসে দাঁড়াতে আর এক প্রস্থ তীব্র সমালোচনা করতে থাকল করালী। বনওয়ারীর সঙ্গে ছিল অনেক কাহার। তারা করালীকে চেপে ধরল। তার কোঠাবাড়ির ভিত নিশ্চিহ্ন করে দিল সবাই। নবীন এসে নিজের হাতে মাটি কাটল হাঁপাতে হাঁপাতে।

করালী পাখিকে নিয়ে চলে গেল চন্দনপুরে।

আসর বসল। সন্ধ্যার মজলিশ। বনওয়ারীর প্রতিপত্তি আজ সীমাহীন। রমণের মারফৎ আটপৌরেরা বনওয়ারীর নেতৃত্ব মেনে নিল। ধূর্ত পানু দিল প্রস্তাব। সুবাসীর সঙ্গে বিয়ে হোক বনওয়ারীর। দুদল মিলে যাক। প্রস্তাব গৃহীত হল। বনওয়ারী আহ্লাদিত।

সেই রাত্রে মৃত্যু হল নবীনের। অন্ধকারে। কেরসিন তেল নেই। আলোহীন অবস্থায় মজলিশে তার বুকে হাত দিয়ে রাখল বাসিনী বউ। শ্বাস নেওয়া বন্ধ হতে তীব্র হাহাকার। পাগল গাইল গান। সে গান কিছুটা দার্শনিক।

পঞ্চম পর্ব। এক পরিচ্ছেদ।। গাজনের পাটায় দ্বিতীয়বার চেপে বসল বনওয়ারী। পরাজয় বোধ তাকে আচ্ছন্ন করছে। করালীর জেদের কোঠাবাড়ি হলই। দারোগা বনওয়ারীকে ডেকে কথঞ্চিৎ বকুনি দিয়েছে। উপরন্তু খাসির দাম দিতে হচ্ছিল—করালী জরিমানা চায় নি, তবু।

সুবাসীর সঙ্গে বিয়ের অনুষ্ঠান। বনওয়ারী গাজনের পাটায় শুয়ে ভাবল। নসুবালা কিন্তু এই আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দেয় নি। তখন করালীরা বাইরে থাকে। নসুর প্রতিবাদ। পাগল আনন্দে মাতিয়ে রাখল সব গোপালীবালা কেঁদে উঠল। তাকে শান্ত করা কঠিন। পাগল প্রস্তাব দিল গোপালীকে সাঙা করবে সে। গোপালী সে প্রস্তাব মানল না। পানু কিছু টাকা দিয়ে গোপালীকে সংসার অতিরিক্ত কাজকর্ম করার পরামর্শ দিল। কুড়ি টাকা দিয়ে গোপালীকে নিরস্ত করল বনওয়ারী।

ভাবছে বনওয়ারী। সুবাসীর চাল চলন অদ্ভুত। যাতে লক্ষ্মীশ্রী বলে তা আছে গোপালীর। ১৩৪৮ সাল চলে গেল এল ১৩৪৯। গোটা পরিচ্ছেদটি যেন অতীত ভাষ্য। বনওয়ারীর কল্পনায় স্মৃতিচিত্রের সম্পাদিত উপস্থাপনা।

দুই পরিচ্ছেদ।। বর্ষ শুরু হল কালবৈশাখী দিয়ে। চার-পাঁচ বৈশাখ এল প্রবল ঝড়। ঝড়ে উড়ে গেল নয়ানের বাড়ি।

চন্দনপুর কারখানা আরও বড় হচ্ছে। বৈশাখ সংক্রান্তির নিমন্ত্রণ এল। করালী সদ্‌গোপদের এঁটো খাবে না।

শুধু নয়ানের বাড়ি নয়। কর্তাবাবার বেলগাছটি পড়ে গেল—নিচে ভিতটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। বনওয়ারী কাহারদের নিয়ে দেবতার বৃক্ষটি ঠেলে তুলল। দেবতা কি চলে গেলেন! তার আশঙ্কা।

রাত্রে হাহাকার শোনা গেল—পানুর ছেলে সর্পাঘাতে মারা গেছে। সুচাঁদ ব্যাখ্যা দিল—পাপের শাস্তি পেল পানু। কর্তাবাবার কাছে বছরের হিসাব নেই। পাপের শাস্তি পেতেই হবে।

তিন পরিচ্ছেদ।। পানুর ছেলের মৃত্যুর পর নতুন প্রজন্মের যারা করালীর দলে ভিড়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে এসে কৃষিকর্ম শুরু করল। ঘোষ বাড়ির নিমন্ত্রণে গেল অনেকে। করালী তাদের 'পতিত' করল।

পড়ে যাওয়া বেলগাছের গোড়া বাঁধাতে চায় বনওয়ারী। কিন্তু বিলাতী মাটি অর্থাৎ সিমেন্ট পাওয়া গেল বহু কষ্টে। রেশন থেকে নয় 'ব্ল্যাক মারকেট' থেকে। তিনগুণ দাম দিয়ে। যুদ্ধ দৈনন্দিন জীবনে ছায়া ফেলল। মনিবরা ধান দেয় না—খোরাকি না পেলে কাহাররা কাজ করে কি করে! বড় ঘোষ ইউনিয়ান বোর্ডের সদস্য। ইচ্ছা করলে কেরসিন তেল-কাপড়-ম্যালেরিয়ার ওষুধ—মিহিজামের সাপের কামড়ের ওষুধ দিতে পারতেন। কিছুই দিচ্ছেন না।

করালী এসে বনওয়ারীকে উঁচুস্বরে বলে গেল মনিব যদি বাঁচার ব্যবস্থা না করতে পারে, মোড়ল হয় অক্ষম, তাহলে যুদ্ধের কারখানায় কাহাররা চলুক। অসহায় বনওয়ারী। কিন্তু ধর্ম বেচবে কিভাবে!

নামল বৃষ্টি। কাহাররা কিছুতেই চাষের কাজ ছাড়তে পারল না। মাঠে কাজ করার সময় গোপালীবালা জলখাবার নিয়ে যায়। বনওয়ারী-গোপালী স্বপ্ন দেখে দারুণ ফসল হবে। সুবাসীকে বিয়ে করার কারণ তাকে কালোশশীর মতো দেখতে। সুবাসী সম্পর্কে গোপালীর এই কথা শুনে বনওয়ারী অবাক। যতটা বোকা ভবত ততটা বোকা সে নয়।

মাথলার ছেলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে সর্পাঘাতে মারা গেল। বনওয়ারী তাকে বাঁচাতে পারল না। ঘোষরা মিহিজামের ওষুধও দিলেন না! কর্তাবাবাবর রোষ—সবাই তেমনি ভাবল।

চার পরিচ্ছেদ।। মাথলার ছেলে মরল। সাপ অবশ্য সর্বদা দেবরোষ নয়। তাদের জীবনে নাগ নানাভাবে দেখা দেয়। কিছু স্মৃতিচিত্র। বড় ঘোষ সামান্য কেরসিন দিলেন না। রাত বিরেতে সাপের হাত থেকে সামান্য নিস্তার পাবার উপায়ও থাকল না। অসহায় মাতব্বর বনওয়ারী।

ফেরার পথে ঝড়ের পূর্বাভাস পশ্চিম আকাশে লক্ষ করল বনওয়ারী। হঠাৎই দেখা করালীর সঙ্গে। করালীর কথা—কাহাররা রেশন থেকে কেরসিন পায় না কেন? বনওয়ারী ক্ষুব্ধ হয়। করালী বলে অধিকারের কথা—স্বাস্থ্যের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক কথা তার। মাথলার ছেলেটাকে হাসপাতালে নিলে হত। ও হয়তো বেঁচে যেত।

আকাশে দেখা দিল হাতীর শুঁড়। ইন্দ্ররাজার ঐরাবত। প্রবল জলস্তম্ভ আসছে। উপকথার প্রলয় ইঙ্গিত দেখা গেল। ভেঙে পড়েছে একটা যুদ্ধের জাহাজ। খবর পেয়ে বনওয়ারী খুশি।

সুবাসী-গোপালীর উপর ক্ষুব্ধ হল বনওয়ারী। দলা পাকানো ঝগড়ার বিবরণ।

বড় ঘোষ বনওয়ারীর উপর প্রবল ক্ষুব্ধ। তার নামে ইউনিয়ান বোর্ডে নালিশ করেছে করালী। কাহাররা কোন সুযোগই পাচ্ছে না—পাবে না কেন। বড় ঘোষের ধারণা বনওয়ারীই করালীকে দিয়ে অভিযোগ করিয়েছে।

খবর এল রমণ কাকার। তার স্ত্রী মরেছে। বনওয়ারীর ধারণা কালোশশীর প্রেতাত্মার

পাঁচ পরিচ্ছেদ।। ইঁদ পুজো জমির মালিকদের। তারা পুজো শেষ করলে ইঁদ পুজোর মাটি এনে কাহাররা ভাঁজো পাতে। জিতাষ্টমীর দিনের অনুষ্ঠান। যে যার সঙ্গে খুশি নাচবে—কাহার পাড়ায় যে যার সঙ্গে পারে অঙ করুক। কেউ নিষেধ করবে না। পাগল ভাবল গোপালীবালার সঙ্গে নাচবে।

করালী পৃথক ভাঁজো বসাচ্ছে। সেখানে আসবে সাহেবরা। কাহার পাড়ার ভ্রষ্ট নষ্ট মেয়েরা আসবে—নাচবে। আধুনিক নানান উপকরণ দিয়ে করালীর ভাঁজো। সাহেব-রা ক্যামেরায় ছবি তুলবে।

বনওয়ারী উদ্যোগের ত্রুটি রাখে নি। করালী এল। বনওয়ারী লক্ষ করল সুবাসী যেন তার প্রতি একটু বেশি উৎসাহী। রীতি—তাই বনওয়ারী বলে না কিছু। তার তীব্র ক্ষোভ জাগে। মনে হয় কর্তাবাবা যেন সবাইকে সাবধান করে দেন। পানু আজ খুশি খুশি। তির্যক তার কথা। কর্তা নাকি আগেও সাবধান করেছেন। পাগল গাইল গান।

করালী এনেছে রেকর্ডের গান। তার আসরে হারমণি বাজছে।

বনওয়ারী মধ্যরাতে প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার উদ্দাম উৎসবের মধ্যে আনমনে গিয়ে রমণের বাড়িতে জ্বালিয়ে এল আগুন। তাকে দিয়ে কর্তাবাবা এই কাজ করালেন—তার তেমনি মনে হচ্ছিল। বস্তুত কর্তার ক্রোধ তো কখনো জল কখনো আগুন। বনওয়ারী তো তারই প্রতিনিধি। কাহাররা গিয়ে রমণের বাড়ির আগুন নেবাল।

পাখি এল বাড়ি। করালী নেই! কোথায় গেছে সে?

গতরাতে অতিরিক্ত পান করায় উত্তেজনায় বনওয়ারী অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সুবাসী ভাঁজো বিসর্জন দিয়ে এসেছে। কোপাইতে স্নান করে এসেছে! আর তেমন ক্লান্তিও নেই যেন। বনওয়ারীর মনে হল তার গা থেকে মৃদু সুবাস আসছে। এর আগে করালীর গায়ে এরকম খোশবাস পেয়েছিল।

ছয় পরিচ্ছেদ।। ভাঁজোর রাতে গোপালীবালাও প্রচুর মদ্য পান করেছিল। পাগলের সঙ্গে নেচেছিল। তিনদিনের জ্বর-তাপে গোপালীর মৃত্যু হল। বাসিনী বলল, কলির আরম্ভ সতী গোপালী চলে গেল তাই। সুচাঁদ অবশ্য গোপালীর মৃত্যুর অন্য ব্যাখ্যা দিল। সতীন-কাঁটা ছমাসও সহ্য করল না। তাই তার মৃত্যু। লক্ষ্মীমন্ত বউ ছিল। মাঠে অজস্র ফসলের সমারোহ।

শ্মশানে গেল সবাই। গোপালীর জন্য নতুন কাপড় চেষ্টা করে যোগাড় করতে পারল না বনওয়ারী। করালী সাহায্য করতে চাইল। বনওয়ারী রাজি হয় নি। তাঁতীদের কাছ থেকে আনা হল গামছা। নসু এসে গোপালীকে সিঁদুর দিয়ে সুখ যাত্রা করুক—তার প্রতি ঈর্ষা না করুক, এই প্রার্থনা করার পরামর্শ দিল সুবাসীকে।

শ্মশান থেকে ফেরার পথে পাখিকে দেখল বনওয়ারী। তরুণ এক কাহারকে বোঝাচ্ছে। চাষবাস ত্যাগ করে সব আসুক কারখানায়। বাড়ি এসে বনওয়ারী দেখে করালী বসে আছে। সুবাসী যেন ঘোমটার আড়াল থেকে তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। ক্ষুব্ধ হল বনওয়ারী। করালী তার সঙ্গে যুক্তি দিয়ে বিতর্ক করল খানিক। তরুণ কাহাররা চলুক তার সঙ্গে। তাছাড়া বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বনওয়ারী সবাইকে ধর্ম শেখাচ্ছে। এসব মোটেই ভালো নয়। বনওয়ারী তীব্রতম ক্ষোভে তার চুল ধরে মাথা নোয়াবার প্রবল চেষ্টা করল। কিন্তু করালী তো কোশকেঁধে কাহারের মতো মাথা নোয়াতে শেখে নি। বনওয়ারী কিছুতেই তার মাথা নোয়াতে পারল না। করালী স্থির দাঁড়িয়ে থাকল। পাগল এসে বলল শোকতপ্ত অবস্থায় তার এমন করা উচিত নয় কোন মতে। তাছাড়া তার বাড়িতে গোপালীবালার মৃত্যু সংবাদ

শুনে ও এসেছে। এমন অনুচিত। কোনক্রমে পাগল বনওয়ারীকে নিরস্ত করল। পাখিও ইতিমধ্যে বনওয়ারীর বাহুতে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল।

করালী বলে গেল মাতব্বর হিসাবে এই শেষ বারের মতো খাতির করে গেল সে। এরপর আর খাতির করবে না।

সাত পরিচ্ছেদ।। বনওয়ারী এখন ভয়ে ভয়ে থাকে। রাত্রে বিশেষত। কালোশশী আর গোপালী প্রেত হয়েছে—এই ধারণা তার। ভয় পায় সুবাসীকেও। রূপকথার নাগিনী কন্যা ভাবে সুবাসীকে। নাক দিয়ে সরু সাপ বের হতে পারে সেই ভয়।

দারুণ ফসল হয়েছে। কিন্তু কাহারদের অভাবের সীমা পরিসীমা নেই। যুদ্ধে দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কিন্তু সদ্‌গোপ মনিবরা ধান দিচ্ছেন না। কাহাররা বড়ই মুশকিলে পড়েছে। পুজোর সময়কার কাপড়ও ধারে কিনতে বাধ্য হল বনওয়ারী। চন্দনপুরের দত্তবাবু দিয়েছেন। শর্ত, ধানে শোধ করতে হবে। বনওয়ারী বোঝে ধানের দাম আরও বাড়বে—দত্তবাবু নেবেন এখনকার দরে।

ফসলের হিসাব কষতে পারে না রমণ। কত ধান পাবে বনওয়ারী? হিসাব করে সুবাসী। হিসাব শেষে আনন্দে পা ছড়িয়ে কাঁদে। তার আবদার পাখির মতো উড়োজাহাজ-পাড় শাড়ি দিতে হবে। বনওয়ারী চেষ্টা করবে—বলল।

পুজোর আগে কাঁদে নয়ানের মা। তার তো কেউ নেই! সুচাঁদ কাঁদে। উৎসবের আগে কাঁদতে হয়। রীতি।

কোপাইয়ের বাঁধ দেবার কথা ভাবেন সদ্‌গোপ মনিবরা। আসলে একটু জল দরকার। অন্যথায় হাতি ঠেলা ধান হয়েছে। করালী বলল—বাঁধ বাঁধতে পারবেনা—মিলিটারিরা নাকি বাধা দেবে। বনওয়ারীর ধারণা, করালীই আছে এর পিছনে। সদ্‌গোপ প্রভুরা বললেন, করালীর তত ক্ষমতা এখনও হয়নি।

নসুবালা নতুন শাড়ি পরে অহঙ্কার করে গেল। তাদের তো ধান হলে পয়সা হবে, এমন নয়—নগদ পয়সা উপার্জন করে করালী।

এল ভয়ঙ্কর ঝড়। করালী রেনকোট পরে ঝড়ের মধ্যে সবাইকে সাবধান করে গেল। চন্দনপুরে খবর এসেছে—সাইক্লোন! বনওয়ারীকে বলে গেল ভেঙে পড়েছে কর্তার বেলগাছের গাঁথনি। কর্তা চলে গেছেন। চিরকালের জন্য! হাঁসুলীবাঁকের ধান—লক্ষ্মী, তা কর্তা ছাড়া কে রক্ষা করবে আর।

আট পরিচ্ছেদ।। ঝড়ে ভাঙল সুঁচাদের পা। করালী তাকে চন্দনপুরের হাসপাতালে ভর্তি করল। কাহারপাড়ার প্রান্তে কালারুদ্রতলায় মটর গাড়ি এল। যুদ্ধের অফিস হবে। বাঁশকাটা হবে। সাহেবরা এল—বড় ঘোষ তাদের সঙ্গে কথা বলছেন। করালীও তদারকি করতে লাগল।

রতন ক্ষেতে বলল—আর পারছে না। বনওয়ারী তাকে অসম্ভব রেগে গালাগাল দেয়। পরে তাকে বলল, মন মেজাজ ভাল নেই। রতনও তাকে গালাগাল দিক। ধর্ম তো কেউ বেচে না—বনওয়ারী এভাবেই ভাবে। শোনা গেল মাইতো ঘোষ এনেছেন 'চেতামুনি' না কি যেন। তাতে লেখা আছে পৃথিবী ধ্বংস হবে। এছাড়া আর কোনোভাবেই আসন্নমান পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করতে পারে না বনওয়ারী—কাহারদের কেউ। সহসা ঢেঁড়া পড়ল—খাজনা নেবেন না চন্দনপুরের বাবুরা। যারা বিনা সেলামিতে জমি নিয়েছে, তাদের দিতে হবে ফসলের ভাগ। বনওয়ারী এবার সত্যি পথে বসল। তার সব আশা সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সুবাসীর মাথায় ছাতিম ফুল দেখতে পেল বনওয়ারী। মনে সন্দেহ। ছাতিম গাছ কাছাকাছি নেই। বাবুদের কাছে গেল বনওয়ারী। পথে সন্দেহ ঘনিয়ে আসছে—নানাভাবে তা নিয়ে তোলাপড়া করল। বাবুরা এবছরের মতো ভাগ নেবেন না—এটা মন্দের ভালো। বনওয়ারী সাহা বাবুদের শুঁড়িখানায় গিয়ে একভাঁড় মদ কিনল। গ্রামের মাতব্বর, নিজের জন্য সামান্য মদ নিয়ে পানে বসল। পান শেষে শুনতে পেল পাখি উত্তেজিতভাবে করালীর সঙ্গে কথা বলছে। সুবাসীকে ছাতিম ফুল দিয়েছে করালী। পাখির কথার উত্তরে আরও বলল সে, এখন তার অবস্থা যা সুবাসীকে সাঙা করলেও করতে পারে।

নেশাগ্রস্ত বনওয়ারী আর সহ্য করতে পারল না। করালীর টুঁটি টিপে ধরল সে। পাখিও ভীত বিহ্বল। বনওয়ারী যদি জেতে—তাকেই হয়তো...। করালীর সঙ্গে এই ভয়ঙ্কর লড়াই চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর স্বভাবতই বনওয়ারী পরাজিত হল। তাকে ফেলে অজ্ঞান অবস্থায় রেখে করালী চলে গেল। রাত গভীর হল। বনওয়ারী চাইল করালীর কোঠা বাড়িতে আগুন দেবে। গেল সেখানে। কেউ নেই। হতাশ পরাজিত অসম্মানিত সব হারানো বনওয়ারী হাঁসুলী বাঁকের মাঠে কুয়াশার মধ্যে, নিজের অবচেতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল!

শেষপর্ব।। যাট দিন কেটে গেল। বনওয়ারী বেঁচে উঠেছে। পাগল আর নসু তাকে সেবা করছে। আসলে নসুই তাকে বাঁচিয়েছে। সবাই ছেড়ে চলে গেছে—গ্রামের মেয়েরা এসে দেখাশোনা করত। তার মতো শুরবীর মানুষের সেবা—মেয়েদের কাজ নয়। নসু তখন ভাবল এসময় বনওয়ারীকে না দেখলে তার নারী-ভাবের কী মূল্য? নসুর কথায় জানা গেল সবার কথা। না শুনলেই ভালো হত —বলে বনওয়ারী। এর চেয়ে মৃত্যু ছিল অনেক কাম্য।

সুবাসী বনওয়ারীর চিকিৎসা করানোর কথা বলে গোরু বাছুর সব বিক্রি করল। তারপর করালীকে সাঙা করে চলে গেল চন্দনপুরে।

তীব্র আলো এসে ধাক্কা মারল বনওয়ারীর চোখে। সব বদলেছে। বাঁশবন সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। কর্তাবাবার থানে যুদ্ধের মোটর গাড়ির আড্ডা বসেছে। চন্দনপুরের কারখানা হাঁসুলী বাঁককে শেষ করে দিল!

নিম তেলে পানু মনিবের রূপো বাঁধানো হুঁকো চুরি করেছিল। পুলিশে জানায় তার মনিব। পালিয়ে বেড়াত। করালী ধরিয়ে দেয়। চুরির অভিযোগে এবার জেল হল। পানু বলে গেল ভালোই হল। কিছুদিন ভালোই থাকতে পারবে। তার বউ এখন উড়োজাহাজের আড্ডায় কাজ করছে। কাজ আর কি। ফ্যাশন বেড়েছে খুব। কিরকম কাজ তা এই সংবাদ টুকুতেই বোঝা গেল।

বাসিনী বউ অতিরিক্ত খেয়ে মারা গেছে। আবর্জনার মধ্যে ফেলে দেওয়া খাবার খেয়েছিল। শেষে পেট ফেটে মরেছে।

পাখি আত্মহত্যা করেছে। তার আগে ধারালো অস্ত্র দিয়ে করালীকে আঘাত করেছিল। জোয়ান মরদ করালীর কপালে পাখি রেখে গেল স্থায়ী দাগ। করালী এসে দেখে বসন্তের বাড়ি গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে পাখি।

বসন্ত চলে গেছে চৌধুরীদের বাড়ি। চৌধুরীদের যুবক প্রেমিকের কথা ভোলে নি। তার মৃত্যুর পর বিধবার মতো থাকে।

চন্দনপুর—জাঙলের বাবুরা আর মুনিব নয়। তারা সামন্ত সম্পর্ক রাখতে চান না আর। কাহাররা সব বেশ ভূষা আচার আচরণে বদলে গেছে। চন্দনপুরের শ্রমিক তারা। কর্তার উপর তাদের আর বিশ্বাস নেই।

সুবাসীর ভাঙা পা জোড়া লেগেছে। চন্দনপুরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষা করে। মাঝে মাঝে স্টেশন চত্বরে পা ছড়িয়ে বসে উপকথা বলে। কেউ কতকটা শোনে চলে যায়—কেউই সবটা শোনে না। সুচাঁদ উপকথার জন্য দুঃখ করে। কেউ যদি তার হৃদয়ের এই স্মৃতি ঝরা উপকথা শুনত! কেউ যদি লিখে রাখতো। নসু আর পাগল গান গায়। উপকথার সঙ্গীত-রূপায়ণ। সঙ্গে নসুর নাচ।

বনওয়ারী বলে পাগলকে—তাকে যেন কালিদহের কাছে দাহ করা হয়। জ্ঞানগঙ্গা তো তার নেই। তাদের ছোট জাতের। মনে করায় বনওয়ারী— একবার কাঁদড়া গিয়েছিল তারা। কোনো উঁচুজাতের মানুষকে জ্ঞানগঙ্গা করিয়ে ফেরার পথে। এক বৈষ্ণব সাধু তাদের বলেছিল শরীর জানান দিচ্ছে—আর বেশিদিন নেই। এবার তাই নিজের শরীরটা টেনে নিয়ে যাচ্ছেন গঙ্গার দিকে। বনওয়ারীর শরীরও জানান দেয়—আর বেশিদিন নেই। মারা গেল বনওয়ারী। করালী শালকাঠ আর ঘি এনে দাহ করল। বলল—স্বর্গে যাও।

বনওয়ারী বলেছিল উপকথা শেষ হবে—আসবে বন্যা। পুরাকথায় যেমন থাকে। ১৩৫০-এ এল বন্যা। এ বন্যাকে ইতিহাসের বন্যা বলে জানান তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বন্যার ফলে বহু অঞ্চলে নদীর জলোচ্ছ্বাসে শেষ হয়ে যায় পুরোনো উপকথা-ঘেঁষা জীবনের ছন্দ।

এর দুবছর পর—করালী এল হাঁসুলীবাঁকে। বাঁশ গাছে নতুন কোঁড়া ফুটেছে। তার আশা নতুন করে পত্তন করবে আবার এই গ্রাম। বাঁধ দেবে নদীতে! গড়ে তুলবে ইতিহাসের হাঁসুলীবাঁক। ডাকাবুকোর কাণ্ড দেখে নসুবালা নেচে ওঠে, গান গায়।

এই বিশাল মহাকাব্যিক উপন্যাসের চমৎকার আখ্যান। ঠিক যেমন করে গড়ে ওঠে মৌলিক মহাকাব্য authentic epic বনওয়ারীর মহাপ্রস্থান আর করালীর নবপ্রস্থানে সেই কাহিনী গড়েছেন তারাশঙ্কর। অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ উপন্যাস। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদি উপন্যাস।

আদলের সন্ধান করতে গেলে একটি রেখাচিত্রের সাহায্য নিতে হয়। রেখা চিত্রটি উপস্থাপিত হল। প্রথম পর্বের পাঁচটি পরিচ্ছেদে ঘটনার অগ্রগতি বেশি হয় নি। প্রথম পর্বে
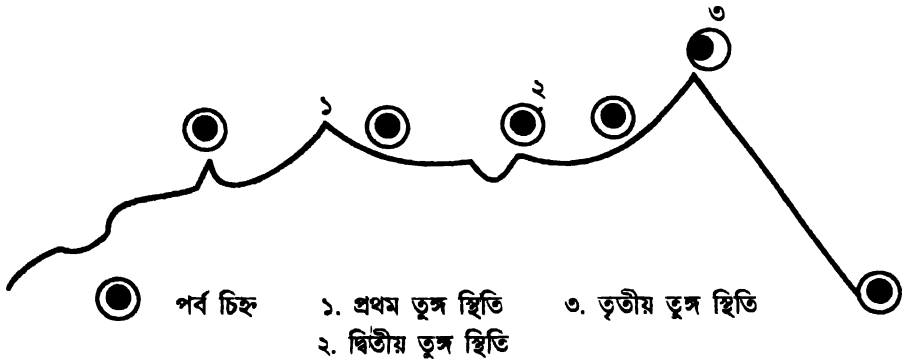
এক পরিচ্ছেদে করালীর কুকুরের মৃত্যু এক তীব্র রহস্যের মতো পরিস্থিতি গড়ে তোলে। দুই পরিচ্ছেদে চন্দ্রবোড়া সাপের মৃত্যু সেই রহস্য আপাতদৃষ্টিতে মোচন করে। তাই কাহিনীর রেখাচিত্র এখানে টিলার মতো সামান্য ওঠে—আবার নেমে আসে। মৃত সাপটিকে নিয়ে

গড়ে ওঠে অঞ্চলের তিনটি প্রবণতার অন্তর্দ্বন্দ্ব—আন্তঃসম্পর্কের বুনট। করালী আধুনিক, সাপ চলুক চন্দনপুর—এই বাসনা তার। বনওয়ারী প্রাচীনপন্থী—সাপ তার কাছে আধিদৈবিক রহস্যের গুহামুখ। আর মাতব্বরের বাড়ির উঠোনেই তো চিরকাল বড় শিকার (big game) এনে রাখার নিয়ম। মাইতো ঘোষ এই শিকারের উপর আসল অধিকারী—যেমন বাঘ দেখিয়ে তারা, ভদ্রলোকের দল, কেউ নিয়েছে বন্দুক— কেউ কৃতিত্ব লাভ করেছে। করালীর সক্রিয় বিদ্রোহ—মাইতো ঘোষকে নিবৃত্ত করল। মাত্র এক সিকি পুরস্কার দিয়ে চলে গেলেন সামন্ত প্রভু। শেষ পর্যন্ত জিতল কিন্তু বনওয়ারী। সাপ দাহ হল—স্নান করল কাহারপাড়ার সবাই, কাহিনী এখানে সামান্য উচ্চতা পেয়েছে। কর্তার পুজোতেও দুই দৃষ্টি ভঙ্গির লড়াই। বলি বলতে কাহাররা যা বোঝে, করালী তা বোঝে না। দারোগার কাছে বকশিস প্রাপ্তির সংবাদে করালী বিজয় পেল। বিজয় সমাজের বিস্ময় আদায়ে—বিজয় ঘর ভাঙাদের বাড়ির বৌ-এর প্রেমের অধিকারে। দ্বিতীয় পর্বে গতি কম—উচ্চতা বেশি নয়। পরমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা জমি নিয়ে—করালীর সঙ্গে পাখির বিয়ে একটি উচ্চতার টান (তিন পরিচ্ছেদ) আর গুড় তৈরি করা বনওয়ারীর নামে আটপৌরেদের ঘেঁটুগানে সামান্য উচ্চাবচতা (চার ও পাঁচ পরিচ্ছেদ)। এই পর্যায়ে নয়নকে আঘাত আর হেদো মণ্ডলকে বেটা বলার জন্য আপত্তি করালীর সঙ্গে সামন্ত প্রভুর সংঘাত আর কাহারদের পুরোনো গোষ্ঠীপতির চূড়ান্ত অবক্ষয়কে সনাক্ত করছে। ছয় পরিচ্ছেদ এই তুঙ্গ স্থিতি। এরপর আবার কাহারদের 'বাবু' হবার কথা— সদগোপদের চাষ ছেড়ে দেওয়া ইত্যাদি কথা। চড়কে বাণ গোঁসাই-এর পাটায় শোয়া প্রভৃতি ঘটনা—সাত ও আট পরিচ্ছেদের কথাবস্তু। কাহিনী এখানে সামান্য নিম্নগতি। করালীর বশ্যতা প্রদর্শন, কোশকেঁধে প্রসঙ্গ, পরমের আড্ডায় যেতে নিষেধ করা—কৌশলে নিমতেলে পানুকে ঘেঁটু গানের ব্যাপারে শাসন—বনওয়ারীর চড়ক পাটায় শোয়ার ঘটনায় পাড়ায় সম্পূর্ণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। দ্বন্দ্ব প্রমাণিত। দ্বিতীয় পর্বের উপান্তে ঘটনাকে বলতে চাই নিম্নগতির। পাগল কাহারের আগমনের পর ঘটনার গতি সমস্যা সংকট অপেক্ষা রম্য উপাদানের আনুগত্য করেছে। সুচাঁদকে কোলে করে করালীর নিয়ে যাওয়া (এক পরিচ্ছেদ, তৃতীয় পর্ব) এই উপাদানেরই আদি রূপ বলে মনে হয়। পাগলের নন্দী-বেশে আগমন রম্য উপাদানকে বিস্তৃত করল। (দুই পরিচ্ছেদ)। গান গাইতে গাইতে এখানে কাহাররা ঘর ছাইছে আর চন্দনপুর যাত্রা নিষেধের চিরকালীন নীতি শোনাচ্ছে (তিন পরিচ্ছেদ)। ঘটনার গতি কিন্তু এখানেও অধোমুখী। কর্তার শিমূল গাছে দ্বিতীয়বার ওঠা, কোঠাবাড়ি বানানোয় বদ্ধপরিকর করালী কাহিনীকে সামান্য উচ্চগতি দিয়েছে। (চার পরিচ্ছেদ)। মিত্র গোপালপুর থেকে ফিরে পরম-বনওয়ারীর মরণপণ সংগ্রাম—পরমের পরাজয়, কালোশশীর মৃত্যু আর পরমের চিরকালের জন্য গ্রাম ত্যাগ; এও পরাজয়ের শেষ ধাক্কা। কাহিনীর আর একটি তুঙ্গ-পরিস্থিতির জন্ম দিল। (পাঁচ পরিচ্ছেদ)। এটি কিন্তু কাহারদের নতুন কোনো দ্বন্দ্ব নয়। এর সূচনা ঘটেছে কাহারদের দুই গোষ্ঠীতে বিভাজিত হবার সময় অর্থাৎ উপকথার যুগেই। তাই সামন্ততন্ত্রের সমান্তরাল মানসিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত বনওয়ারীর চেয়ে লড়াকু হিসাবে সম্পর্ক-রিক্ত করালীর যে ভাবাদর্শের সংঘাত তাকে বেশি উচ্চ স্থানে রাখতে চাই আমরা। চতুর্থ পর্বের সূচনায় বনওয়ারীর অধিকার ব্যাপ্ত হল রমণের প্রস্তাবে। গতি সামান্য উচ্চ। (এক পরিচ্ছেদ)। তারপর আগা সাহেবকে শাসন করে করালীও এক অর্থে নায়ক বনওয়ারীর প্রতিকল্প হয়ে উঠল। (দুই পরিচ্ছেদ)। করালীর গ্রামীণ প্রতিষ্ঠার প্রতীকটি ভূমিসাৎ করতে এগিয়ে এল সবাই। বনওয়ারীর শক্তির পরিচয় পেল করালী। নয়ান এল

রক্ষণশীলতার সহায়ক হয়ে। তার মৃত্যু ঘটল। শেষ হল ঘরভাঙাদের বংশ—উত্তরাধিকার। এখানে কাহিনীর গতি মোটামুটি একই উচ্চতায়। দ্বন্দ্ব নয়—দ্বন্দ্ব প্রশমনই ঘটল। করালীও গ্রাম ত্যাগ করেছে।

পঞ্চম পর্বের প্রথমে কাহিনী গতি পায়নি। সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ে—আসলে আদিম সমাজ গঠনের উপযোগী। দ্বন্দ্ব ভাবাদর্শের। করালী স্পষ্ট জানিয়েছে সদ্গোপদের এঁটো খাবেনা। বনওয়ারীর ভাবাদর্শ প্রাচীন। কর্তার ভেঙেপড়া বেলগাছ ঠেলে তোলার চেষ্টা তার। নিমতেলে পানুর ছেলের মৃত্যু পুরোনো ভাবাদর্শকেই যেন সমর্থন করছে। (দুই পরিচ্ছেদ)। মারা গেল মাথলার ছেলে। ভয় ছড়িয়ে পড়ল। বনওয়ারী মাতব্বর হিসাবে ব্যর্থ এখানে। কার্যকর যা কিছু, করছে, করালী। রেশন কার্ড আনা, ইউনিয়ান বোর্ড সদস্য বড় ঘোষের নামে অভিযোগ করার সাহস দ্বন্দ্বকে গতি দিল—কাহিনী উর্ধ্বগতি লাভ করল এখানে। (চার পরিচ্ছেদ)। ভাঁজো উৎসবে করালীর সমান্তরাল অবস্থান বনওয়ারীর অসংযত ব্যবহার—মাতাল অবস্থায় রমণের চালে আগুন দেওয়া, হয়তো কোশকেঁধেদের সব শক্তি নিঃশেষ করারই প্রতীক। কাহিনী এগিয়েছে ধীরে। গতি এখানে ক্রমশ উচ্চের দিকে। (পাঁচ পরিচ্ছেদ)। গোপালীর মৃত্যু—তার জন্য কাপড় দিতে না পারা, বনওয়ারীর মাতব্বরীর অধঃপতনের ইশারা। সুবাসীর সঙ্গে সামান্য সম্পর্কের ইঙ্গিত পেয়ে সন্দেহ আর করালীকে চেপে ধরার চেষ্টা উচ্চগতি দিল ঘটনাকে। (ছয় পরিচ্ছেদ)। বনওয়ারী করালীর মাথা নোয়াতে পারে নি—এ তার অধঃপতনের আর এক প্রমাণ। তবে করালী-সুবাসীকে ঘিবে বনওয়ারীর সন্দেহ অমূলক ছিল না। ভাঁজো ভাসিয়ে স্নান করে আসার পর গায়ে যে মৃদু সুবাস পাওয়া যাচ্ছিল, বনওয়ারী তাতেই সন্দেহ করেছিল—এইরকম খোশবাসই তো করালী ছড়িয়েছিল! (পাঁচ পরিচ্ছেদ)। এরপর বনওয়ারী ক্ষমতার অধোগতি সত্ত্বেও কখনো ধার করে, কখনো আসন্ন ভালো ফসলের স্বপ্নে বিভোর থেকে করালীর উচ্চতায় আসার চেষ্টা লক্ষ করি। শেষ ধাক্কা এল প্রকৃতির। সাইক্লোন। মাঠের লক্ষ্মী আর রক্ষিত হচ্ছে না। (সাত পরিচ্ছেদ)। বনওয়ারী শেষবারের মতো উঠে দাঁড়াতে চাইল এবার। যে মুহূর্তে শুনল তার সন্দেহ ঠিক ছিল। সুবাসীর ছাতিম ফুল করালীরই উপহার—একথা জানামাত্র এগিয়ে গেল বনওয়ারী। আর এই যুদ্ধকে আমি তৃতীয় তুঙ্গ স্থিতি বলছি। এরপর কাহিনী দ্রুত অধোগতি পেয়েছে।

শেষপর্ব পরিচ্ছেদ বিহীন। পরিচ্ছেদ অবশ্য আছে। কালগত পরিচ্ছেদ। পঞ্চম পর্বেব পর কাহার পল্লীর ইতিহাস বদলে যাওয়ার জন্য তারাশঙ্কর সময় নিয়েছেন ষাট দিন। দুমাস। আর বনওয়ারীর মৃত্যুর পর প্রবল বন্যার পর কাটল দু দুটি বৎসর। ১৯৪৩-এর বন্যার পর দুবছর ধরলে ১৯৪৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। তাই হয়তো করালী কোপাইতে নতুন বাঁধ দেবার কথা ভাবতে পেরেছে। বিয়াল্লিশের গণ আন্দোলন তো তার দেখা—স্বদেশী বাবুদের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল। এবার সে বুঝি স্বাধীনতার জন্য তৈরি হচ্ছিল। তাই নতুন হাঁসুলীবাঁকের কথা তাকে অবলম্বন করে ক্ষীণ স্বপ্নের মতো তার দ্রষ্টা দেখাতে পেরেছেন।

৪

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র ভাষা বিশ্লেষণ

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র ভাষাকে ড. মৃত্যুঞ্জয় কুমার 'উত্তর রাঢ়ের বিশেষত বীরভূমের শ্রেণি-উপকথা' বলে চিহ্নিত করেছেন। (পশ্য : *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা—পাঠ ও পর্যালোচনা* গ্রন্থভুক্ত; বিশেষত স্থলে 'বিশেষিত' ছাপা হয়েছে। ১৬৪ পৃ.) এরপর ড. কুমার তাঁর বিশ্লেষণে আরও কিছু কথা লিখেছেন। সেগুলির উল্লেখ করছি :

১. 'উপন্যাসটিতে মূলত মান্য চলিত রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।'

২. 'মান্য চলিতের সঙ্গে কিছু কিছু উপভাষা ব্যবহার করে লেখক গদ্যের স্বাদ বদল করেছেন।'

৩. 'বর্ণনা অংশ' আর 'চরিত্র বিশ্লেষণ'—এবং 'সংলাপের' ক্ষেত্রে উপভাষা ব্যবহার করেছেন তারাশঙ্কর।

৪. প্রযুক্ত শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য সামান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হলে লেখক 'উদ্ধৃতি চিহ্ন' ব্যবহার করেছেন।

৫. কাহারদের সংলাপে সর্বত্র 'নিভাষা, শ্রেণি-উপভাষার বা আঞ্চলিক উপভাষা'র লক্ষণ সব জায়গায় ধরা পড়ে নি—লেখক সে ভাষার সঙ্গে মান্য চলিত মিশিয়ে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য 'উপন্যাসটি সর্বস্তরের মানুষ পাঠ করবেন—তারা যেন ভাষার দুর্বোধ্যতায় আটকে না পড়েন।'

ঠিকই বিশ্লেষণ করেছেন তরুণ আলোচক।

কিছুদিন পূর্বে 'তারাশঙ্করের ছোট গল্প : গদ্যশৈলী' শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী বাংলা ভাষার একটি ছক ব্যবহার করেছিলেন। (পশ্য : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* ; গ্রন্থভুক্ত; সূত্র উল্লেখিত। ২৮৯ পৃ.) এর সঙ্গে ড. কুমারের প্রদত্ত 'রেখাচিত্র'-টি সম্পূর্ণ একরকম। অবশ্য এক রেখাচিত্র থাকলেও সিদ্ধান্ত তাঁদের ভিন্ন। ড. চক্রবর্তী দেখেছেন তারাশঙ্করের ছোটগল্পে মূলত সাধু রীতি প্রযুক্ত—তিনি তাঁর শৈলী-রহস্য উন্মোচন করেছেন। অন্যপক্ষে ড. কুমার দেখিয়েছেন মান্যচলিতের সঙ্গে অঞ্চলের শ্রেণী-উপভাষার মিশ্রণে কেমন করে তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র ভাষ্যটি গড়ে উঠেছে।

উপন্যাসের ভাষা বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। উপন্যাসের কথন-বিশ্বে কথক আর লেখক, চরিত্রের ভাষ্য আর তার সংলাপ এক অনন্য মিশ্রণ বা অভাবিতপূর্ব পরম্পরিত সূত্রে গড়ে ওঠে। উপন্যাসের ভাষা ও কাহিনী—আধার-আধেয় নয়, তা এক অনিবার্য অবিচ্ছিন্ন রচনাশৈলী। উপন্যাস নাটক নয়। পরিবেশ পটভূমি আর পাত্র-পাত্রীর আচরণের কথা এখানে বন্ধনীভুক্ত বা বাঁকানো হরফে স্বেচ্ছা-বিযুক্তি তৈরি করে না। ঔপন্যাসিক বিষয়—ঘটনাস্রোত আর কালপ্রবাহের মধ্যে কখনো মানস অভিসার করেন কখনো আবার আত্মতা জেগে ওঠে তাঁর। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এই মিশ্রকলা কেমন কাজ করেছে একটি অসাধারণ বিবরণ থেকে সামান্য উদ্ধার করলে বোঝা যাবে :

কথা সত্য। কার্তিক-অগ্রহায়ণে হাঁসুলীর বাঁকের উপকথায় পলেনের মাঠের রঙ সোনার

> বরণ। ঝিরঝির হিমের বাতাস; পাকা ধানের গন্ধে ভুর ভুর করে গোবিন্দভোগ বাদশা ভোগ কনকচুর রামশাল সিঁদুরমুখী নয়ানকল্মা—কত রকমের ধানের বাস! এক-এক ধানের এক-এক সুবাস, সকল সুবাসে মিলে সে এক সুমধুর বাস। সোনার বরণ ধান ভরা মাঠের বুকে বেড় দিয়ে কাঁচ-বরণ জল রূপার হাঁসুলী টলমল—কোপাই নদীর বাঁক। কূলে পাকা কাশগুলির ডাঁটার পাতায় সোনালী রঙের একটি পাড়। পুকুরে পুকুরে পদ্মগুলি শুকোতে শুরু করলেও পুরো ঝরে না, অল্প স্বল্প গন্ধও থাকে। খালে নালায় ঝির-ঝিরে ধারা জল বয়, রূপার কুচির মত ছোট ছোট মাছ ঝাঁক বেঁধে চলে নদীর সন্ধানে। আউশের মাঠে আউশ-ধান উঠে গিয়ে রবি ফসলের সবুজ ভরে ওঠে। গম, কলাই, আলু, যব, মসনে, তিষির অঙ্কুর-রোমাঞ্চ দেখা যায়। [পঞ্চম পর্ব : আট পরিচ্ছেদ]

এই বর্ণনায় কোথাও উপভাষা নেই, আঞ্চলিকতা থাকতে পারে তা হাঁসুলীবাঁকে আবদ্ধ নয়। কৃষি-সংস্কৃতির রূপ-রস-গন্ধ আর লেখকের মুগ্ধ দৃষ্টি এখানে হাজির। শব্দ ব্যবহারও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। 'অঙ্কুর-রোমাঞ্চ'— *লেখকের মানস-অভিসার* ; এ কাহার সমাজের ভাবদৃষ্টি নয়। একটু পরেই আকাশের বর্ণনা, বালিহাঁসের আসা-যাওয়া আর টিয়ার উড়ে যাওয়ার বর্ণনা থেকে তারাশঙ্কর যে উপমাটি ব্যবহার করেন—'আকাশ যেন নাচনে মেতে-ওঠা ছেলেমেয়ে ভরা পূজা তলার আঙিনা হয়ে *ওঠে*'—তা কখনই কাহার সমাজের অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়। এরকম বর্ণনা অবশ্য সর্বত্র নেই। প্রায় গোটা উপন্যাসেই তারাশঙ্কর তাঁর আত্মতা (individuality) আড়াল করেছেন—ফলে উপন্যাসের ভাষা ও ভাষ্য কিছুতেই যেন পৃথক করা যায় না।

ভাষা বিষয়টি কাব্য-সাহিত্যে যেমন 'monologic', উপন্যাসে তেমন নয়। একমাত্রিক ভাষারীতি উপন্যাসে থাকে না। সেই বৈশিষ্ট্যকে মিখাইল বাখতিন বলেন দ্বি-বাচনিক বা 'dialogic'। বাখতিন-কে ইংরেজি সাহিত্যে প্রয়োগ করে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন লেখক সমালোচক ডেভিড লজ। তাঁর মন্তব্য : 'The novel, in contrast, is inherently 'dialogic' or, in an alternative formulation,'polyphonic'—an orchestration of diverse discourses culled from both writing and oral speech.' (পশ্য : ডেভিড লজ : *After Bakhtin–Essays on Fiction and Criticism*; রুটলেজ; 1990 ; প্রথম সংস্করণ ; 76 পৃ.) বহু বিপরীতমুখী ভাষ্যের সম্মেলক তথা 'orchestration', লিখিত ভাষ্য আর মৌখিক রীতি যেখানে একাকার—উপরন্তু যেখানে আছে লেখক আর তার চরিত্রের মন মনন ও ভাবনার আদান প্রদান—তা-ই উপন্যাসের ভাষা পরিবেশ গড়ে তোলে। একে অন্য উপাদান থেকে ছিঁড়ে পৃথক করা যায় না—উচিত না—সম্ভবও না।

উপন্যাসের ভাষা প্রায়ই দ্বি-স্তরীয়। বাখতিন যাকে বলেন 'doubly-voiced of doubly oriented discourse' তা উপন্যাসের প্রাণ। একে নিছক দুই স্তরের সমান্তরালতা বলা যাবে না—'Which cannot be classified according to a simple binary opposition' (উক্ত সূত্র; 82 পৃ.)। তাই এই অনন্য শিল্প-মাধ্যমটিকে বিশ্লেষণ করার সময় ভাষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করে বিবেচনায় আনাটা ভুল। অসীম রায়কে অমিয়ভূষণ মজুমদার কিছুদিন পূর্বে ঠিক এরকম একটি সিদ্ধান্তের কথা পত্রযোগে জানিয়েছিলেন :

> 'আসল কথা উপন্যাস একটা কলা-পরিণতি। তার গদ্যকে তার থেকে আলাদা করা প্রকৃতপক্ষে যায় না।' [১৯. ৫. ১৯৭২-এ লেখা এই চিঠি। পশ্য : "উপন্যাসের ভাষা" ; *বাঙলা গদ্যজিজ্ঞাসা*; সমতট, কলকাতা; ১৩৮৮, ১৫৬ পৃ.]

বাখতিন উপন্যাসের তত্ত্ব নিয়ে যে-কটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন, তার মধ্যে *Rabelais and his World* অত্যন্ত মৌলিক। এখানে তিনি লোকসমাজের ভাষা কেমন করে উপন্যাসের ভাষ্য হয়ে ওঠে তার বিশ্লেষণ করেছেন। এ ভাষায় তিনি দেখেছেন— গালাগাল, অভিশম্পাত আর শপথ গ্রহণ। ('abuses, curses and oaths' ; পশ্য : *Rabelais and his world* : মিখাইল বাখতিন ; হেলেন ইসোলস্কি অনূদিত ; ইণ্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত ; 1984 ; প্রথম প্রকাশ 1968 ; 187 পৃ.) হাঁসুলীবাঁকের লেখক এই বই দেখেছেন! অসম্ভব। কিন্তু হাঁসুলীবাঁকের কাহার পল্লীর কলহসংস্কৃতি, বাসিনী বউ-এর ভয়ঙ্কর অভিশাপ আর বনওয়ারীর শপথ গ্রহণ ও রক্ষার চেষ্টা এ-উপন্যাসে অপরূপ এক বুনট তৈরি করেছে—বলাই বাহুল্য। এগুলির মারফৎ গড়ে উঠেছে হাঁসুলীবাঁকের আশ্চর্য ভাষ্য।

তারাশঙ্কর লিখেছেন—ঝগড়া সেখানে 'একদিনে মেটে না। দিনের পর দিন তার জের চলতে থাকে'। একে তিনি নাম দিয়েছেন 'কলহ সংস্কৃতি'। গালাগালের এই তীব্র প্রাণঘাতী আক্রমণে আছে কাহারদের ভাষার অমোঘ উপস্থিতি। নসুবালা বনওয়ারীকে বলেছে :

> 'বল, চোখ তো আছে, মাতব্বর মানুষ', বিচেরও আছে, বলি একবার দেখ। লাকে কামুড়ে কি করেছে দেখ। 'সব পুত থাকতে লাতির মাথায় হাত!' 'হাত গেল, আঙুল গেল, পিঠ গেল, কাঁধ গেল, গিয়ে লাকে কামড়?' [দ্বিতীয় পর্ব : ছয় পরিচ্ছেদ]

এই সংসারে কলহ আছে—প্রবাদ আছে, লেখ্যরীতি আর কথ্যরীতির আশ্চর্য মিশেল, ডেভিড লজ যাকে বলবেন 'both written and oral speech'. শুধু কি মানুষের সঙ্গে ঝগড়া। অভিশাপ কখনো গাছকেও। 'পানার উঠানের নিমগাছটাকে' গালাগাল দেয় বাসিনী বউ—নয়ানের মা। কারণ—'গোঁদা হনুমানের অত্যাচার। গাছটা অত উঁচু কেন'—তাই ঝগড়া? আছে অভিশাপ। আকাশের মেঘ দেখে—কত্তার বাহন হয়ে আসুব ঐ মেঘ এমন অসম্ভব কামনা তার। মারা গেছে নয়ান—সেকথা মনে করিয়ে 'সুচাঁদ ধেই-ধেই করে লাফিয়ে নাচছে, আর মোটা গলায় চীৎকার করছে—বেটার মাথা খেয়েছিস, এইবার চোখের মাথা খাবি। ভাতে হাত দিতে ছাইয়ের গাদায় হাত দিবি। ভূত হয় নাই বলছিস? দেখবি লো দেখবি।' নয়ানের মাকে এই অপূর্ব শাপান্তের উপলক্ষ কালোশশী। সে যে মরে ভূত হয়েছে আর অবসর মতো নয়ানের মায়ের ঘাড়েই চাপবে সেকথা অবিশ্বাস করার উপায় নেই! 'কথার শেষে সুচাঁদ সর্বাঙ্গ দুটি হাত নাড়া দেয় বার কয়েক!' এই আচরণ ও ভঙ্গির সঙ্গে মিশে আছে হাঁসুলীবাঁকের ভাষা। একে উপন্যাসের narrative থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। আর অবিচ্ছিন্ন এই ভাষা রীতিতেই আছে উপন্যাসের প্রকৃত সার্থকতা।

উক্ত বিশ্লেষণের পরও আমরা তারাশঙ্করের ভাষা-রীতি ও শৈলীটি বুঝে নেবার চেষ্টা করছি। উপন্যাসের কথা-শরীরটি ব্যবচ্ছিন্ন করে বুঝতে চাইছি উপাদানের বয়ন রহস্য। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র ভাষা ব্যবহারে আছে একটি অঞ্চলের নিজস্ব মনোগত অভিপ্রায়। ভাষা তাদের অঞ্চল-সন্নিধি। অঞ্চলের সূত্র দিয়েই বাঁধা তা। প্রথমেই লক্ষ করবো চরিত্রগুলির পরিচয়-দ্যোতক বিভিন্ন নাম। একে বলা যায় folk-naming. নানান সংস্কার আর সূত্র মিশে গড়ে ওঠে এই নামগুলি। কয়েকটির কথা লিখছি :

১. নিমতেলে পানু : 'পাড়ায় দুজন প্রাণকৃষ্ণ থাকায় এ প্রাণকৃষ্ণের বাড়ির উঠোনের নিমগাছটির অস্তিত্ব তার নামের আগে জুড়ে দিয়ে নিমতেলে পানু বলে ডাকা হয়।' (প্রথম পর্ব : এক পরিচ্ছেদ) ঐ গাছের নিমপাতা/ফল দিয়ে মেশানো তেল মাখানোর কথা পাই সুঁচাদের ভাষ্যে। সুতরাং নামটিতে আছে অন্য প্রাণকৃষ্ণদের সঙ্গে পার্থক্য তৈরির জন্য—নিমগাছটিকে শনাক্তকরণের চিহ্ন হিসাবে যোগ করে আর তার বড় হয়ে ওঠার একটি ইতিবৃত্ত মিশিয়ে। মানুষটি এখানে গ্রাম দেশের বৃক্ষলতা-পরিবেশের সঙ্গে বেমালুম একাকার হল।

২. মাথলা : 'মাথলার আসল নাম রাখাল বা আখাল, কিন্তু দেহের অনুপাতে মাথাটা মোটা বলে কাহারেরা তাদের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী সম্ভবত ওয়ালা প্রত্যয় করে করেছে মাথলা।' (প্রথম পর্ব : তিন পরিচ্ছেদ) তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় কাহারদের এই 'নিজস্ব ব্যাকরণ' আরও প্রযুক্ত হয়েছে।

৩. গেছো-ষষ্ঠী : আসল নাম ষষ্ঠীদাস। 'মনন্তরা'-র প্রবল বন্যায় কাহাররা যখন গাছে আশ্রয় নিয়েছিল, 'করালীর কত্তাবাবা ছিল তখন মায়ের প্যাটে। ভর্তি-ভর্তি দশ মাস। গাছের ডালেই পেসব হল গেয়ে। তাতেই নাম হ'ল—ষষ্ঠী দাস। গাছটি ছিল ষষ্ঠীগাছ। ডাকত নোকে গেছো ষষ্ঠী বলে।' (প্রথম পর্ব : পাঁচ পরিচ্ছেদ) গেছো এখানে নিছক বিশেষণ নয়—কাহারদের 'নিজস্ব ব্যাকরণ'-সম্মত অতিরিক্ত একটি পরম্পরা।

৪. কলকাটা : 'রতন কাহারের বাবার এই নাম। কলে তার চারটে আঙুল কেটে গিয়েছিল। শুধু বেঁচেছিল বুড়ো আঙুলটি।' তার রসিক-ব্যাখ্যা ছিল সেটি তাকে 'লবডঙ্কা দেখাতে বেঁচে' গেছে। (দ্বিতীয় পর্ব : চার পরিচ্ছেদ)

৫. দাঁতাল কুঞ্জ : নয়ানের বাবা। এ নামটি কেন? তারাশঙ্কর লেখেন নি। 'দাঁতাল' যুক্ত হয়েছিল কোন না কোন লোক-সামাজিক চিহ্নায়নের উদ্দেশ্যে সন্দেহ নেই। (দ্বিতীয় পর্ব : ছয় পরিচ্ছেদ)

৬. পাঁকু মণ্ডল : 'পানুর মুনিব...অতি বিচক্ষণ হিসাবী লোক। তার হিসাবের পাক অত্যন্ত জটিল—খুলতে গেলেও জট পাকায়, সেই জন্যই তার আসল নামের পরিবর্তে পাকু নাম দিয়েছে লোকে।' (দ্বিতীয় পর্ব : আট পরিচ্ছেদ) আসল নামটি নগেন্দ্র বা লগন্দ। এক আধবার সে নামটিও ব্যবহৃত হয়েছে বটে।

৭. হেদো মণ্ডল : 'রতনের মনিবের স্থূল চেহারার জন্য নাম হয়েছে "হেদো মণ্ডল"।' (দ্বিতীয় পর্ব : আট পরিচ্ছেদ) পাকুর নাম তার স্বভাবের ব্যাখ্যান, হেদো-নামটিতে আছে চেহারার পরিচয়। দু-ক্ষেত্রেই নামটি অবশ্যই কৃষি শ্রমিক কাহারদের দিক থেকে দেখা। তারাশঙ্কর মন্তব্য করেছেন—'*এ নামগুলি দেয় কিন্তু কাহারেরাই*। এ বিষয়ে তাদের একটা প্রাক পৌরাণিক মৌলিকত্ব আছে।' এ হেন 'নিজেদের ভাষাজ্ঞান অনুযায়ী' 'সুসমঞ্জস নামকরণ'। ভাষার এই গভীর রহস্য ভেদ না করে তারাশঙ্করের ভাষা নিয়ে আলোচনা করা উচিত নয়। বিশেষত *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র ভাষায় এর রহস্য বহুমাত্রিক—গভীর আর তাৎপর্যে ভরা।

৮. খোনা কাহার : নয়ানের কর্তাবাবা; দাঁতাল কুঞ্জের বাবা। তার পিতার নাম অমাই। মরে যাবার পর তার আত্মার মুক্তি হয় নি। 'তিনি তাই হলেন।'—অর্থাৎ প্রেত। তারপরও স্ত্রীকে কখনো এনে দিত জল কখনো কাঁদির রাজবাড়ির রাসপূর্ণিমার

প্রসাদ। নয়ানের কর্তাবাবার গলার স্বর ('রজ') এই নাসিক্য-ধ্বনিতে কথা বলা প্রেতের প্রভাবে নাকি খোনা হয়ে যায়। তাই তাকে লোকে বলত 'খোনা কাহার'। অমাই তার বশে থাকা ভূত ছিল। (চতুর্থ পর্ব : দুই পরিচ্ছেদ) এ সমস্ত উপকথাকে যুক্তির ছাঁকনি দিয়ে বিচারের প্রয়োজন নেই—এ হল কাহারদের বিশ্বাসের ইতিহাস—মনস্তত্ত্ব প্রবাহ। ভাষাটি তার অন্তর্গত।

শুধু মানুষ নয়—কখনো কোনো গাছ, কখনো কোনো পোষা-প্রাণীকে নিয়েও এই রকম নাম তৈরি করে নেয় কাহাররা। কালিদহের পাশে বড়ডাঙার ঝাঁকাটে গাছ— যেখানে তাদের নির্ণায়ক সংঘর্ষগুলো সংগঠিত হয়েছে তার নাম, 'এদেশে' যাকে বলে 'হুমো' পাখি তার নাম—সবই কাহারদের জীবন পরিধির অন্তর্গত। ভাষা-রচিত এক বিচিত্র অপরূপ ভুবন। Lost world একটি। বনওয়ারীর একটি গরুর নাম 'আটকেলে'। 'সাদার উপরে আটটি কালো দাগ বিশিষ্ট বলদটা বনওয়ারীর বড় ন্যাওটা।' [চতুর্থ পর্ব : এক পরিচ্ছেদ]

অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন লাহা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় হিন্দির প্রভাব নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছেন। প্রায়ই তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে হিন্দি-ভাষা জানা এক-আধটি চরিত্র আনেন। ইতিপূবে *কবি* উপন্যাসের আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি রাজা পয়েন্টসম্যান প্রায়ই হিন্দি বলে। 'বাংলা ও হিন্দির মিশ্রণ'—সে কথাগুলি। চরিত্রটি এক সময় সৈন্যবাহিনীতে ছিল। 'ঘটনাচক্রে' 'বিগত মহাযুদ্ধে' রাজা গিয়ে পড়েছিল 'মেসোপটেমিয়া'-য়। সুতরাং হিন্দি বলার মধ্য দিয়ে রাজা গ্রাম-জীবনের বৃত্তটিতে অস্বীকার করে কিনা ভাবা দরকার। (পশ্য : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবি* : অচিন্ত্য বিশ্বাস; রত্নাবলী; কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ—২০০৫; প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯; ১৯২-৯৩ পৃ.) আমাদের দেশের চিরাচরিত জাতব্যবস্থা (caste system)-য় তার তেমন বিশ্বাস নেই। অনায়াসে সে তার শ্যালিকা ঠাকুরঝির জাতে 'জাত দেগা'—বলে নিতাইকে প্রস্তাব দেয়। আর আছে এক বৃহত্তর পটভূমির ইশারা। হাঁসুলীবাঁকে করালীর মারফৎ এই রকমই একটি ভাষা পরিস্থিতি (Linguistic situation)-এর আভাস দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

কানাডার ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাভাষীদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে ডব্লু. ই. লামবার্ট একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন "A Social Psychology of Bilingualism". তার একাংশে লামবার্ট দেখাচ্ছেন 'bilingualism' বেশ কিছু পূর্ব শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যারা দুই ভাষাতে স্বচ্ছন্দ তারা একভাষিক (monolingual)-দের তুলনায় অনেক মুক্ত পরিস্থিতিতেও তাদের ভাষিক অধিকার ও প্রত্যয় উপস্থিত করে। Linguistic Competence—এসব ক্ষেত্রে কতকটা যেন ক্ষমতার পূর্ব শর্ত হিসাবেও কাজ করে। লামবার্ট মনে করেন এই গবেষণা কর্মের 'theoretical significance' অন্যান্য দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে ব্যবহার যোগ্য। (পশ্য : জে. বি. প্রাইড এবং জেনেট হোলমেস সম্পাদিত *Sociolinguistics*' পেঙ্গুইন; বাল্টিমোর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; 1972 ; 347 পৃ.)

হিন্দিকে ঘিরে এক ধরনের ক্ষমতার বৃত্ত বা স্তর ভারতীয় সমাজে বর্তমান। ১৯৪৬-এ যদিও এই ক্ষমতায়ন ঘটেনি, তবু *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় হিন্দি মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করালীর হাঁসুলীবাঁক-কেন্দ্রিক জীবন পরিধির বাইরের সত্য বলে মনে হয়। দেখাই :

১. বনওয়ারীর এক্তিয়ারের বাইরে আলপথ বেয়ে করালী চলেছে চন্দনপুরে। মৃত চন্দ্রবোড়া সাপটি নিয়ে। তখনও বনওয়ারীর অপেক্ষায় দ্বিধান্বিত তরুণ দল। *'করালী বলল তার বিদ্যাসম্মত হিন্দীতে—যে আসেঙ্গা সে আসেঙ্গা, হাম কেয়ার*

করতো নেহি হ্যায়।' (প্রথম পর্ব : চার পরিচ্ছেদ)। হিন্দি এখানে করালীর মুক্ত-জগতের আভাস। চন্দনপুর যেন তার ভাষায় বাহিত হয়ে উপস্থিত। মনে রাখতে হবে, রাঢ় বাংলার পশ্চিমে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ। এই স্বতন্ত্র প্রদেশে হিন্দি প্রধান ভাষা এখন। তারাশঙ্করের সময় (উপন্যাসের ভাষ্য রচনার সময়) তা ছিল বিহার। বিহারও হিন্দি ভাষাকে মূল প্রকাশ-মাধ্যম বলে মনে করেছে তখন। সুতরাং হাঁসুলীবাঁকের বৃত্তটি পার হলেই করালীকে আয়ত্ত করতে হয় দ্বিভাষিক পরিবেশের সঙ্গে টিকে থাকার ক্ষমতা। বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা পরিস্থিতিও এর পিছনে কাজ করছে বলা নিষ্প্রয়োজন।

২. পরমের নিরুদ্দেশ হবার পর, পাওয়া গেল কালোশশীর মৃতদেহ। দারোগা এল গ্রামে। ঘটনার একটা নিজস্ব বিবরণ দিল পাগল। তা শুনে করালী বলল : 'কাঁহা সে পরম? কাহা?' (চতুর্থ পর্ব : এক পরিচ্ছেদ)। করালীর হিন্দি এখানে ক্ষমতারই প্রতিধ্বনি যেন।

৩. সুচাঁদ করালীকে কোঠাবাড়ি তৈরির ব্যাপারে নিষেধ করতে গেল। বারণ করতে যাবার পর—'করালী তাকে দরজা দেখিয়ে বলেছে—নিকালো'। (চতুর্থ পর্ব : এক পরিচ্ছেদ)। এই শব্দ—করালীর দুঃসাহস, কাউকে না-মানা এবং তার আর্থিক শক্তির পরিচয় বহন করছে। 'যুদ্ধের চাকরি' নিয়ে 'দিন মজুর' থেকে 'মাস মাইনে' পাবার সুযোগ পাবে এরপর—করালী তখন 'কোট পেন্টুলেন' পরে বেড়াবে। 'পায়ে জুতো'—ফোস্কা পড়া সত্ত্বেও খুঁড়িয়ে চলবে সে।

৪. আগাসাহেবের সঙ্গে করালীর কথা স্মরণ করছি। আগার সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছে : 'খবরদার! মারে গা তো মাথা ভাঙ দেগা তুমারা।' (চতুর্থ পর্ব : দুই পরিচ্ছেদ)। কাবুলিওয়ালা মহাজন, 'এ দেশে ব্যবসা করছে এতদিন লাঠির জোরে।' করালীর কথা শুনে থমকেই গেল যেন। উপন্যাসের কথক লিখছেন : 'কাহার পাড়ায় করালী ভিনদেশী মানুষ। জাত এক হলে কি হয়, রীতকরণ আলাদা—বাক্যি, যে বাক্যি শিখেছে সে হাঁসুলীবাঁকের কাহার পাড়ায়, সেই মুখের বাক্যি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গিয়েছে।' করালীর এই নবজন্ম—তার ভাষায়। দ্বিভাষিক দক্ষতায়—bilingualism-এ।

হিন্দির প্রয়োগ হাঁসুলীবাঁকে আর এক ক্ষেত্রে আছে। সাধারণত সেটি পাঠকের নজরে আসে না। নীলকর সাহেবরা যখন কাহারদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তখনকার কথাও উপকথার স্মৃতিতে ক্বচিৎ উঠে এসেছে। বিশেষ করে তাদের দিন যখন শেষ হল—কোপাইয়ের প্রবল বন্যা—মনন্তরার সময়। 'পঞ্চশব্দের বাদ্যি বাজিয়ে' নদীর বুকে আলোয় 'আলোকীন্নী' করে ভেসে উঠেছিল নৌকা। নীলকুঠির সাহেব নৌকা ধরতে যাবে—কর্তাবাবা এসে দাঁড়ালেন : 'ন্যাড়া মাথা, ধবধব করছে রঙ', গলায় রুদ্রাক্ষ—'গলায় পৈতে, রক্তাম্বর, 'পায়ে খড়ম'। জলের উপর হেঁটে এলেন! বললেন, 'যেয়ো না, ও নৌকা তোমার নয়।' সাহেব স্বভাবতই মানে নি। বলেছে—'পথ ছাড়, নইলে গুলি করেঙ্গা।' অর্থাৎ হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে সাহেবের কথা। কর্তাবাবার উত্তর : 'বেশ ধরেঙ্গা তবে নৌকো।' এরপরের কথা এখানে বলার হেতু নেই। নীলকরদের জল সমাধি হল—শেষ হল হাঁসুলীবাঁকের যুগ। যুগ-নিয়ন্ত্রক দেবশক্তিও এখানে কথা বলেছেন সেই ভাষায়—মিখাইল বাখতিন যাকে বলেছেন 'Language of the market place', যাতে থাকবে মৌখিকতা 'colloquialism' আর যা পুরোপুরি উচ্চ

কোটির সুনির্দিষ্ট সুনিরূপিত ভাষা নয়। এই ভাষায় থাকে 'unofficial element of speech' (পশ্য : মিখাইল বাখতিন : *Rabelais and His World,*—উক্ত ; 189 পৃ.) বাংলার বেশ, তবে, নৌকা-র মাঝখানে হিন্দি 'ধরেঙ্গা'—এরকম একটি ভাষা পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে বলেই মনে করি।

বনওয়ারী-রতন-প্রহ্লাদ-রাও কখনো কখনো হিন্দি মিশিয়ে কথা বলেছে। তাদের কাছে হিন্দি দৈবী প্রভুত্বের ভাষা যেন। হাতি ঠেলা ধান হয়েছে হাঁসুলীবাঁকে। আর একটুখানি বৃষ্টি হলেই সোনায় সোহাগা হবে। এরকম সময় নেমে এল হাতির শুঁড়। জলস্তম্ভ। বনওয়ারীরা জানে এ হল দেবরাজ ইন্দ্রের হাতি। বজ্রদণ্ড দিয়ে মেঘের সমুদ্রে আঘাত করছেন দেবরাজ। বনওয়ারীরা কর্তাবাবার কাছে প্রার্থনা করছে—'হে বাবা, তুমিই ভরসা কাহার পাড়ার দণ্ডমুণ্ডের কথা। যদিই নামে আবার ক্ষ্যাপা হাতী, তবে রক্ষো করো তুমি। আঙুল দেখিয়ে বলো—ই ধার নেহি, উধার যাও।' (পঞ্চম পর্ব : চার পরিচ্ছেদ)। প্রভুত্বের ভাষা—নিজের মতো তাকে দেবতার মুখে বসিয়ে ইচ্ছাপূরণ—হাঁসুলীবাঁকের ভাষা নির্মাণটিকে চমৎকার তুলে ধরেছে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের আর একটি দিক 'মৌখিক পরম্পরা' (Oral tradition)। ভাষার লিখন রূপ যে প্রতীককে ধারণ করে মৌখিক প্রতিবেদনে তা থাকে না। মৌখিক প্রতিবেদনে যে Orality তাকে ভিন্ন সংস্কৃতির লক্ষণ বলে শনাক্ত করেছেন আধুনিক গবেষকরা। মৌখির রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য স্মৃতিধার্যতা (Memoriza-tion)। কেমন করে এই স্মৃতিধার্যতা তৈরি হয়? এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সমস্ত তাত্ত্বিক কাঠামো এখানে উল্লেখের প্রয়োজন দেখছি না। হাঁসুলীবাঁকের ভাষা-বিশ্লেষণে তার সামান্য কিছু উদাহরণ আনতে চাই—তার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যানটি যুক্ত করে দেব।

১. কালোশশী বনওয়ারীকে বলেছে—পরম নেই।—'তা সে তো তোমার এই খানিক আগে বেরিয়ে গেল।' (প্রথম পর্ব : দুই পরিচ্ছেদ) সামান্য এই সংলাপেই কি কালোশশীর বলার ভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়ে আসছে না? ডেভিড লজ লক্ষ করেছিলেন লিখিত সংলাপ যখন উপন্যাসে যুক্ত হয়, তখন যতিচিহ্ন (punctuation) খুব নির্দিষ্টতা আনে কিন্তু তার ফলে উপন্যাসের সংলাপ একটু ঐতিহ্য-শাসিত হয়ে পড়ে (হয়—'highly conventional') এর সঙ্গে মানুষের মুখের ভাষার দূরত্ব ঘোচে না। আগেকার দিনের উপন্যাসে পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ক তাই রচিত হয় না তেমন—তার অবস্থা হয় মানুষের প্রকৃত কথন রীতি ('actual speech')—থেকে অনেক দূরবর্তী। পক্ষান্তরে, আমাদের উল্লেখ করা সংলাপটি পড়লে পাঠক বুঝবেন—সংলাপটিতে যতি চিহ্ন না থাকায় (তা-এরপর একটি স্বাভাবিক 'pause' থাকলেও নেই)—কালোশশী কি বলছে, তার সঙ্গে কিভাবে বলছে তাও স্পষ্ট হয়েছে।

২. পাখির নতুন ভালোবাসা জেগেছে—সুচাঁদ তার কথা বলছে। 'সর্বনাশীর করালী ছাড়া সারা "তিভুবন" খাঁ-খাঁ—খাঁ-খাঁ করছে।' (প্রথম পর্ব : দুই পরিচ্ছেদ) এই কথাটুকুর মধ্যে পুনরাবর্তনের একটি ভঙ্গি আছে। একটি শব্দ ধ্বন্যুক্তির মতো বার চারেক ব্যবহার করার ফলে কাহার-কন্যা পাখির সক্রিয়তা যেন সুচাঁদের ভাষ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শব্দ-দৃশ্য-রূপ তৈরি করল এখানে।

৩. বনওয়ারীর স্বপ্নদর্শন তার অভিজ্ঞতার টাটকা বিবরণ শুনিয়েছেন তারাশঙ্কর। 'সকালে সেই ধর পেত্থম—কাক-কোকিল ডাকতে ঘুম ভেঙেছে। সমস্ত 'অতি' ভাবনায় ঘুম হয় নাই। ভোর 'আতে' চোখ লেগেছেল খানিক—তা তোমার সঙ্গে সঙ্গে স্বপন হয়ে গেল। দেখলাম যেন, ঠিক কত্তা এসে দাঁড়িয়েছেন মাথার 'ছিয়রে' বু-বু করে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম।' (প্রথম পর্ব : দুই পরিচ্ছেদ) ঈশ্বর বা দেবতা কথা বলেন ভক্ত বা মাতব্বরের মুখে। বনওয়ারীর এই কথার সেই অভিজ্ঞতার টানা পোড়েন আশ্চর্য ভঙ্গিতে উপস্থিত। প্রথম বাক্যটিতে ড্যাশ চিহ্নটি আর কাক কোকিলের মধ্যে হাইফেন ছাড়াও 'সকালে' আর 'সেই ধর'-র মধ্যে যে স্বরভঙ্গি আর কথনরীতি তা এই মুদ্রিত অংশকে মৌখিকতার বৈশিষ্ট্য না ব্যাখ্যা করলে চলবে না। অন্য অংশের ব্যাখ্যাও এইভাবেই করা সম্ভব।

৪. কালোশশী 'বনওয়ারীর মদ্যসিক্ত নরম মনকে ব্যাকুল করে তুললে', তার কথা তার যেন 'মিত্যু' হয়। বনওয়ারীর সামনে এই irony of fate-এর মতো কথা কালোশশীর। সে কথা এখানে বলার প্রয়োজন নেই। কেন এমন মৃত্যুকামনা তার? বনওয়ারীর আন্তরিক কৌতূহল মোচন করতে গিয়ে কালোশশী বলল— 'কি হবে বেঁচে? ছেলে নাই? পুলে নাই? সোয়ামী, না কসাই—' [প্রথম পর্ব : পাঁচ পরিচ্ছেদ]

— ডেভিড লজ ঠিকই লিখেছেন—যতি চিহ্ন, মৌখিকতার পক্ষে কখনো কখনো বাধা সৃষ্টি করে। বাক্যগুলির প্রথম তিনটির পরেই জিজ্ঞাসা চিহ্ন না থাকলেই বুঝি ভালো হত। সোয়ামী নয় পরম—পরম কসাই। এরকম বহুমাত্রিকতা মৌখিক ভঙ্গিতে শেষ অসম্পূর্ণ বাক্যাংশটিতে উপস্থিত।

৫. মাইতো ঘোষের মালপত্র পৌঁছে বনওয়ারী চন্দনপুরে একটু ঘুরতে বেরিয়েছে। 'ঘুরল বনওয়ারী। ইষ্টিশানের এলাকায় ঢুকল। লম্বা—এই এখান থেকে সেখান পর্যন্ত চলে গিয়েছে সারি সারি ঘর।' (দ্বিতীয় পর্ব : দুই পরিচ্ছেদ) কত লম্বা তা আন্দাজ করবেন পাঠক, তার সামনে মনের চোখে জেগে উঠবে বনওয়ারী আর তার কথকের দ্বি-বাচনিক কল্পনা (dialogic imagination)-এর জগৎ। মৌখিকতার আশ্রয়ে এই উদ্ভাস সন্দেহ নেই।

৬. চন্দনপুর থেকে ফেরার পথে দেখতে পেল বনওয়ারী পলেনের জমিতে রাখালরা গরু চরাচ্ছে। গাছতলায় তারা কড়ি খেলছে। একটা শেয়াল আলের পাশে মুখ বাড়িয়েছে। বনওয়ারী দেখল ছাগলরা পালালেও ভেড়ারা জমাট বেঁধে দাঁড়িয়েছে। 'চোখ বন্ধ করে'। 'বনওয়ারী হাঁকলে—লিলে-রে—লিলে রে! এই ছোঁড়ারা!' (দ্বিতীয় পর্ব : তিন পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীর শব্দ শুনে সব রাখাল ছুটল '—লে-লে-লে-লে'। বিরক্ত বনওয়ারী ওভাবে এক দিকে ছুটলে ধূর্ত শেয়ালকে ঠেকানো যাবে না। আসল শিকারী শিয়াল আছে অন্য দিকে। 'কুলকর্মের' এসব ধারা করালীর আখড়ায় শেখা অসম্ভব। অন্যদিকে বনওয়ারী তাক করে দাঁড়াতেই 'খ্যাক্' করে শব্দ উঠল—'ওঃ—ওঃ—এখন ছুটছে পণ্ডিত! ধর্—ধর্—ধূর্তকে ধর্! পণ্ডিতকে ধর্!' (ঐ) গোটা বর্ণনাটি মৌখিক পরম্পরাকে ছুঁয়ে আছে। এরকম narrative-এর ভাষাশৈলী শ্লাঘনীয়।

৭. বনওয়ারীর ভাঁজোতলায় বাঁশি বাজাচ্ছিল করালী। বনওয়ারী ক্ষুব্ধ। সুবাসী

করালীর প্রতি কিছুটা যেন আগ্রহী। বনওয়ারীকে নিরস্ত করল তার বন্ধু পাগল।—'খবরদার! তু কত বড় মানুষ মনে আকিস! পিতিপুরুষের বাকিত্য মনে কর্। আজ অঙের দিন—চোখ থাকতে দেখো না, কান থাকতে শুনো না, পরাণ যা চায় অমান্যি করো না। লে লে, বাজা বাঁশি, করালী বাজা বাঁশি।' (পঞ্চম পর্ব : পাঁচ পরিচ্ছেদ) এরকম বহু পরিবেশ তৈরি করেছেন তারাশঙ্কর। পাগলের মুখের কথায় কাহারদের বহুদিনের সংস্কার আর তার টানাপোড়েন লক্ষ করলাম। এখানে দ্বিস্তরতা গভীর ভাবে অনুভববেদ্য, ভাঁজো উৎসব কৃষিলক্ষ্মীর আবাহন। তার অনুষ্ঠান উর্বরতার কৃত্যে পরিণত। অবশ্য তার আদি তাৎপর্য থেকে বনওয়ারীও যেন সামান্য ভ্রষ্ট। এদিনের উদ্দাম মিলন উৎসব—আসলে ভূমিলক্ষ্মীকে যৌন অনুষঙ্গে উত্তেজিত করা। 'গানে গানে গালাগালি'-র আসল উদ্দেশ্যই তো তা। এই দিনে সুবাসী যদি করালীর বাঁশি শুনে আনন্দ প্রকাশ করে কিছু বলার নেই। অথচ বনওয়ারীর মধ্যে যে ব্যক্তি আছে সে তার ঐতিহ্য অনুগত মাতব্বরকে আড়াল করে ক্ষুব্ধ হচ্ছিল, বনওয়ারীকে স্বপথে আনল পাগল। পাগলের মৌখিক পরম্পরা। তারাশঙ্করের ভাষারীতির এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি মনে রাখতেই হবে। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র সার্থকতার অন্যতম দিকচিহ্ন এখানে।

ডব্লু ব্রাইট এবং এ. কে. রামানুজন—একটি যৌথ গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেছিলেন ১৯৬৪ সালে 'আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান কংগ্রেস'-এর কেমব্রিজ অধিবেশনে। এই গবেষণাপত্রটিতে উপভাষা তত্ত্বের সাধারণ রীতিটি এরকম সমালোচনা করে নতুন পথ সন্ধান করেছেন রাইট ও রামানুজন। উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য (phonological) যখন মূল প্রচলিত ভাষা থেকে একটু আলাদা হয়, যখন ব্যাকরণের রীতি নিয়ম (grammatical) খানিকটা বদলে যায় আর যখন আভিধানিক সীমানা (lexical) অতিক্রম করে যায় কোনো ভাষার অন্তর্গত কোনো অঞ্চল—তখন সে অঞ্চলের ভাষাকে বলে উপভাষা। এই উপভাষা-চর্চার প্রধান রীতিটি সাধারণত ভৌগোলিক—ব্রাইট-রামানুজন লিখছেন : 'The geographical dimension is, of course, the main one'. (পেশ্য : ডব্লু, রাইট ও এ. কে. রামানুজন : ''Sociolinguistic Variation and Language Change'' ; প্রবন্ধটি আছে Proceeding of the Ninth International Congress of Linguists, কেমব্রিজ, ১৯৬৪) এই ধারার ভাষাবিজ্ঞানীরা উপভাষা মানচিত্র গড়ার চেষ্টায় মুখ্যত ব্যাপৃত থাকেন; তৈরি করেন dialect atlases. এর পাশাপাশি অন্য কিছু ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে, কারণ কোনো নির্দিষ্ট ভূগোলের সব শ্রেণীর মানুষ একই রকম বুঝি ব্যবহার করে না। তাই তাঁরা লক্ষ করেছেন উপভাষা-বিশেষজ্ঞরা কিছু ক্ষেত্রে আলোচনা করেছেন অনেক কম—এসব দিকে আকর্ষণ কম দেখা গেছে ('have received less attention') অথচ উপভাষা বৈচিত্র্য কেবল অঞ্চলে অঞ্চলে পৃথক নয়। সম্ভাব্য বহু বিষয়ই দেখিয়েছেন ব্রাইট ও রামানুজন। যেমন—

১. শিশু, মোটাসোটা মানুষ, বেঁটে বামন, কুঁজ-যুক্ত মানুষের ক্ষেত্রে ভাষা কিভাবে বদল হয়ে যায় সে ব্যাপারে উপভাষা তত্ত্ব তৈরি করা সম্ভব।
২. পুরুষ আর মহিলাদের ভাষাভঙ্গি কোনো কোনো সময় একেবারেই পৃথক।
৩. ভাষা ব্যবহারকারীর সামাজিক অবস্থান (the speaker's status) কখনো কখনো পৃথকীকরণের ভিত্তি হতে পারে।

৪. লিখিত ভাষার বিধিবদ্ধ রীতি (formal) আর মৌখিক রীতির অবাধ বৈশিষ্ট্য (informal)-কে উপভাষাতত্ত্বের আলোচনার সীমানায় আনতে চেয়েছেন কোনো কোনো গবেষক।

শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য বাংলা ভাষায় আছে। আছে আধুনিক গ্রিক আর আরবিতেও। চলিত রীতি প্রতিষ্ঠার তাত্ত্বিক বিশ্লেষক, চলিত রীতির প্রবক্তা প্রমথ চৌধুরী ইতালীয় ভাষাতেও অনুরূপ বিভাজন দেখেছেন। ১৯৫৯ সালে সি. এ. ফার্গুসেন এই পদ্ধতির মধ্যে উপভাষার একটি সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করার প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে এ হল এক ধরনের উপভাষা-হীনতা (a 'kind of bidialectism')—এর নাম দিয়েছেন তিনি : 'diaglossia'।

একদিকে যেমন চলিত-রীতি আর সাধু-রীতির মারফৎ বাংলা ভাষায় diaglossia -র বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছে তেমনি হিন্দি ভাষার ঠেটবুলি খড়িবোলি প্রভৃতির কথাও হয়তো প্রাসঙ্গিক— ঠিক তার পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষা পরিস্থিতিতে নতুন নতুন উপভাষা-বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাচ্ছেন ভাষাবিজ্ঞানীরা। ব্রাইট আর রামানুজন দেখিয়েছেন—হিন্দু সমাজ জাতিবর্ণপ্রথা ভাষাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সংস্কৃত ভাষা ব্যবহারের অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে একসময়—ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন সাধু-চলিত রীতির অল্পাধিক পচিয় পাওয়া গেলেও 'most published works on South Asian Languages concentrate on high caste dialects or formal style.' (ঐ) অথচ প্রায় সর্বত্র ব্যতিক্রমহীন ভাবে নিচুজাতদের অন্য ভাষারীতি বিদ্যমান। ফলে জাতি-বর্ণের ভিত্তিতেও ভারতীয় ভাষাগুলির বিভাজন সম্ভব—ব্রাইট-রামানুজন দেখেছেন অন্তত দুটি রূপ ('we find sociolinguistic factors organized into at least two contrasting patterns')। প্রান্তিক ছোট ছোট গোষ্ঠীতে যে-সব ভাষা প্রচলিত—সেগুলি মৌখিক, এসবই 'informal or colloquial' আর বলাই বাহুল্য এসবের কোনো লিখিত রূপ নেই। এইভাবে উপভাষা তত্ত্বের অনেক অনালোচিত দিক উন্মোচন করেছেন ব্রাইট ও রামানুজন।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় তারাশঙ্কর নৃতত্ত্বের কোনো বই লিখছেন না—একথা যেমন সত্য তেমনি উপভাষা-গবেষণাও করছেন না। ড. পল্লব সেনগুপ্ত এই ধরনের নৃতাত্ত্বিক-ভাষ্যকে সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব (Literary Anthropology) বলে গণ্য করেছেন। আমাদেরও মনে হয় উপভাষার চরিত্র-লক্ষণ বলে তারাশঙ্কর যে discourse উপহার দিয়েছেন তার মূল চলনটি সাহিত্যিক। কল্পনা ও বাস্তবের মিশেলে তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের দরিদ্র খেতমজুর কাহারদের ভাষা তৈরি হয়েছে। এখানে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষার সত্য মিলবে না। তারাশঙ্কর তা চানও নি। তাঁর চেষ্টা ইঙ্গিতের মাধ্যমে কাহারদের নিম্নবর্গীয় জাতি বা বৃত্তিগত ভাষা পরিস্থিতিকে উপহার দেওয়া। এখানে তাঁকে একটি সুবর্ণ-মধ্যম (golden-mean-এর উপস্থিত বাংলা করলাম) খুঁজে নিতে হয়েছে। যার লক্ষ্য ১. কাহারদের 'informal' বা 'colloquial' ভাষাকে তুলে ধরা। ২. বাংলা ভাষার সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর ভাষ্য দুর্বোধ্য হয়ে না যায় তাও খেয়াল রাখা। এই দুই ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তারাশঙ্কর যা উপহার দিয়েছেন তা বিচ্ছিন্নভাবে ভাষা হিসাবে গণ্য না করে ভাষা পরিস্থিতির ইশারা বলেই গণ্য করা দরকার। পরিচ্ছেদের সূচনায় উল্লেখিত ড. কুমারের প্রবন্ধে সেই ব্যাপারে খুব পরিণত চিন্তার পরিচয় পাইনি।

তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় স্বনির্মিত ভাষা-জগৎটি শেষ পর্যন্ত ফার্গুসেন

কথিত 'diaglossia'-ই থেকে গেছে। কাহারদের ভাষা-জগৎ সবসময় রক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে আমাদের ভাষা-পরিকল্পনা (speech plan) আর ভাষা-আদর্শ (speech will)-এর মারফৎ তৃতীয় একটি মাত্রা (the third category) খুঁজে আনে। ফলে ভাষার প্রচলিত রূপটি ('the habitual forms of expression') শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়। (পশ্য : মিখাইল বাখতিনের 'Speech Genres' সংক্রান্ত তত্ত্বের বিশ্লেষণ। আমরা দেখছি মাইকেল হলকোয়েস্টের *Dialogism Bakhtin and His World* গ্রন্থ; রুটলেজ, লন্ডন; ১৯৯৪; প্রথম সংস্করণ ১৯৯০; 64 পৃ.) আবার অন্যদিক থেকে দেখলে বাখতিন যাকে বলেন ভাষার ' "lowly" nature তাও তারাশঙ্কর অভ্রান্ত ভাবেই দেখাতে থাকেন হাঁসুলীবাঁকে। গার্গান্তুয়া-প্যান্টাগ্রুয়েলের আশ্চর্য কথাশরীরে র‍্যাবেলাইস এইরকম এক ভাষাই প্রয়োগ করেছিলেন। 'The national French Language' নয়, যা ছিল ফ্রান্সের মহৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষ্য ('the language of great literature, science, and ideology') তাকে এড়িয়ে উপন্যাসে র‍্যাবেলাইস আনলেন মুখের ভাষা—'the language of folklore, of the market place, the street, the bazaar or the merchant row–the language of *the cris de Paris*'. (পশ্য : *Rabelais and His World*; উক্ত 182 পৃ.)। ক্রমে এই পথের ভাষাতে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হল। এই নিচুস্তরের ভাষা ("Lowly" language) হয়ে উঠল সাহিত্য সৃষ্টির উপায়। এই যে ভাষা পরিকল্পনা আর ভাষা আদর্শের টানাপোড়েনে তৃতীয় পক্ষ খোঁজা—নিচু শ্রেণীর মুখের ভাষার দিকে ক্রমিক সঞ্চরমানতা এই প্রক্রিয়াই তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র মৌলিক কথনবিশ্বটি নির্মিত হয়েছে। একেই আমরা সুবর্ণ- মধ্যম বলে চিহ্নিত করেছি। এ কোনো অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়—কোনো জনগোষ্ঠীতে সীমিত নয়—এ একটি সাহিত্যিক প্রবণতা।

বইয়ের উৎসর্গপত্রে কবিশেখর কালিদাস রায়কে জানিয়েছিলেন তারাশঙ্কর রাঢ়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' তাঁর জানা। এখানকার 'মাটি, মানুষ' তিনি জানেন—জানেন এই মানুষদের 'অপভ্রংশ ভাষা'। সন্দেহ ছিল 'এই মানুষদের কথা শিক্ষিত সমাজের কাছে কেমন লাগবে' তা নিয়ে। দ্বিতীয় সংস্করণের উৎসর্গপত্র এটি—আষাঢ় ১৩৫৫-র। ততদিনে তারাশঙ্কর এই বইয়ের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্মান পেয়েছেন। অথচ তখনও তাঁর সন্দেহ যায় নি। সম্ভবত তখনও তিনি ঐ সুবর্ণ-মধ্যমটি খুঁজছেন। জানা জগৎ—জানা মানুষের জানা ভাষা তথা বাস্তবকে কতটা বদল করে কাঁটছাট করে উপস্থিত করলে তার বাস্তবতা ক্ষুণ্ণ হবে না, কতটা না বদলালে তা সাধারণ শিক্ষিতের কাছে রসভঙ্গ ঘটাবে না—তাঁর সমস্যা তখনও সেই ভঙ্গিটি আয়ত্ত করার। ফল বহুশব্দে উদ্ধৃতি-চিহ্নের প্রয়োগ ; কখনো সেসবের অর্থ প্রদান।

৫. উর্ধ্বকমাহীন, অর্থব্যাখ্যানসহ শব্দ : সরিঙ্গী (অর্থাৎ কাঠির মতো); আটকেলে (অর্থাৎ সাদার উপরে আটটি কালো দাগ বিশিষ্ট বলদ); হেঁড়ে ব্যাঙ (হাড়ির মতো চেহারা—তাই); খেয়ে নিয়েছি (অর্থাৎ গেল খেলনাদারের হাত); ই-উ-সি (এ-ও-সে); নিস্কেলে (অর্থাৎ ঘোর কৃষ্ণ)।

ভাষা প্রয়োগ ও ব্যাখ্যানের এমন ভাষ্য বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সম্ভবত আর নেই। এ যেন শিক্ষিত ভদ্র বাঙালি পাঠকের কাছে উপস্থিত হবার অন্তরাবেগ; অথবা হয়তো হাঁসুলীবাঁকের হতশ্রী দরিদ্র মানুষগুলিকে বৃহত্তর বঙ্গভূমিতে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ববোধ। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত এই প্রয়াস কতটা সিদ্ধি পেল সে বিচারের আগে তারাশঙ্করের ভাষা শরীরটি নির্মাণের আরও কিছু প্রবণতার দিকে নজর করা দরকার।

৬. কতকগুলি শব্দ সম্ভবত তারাশঙ্কর বানিয়ে দিয়েছেন। যেমন :

'আলবোড়েমি'; 'কোড়ল'; 'নিস্কেলে'; 'ভাকুম কুমো'; 'সকুমেরী'; 'হেঁড়ে'; 'দগুদ্ধে'; 'গিদেরে'; 'আব'; 'কেডামাতন'; 'নিব্যুনদ'; 'বিত্যেব'; 'পিতুল'; 'ল্যাই'; 'সোমকালে'। শব্দগুলির উৎস পরিবেশ। 'আলবোড্ডেমি' বলতে তারাশঙ্কর কি বুঝিয়েছেন? প্রয়োগটা অদ্ভুত।—'মেয়েরা একটুকুন সাজতে গুজতে ভালবাসে, কোপাই নদীর 'আলবোড্ডেনি' তাদের চিরকাল আছে।' [দ্বিতীয় পর্ব : চার পরিচ্ছেদ]

আলবোড্ডেমি বলতে একটু প্রসাধনপ্রিয়তা নিশ্চয়। আলবোট কাটা অর্থাৎ টেরিকাটা। শব্দটি তারাশঙ্করের অবেচেতনে ধরা পড়ে থাকবে।

'কোড়ল'-এর প্রয়োগ—'তোমার বাহন যেন সেদিনের মত কোড়ল পকিয়ে নকলকিয়ে জিভ মেলিয়ে ফুঁসিয়ে না ওঠে।' [পঞ্চম পর্ব : এক পরিচ্ছেদ]

কোড়ল অর্থাৎ কুণ্ডল। কুণ্ডলি পাকিয়ে ওঠা? বিরাট সাপ বলেই হয়তো সম্ভব।

'নিস্কেলে' শব্দটির পিছনে মিশকেলে শব্দের ছায়া থাকা সম্ভব। অর্থ জানিয়েছেন তারাশঙ্কর—ঘন কৃষ্ণবর্ণ।

'দগুদ্ধে' শব্দটি হাঁসুলীবাঁকের বিচিত্র ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফল। দগ্ধে > দগুদ্ধে আসাটা কষ্টকল্পনা। একটু আকস্মিক। তবে অসম্ভব নয়।

'আব' অর্থ-সঙ্কেত তারাশঙ্করের 'গন্ধ'। আব শব্দ প্রাচীন সাহিত্যে আছে। অভ্র > আব। অর্থ আকাশ। আকাশ কাহারদের বদলে যাওয়া 'lexicon'-এ গন্ধ হয়েছে।

'নিব্যুনদ'—শেষ হয়ে যাওয়া তারাশঙ্করের প্রয়োগ—'দু-তিন ঘর 'নিব্যুনদ' হয়ে গেল।' (প্রথম পর্ব : পাঁচ পরিচ্ছেদ)৩ বনিয়াদ থেকে ব্যুনদ আর বুনিয়াদহীন নি-'prefix' যুক্ত করে 'নিব্যুনদ' হয়ে থাকবে।

'ল্যাই' কলহ। কলহ থেকে আদি ব্যঞ্জন লোপ করে এ শব্দ গড়েছেন তারাশঙ্কর।

'সোমকালে' শব্দটির প্রয়োগ হয়েছে নয়ানের সংলাপে। বনওয়ারীকে খুঁজতে এসেছে নয়ান। বনওয়ারী নেই—সকাল সকাল ট্রেন ধরাতে চন্দনপুরে গেছে মাইতো ঘোষের জিনিস নিয়ে। নয়ানের কথা : 'এই 'সোমকালে' গেল কোন ভাগাড়ে? কেউ তো এখনও যায় নাই?' (দ্বিতীয় পর্ব : এক পরিচ্ছেদ) 'সোমকালে' অর্থাৎ সকাল বেলা—'সময় কালে'? হতে পারে।

অন্য শব্দগুলি—'ভাকুমকুমো' কি ভরন্ত কুম্ভ ? 'সুকুমেরী', 'হেঁড়ে', 'গিদেরে', 'কেডামাতন', 'পিতুল'-এর উৎস নির্ণয় করতে পারছি না। পত্রিকা পাঠে পিতুল-এর অর্থ দেওয়া আছে—প্রতুল। অর্থটি অস্পষ্ট।

উৎস যাইহোক এসব শব্দের মাধ্যমে তারাশঙ্কর কাহার সমাজের জীবন-পরিধিটিকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে উপহার দিয়েছেন। এই সক্ষমতার তুলনা বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। শব্দগুলির ক্ষেত্রে উপন্যাস যেমন অগ্রসর হয়েছে, অর্থ ব্যাখ্যান, বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপব উর্ধ্বকমার প্রয়োগ তারাশঙ্কর কমিয়ে এনেছেন। বাংলা সাহিত্যের পাঠকরা ততদিনে তাঁর সন্দেহ মুক্ত করেছে বলে মনে হয়। অন্য একটি সম্ভাব্য কারণ, তারাশঙ্কর পাঠককে ইতিমধ্যেই শব্দগুলি সম্পর্কে জানিয়েছেন।

কাহিনীর প্রথম দিকে অস্পষ্ট, অভিধান-বহির্ভূত শব্দ ব্যবহারের সময় তারাশঙ্কর তাঁর পাঠকদের কথা মনে রেখেছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে উর্ধ্ব কমা ব্যাবহার করেছেন—সঙ্গে অর্থ জানাতে ভোলেন নি। কিছু উদাহরণ আনছি :

১. শুধু উর্ধ্বকমা যুক্ত শব্দ : 'পেলয়' বান, 'আলোকীন্নী', 'পিতিবিধান', 'রপমান',

'রবহেলা', 'আতে', 'অক্ত', 'আশ্চয়ে', 'পভু', 'সাসাজ', 'পিতুল', 'ধ্রোব', 'তিভুবন', 'ছিয়রে', 'রোপদ্দরব', 'এখো', 'অমরেতো', 'কত্তার কোধ', 'তাক' (বাটির), 'লালবন্ন', 'বল', 'কেডামাতন', 'স্ন্যাহ', 'আগ', 'আষিড়ে' কিনল, 'আল বোড্ডেমি', 'রঙ্গে-র কাপড়, 'পবন পেতাপ' (সম্ভবত 'পবল পেতাপ'), 'পেধান', 'বেক্কম', 'গেরামনাশ', 'গেরাস', 'অনিবাষ্য', 'গতর', 'তিনপর', 'চুটা', 'ছাড়বিড়', 'দুস্কু, টরচ', 'পুত্তু' সন্তান, 'রোপকার', 'তিপুশুক', 'কোষ', 'আশ্চয়', 'বিচিত্ত', 'হাতীনামা', 'রনুমতি', 'কেরাচিনি', 'কন্টোল', 'কুনিয়াল পিল'।

২. **ধ্বনিতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা ও ঊর্ধ্বকমা-যুক্ত শব্দ** : রঙ নয়—বলে 'অঙ'; রামকে বলে 'আম'; রজনীকে বলে 'অজুনী'; রীতিকরণকে বলে 'ইতকরণ, রাং বিরেতকে বলে 'আত বিরেত' ; (সূত্র—'শব্দের প্রথমে র থাকলে সেখানে ওরা র-কে অ ক'রে দেয়'); 'বিত্যেব' দেখ বুড়ীর ('অর্থাৎ ভয়ে চেঁচানি দেখ বুড়ীর'); 'লালবন্ন' ('সোনার পয়সার মতো চকচকে'); ঝুঁজকি ডাকতে ('অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই'); 'ডাহ' ('অর্থাৎ দাহ করে'); 'টোকা' (অর্থাৎ চুপড়ি); 'আব' ('অথবা গন্ধ'); 'আলুমিনি' ('অ্যামোনিয়া'); 'এনামিলি' ('অ্যালুমিনিয়াম'); 'পলেনের' ('অর্থাৎ পলিপড়া মাঠে'); 'পাঁজের' ('পায়ের'); 'থইলা' ('অর্থাৎ তোয়ালে'); 'ডাউরী' (অর্থাৎ বাদল-লাগা পূর্ণিমা); 'দপদপিয়ে' (অর্থাৎ দগদগ করে); 'পেত্যা' (অর্থাৎ আলেয়া); 'গাদ' (অর্থাৎ ময়লা); 'ছচল বচল' (অর্থাৎ স্বচ্ছল); 'পাঁজের' (অর্থাৎ পদচিহ্নের); 'গ্যাজেটে' (অর্থাৎ খবরের কাগজে); 'আরুণ্যের' (অর্থাৎ অরণ্যের মতো); 'ডেলুই' (অর্থাৎ প্রদীপ); 'রনুমতি' (অর্থাৎ অনুমতি); 'চিলোকে' (অর্থাৎ স্ত্রীলোকের); 'পিতের' (অর্থাৎ পিতার); 'ললপাচ্ছে' (অর্থাৎ চমকাচ্ছে); 'বাত' (অর্থাৎ সময়); 'হরে' খেয়েছে (অর্থাৎ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে); 'আচোটা মাটিকে' (অর্থাৎ ভূমিকে); 'তেপেখে' (অর্থাৎ তিন পক্ষীয়); 'রসম্ভব' (অর্থাৎ অসম্ভব); 'রামদানি' (অর্থাৎ আমদানি'); 'তাই' (অর্থাৎ তাপ); 'লাওর' (অর্থাৎ বাষ্প); 'ছেদ্দায়' (অর্থাৎ শ্রদ্ধায়); 'বেরতোর' (অর্থাৎ ব্রতের); 'ভাকুম-কুমো' (অর্থাৎ মোটাসোটা); 'ভিকনেস' (অর্থাৎ ব্যঙ্গভরে মানুষকে নকল করা); 'সেজ্জন' (অর্থাৎ সৃজন); 'পাটাগানে' (অর্থাৎ পাট-অঙ্গনে); 'উতুরী' (অর্থাৎ উত্তরীয়); 'দোলা' (অর্থাৎ চতুর্দল); বাহন-'হত্যে'র (অর্থাৎ সেই অজগরটি পুড়িয়ে মারার); 'কেরাচিনি' (অর্থাৎ কেরসিন); 'লম্প' (অর্থাৎ ডিবে); 'টুই'-য়ে (অর্থাৎ মাথায়); 'বন্ন' (অর্থাৎ বর্ণ); 'আমলে' (অর্থাৎ ম্লান); 'টেকরের' (অর্থাৎ চড়াইয়ের); 'ললপে' (অর্থাৎ চমকে); 'হেঁড়ে' (অর্থাৎ বায়ুকোণে); 'দালাই' (অর্থাৎ চাদর); 'কাড়ছে' (অর্থাৎ বার করছে); 'নিশ্চিন্দি' (অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে); 'টিটে' (অর্থাৎ টিট্টিভ পাখি); 'বেজুত' (অর্থাৎ অসুস্থতা); 'নিকালো' (অর্থাৎ বেরিয়ে যাও); 'বার জালা' (অর্থাৎ জানলা); 'স্তেঁহ' (অর্থাৎ স্নেহ); 'এলেম' (অর্থাৎ কৃতিত্ব); 'ঘোর' (অর্থাৎ নেশা); 'বেক্কমশালী' (অর্থাৎ বিক্রমশীল); 'শেতল' (ঠান্ডা); 'গতরের' (অর্থাৎ পরিশ্রমের ক্ষমতার); 'খুঙি' (অর্থাৎ আবরণ); 'পোতায়' (অর্থাৎ ভিত পর্যন্ত); 'পাট আঙনে' (অর্থাৎ পাটাঙ্গনের); 'ল' (অর্থাৎ 'ন', 'ন' কে ওরা 'ল' হিসাবে উচ্চারণ করে, 'ন' অর্থাৎ নতুন); 'গজ্জা' (অর্থাৎ একদানের হার); 'দানো' (অর্থাৎ দানব); 'বিক্যমে' (অর্থাৎ বিক্রমে ; 'আইছেন লাগছে' (অর্থাৎ এসেছে মনে হচ্ছে ;

'নেকনে' (অর্থাৎ লিখনে); 'ফটোক্' (অর্থাৎ ফোটো); 'বরশ্যাষে' (অর্থাৎ অবশেষে); 'চৌরস' (অথাৎ সমান ; 'দেখনশারি' (অর্থাৎ দেখতে সুন্দর); 'নিয়ৎ' (অর্থাৎ নিয়তি); 'টাটোয়ার' (অর্থাৎ চতুর বুদ্ধিমান); 'লাগে লরে' (অর্থাৎ নাগে-নরে); 'জলাম্পয়' (অর্থাৎ জলময়); 'বাবাওড়' (অর্থাৎ ভূত); 'মাঝলা' (অর্থাৎ মাঝারি); 'চাকি' (অর্থাৎ অস্তোম্মুখ সূর্য; কাঁড় (অর্থাৎ রামধনু); 'ল্যাই' (অর্থাৎ কলহ); 'ভোমণ্ডলে' (অর্থাৎ ভূমণ্ডলে); 'চরণ' (অর্থাৎ [ঠ্যাং] বৃত্তি); 'ম্যান' (লালমুখো সাহেব); 'আঙনেতে' (অর্থাৎ আঙিনায়); 'যোবতী' (অর্থাৎ যুবতী); 'পাঁচ আঁকুড়ি' (অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুর); 'ম্যাতা' (অর্থাৎ পচুই ছাঁকা পচা ভাত); 'থম্ব' (অর্থাৎ অসাড়); 'লালি' (অর্থাৎ লালচে আভা); 'ফুলিয়েছে' (অর্থাৎ ফুল ফুটেছে) ; 'গোনে গোনে' (অর্থাৎ পথে পথে); 'সান কেড়ে' (অর্থাৎ ঘোমটা দিয়ে); আচাল (অর্থাৎ একপশলা বেশ জোর; 'চিত্তবিচিত্ত' (অর্থাৎ চিত্রবিচিত্র); 'আউলি-বাউলি' (অর্থাৎ এলোমেলো); 'দয়' বাবাঠাকুর (অর্থাৎ দোহাই বাবাঠাকুর!); 'রবিপ্রায়টি' (অর্থাৎ অভিপ্রায়টি)।

৩. ঊর্ধ্ব কমাহীন, অর্থ বলারও প্রয়োজন নেই এমন শব্দ : ব্যন্নন; পেকাণ্ড; বেবরণ, পেচউ পোহার, রজগর, পিতিবিধেন, ওজগারের, পেসব, বেহেট-বেতরিবৎ, পিতিক্যার, নোক, মোচল চাষবাবু, সতর, টায়েম, নিম্মলা, গেরাহ্যি, মাজ্জনা, জ্যাল, টুকচে, তেরপল, আজা, রুজী, ছামনেই, বাকুড়ি, বৈমুখ, ওদ, তুলকামাল, উতরী, খ্যানত, ট্যান, অস, ছুতপতিত, ফিচলে, রনুমতি, ফেরত গোষ্ঠ, পারা, পিতুল, চিকুরছে, থম ধরেছে, হাঁকড়ে, পস্তা উড়িয়ে, পম্বা নাড়িয়ে, আখবা, আতবিরেত, জেসলাই, পিতিবিধান, সেকেটারি, কাড, পেরমায়, আত্রিরে, কেমে কেমে, সনজেতে, আতাআতিই, 'সোর', সনজে, উপো; ওদর, পেরমাই, স্থপুইমান।

৪. ঊর্ধ্বকমা দিয়ে বৈশিষ্ট্য বোঝানোর চেষ্টা যেসব শব্দে : 'চন্দ্রশশী'; 'হলুদমণি' পাখী; 'সওয়ারী'; 'গোপ্তা' যোগাযোগ; 'জেবন'; 'নক্ষী'; 'ওদরের'; 'মিতু'; 'শোগে'; 'মনস্তরা'; 'বকশিশ'; 'ওগ'; 'নিব্যুনদ'; 'হুকহুকুক'; 'আতে'; 'ওষ'; 'চুলবুল', 'সতর'; 'অজ্ঞাত' জাত; 'কালারুদ্দু'; 'গিহিণী'; 'ত্যাজ'; 'তাত'; 'আভা'; তারাশঙ্করকে 'তরাস'; 'অন্যায়'; 'আজা'; 'আজ্য'; 'নিশ্চয়'; 'পরিজনকে'; 'অতনা'; 'জাতন'; 'পাট'; 'আজী'; 'ঘরভাঙা'; 'নিশ্চয়'; 'বগ'; 'সুটক্যাস'; 'বেছনা'; 'নাইন'; 'পাট কাম'; 'বেথা'; 'হেনগেল'; 'ছেষ্ট'; 'দব্য'; 'ডাঁটো মরদ'; 'চারচৌকস'; 'আজ লক্ষ্মী'; 'থান'; 'দুভ্যাগা মেয়ে'; 'অ্যাল'; 'ওজকার'; 'পেতাপ'; 'আসকারা'; 'দুঁপছে'; 'শাল'; 'ব্যাতন'; 'খানিক আদেক'; 'বাজেহাল'; 'প্যাটের'; 'ত্যাল'; 'রসির'; 'পেহার'; 'বন্ন'; 'পেকাণ্ড'; 'পবীণ'; 'হিয়ের'; 'সনসনে'; 'আত্তিকালে'; 'রিন্দভোবন' (সম্ভবত 'বিন্দ ভোবন'); 'লবাবী'; 'ঘোড়াগোত্ত'; 'আণ্ডোরা'; 'বেলাতী বাজনা'; 'গড়ের বাদ্যি'; 'নেপাট'; 'বারজালা'; 'অক্ত সনজে'; 'সামিগ্যি'; 'সুকুমোরী'; 'ফুস-ধা'; 'ভুলো'; 'নিশি'; 'হিতবুদ্ধি'; 'এতে'; 'উদোমাদা'; 'তার'; 'মরণশয্যের'; 'পিঁড়ি'; ' গৈরব'; 'রামোদ-রাম্নাদ'; 'অঙচঙে'; 'দব্য পস্তুত'; 'নিকে'; 'বেলাক মারকিটি'; 'ঝিকিমিকি বেলা'; 'অ্যাল-লাইন'; 'আচোট'; 'চৌকস'; 'পুত্তু'; 'ওজগার'; 'হারমণি'; 'রেকর্ডের গান; 'গেরাম'; 'নিউনাইন-বোর্ড'; 'মালোয়ারী'; 'কুনিয়ন'; 'কুনিয়ান'; বেথা'; 'দ্যাশ ঘাট'; 'থোড়'; 'নেকা'; 'হাঁটন'; 'অঙের খেলা'।

আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে আসে তারাশঙ্করের আঞ্চলিক-নিম্নবর্ণীয় ভাষা নির্মাণের উপাদানগুলিকে পরীক্ষা করলে। দেখতে পাই, প্রথম দিকে হাঁসুলীবাঁকের পটভূমিকে স্পষ্ট করার জন্য শব্দের দুর্বোধ্যতা দূর করার প্রয়াস পেয়েছেন তারাশঙ্কর। প্রকাশের আকাঙক্ষা সেখানে প্রধান। যত কাহিনী এগিয়েছে শব্দের রূপ গেছে বদলে। মনে হয় বাইরের পটভূমির অভিঘাত যেন কাজ করে গেছে। একটু উদাহরণ আনছি।

হাঁসুলী বাঁকের নিজস্ব পরিচয়বাহী শব্দ	বাইরের মানুষের সাংস্কৃতিক অভিঘাত
আলোকীন্নী, পিতুল, অণ্ড, বিত্যেব, টোকা, তেপেখে, দোলা, টুই, হেঁড়ে, তাই, বারজালা, কাঁড়, বাবাওড়, চরণ, ম্যাতা, সানকেড়ে, আচাল, গজা, ছচল-বচল আউলি-বাউলি।	কেডামাতন, চুটা, টরচ, কেরাচিনি, কন্টোল, কুনিয়ান পিল, থইলা; আলুমিনি, এনামিলি, টায়েম, গ্যাজেট, জেসলাই, ম্যান, ফটোক্, তেরপল।

বাইরের সংস্কৃতি, শুধু নাগরিক নয়। কাহারদের উপর এসেছে চিরাচরিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণের প্রভাব। আর এসেছে ফারসি-ভাষা প্রবাহিত জমিদারি ব্যবস্থার অভিঘাতও।

ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতিক উপকরণ	জমিদারি-ব্যবস্থার উপকরণ
তিপুণ্ডক; নক্ষী; উতুরী; পাঁচআঁকুড়ি; ছুতপতিত	সওয়ারী; বকশিশ; হুকুহুকুক; এলেম; রুজী; তুলকামাল

বস্তুত জমিদার পরিবারের কুলীন ব্রাহ্মণ তারাশঙ্করের সংস্কার এই ভাষ্য রচনা করেছে। বিনয় ঘোষ একটি প্রবন্ধে তারাশঙ্কর সম্পর্কে একটি সংবাদ দিয়েছেন—'পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর থেকে তারাশঙ্করের প্রপিতামহ আসেন আনুমানিক ১২২৭ সালে, ইংরেজী ১৮১৯-২০ সনে। লাভপুরে তাদের ছ পুরুষের বাস' ("তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ" : বিনয় ঘোষ; 'শনিবারের চিঠি', আষাঢ় ১৩৭১)। মোটকথা সমাজের প্রাতিষ্ঠানিকতার দুটি প্রতীকি স্তর—ধর্মজীবন আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার কাছ থেকে ঐ শব্দগুলি কাহার সমাজে এসেছে বলেই মনে করি। প্রসঙ্গত আর একটি কথা লিখব। উক্ত ছকের প্রথম বর্গে হাঁসুলীবাঁকের পরিচয়বাহী শব্দগুলির মধ্যে হাঁসুলীবাঁকের মানুষজনকে স্পর্শ করার চেষ্টা স্পষ্ট হয়। এই মানুষরা কৃষি সংস্কৃতির বাস্তবে তাদের সংস্কার ও ভাবাদর্শ নিয়ে কেমন করে বেঁচে আছে—শব্দগুলি তার চিত্র অঙ্কন করতে চেয়েছে। এর পাশাপাশি চন্দনপুর থেকে ভেসে আসা সাংস্কৃতিক উপকরণ (cultural goods)-এর দ্বারা এই সংস্কৃতির আবদ্ধ পরিবেশটি কেমন চঞ্চল হল—হাঁসুলীবাঁকের মূল কথাই তো সেই চাঞ্চল্য ও তার পরিণতি দেখানো। সুতরাং প্রথম বর্গের শব্দগুলি তারাশঙ্করের মারফৎ পাঠকের মানস অভিসার আর দ্বিতীয় বর্গের শব্দগুলিতে নতুন নতুন সংকটের সঙ্গে একটি অপ্রস্তুত জনগোষ্ঠীর অনিবার্য পরিণতির ভয়াবহ ভবিষ্যৎ যাত্রার পরিচয় লুকিয়ে আছে বলে মনে করি। দ্বিতীয় ছকের শব্দগুলির এই রকম গভীর তাৎপর্য আছে কিনা স্থির করা যাচ্ছে না। জাত-নীতি মেনে নেওয়া জনগোষ্ঠী—ক্রমান্বয়ে হিন্দুত্বের দিকে অভিসরিত হচ্ছে। তার ইঙ্গিত এই দ্বিতীয় ছকের প্রথম বর্গের শব্দগুলির মধ্যে ধরা রয়েছে।

ভাষায় প্রবচন প্রাণ সঞ্চার করে। প্রবাদ-প্রবচন। চলিত কথা যখন জনপ্রিয় হয় তখন তা প্রবাদ। প্রবাদ যখন উচ্চ জ্ঞানের প্রকাশ ঘটায় স্মরণীয় হয়ে পড়ে তখন তা প্রবচন। বাগধারা বা idiom বাক্যাংশ; প্রবাদ প্রবচন তথা proverb পূর্ণবাক্য। কখনো একাধিক বাক্য। ছড়ার মতো সংক্ষিপ্ত ছন্দ-স্পন্দিত কখনো। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়* অনেক প্রবাদ-প্রবচন। অধিকাংশই হাঁসুলীবাঁকের সাধারণ মানুষের জীনজীবনকে স্পর্শ করে এসব আবর্তিত হয়েছে, কখনো অবশ্য অন্য মানুষের ধারাবাহিক ভাষিক সংস্কারের সঙ্গেও তারাশঙ্করের এই উপন্যাস ভাষ্য অল্প বিস্তর বিনিময় করেছে।

হাঁসুলীবাঁকের কথা-অংশ কখনো চরিত্রের অনুগত কখনো বর্ণনা বা ব্যাখ্যানের অন্তর্গত হয়ে প্রবাদ-প্রবচন প্রযুক্ত হয়েছে। সেসবের মধ্যে হাঁসুলীবাঁকের তাৎপর্য—আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আর আনুষঙ্গিক কেমন দেখা গেছে, নিচের উদাহরণগুলির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে :

১. কথকের বর্ণনার অন্তর্গত প্রবাদ-প্রবচন :

১.১ বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেতো (চৌধুরীদের সময়)। ১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ ;

১.২ হাড়ির ললাট ডোমের দুগগতি (মনন্তরার পর ভূমির অধিকার হারাবার পর কাহারদের অবস্থা বোঝাতে)। ১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

১.৩ কাকের মাংস কাক খায় না (কাহারদের পাড়ায় চোর আসেনা, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ ;

১.৪ 'শাক ঢাকা মাছ' (কাহার কন্যাদের বিবাহের পর, তাদের নানাভাবে এমন কি অনৈতিক উপায়ে অর্থ উপার্জন প্রসঙ্গে)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

১.৫ ফাগুনের জল আগুন (ফালগুনে বৃষ্টি অবাঞ্ছিত, আমের মুকুল নষ্ট হয়ে যায়; 'ঝাঁই' লাগে)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

১.৬ আম দেখে ধান (আম না হলে ধান হবে না)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

১.৭ রাজার পাপে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের শাপে 'গেরাম নাশ', কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার, পিতের অর্থাৎ পিতার পাপে 'পুত্তে'র দণ্ড।' (বনওয়ারীর বিষয়ে—করালীর অন্যায়, কিন্তু তাকে শাসন না করার দায়িত্ব এড়াতে পারে না সে)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

১.৮ কুঁদোর মুখে বাঁকা কাঠ সোজা, নেয়াইয়ের উপর হাতুড়ির নিচে লোহা জব্দ, গাঁইতির মুখে মাটি-পাথর জব্দ। (কৃষিকর্মের আয়াসসাধ্য কাজ করার সময় কার বর্ণনা)। ২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ ;

১.৯ সাপের লেখা বাঘের দেখা। (প্রকৃতির রোষ নেমে এসেছে—কাহার পাড়ায় এই ভাবনা যখন আশঙ্কার জন্ম দিয়েছে। সাপের ভয় বাড়ছে। সর্বাতিশায়ী সর্প ভীতির অনুষঙ্গে বলা)। ৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ;

১.১০ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত (চন্দনপুরের বাবুরা ট্যাঁড়া পিটিয়ে জানায় সাহেব-ডাঙার জমি যারা বিনা সেলামিতে নিয়েছে, তাদের দিতে হবে ধানের ভাগ—খাজনা দিলে চলবেনা বনওয়ারী তাদের মধ্যে একজন রায়ত। ৫ম পর্ব, পাঁচ পচিচ্ছেদ ;

১.১১ কে করলে ব্রহ্মহত্যে কার প্রায় যায়! (গোপালীবালার মৃত্যুর আগে কথকের ভাবনা) ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ।

কথকের দৃষ্টি নিম্নবর্গের কাহারদের সম্পর্ক খুব উচ্চ নয়; কাহারদের নীতিবোধ বিষয়ে একমাত্রিক দৃষ্টি তার নয়—তবু তাদের অপরাধ-প্রবণতা, নারীদের চরিত্রহীনতা বিষয়ে ভাবনা থেকে দৃষ্টিভঙ্গিটি বোঝা যায়। তারা চোর সুতরাং তাদের চুরির ভয় নেই—এই তথ্য যখন তাদের বাড়িতে চুরি করার বিশেষ কিইবা আছে—তারাশঙ্কর এই দ্বৈত ব্যাখ্যানটি স্পষ্ট করেছেন ১.৩ প্রবচনটিতে। কাহার কন্যাদের চরিত্রভ্রষ্টতা 'শাক ঢাকা মাছে' উপস্থাপিত, সামান্য পরে অবশ্য উচ্চবর্ণের পাপ প্রভৃতির কথা লিখেছেন তারাশঙ্কর। এখানেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির আড়ালে নীতিবাগীশ মানুষটির মুখ উঁকি দেয়। কৃষি অর্থনীতির ভিত্তি সামন্ততন্ত্রের নিম্নতম কোঠায় বসবাসকারী কাহারদের মানসিকতা স্পষ্ট হয় ১.৫, ১.৬ প্রবচন দুটি থেকে—দ্বিতীয় (১.৬) প্রবচনটি খনার বচন হিসাবে প্রসিদ্ধ। সামান্য অন্যরূপে। একদিকে প্রকৃতির সঙ্গে নিশ্ছিদ্র সংগ্রাম, অন্যদিকে অনিশ্চয়তার চূড়ান্ত, আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা—হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজের এই বাস্তব স্পষ্ট হয় ১.৮, ১.৯, ১.১০ আর ১.১১ সংখ্যক উদাহরণে। যে বদ্ধ-সমাজের শাসন ও নির্দিষ্ট কাঠামোতে বাস করে কাহাররা—১৭ নং উদাহরণে সেই নির্দিষ্টতার নৈতিক সংগঠন (moral structure)-টি ধরা পড়েছে।

২. চরিত্রের ভাবনার অনুষঙ্গে কথক যেসব প্রবাদ প্রবচন উল্লেখ করেছেন :

২.১ প্রজার পাপ জমিদার-রাজাকে অর্সায়। (করালী-সম্পর্কে বনওয়ারীর ভাবনা) ১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ;

২.২ লরে-লাগে অর্থাৎ নরে নাগে বাস করতে নাই (সাপদের সম্পর্কে ভাবনা, কতকটা যেন সাপদের উদ্দেশ্য করে বলা)। ১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

২.৩ একের পাপে দশ নষ্ট (হবে)। (বনওয়ারীর ভাবনা)। ১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

২.৪ এ দুনিয়া আজব কারখানা (বাউল ফকিরদের ভাবনা)। ১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

২.৫ ঢাকে ঢোলে বিয়ে তাতে কাশতে মানা (হেদো মণ্ডলের গোপন কথা চলে চন্দনপুরের বাবুদের নিযুক্ত 'চাষাবাবু'দের সঙ্গে। বনওয়ারী মনে মনে ভাবছে)। ২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ;

২.৬ যে প্যাটে ছেলে ধরে সে প্যাট কি অল্পে ভরে? (সায়েবডাঙার জমি তৈরি করার সময় মাথায় চোট লেগে রক্তপাত হবার সময় বনওয়ারীর ভাবনা)। ২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ;

২.৭ আজার মায়ের সাজার কথা। (নয়ানের দ্বিতীয় বিয়ে যদি হয় আর অসুস্থ নয়ান যদি মারা যায় কি করবে সেই বউ?— এই প্রসঙ্গে বনওয়ারীর ভাবনা) ২য় পর্ব; সাত পরিচ্ছেদ;

২.৮ কর্তার ইচ্ছেতে কর্ম, কালরুদ্রের হুকুমে মরণ বাঁচন। (কালরুদ্রকে সর্বস্ব সমর্পণ করার মানসিকতা নিয়ে বনওয়ারীর ভাবনা)। ২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ;

২.৯ যাকে দশে করে ছি, তার জীবনে কাজ কি? (বনওয়ারীর ভাবনা)। ২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ;

২.১০ ধর্মপথে অধিক রাতে ভাত (বনওয়ারীর ভাবনা) ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ; (এই প্রবচনটি আবার এসেছে)। ধর্মপথে থাকলে আদেক এতে ভাত (বনওয়ারীর ভাবনা)। ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

২.১১ গোদা লড়ি ছাঁদন দড়ি যখন যার কাছে থাকে তখন তারই (সুচাঁদ সম্পর্কে বনওয়ারীর ভাবনা)। ৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

২.১২ ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাত, নিম না ছাড়েন আপন জাত! (বনওয়ারীর ভাবনা, করালী সম্পর্কে)। ৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ;

২.১৩ মি নইলে মাড়ন হয় না, পাঁচন নইলে গরু হাটে না, সওয়ার নইলে ঘোড়া ছোটে না (বনওয়ারীর ভাবনা)। ৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

২.১৪ ধরাকে সে সরা দেখছে (করালীর ঔদ্ধত্য সম্পর্কে বনওয়ারীর ভাবনা)। ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ ;

২.১৫ অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে (করালীর ঔদ্ধত্য সম্পর্কে বনওয়ারীর ভাবনা)। ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

২.১৬ পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে (করালীর কোঠাঘর সম্পর্কে বনওয়ারীর ভাবনা)। ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

২.১৭ যেমন বিয়ে তেমনি বাজনা (গোপালীবালার মৃত্যুর পর যুদ্ধের বাজারে বনওয়ারী তাকে নতুন কাপড় দিতে পারল না—তীব্র হতাশায় বনওয়ারীর ভাবনা)। ৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ ;

২.১৮ হাকিম ফেরে তবু হুকুম রদ হয় না (চন্দনপুরের বাবুরা ঢেঁড়া পিটিয়ে—সেলামি ছাড়া যারা জমি নিয়েছে সায়েবডাঙায় তাদের কাছে ফসলের ভাগ নেবেন তারা। বনওয়ারী এ ব্যাপারে ভীষণ চিন্তায় পড়ে চন্দনপুর যাত্রার উদ্যোগ নিয়েছে—সে সময় তার ভাবনা)। ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

২.১৯ সৎসঙ্গে কাশীবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ (বনওয়ারীর ভাবনা)। ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

২.২০ যেমন কলি তেমনি চলি (গোপালীবালাকে নতুন কাপড় না দিতে পারার যন্ত্রণায়, বনওয়ারীর ভাবনা)। ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ।

ভাবনার স্তরে বনওয়ারীর সঙ্গে উপন্যাসের কথকের গভীর কোনো সম্পর্কের প্রমাণ উক্ত প্রবচনগুলির মধ্যে উপস্থিত। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* আসলে বনওয়ারী-কেন্দ্রিক উপন্যাস। তাকে প্রধান চরিত্র বা protagonist হিসাবেই এঁকেছেন তারাশঙ্কর। ফলে উপন্যাসে তার প্রতি আলো পড়েছে বেশি। কথকের ভাবনার সঙ্গে বনওয়ারীর ভাবনার বিনিময় এই উদাহরণগুলিতে স্পষ্ট।

বনওয়ারী শুধু মাতব্বর নয়। হাঁসুলীবাঁকের মানুষগুলির culture-hero বলেই তাকে গণ্য করতে হয়। তবে তার মূল চেহারাটি রক্ষণশীল। যে সংস্কৃতি গ্রামীণ—যার ভিত্তি কৃষি অর্থনীতি তা তো রক্ষণশীল হতে বাধ্য। বনওয়ারীর প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি দুর্বলতাকে নেহাৎ পশ্চাদগতি বলে ভাবা যায় না। প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা—রক্ষা করার দায়িত্ব তার উপর পড়েছে এমন সময় যখন প্রতিষ্ঠানটি তীব্র সংকটের মুখে পড়েছে। করালীর ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ছাড়াও চন্দনপুর কারখানার প্রবল অভিঘাত, রেললাইন, বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে সুতীব্র অনিশ্চয়তা কাহারপাড়ায় এসে পড়ল—বনওয়ারী তার বিরুদ্ধে লড়তে পারল না। তবু তার নিজস্ব নৈতিক সিদ্ধান্ত, দায়িত্ববোধ আর চেষ্টার মূল্য ছোট হয়না। ২.১, ২.৩, ২.৯, ২.১২, ২.১৪, ২.১৫, ২.১৬—প্রভৃতি উদাহরণে তার প্রমাণ বিধৃত। যে প্রকৃতির সঙ্গে তাকে লড়তে হচ্ছে—সেই আদিম প্রতিবেশ জড়িয়ে আছে ২.২, ২.৬—এই দুটি

উদাহরণে। সামন্ততন্ত্রের কাঠামোটি ক্রমিক অবদমনের—নিম্নতম স্তরের উপর অবদমন সব থেকে বেশি। এই graded degraded সমাজব্যবস্থার মধ্যে বনওয়ারী যেভাবে নিজের সত্তা সম্মানের সঙ্গে স্বতন্ত্র রাখতে পেরেছে তার প্রমাণ ২.৫, ২.১৮ সংখ্যক উদাহরণ দুটিতে মিলবে। সামন্তপ্রভুদের সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আত্মমর্যাদা রক্ষার দ্বৈত এই প্রবাদ-প্রবচনের ভাষ্যে ধরা পড়ে।

সমাজের যে অংশের সে নেতা সেই অংশের মধ্যে নারীর সম্মান ক্ষীয়মাণ। যদিও তারা কতকটা স্বেচ্ছাবিহারী। এ-পরিস্থিতি মহাকাব্যে আদিম সামাজিক দ্বন্দ্বের পর্যায়ে মেলে। নারীর বহুবিবাহ আর পুরুষের বহুবিবাহ মহাকাব্যগুলিতে যেভাবে দুটি কালিক দিগন্তকে স্পর্শ করে তার কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। বনওয়ারীর শাসিত সমাজে নারীর অধিকারের সম্ভাবনা আর অধঃপতনের ইঙ্গিত ধরা পড়েছে ২.৭, ২.১১—এই দুটি উদাহরণে।

বনওয়ারীর ধর্মীয় আদর্শ, সামাজিক প্রত্যয় আর কর্তাবাবার সর্বাতিশায়ী অধিকার—বনওয়ারীর প্রশ্নহীন আনুগত্য ধরা পড়েছে ২.৪, ২.৬, ২.৮, ২.১০-এর মধ্যে। বনওয়ারী এই আদর্শ, প্রত্যয় আর আনুগত্যে যে শক্তি অর্জন করেছে তাকেই করালীর বিপক্ষে (কখনো 'স্নেহ' করার মাধ্যমে স্বপক্ষে আনার প্রয়োগে) ব্যবহার করেছে। তবু তার সংকট গভীর হয়েছে। তার প্রমাণ মিলছে ২.১৭ আর ২.২০ প্রবচনের ধর্মীয় ভাবনার মধ্যে। এখানে বনওয়ারীর প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীমন্ত গোপালীবালাকে নতুন কাপড় ছাড়া শেষ বিদায় দিতে বাধ্য হবার বিষয়টি ধরা পড়েছে। উপন্যাসের প্রতীক ভাবনায় এর ভূমিকা বিবেচনার যোগ্য।

৩. পরম্পরার চিহ্ন হিসাবে প্রযুক্ত প্রবাদ প্রবচন :

৩.১ বেগুনে কেন খাড়া? না বংশাবলীর ধারা। (সুচাঁদ করালীর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বলছে)। ১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ;

৩.২ মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী, কখনও মশা। (ঘরভাঙাদের সম্পর্কে সুচাঁদের কথা)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ ;

৩.৩ সব শেয়ালের এক রা। (হেদো মণ্ডলকে সুচাঁদ বলছে—সদ্‌গোপরা বাবু হয়েছে—চাষ করছে না এ নিয়ে কথা প্রসঙ্গে)। ২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ;

৩.৪ সে আমও নাই, সে অযুধ্যেও নাই (কাহারদের কৃষিকর্মে প্রবেশের আগেকার বীর-যুগ সম্পর্কে খেদসহ সুচাঁদের উক্তি)। ৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

৩.৫ যেমন কলি তেমন চলি (পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে না পারার দুঃখ-পূর্ণ মন্তব্য, সুচাঁদের)। ৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ।

সুচাঁদ উপকথার জগতের শেষ চিহ্ন। কাহারদের পরম্পরা—মৌখিক সংস্কৃতি তার স্মৃতিতে ধরা পড়েছে। ব্যক্তির বংশ পরম্পরার কাহিনী (৩.১), মাতব্বর বংশের ওঠাপড়ার কাহিনী (৩.২), সমাজ প্রগতিতে অনীহা—সমাজ বদলে তার নিহিত আপত্তি (৩.৩), অতীত অবস্থা পরিবর্তিত পরিস্থিতে অপরিচিত না থাকায় হাহাকার (৩.৪) আর পরিবর্তমান পরিস্থিতি মেনে নেবার বাধ্যতা ও বেদনা (৩.৫)—তার ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগে লক্ষ করতে পারি। সুচাঁদ কতকটা যেন আদিম নারী-প্রধান ধর্ম সামাজিক সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের প্রতিনিধি। তার ভাষা-প্রয়োগে পশ্চাদগতি, রক্ষণশীলতাই আশ্চর্য বর্ণাঢ্য মায়াময় রূপায়ণ নিয়ে উপস্থিত। হাঁসুলীবাঁকের-উপকথা অংশের প্রকৃত কথক সে—তবে তাকে সামান্য অস্থিতিশীলতার মধ্যে রেখেছেন তারাশঙ্কর। বনওয়ারীকে সমর্থন—নিয়োগ—প্ররোচিত করে সে, কিন্তু খাওয়ার জন্য করালীর ওপর নির্ভর করতে সে বাধ্য হয়। এই দ্বিধার কারণেই বুঝি তার ঝড়ের মুখে

পড়ে গিয়ে পা ভাঙার ঘটনা ভেবেছেন তারাশঙ্কর। আদিম মুখরতার অকৃত্রিম প্রতিনিধি—স্থাণু হয়ে কেমন করে সমাজচ্যুত বিভ্রান্ত হল—সুচাঁদ তাই দেখালো।

৪. সমাজ-প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও স্থিতিকে রক্ষার প্রয়াসে প্রযুক্ত প্রবাদ প্রবচন :

৪.১ ধম্মের পাক সাতটা, পাপের পাক সাতান্নটা। (করালীকে বনওয়ারী— সে যাতে পরমের দলে না মেশে)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ;

৪.২ মুখ একে বাক্য আর ঠাঁই একে মার। (নয়ানকে ক্রুদ্ধ আক্রোশে মেরেছে করালী, বনওয়ারী তাকে উপদেশ দেবার অবকাশে বলেছে) ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

৪.৩ ন্যাংটার আর বাটপাড়ের ভয় কিসে। (পরম সম্পর্কে, আটপৌরেদের বৃত্তি বা দুবৃত্তি সম্পর্কে বনওয়ারী বলছে)। ৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

৪.৪ আষিড়ে কাড়ান পায় কে? শাঙন কাড়ান ধানকে। ভাদুরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিসকে? (আবহাওয়া-সংক্রান্ত সংস্কার-কৃষি-কর্মের প্রাণ, মূলত খনার বচনের পুনর্গঠন করে বলা বনওয়ারীর উক্তি)। ৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ ;

৪.৫ পতঙ্গের পাখা উঠলে সে মাতঙ্গ হয় না...। (করালীর কীর্তিকলাপে বিরক্ত বনওয়ারী—তাকে মানসিকভাবে শাসনের উদ্দেশ্যে বলেছে) ৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ;

৪.৬ মানুষে সব বেচে খায় ধরম বেচে কেউ খায় না। (রতনকে গালাগাল করে অনুশোচনা প্রকাশ করার পর বেদনা-করুণ অসহায় বনওয়ারীর উক্তি)। ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ।

—এখানেও protagonist বনওয়ারীর ভাবাদর্শ। যে প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি তার আটপৌরেদের অপরাধ-প্রবণতাকে অস্বীকার করতে চায়, সেই দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মবোধের প্রাণ—এই ধর্মকে কর্মের সঙ্গে মেলাবার আকাঙ্ক্ষা আর প্রবৃত্তি তাকে উজ্জ্বল উচ্চতা দান করে। ৪.১ আর ৪.৬-এ এই উজ্জ্বল উপস্থিতি। শেষ উক্তিটিতে অবশ্য অসহায়তা প্রধান হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠান বনওয়ারীর তা মধ্যম পন্থার। বিতর্ক বিক্ষোভ বৈপরীত্য যেন সংকট গড়ে না তোলে—এই অভিপ্রায় দ্বন্দ্ব সংঘাতের স্থিতিস্থাপকতা (৪.২), ভ্রষ্ট চরমপন্থাকে সমালোচনা (৪.৩ আর ৪.৫)—কৃষিকর্মের পরম্পরা ও শিক্ষার ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করার চেষ্টা ৪.৪ উদাহরণে স্পষ্ট হয়েছে। বনওয়ারীর এই অবস্থান—*হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* উপন্যাসটিকে ভারতীয় জীবনবোধের অন্তর্গত করেছে। এই জীবনবোধ বহু সহস্র বৎসরের উত্তরাধিকার—ব্রিটিশ শাসনের প্রবল অভিঘাতে কেমন করে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ—তাই হাঁসুলীবাঁকের মহত্ত্বের অন্তঃসার।

৫. বিভিন্ন চরিত্রের মুখে বলা পরস্পরের চারিত্র্য-প্রকাশক প্রবাদ-প্রবচন

৫.১ ছাইফেলতি ভাঙা কুলো। (করালী সম্পর্কে পাখির উক্তি)। ১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

৫.২ যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি। (করালী কুকুরের সমাধি দেবার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে—পাখির উক্তি)। ১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

৫.৩ যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপন জন। (আত্মপ্রকাশক—পাখির উক্তি)। ২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

৫.৪ বানের এগুতে হাদি। (করালীর অতি-সক্রিয়তা সম্পর্কে উৎসাহ ও সমালোচনার সঙ্গে পাখির উক্তি)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ;

৫.৫ ধরে মারে সয় বড়। (মনিব সম্পর্কে—কাহার পঞ্চায়েতে নিমতেলে পানুর মন্তব্য)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ;

৫.৬ ছুঁচোর সাকরেদ চামচিকে (-র কথায় জবাব...)। (করালীর দলভুক্ত রতনের পুত্র মাথলার প্রশ্নের উত্তরে অভিমানী পানুর মন্তব্য)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ;

৫.৭ লরমকে ধরম দেখায়। (সমগ্র কাহার সমাজ সম্পর্কে পানুর বক্তব্য)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ ;

৫.৮ আপনার গরজে ধান ভানে মরদে। (আটপৌরেদের সম্পর্কে নিমতেলে পানুর মন্তব্য)। ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

৫.৯ ভাদোরে না নিড়িয়ে ভুঁই কাঁদে রবশ্যাষে—অজাতি পুষিলে ঘরে সেই জাতি নাশে। (করালীকে ইঙ্গিত করে নিমতেলে পানুর উক্তি)। ৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ ;

৫.১০ সব পুত থাকতে লাতির মাথায় হাত! (নয়ান পাখির নাক কামড়ে দেবার পর নসুরাম তথা নসুবালা বলেছে)। ২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ;

৫.১১ বাঘের পেছুতে ফেউ...(পানুর উদ্দেশ্যে নসুবালার ব্যঙ্গাত্মক উক্তি)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ;

৫.১২ সানাইয়ের পোঁ...(পানুর উদ্দেশ্যে নসুবালার ব্যঙ্গ)। ২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ;

৫.১৩ বেঁচে থাকুক চুড়ো বাঁশি, রাই হেন কত মিলবে দাসী। (সুবাসী সম্পর্কে বনওয়ারীর উদ্দেশ্যে নসুবালার কথা)। শেষ পর্ব ;

৫.১৪ মানুষের দশ-দশা, কখনও হাতী কখনও মশা। (গুপীর কথা—নয়ানের পিতার প্রতাপের কথা—এখনকার অবক্ষয়ের কথা ভেবে বলা)। ২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ;

৫.১৫ যার যেথা মন সেথাই বিন্দাবন। (গুপীর মন্তব্য—পরম ডোমদের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছে দেখে)। ৩য় পর্ব পাঁচ পরিচ্ছেদ;

৫.১৬ মানুষ বুঝে কই কথা, দেবতা বুঝে নই মাথা। (রতন-প্রহ্লাদদের ভাবনা, বনওয়ারীর প্রতি নির্ভরতার কথা ব্যক্ত করে তারা)। ৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ;

৫.১৭ না মাথা, না ছাতা। (রমণ—বনওয়ারীকে, আটপৌরেদের সমস্যা সম্পর্কে পরমের নিরুদ্দেশ হবার পর—বলা)। ৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

৫.১৮ যতই ঢেকে কর পাপ, সময় পেলেই ফলেন পাপ, পাপ মানেন না আপন বাপ। (পরম সম্পর্কে বনওয়ারীর উদ্দেশ্যে রমণের বলা)। ৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

৫.১৯ শালীর কন্যে আর পালতে-দেওয়া গাইয়ের বাছুর—ও দুই সমান। (রমণের আত্মকথন)। ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

৫.২০ পেটে ভাত নাই ধরমের উপোস। (কাহার মজলিশে আটপৌরেদের অবস্থা বিষয়ে রমণের উক্তি)। ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

৫.২১ তোর সঙ্গে ভাব নাই তো হাসলে হবে কি? (নয়ানের মা বাসিনী বউ-এর স্বগত ভাষণ)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

৫.২২ ইটের বদলে পাটকেল। (পানুকে ভয় দেখাবার জন্য করালীর বলা)। ৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ ;

৫.২৩ ভ্যাক লইলে ভিখ মেলে না। (পাগলের উক্তি)। ৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ;

৫.২৪ সাপের হাঁচি বেদেতে চেনে। (কালোশশী পরমকে চেনে তেমনি—এই ভাবে কথকের মন্তব্য)। ২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ;

৫.২৫ বেদের সাপের হাঁচি চেনা। (পানু সম্পর্কে, পানুর হাসি সম্পর্কে— মজলিশের সকলের ভাব)। ২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

৫.২৬ আহা মরি মরি রে মরি, শ্যামের পাশে রায়কিশোরী। (পাখি-করালীর বিয়ের সময় বাজনদারদের সমবেত ভাবনা)। ২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ।

উল্লেখিত প্রবাদ-প্রবচনগুলির ব্যাখ্যা সামান্য কিছু প্রকাশ করা দরকার। পাখি এ উপন্যাসে protagonist হিসাবে গণনীয়। তার মধ্য দিয়ে কাহার তরুণীর আধুনিকতার প্রতি আকর্ষণের ছবিটি স্পষ্ট। করালী সম্পর্কে তার গৌরববোধ (৫,১), অভিমান (৫.২), অহঙ্কারী আত্মপ্রকাশের উৎসাহ (৫.৩), আর সেই সঙ্গে আনন্দ-আশঙ্কা মিশ্রিত ভালোবাসা (৫.৪)—এক কথায় চলৎ চঞ্চল সক্রিয় তারুণ্যের ছবি তার বলা প্রবাদ-প্রবচন মিশ্রিত ভাষ্যতে জুড়ে দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

নিমতেলে পানু কাহার সমাজের বিচিত্র রূপ একটি। কৌশল, উপস্থিত বুদ্ধি, চোরা জটপাকানো ভাব, গ্রাম্য দলাদলির মূর্ত প্রতীক সে। তার বক্তব্যে কখনও কাহার-মজলিশের মন নিজের দিকে টানার কৌশল, সামন্ত প্রভুর অত্যাচারী রূপটি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস—সেই ভাবে সকলের মনকে নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা (৫.৫-এ যেমন), কখনও কাহার-সমাজের প্রতিষ্ঠানের অত্যাচারী দিকটি স্পষ্ট করার সাহস (৫.৭) কিংবা অন্যদের উপেক্ষা করার প্রবণতা (৫.৬) লক্ষ করি। সুযোগ পেলেই পানু সমাজের প্রতিনিধি বনে যায়—সমাজকে পরিচালনা করে নিপুণ চালবাজির দ্বারা। আটপৌরেদের অবস্থা সম্পর্কে তার অভ্রান্ত ব্যাখ্যান (৫.৮) আর তারপরই বনওয়ারীর মন বুঝে সুবাসীর সঙ্গে তার বিয়ে দেবার প্রস্তাব অত্যন্ত পটু কূট কৌশল। করালীর আচরণকে সমালোচনা করে সুযোগ বুঝে সমাজমনকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে (৫.৯) যখন—তখনও তার নির্ভুল সময়জ্ঞান লক্ষ করি। তবে নিমতেলের চেষ্টা অধিকাংশ সময়ই আত্মকেন্দ্রিক। স্বার্থবুদ্ধি আর অনুশাসন-হীনতা তাকে মহৎ চরিত্রে পরিণত করে নি। তবুও, বনওয়ারীর মতোই নিমতেলের প্রবাদ-প্রবচন মিশ্রিত ভাষ্যটিতে হাঁসুলীবাঁকের সমাজ কাঠামোটির বৈশিষ্ট্য চমৎকার বর্ণাঢ্যতা অর্জন করেছে।

নসুরাম—নসুবালা হাঁসুলীবাঁকের ক্রান্তিলগ্নের স্বাক্ষর। অপূর্ব বাঙ্ময় তার অস্তিত্ব। নারী-পরিচালিত উপকথার জগৎ ক্রমশ অবক্ষয়িত— পুরুষের কৃত্যকে প্রভাবিত করার সক্ষমতা তার আর নেই, এ অবস্থায় নারীভাবে ভাবিত, নারীবেশী নসুবালা আসলে transvestism-এর আদিম লক্ষণ ধরে রেখেছে। তার এই আচরণ তুলনীয় হতে পারে রায়বেঁশে নেচে ফেরার পথে পরমদের নারী-বেশ খুলে মদের আড্ডায় হাজির হওয়ার মধ্যে। সাময়িক transvestism তাদের, নসুর নারীভাব স্থায়ী। তাই তার মধ্য দিয়েই সুচাঁদের উপকথা জীবন্ত নৃত্যগীতে উপস্থিত। পরিবর্তনের এই দিকচিহ্ন বৃহন্নলাদের সমাজ-ধর্মে নেতৃত্বের eunuch priestship-এর ছবিটিও আভাসিত করে। তবে এই মুহূর্তে আমরা দেখাচ্ছি নসুবালার প্রবাদ প্রবচনগুলির অভিমুখ ও প্রাসঙ্গিকতা। নয়ান পাখির নাক কামড়ে দেবার

ঘটনাটি তার অভিনয়যোগ্য অননুকরণীয় ভঙ্গিতে বর্ণিত—জনতার সমর্থন জোগাড়ের উত্তেজনায় তার প্রবাদধর্মী উক্তি (৫.১০) বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পানুকে তীব্র সমালোচনা তার (৫.১১, ৫.১২) অনেকটাই করালীর পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে সুচাঁদ-পাখির মতোই করালীর নাগরিক উপাদান, সামাজিক সচলতা (social mobility) আর আর্থিক সক্ষমতার প্রতি ঝুঁকে থাকার বাধ্যতা লক্ষিত হয়। সুবাসীর অন্যায় আচরণ মেনে নেয় নি, বনওয়ারীকে সান্ত্বনা দিয়েছে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির ভাষ্য থেকে (৫.১৩)। সমগ্র *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় বৈষ্ণবতার হাল্কা একটি আলো ছড়িয়ে আছে। নসুবালার এই প্রবচন প্রয়োগে সেই তাৎপর্য কতকটা রূপ পেয়েয়ে।

গুপী খুব তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে না উঠলেও তার বলা দুটি প্রবচন (৫.১৪, ৫.১৫) দুটি সমাজের দুটি প্রান্তিক পরিস্থিতিকে ব্যক্ত করেছে। ঘরভাঙাদের পড়তি অবস্থার কথা প্রথম প্রবচনে আর পরমের সমাজ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত দ্বিতীয় প্রবচনে স্পষ্ট। অপ্রধান হলেও, তার মধ্য দিয়ে কাহার সমাজমন কথা হয়েছে।

রতন-প্রহ্লাদদের কথার মধ্যে (৫.১৬) পাচ্ছি ক্রান্তিকালে সম্ভব মতো সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা। বস্তুত তাদের ভাবনায় স্পষ্ট কাহার সমাজ এখন আর প্রশ্নহীন আনুগত্যে আস্থা রাখতে পারছে না। এই আনুগত্য মানুষে-মানুষে ভেদ স্বীকার করছে—যুক্তির অপেক্ষা করছে। পানশালা থেকে ফেরার পর তারা বনওয়ারীর কাছে পাওনা-গণ্ডার হিসাব বুঝে নেয়— নেশা কাটার পর। জানে, বনওয়ারী ঠকাবে না। এই নির্ভররতা অর্থ-সচেতন হলেও রক্ষণশীল প্রতিষ্ঠানকে স্বীকার করার ভাবাদর্শই বলতে হবে।

রমণ বনওয়ারীর কাছে নির্ভরতা পেতে চায়, সে কতকটা বাধ্যতা—বেশিরভাগটাই স্বার্থ বুদ্ধি। কাহার সমাজের মিলন্ ঘটানোর সঙ্গে জমি পাবার আকাঙ্ক্ষা আর না খেটে জীবন যাপনের চাহিদা তার বনওয়ারীর প্রতি নির্ভরতার ছদ্ম-উচ্চারণ (৫.১৭), পরমের সমালোচনা (৫.১৮), সমাজ সংকটের ভাষ্য রচনা (৫.২০) আর বিচিত্র জটিল গোত্রভাবনা (৫.২০) প্রভৃতির বহুমাত্রিকতা তৈরি করছে। রমণকে এই প্রবাদ-প্রবচনে বেশ চেনা যায়।

নয়ানের মা, কটুভাষিণী এই মহিলা ঘরভাঙাদের অধিকার হারানোর ইতিহাসকে জীবন্ত রাখে তার কলহপরায়ণতা, গালগালের ভাষ্য (abusing language) ব্যবহার প্রভৃতির মধ্যে। কোশবেঁধে কাহার সমাজের প্রথম ফাটলটি যতই ক্ষীণ রেখায় ধরা পড়ুক—বাসিনী বউ-এর উক্তিটি বেশ স্পষ্ট (৫. ২০) হয়েছে।

করালীর প্রবচনে খুব গভীর তাৎপর্য নেই (৫. ২২), পাগলের বলা কথাতেও (৫.২৩) নেই তেমন মৌলিকতা। করালী হাঁসুলীবাঁক ছাড়ার পর বাইরের পৃথিবীর ভাষ্যটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছে—পাগলের গান হাঁসুলীবাঁকের উপকথার একটি স্বতন্ত্র ভাষ্য হয়ে উঠলেও তার প্রবণতা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ। বনওয়ারীর কাহার সমাজ শোষিত, সর্বরিক্ত কিন্তু মাধুকরী তাদের পথ নয়।

উদাহৃত অন্য প্রবাদ প্রবচনে কাহারদের মনোজগৎ খুব স্পষ্ট হয় নি। ৫.২৪ আর ৫.২৫ একই প্রবাদের দুটি ভাষ্য। চরিত্রধর্মকে স্পষ্ট করলেও এই ভাষ্য কাহারদের মনের ভিতর থেকে বের হয়নি। এ হল তাদের চিনে নেওয়ার লেখক-রচিত নির্দেশক (signifier)। পাখি-করালীর বিবাহ, কাহার সমাজের বিধিসম্মত নয়। 'ছাড়বিড়' না করে অন্যের 'রিয়োনো' স্ত্রীকে নিয়ে সমাজসম্মত বিবাহ অন্যায়। এই অন্যায়কে বনওয়ারী সমর্থন করতে বাধ্য হয়েছে। প্রাকৃতিক আবেগ কাহারসমাজে স্বীকৃত, কিন্তু এই রীতি অস্বীকৃত হবার ফলে তা

অনেকটাই পরকীয়া প্রেম—বৈষ্ণব সংস্কৃতির এ আর এক টুকরো অভিঘাত। বাজনদারদের মধ্য দিয়ে এই ব্যাখ্যানটি সামান্য কিছুদিন কাহার সমাজের মৌলিক ভাঙনটি অস্পষ্ট রেখেছিল। তাই এই প্রবাদটিকে (৫. ২৬) উপকথার ভাষ্য সমৃদ্ধ হয়েছে। বলে নিই, এ কিন্তু হাঁসুলীবাঁকে আলতো হয়ে পড়া বাইরের ইঙ্গিত বা আলোর ছটা। তারাশঙ্কর এই প্রবাদের দ্বারা তাদের জীবনভঙ্গির একটি ভয়ঙ্কর নীতিহীন সম্পর্কের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন ভারতীয় পুরাণের একটি প্রসঙ্গ। হাঁসুলীবাঁকের ভাষা-শরীরে এটি প্রসাধন হিসাবে গ্রহণযোগ্য—আন্তরিক নির্মাণ বলে মনে হয় না।

৬. হাঁসুলীবাঁকে বাইরের ভাবাদর্শ এসে পড়া—কিছু প্রবাদ-প্রবচনের মারফৎ

৬.১ নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। (পূর্ববঙ্গের দারোগা মশাইয়ের বলা প্রবাদ)। ১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ;

৬.২ এল বাউরী মল বাউরী। (বর্ষা-বাদলের ফলে কাহারদের চরম দুরবস্থা ঘটার কথা ভেবে মাইতো ঘোষের উক্তি)। ২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ;

৬.৩ কলিকালে ধর্মের এক ঠ্যাঙ। (জাঙলের চৌধুরীর কথা, সুচাঁদের ভাষ্যে ধরা পড়েছে)। ৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ।

এই পর্যায়ে প্রথমেই মনে পড়েছে পূর্ববঙ্গের দারোগা মশাইয়ের বলা প্রবাদটির কথা। (৬.১)। তারাশঙ্কর স্পষ্ট জানিয়েছেন হাঁসুলীবাঁকের মানুষদের পক্ষে এ প্রবাদ সত্য নয়। কারণ 'হাঁসুলীবাঁকের দেশ কড়া ধাতের মাটির দেশ।' 'নদীর ভাবনা এখানে চার মাসের।' আসলে হাঁসুলীবাঁকের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য—রাঢ়েতর বাংলার সঙ্গে তুলনা করে দেখাতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। তাই পূর্ববঙ্গের নদীগুলির বর্ণনাও দিয়েছেন ঘোষদের বাড়ির ছেলের মুখে।

মাইতো ঘোষের চোখে বাউরি আর কাহাররা এক—সমস্ত শ্রমজীবী মানুষই তার বলা প্রবচনে একরকম অসুবিধায় পড়ে বর্ষার আধিক্যে। কাহাররা যে ডোমেদের চেয়ে নিজেদের উচ্চতর ভাবে—বাউরিরা যে চন্দনপুরে কোঠাবাড়ি তৈরি করে দিব্যি বাস করলেও কাহার পল্লীতে কোঠাবাড়ি গড়ার কোনো বিধি নেই, এসব সূক্ষ্ম পার্থক্য জানার কথা তার নয়। ফলে এই প্রবচন বাইরে থেকে আসা। হাঁসুলীবাঁকের ভাষ্যকে একটু বর্ণিল করার চেষ্টা এখানে।

জাঙলের চৌধুরীর কাছে শোনা প্রবাদটি (৬.৩) সুচাঁদ যখন বলেছে তখন কাহার সমাজের উপকথা পুরাণের কালচেতনার দ্বারা প্রবাহিত হয়। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—ভারতীয় পুরাণের নিজস্ব কালচেতনার অন্তর্গত। সত্যযুগ থেকে দিন যত এগিয়ে আসছে তত পাপের ক্রমিক প্রভাব বাড়ছে—সত্যের তথা পুণ্যের প্রভাব কমছে। এই কালচেতনা হিন্দু সমাজ গঠনের বৈশিষ্ট্যটিকেই যেন বিন্যস্ত করে— graded degradation. ক্রমাবনত জাত কাঠামোর ধারণা—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের বর্ণব্যবস্থার মতোই এই কালচেতনা। এই ভাবনার পিছনে দর্শনের ভূমিকা আছে। কাহারদের গোষ্ঠীভাবনার সঙ্গে তাদের সমাজবাস্তবটি অনেকটাই সমান্তরাল বলে মনে হয়। কালারুদ্র আর কর্তাবাবা—এই তাদের ভাবনার সীমা। কালারুদ্রের চক্র যখন মহামন্বন্তরের সময় থেকে ঘুরে চলেছে—তার আগে কি ছিল জানার অভিপ্রায় নেই ক্ষমতাও নেই। জাঙলের চৌধুরীর সংস্কার ভিন্ন। হিন্দু পুরাণ চেতনায় নিষ্ণাত সেই মন। কলির ধর্ম যে একপদ—অর্থাৎ পুণ্য একভাগ, পাপ তিনভাগ, এই মন্তব্য আসলে তার সংস্কারের অন্তর্গত। সুচাঁদ যখন সেই সংস্কারকে তার ভাবনার মধ্যে

মিশিয়ে নেয় তখন কাহার সমাজের আত্মোন্নয়নের আকাঙ্ক্ষাটি ধরা পড়ে। এই সূত্রে প্রবচনটি সামান্য প্রাসঙ্গিক বটে।

সামান্য কিছু ছড়ার ব্যবহার হয়েছে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য়। উপন্যাসের কথাশরীর এভাবে লৌকিক পরম্পরার সঙ্গে মিলেমিশে গেছে। রচনার ভাষা-কাঠামো আর ভাষ্য তথা discourse অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য পেয়েছে এই ছড়াগুলির দ্বারা। একটু আলোচনা এই পর্যায়ে করা দরকার।

১. পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে ছড়া বলেছে নসুবালা। পুরুষপ্রধান পরিবার। নারীর স্বাধীন কোন সত্তা নেই। ছড়াটি এক-পংক্তির :
'কিল ধমাধম পড়ে সই—কিল ধমাধম পড়ে গো'
[২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

২. ব্যক্তিগত প্রেমাকর্ষণ সম্পর্কে নসুর বলা আর একটি ছড়া আছে একই পরিচ্ছেদে। করালী আর পাখির প্রেম সম্পর্কে। কথাটি ভুল নয়। এ ছড়াটিও এক পংক্তির :
একি পাকা অঙ লাগল মনে মনে—ও সজনি
[২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৩. করালী-পাখির বিয়ের আসরে বাজনদারদের উৎসাহ দেবার জন্য বনওয়ারী যে ছড়াটি বলেছে তা বেশ পূর্ণাঙ্গ, সামান্য পুনর্গঠিত করে নিলে একটি নিটোল ছড়া গড়ে ওঠে। দেখাই :
বর আসিলো বর আসিলো, ও বউ অঙ্গ তোল।
বর নামিলো বউ নামিলো, ও বর বউয়ের সানটি তোল।।
[২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]
'সানটি' বা 'সান' শব্দটির উৎস নির্ণয় করতে পারছি না। ঘোমটা অর্থে ব্যবহৃত এই শব্দ। মনে হয় তারাশঙ্কর গড়ে দিয়েছেন।

৪. কর্তাবাবার পুজো স্থির হবার পর একটি ছড়া বলা হয়েছে। কথকই বলছেন, তবে আড়ালে বনওয়ারীর কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ চাপা পড়েনি।
অমাবস্যে রবিবার মৎস্য খাবে তিন বার।
[১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]
একটি সমাজ কেমন করে নানা ভাবে, মৌখিক পরম্পরার দ্বারা প্রবহমান জীবন সূত্রকে ধরে রাখে তার চিত্র হিসাবে এই ছড়া অন্যতর বাস্তবের ইঙ্গিত বহন করে বৈকি।

৫. নবান্নের উৎসব কাহারদের মধ্যে নতুন ছড়িয়ে পড়েছে। তারা মাত্র এক বা দুই প্রজন্মের কৃষক। কৃষি অর্থনীতি একান্ত মানব সম্পদ নিরপেক্ষ নয়—চলমান তার উৎপাদন বৃত্তে মানুষ আসে, তার সঙ্গে গড়ে ওঠে বৃত্তির বন্ধন। সংস্কৃতির সঙ্গেও গড়ে ওঠে এক দুর্মোচ্য লীলাময় আবদ্ধতা। নবান্ন উৎসবে ব্যবহৃত কাহারসমাজের 'মন্ত্রের মতো' একটি ছড়া—তারাশঙ্কর-উপস্থাপিত উপন্যাসের ভাষাশরীরে এনেছে লোকায়তের বর্ণাঢ্যতা :
'ল' লাড়লাম—'ল' চড়লাম।
'ল' পুরনোয় ঘর বাঁধলাম।
লতুন বাখার বাঁধি পুরানো খাই—

এই খেতে যেন জনম যায়—
লতুন বস্ত্র পুরোনো অন্ন—
তোমার কৃপাতে জীবন ধন্য।

[৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন : 'বলার রীতি অবিকৃত ভাবে'—এই ছড়ায় উপস্থিত। (পশ্য : "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ও লোকজ উপাদান"; অলোক রায় সম্পাদিত *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা পাঠ ও পর্যালোচনা* গ্রন্থ—উল্লেখিত; ১৫৯ পৃ.)। বর্ণনা-অংশে অবশ্য তারাশঙ্করের কথক জানিয়েছেন—'ল' অর্থাৎ 'ন', 'ন'-কে ওরা 'ল' হিসাবে উচ্চারণ করে, 'ন' অর্থাৎ নতুন।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) একেই কি 'বলার রীতি অবিকৃত ভাবে' উপস্থাপনা বলতে চান? বিশেষভাবে এই 'বলার রীতি' গোটা উপন্যাসেই আছে। তার কোনো স্বতন্ত্র উল্লেখ না করলেও চলে। আসলে ছড়াটিতে আছে কেমন করে নবান্ন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার আন্তরিক-বাস্তব (inner reality)। নতুন পাত্রে নবান্ন রান্নার—নাড়াচাড়া করার কথা, পুরোনো শস্যাগার আর নতুন শস্যসম্পদের মধ্যে কৃত্য-সম্পর্ক (ritual-contact) ঘটানো হল—তার কথা, 'নতুন বাখার' অর্থাৎ মরাই বন্ধনের আকাঙ্ক্ষা, পুরোনো গোলা যেন সারা বছরে শেষ না হয় সেই আশা ইত্যাদি বহু বৈশিষ্ট্য এই ছড়ায় ধরা আছে। শেষ ইচ্ছাটিকে শুধু উর্বরতার আকাঙ্ক্ষাসূচক কৃত্য বলা যাবে না—Fertility cult-এর সঙ্গে সঙ্গে এটি Fecundity cult অর্থাৎ প্রাচুর্যের আকাঙ্ক্ষাও। বরুণবাবুর ব্যাখ্যান এই দিকে কোনো আলো ফেলল না কেন কে জানে।

৬. নবান্নের মতোই আর একটি উৎসবের সূত্রে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এসেছে ছড়া। বনওয়ারীর উঠোনে 'ভাজো পাতা' হয়েছে। তাদের গানের মতো' ছড়াটি সম্পর্কে তারাশঙ্করের কথক জানাচ্ছেন 'এইটুকু গান হল—মন্তরের মতো। সেই ছড়া :

ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজের কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিবি,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলবি,
পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধরলো ধরা

[৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

এখানে মাটির সরায় পঞ্চ আঁকুড়ি বা 'পঞ্চাঙ্কুর' রেখে একটি নৃত্যগীতময় অনুষ্ঠান—টুসু-ভাদু-ইতু-মাঘমণ্ডল প্রভৃতির মতো। একে বরুণবাবু উক্ত আলোচনায় 'কৃষিভিত্তিক উৎসব', 'Harvest festival' বলেছেন। কৃষিভিত্তিক উৎসব মাত্রই Harvest festival বলা চলে না। নবান্ন নিশ্চয় Harvest festival কিন্তু ভাঁজো অন্য রকম। এখানে উর্বরতার জাদুক্রিয়া উপস্থিত। এই পঞ্চাঙ্কুর হল 'Adonis Garden' জাতীয় অনুষ্ঠান। কৃষি যাতে ভালো হয় তাই মাটিকে সাক্ষী রেখে যৌনগন্ধী 'গালাগালি'—প্রেম-প্রীতিপূর্ণ উদ্দাম নৃত্যগীতের আয়োজন। ফসলের আকাঙ্ক্ষার উৎসব আর ফসল পাবার পরের আকাঙ্ক্ষা এক নয় একথা প্রবীণ 'লোকসংস্কৃতিবিদ' বরুণবাবুকে বোঝাতে হবে না নিশ্চয়। তবে এসব ভুল ভ্রান্তির শৃঙ্খল তৈরি করে। বিদ্যায়তনিক চর্চায় এই শৃঙ্খল মোচন হওয়া জরুরি।

৭. পাগল কাহার তার অন্য গ্রামবাসী মেয়ের ঘরের নাতনী সম্পর্কে একটি ছড়া তৈরি করেছে।
এ বুড়ো বয়সে তুমি আমার নতুন নেশা হে
[৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]
এক পংক্তিক এই ছড়া। পরিবার সংগঠনে মাতামহ-দৌহিত্রীর সম্পর্ক বেশ আনন্দঘন কৌতুকের স্নিগ্ধ একটি রূপ নিয়ে আসে। হেনরি লুইস মরগান মাতৃ-প্রধান পারিবারিক ব্যবস্থা (female line) থেকে পিতৃ-প্রধান পারিবারিক ব্যবস্থা (male line) গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে স্রেফ তিনটি পরিবর্ত, অন্তর্বর্তী ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলেন তার অন্যতম মাতামহ-দৌহিত্র ক্রম। পাগলের আপন ভোলা স্বভাব, এই ছড়ায় অবশ্য কাহারদের জীবন নীতির আদিস্তর উঁকি মেরে থাকবে।

৮. সায়েব ডাঙায় মাটি তৈরি করা—মাতব্বর বনওয়ারীর কৃষিশ্রমিক থেকে রায়ত হবার স্বপ্ন। তার চোখে এই স্বপ্নের মায়াঞ্জনটি কতকাংশে তারাশঙ্কর সযত্নে মাখিয়েছেন। আর তার মধ্য দিয়ে আবহাওয়া বিষয়ে তার বলা (আসলে ভাবা) ছড়াটি খনার বচনের পুনরাবৃত্তি।
চৈতে মথর মথর বৈশাখে ঝড় পাথর
জষ্ঠিতে মাটি ফাটে তবে জেনো বর্ষা বটে
[৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

৯. চন্দনপুরের রেল লাইন—নগর সমাজের লৌহ নিগড়। ঐ ক্ষেত্রে গেলে কেউ আর ফেরে না। হাঁসুলীবাঁকের ভয় তরাস এভাবেই গ্রাম জীবনের বিশেষত নারীদের (ও তরুণদের) উদ্দেশ্যে একটি ছড়ার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। রেল ইঞ্জিনের ছন্দিত যাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে কাহার মনস্তত্ত্বের চমৎকার এই ছড়াটি :
সিদু-জগা-পেবাতী গেল কুল গেল জাতি—
সিদু-জগা পেবাতী
[৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]
বলে নিই তারাশঙ্কর এই 'পেবাতী' অর্থাৎ পার্বতীকে করালীর হারিয়ে-যাওয়া মায়ের নাম বলে জানিয়েছেন। আগে একত্র অবশ্য নামটি বলেছিল নিম্মলা—নির্ম্মলা। ছড়ার টানে নামটি বদলে গেছে কিনা বলতে পারব না। কিন্তু করালী শিশু বয়সে মায়ের সন্ধানে যখন 'মহিষ-ডহরির বিল' 'কোপাইয়ের তীরের বনে বনে' ফিরত তার স্মৃতি এই ছড়ার মাধ্যমে কি একবারও বোধ করে না? মায়ের ইতিহাসের লজ্জা' তাকে কি এখন আর লজ্জা-বেদনা বোধ করায় না? বনওয়ারী তেমনি ভাবছে। রেল ইঞ্জিনের ছন্দিত যাত্রার সঙ্গে কথা বসানো বালকদের খেলা। এর মধ্যে পাশ্চাত্যের যন্ত্র সভ্যতার অভিঘাত আর লোক সমাজের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ধরা পড়ে। বনওয়ারীর স্মৃতিতে এই ছড়া কাহার সমাজের নিষেধাজ্ঞার একটি নতুন চেহারা হাজির করল।

আপাতত ছড়া কটির মাধ্যমে আমরা নিশ্চয় এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারি রাঢ় বাংলার নিম্নবর্গীয় কাহার-জীবনের চিত্রিত ভাষা-শরীরটি নির্মাণে তারাশঙ্কর বর্ণালী বিচ্ছুরণ ঘটান নি—সাতরং এখানে আছে—আলো ছায়ার সঙ্গে মিশে। সমালোচক হিসাবে আমরা উপাদানগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করলাম—বর্ণালী বিচ্ছুরণের মতো পৃথক করে।

ভাষার শক্তি নিহিত থাকে তার প্রয়োগে। নিছক বাক্যরচনার ব্যাকরণ-সিদ্ধ ধারাবাহিকতার মারফৎ ভাষার শক্তি লাভ অসম্ভব। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় কিছু কিছু প্রকাশ বৈশিষ্ট্য এই শক্তির ইঙ্গিত তৈরি করছে। দেখাই :

১. যার হাঁস ছিল, তার না-দেওয়া হয় নাই।

[১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

২. গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না। হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না।

[৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

৩. চন্ননপুর হাঁসুলী বাঁকের উত্তর দিকে। কিন্তু আসলে ওই হল দক্ষিণপুরী।

[৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৪. পাগল কাহার—পাগল পাগল ভাব, কারুর ভালতে নাই, কারুর মন্দতে নাই। ঘর নাই, সংসার নাই, 'স্ত্রী' নাই, 'পুত্ত' নাই, বিচিত্র মানুষ পাগল।

[৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৫. পাড়ার জন্য মদ নেওয়ার নিয়ম বরাবর আছে!

[৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

৬. এঁটো পাতা পরিষ্কার করবে, সড়কি বাসনগুলো মাজবে মেয়েরা—তার জন্য জনাহি এক পাই অর্থাৎ আধসের চাল, আর আঁচলে মুড়ি পাবে।

[৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৭. আটপৌরেরা কাহারেরা—এক হাতের দুটো আঙুল, এক বংশের দুই গোত্ত। তোমরাও যা; আমরাও তাই। খেতে-দেতে মানা নেই। করণ-কারণ বিয়ে-সাদীটাই হয় না।

[৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৮. নসু বলে কাহার কুলে জন্মেছি, কাহার পাড়ায় বাস করি, বনওয়ারী কাহার পাড়ার মাতব্বর, দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তার হুকুম যেন মানতে হবে বাইরে; কিন্তু মন তো কারু দাসী বাঁদী নয়, সে কাহারও নয়, আটপৌরেও নয়, সে শুধুই মানুষ—সে রাজারও প্রজা নয়, মহাজনেরও খাতক নয়, সে মানবে কেনে বুন?

[৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

৯. আটচল্লিশ সাল শেষ হলেন, উনপঞ্চাশ সাল এলেন।

[৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

১০. মেরে তোমার পস্তা উড়িয়ে দোব, পম্বা নড়িয়ে দোব।

[৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

১১. চিকিৎসা! সে না-চিকিৎসা

[শেষ পর্ব]

১২. হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় শেষকালে শুধু গাছ কাটার শব্দ।

[শেষ পর্ব]

সাধারণ বাক্য লিখলে তারাশঙ্কর লিখতেন 'যার হাঁস ছিল সে দিয়েছে'—তাতে কর্তাকে উৎসর্গ করার সক্রিয়তা, আনুষ্ঠানিকতা ধরা পড়ত না। উদাহরণ উপকথার মর্ম। কথা ধারাবাহিক—ধারাবাহিকতা না থাকলে কথাহীন কৃত্য (Ritual) নিষ্প্রাণ তৃতীয় উদাহরণে

হাঁসুলীবাঁকের ভৌগোলিক দিক নির্দেশ আর সাংস্কৃতিক দিক নির্দেশ যে আলাদা—সেকথা বলা হয়েছে। বিপরীতের সমাপতন। চতুর্থ উদাহরণে পাগলের চরিত্র বৈশিষ্ট্য কাহার-সমাজে সংলগ্নতা আর নিভার দূরত্ব সমস্তই বলা হয়েছে। পঞ্চম উদাহরণে 'বরাবর' শব্দটি যথাস্থানে না রেখে মদ নেওয়ার বিষয়টির বিধিবদ্ধতার পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। ষষ্ঠ উদাহরণে 'জনাহি' শব্দটি অপরিচিত বলেই যেন একরকম সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দেওয়া নেওয়ার ক্রিয়াটুকু অনেক স্পষ্টতা পেয়েছে এই ভাবে। সপ্তম উদাহরণে বাক্যপুঞ্জ চলৎচঞ্চল। বিধি আর নিষেধ একাকার। Statement হিসাবে এই বাক্যপুঞ্জ চমৎকার—লক্ষ্যভেদী। অষ্টম উদাহরণটি নসুবালার আত্মতার স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। একটু অবিশ্বাস্য কিন্তু ঠিক যাকে বলে ঔপন্যাসিক ভাষাভঙ্গি এই বাক্যপুঞ্জে তেমনি dialogic imagination ধরা পড়েছে। নবম উদাহরণে বৎসর-কে সম্মানজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ দিয়ে (হলেন, এলেন) উপস্থাপিত করা হয়েছে। সম্মানজ্ঞাপক ক্রিয়াপদ প্রয়োগের উদাহরণ আরও আছে। অমাই মারা যাবার পর—'তাই' হলেন। প্রায় একই রকম। এখানে আছে প্রতিফলিত বাক্যাংশের চমৎকার প্রয়োগ। দশম উদাহরণটি তেমনি। এরকম সমান্তরাল বাক্যাংশ বাংলা ভাষার ধ্রুপদি উপন্যাসের মর্ম। অধ্যাপক শিশির কুমার দাশ বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে এই 'সমান্তরলতা' দেখেছিলেন। 'চিকিৎসা' আর 'না-চিকিৎসা'-র মধ্যে বিস্ময় চিহ্ন (!) আর নির্দেশক অব্যয় (সে) মাত্র—এই সংযত বাক্যাংশে বহু বার্তা যুক্ত করেছেন তারাশঙ্কর।

ই. এম ফর্স্টার উপন্যাসে পেতে চেয়েছিলেন গভীর জ্ঞানের নির্যাস—'Prophecy'। কেমন সে জ্ঞান? তাঁর বিশ্লেষণ থেকে পাচ্ছি কয়েকটি মর্মলক্ষণ। যথা

১. সত্য স্বরূপ জ্ঞান—যা উপন্যাসে ধরা পড়ে। ফর্স্টার লিখছেন— Prophecy হল তাই, যেখানে ঔপন্যাসিক যোজনা করেন তাঁর নিজস্ব ভাষ্য—'an accent in the novelistis voice' (পশ্য : *Aspects of the Novel*, পেঙ্গুইন; লণ্ডন; প্রথম সং ১৯২৭, আমরা দেখছি ১৯৯০ সংস্করণ; 111 পৃ.]
২. শুধু কণ্ঠস্বর নয়—উচ্চারণ : 'Prophecy–in our sense–is a tone of voice' [ঐ]

আমাদের নেওয়া *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র শেষ উদাহরণটি—ভাষাব্যবহারের অন্যতম সার্থক বিন্দু। উপকথা শেষ হয়—শুরু হয় ইতিহাস। সভ্যতা বিকাশের সূচনার আরণ্যক অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই একই জীবন অভিজ্ঞতার নির্যাস বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *আরণ্যক*-এও ধরা ছিল। তবে বাঁশবাদির কাহাররা নিজেরা গাছ কাটে নি—গাছের অন্ধকার দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের মৃত্যু কামনা করে। মনে কি হয় না এখানে তারাশঙ্কর ঔপন্যাসিক ভাষাশরীরের তুঙ্গতম সিদ্ধি? *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এমন অনেক আছে।

৫

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র গান

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র গানগুলি বিচ্ছিন্ন ভাবে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক কাননবিহারী গোস্বামী। তাঁর সিদ্ধান্ত-'উপন্যাসের সমস্ত আবহই লোকজীবন সম্ভব। তারাশঙ্কর এই আবহকে বিশ্বস্ত করে তুলতে বহু লোকগীতি-রীতির গান লিখেছেন।' ("তারশঙ্করের গানের জগৎ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে গ্রন্থভুক্ত*; উল্লেখিত ; ৩৬১ পৃ.) আবহকে বিশ্বস্ত করার পাশাপাশি এখানে আছে বৈচিত্র্যের ইঙ্গিতও। ব্যক্তি আর গণ মানুষের ভাবজগৎ-কে একই ভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তারশঙ্কর। উপন্যাসে সঙ্গীতের প্রয়োগ তারাশঙ্করের সাধারণ লক্ষণ। *কবি-রাইকমল*-এর মতো উপন্যাসে সঙ্গীত গভীরতর মাত্রা পেয়েছে। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় তেমন তাৎপর্য নেই—তবে অনক্ষর কাহার সমাজের উৎসবে-অনুষ্ঠানে, ভালোবাসা-য় প্রেমে, সংবাদে-চাঞ্চল্যে অনেকগুলি গানের প্রয়োগে আবহই বিশ্বস্ত হয় নি—এসেছে আঞ্চলিক পরিবেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয়চিহ্ন। এগুলি থাকায় তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁক শুধু জন চিত্তের মননধার্য বিবরণ থাকে নি, হয়ে উঠেছে উপলব্ধির বিষয়—সুরের মূর্চ্ছনায় রম্য শ্রুতিগোচর আর তীব্র আবেগের উৎসারে চমৎকার। পাঠকের কল্পনাকে এমন চমৎকারের দ্বারা আচ্ছন্ন করে তারাশঙ্কর তাকে মানস ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেন। গানগুলি তার সহায়ক।

হাঁসুলীবাঁকের গানে কিছু 'লোকসঙ্গীত আঙ্গিক' বিচার করেছেন অধ্যাপক গোস্বামী। যেমন : ১. ফকিরী গান, ২. ঘেঁটু গান, ৩. ছড়া গান, ৪. গাজনের গান, ৫. নবান্নের গান, ৬. ভাঁজোর গান, ৭. কথকতা-ধর্মী গান, ৮. রেল লাইন বাঁধার গান।

বিভাজনটি কোন্ রীতি অবলম্বনে তৈরি হয়েছে খুব স্পষ্ট নয়। রেল লাইন বাঁধার গানটি উপন্যাসে ঘেঁটু-গান বলে অভিহিত হয়েছে। এ-গানের রচয়িতা পাগল। রচয়িতা বললাম—পাগল এ-গান মুখে মুখে বেঁধেছে। তারশঙ্কর তেমনি জানাচ্ছেন 'চন্দনপুরে যখন প্রথম রেল লাইন বসে তখন *এই ঘেঁটু গান বেঁধেছিল* পাগল, এ গান গেয়ে খুব নাম হয়েছিল। আজও কাহারেরা কখনও কখনও গায়।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) কোনো স্মরণীয় ঘটনার যখন লোকজীবনে বিশেষ প্রভাব তখন তা নিয়ে গান বাঁধা হয়। একে অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক *লোক সাংবাদিকতা* (folk journalism) বলে অভিহিত করেছেন। কোনো লোক সমাজে বছর আবর্তিত হয় মূলত কৃষি-উৎপাদনের বৃত্তপথে। বৎসরের সূচনা হয় কৃষিকর্মের প্রস্তুতি পর্বে। বৎসর শেষ হয় উৎপাদিত শস্য সম্পদের সংগ্রহ পর্বের আনন্দ, অন্যান্য কৃষি সম্পদ (আখ ইত্যাদি)-কে সংরক্ষণ (গুড় তৈরি) প্রভৃতি কর্ম সম্পাদনের পর। এর মাঝখানে ঘটে যায় অনেক ঘটনা, দুটি প্রান্ত : ১. *লোকসমাজ যাকে অনুমোদন করে* ; ২. *লোকসমাজ যাকে অনুমোদন করে না*। লোকসমাজ যা অনুমোদন করে না—তাই সাধারণত লোক সাংবাদিকতার বিষয় হয়। গানে গানে সেই অনুমোদন—আপত্তি সমালোচনার ভাষ্যে ছড়িয়ে যায়। রেললাইন পত্তনের ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। লোকসমাজের বাইরে প্রবল পরাক্রান্ত আর্থিক সক্ষমতার সচল উপস্থিতি। যে কাহাররা পদাতিক—চালকত্ব আর বাহকত্ব যাদের, হেঁটে হেঁটে চলাচল আর পালকি বহন করা ছাড়া যাদের জীবনে গতি নেই—রেল তাদের জীবনে গতি

আনে না—কিন্তু তৈরি করে সংকট। সমাজ ভেঙে যায়। এই অদূর ভবিষ্যতের অনিবার্যতাই পাগল কাহারের রেল পত্তনের গানে ধরা পড়েছে :

ও সায়েব আস্তা বাঁধালে!
হায় কলিকালে!
কালে কালে সায়েব এতে আস্তা বাঁধালে—
ছ মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।
ও সায়েব আস্তা—
লাল মুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ—
দ্যাশ-বিদ্যাশ থেকে এলে দলে দলে লোক—
—ও সাহেব আস্তা—
ও সাহেব আস্তা বাঁধালে—কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক!
—ও সাহেব আস্তা—

[৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

এ-গানের প্রথমাংশ 'সায়েব' দ্বিতীয়াংশে 'সাহেব'। কালের মাত্রা এখানে খোঁজা সম্ভব। ছ-মাসের পথ এক দণ্ডে চলে যাওয়া প্রচণ্ড গতিশীল রেলগাড়ি পালকি বাহক কাহারদের প্রাথমিক বিস্ময় আর নতুন নতুন মানুষের আসা যাওয়ার ক্রমিক পরিণতি শেষ পর্যন্ত যে সঙ্কটের জন্ম দিল ('কাহার কুলে'র অন্ন ঘুচে যাওয়া) তা সম্ভবত সায়েবদের সাহেব-এ পরিণত হওয়া—মহাপ্রাণতার ধ্বনিসঙ্কেতে ধরা পড়ছে। গানটিকে নিছক 'রেল লাইন বাঁধার গান' না বলে বলতে হয় ভারতীয় স্থিতি-সাম্যের পরিস্থিতিতে রেল লাইন পত্তনের ইতিহাস ও তার নেতিবাচক ফলে কার্যকারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রদর্শনের গান। এ-গান রেলপথ তৈরির ঘটনাটিকে শুধু বিস্ময়কর বিবরণ নয়—রেলপথ রেলগাড়ি প্রভৃতি বাহ্যিক ঘটনার পরম্পরার ব্যাখ্যান হিসাবেই গণনীয়। ঘটনা আর ঘটনার ব্যাখ্যা—লোক-সাংবাদিকতা হিসাবেই আলোচ্য।

ঘেঁটু গানে সমাজ-পরিধির তরঙ্গভঙ্গ কেমন করে ধরা পড়ে তা পাচ্ছি চন্দনপুরের মুকুন্দ ময়রার বাঁধা গানে। চন্দনপুরের ময়রা—'ডাকে' আসা 'গ্যাজেট'-এর সংবাদ তার জানা। এ গানে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খবর :

সায়েব লেগেছে লড়াই।
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্‌খাগোড়াই—
ও হায়, মরব মোরাই উল্‌খাগোড়াই।

[২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

গানটি পূর্ণাঙ্গ নয়। সম্পূর্ণ স্মৃতিধার্য না হওয়াই সম্ভব। খবর ঠিকই, খবরের ব্যাখ্যানও অবশ্যই ষাঁড়ের লড়াইয়ে উলুখাগড়ার মৃত্যু অনিবার্য—এই শঙ্কা) কিন্তু এ-খবর প্রথম প্রথম কাহার সমাজের নয়। কাহাররা প্রথম দিকে বিশ্বযুদ্ধকে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। যুদ্ধ তাদের কাছে সাঁওতালী হাঙ্গামা, বর্গির হামলা আর রাম-রাবণের যুদ্ধের সঙ্গে একই মাত্রায় উপস্থিত। অবশ্য মুকুন্দ ময়রার দূরদর্শিতার পরিচয় কাহার সমাজে অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে।

ঘেঁটুগানে লোক-সাংবাদিকতার অন্য মাত্রাটি সমাজের অন্তর্গত। সমাজ যে-ঘটনা অনুমোদন করে না—নিমতেলে পানুর গোপনে বানানো ঘেঁটু গানে তারই প্রসঙ্গ।

হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে, তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর
অতিবড় বাড় বাড়িল যারা তাদের ভে-ঙে পাড়ো।

বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা
সাজের পিদীম বলো ফুঁদিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের এ কি লীলা সন্‌জে বেলাতে।
মহি গলাতে মোটা গলাতে হায় কি গলাগলি
কত হাসিখুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি!
সেই কাপড়ে বাবা তোমার সন্‌জে দেখালে
হায় কলিকালে—

[২য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

এ-গানে যে দৃষ্টিভঙ্গি তা সামগ্রিকভাবে কাহার সমাজের বলে মনে হয়—যদিও এই সমালোচনার মূল লক্ষ্য কোশকেঁধেদের দুই প্রধান চরিত্র—করালী আর বনওয়ারী। তৃতীয় লক্ষ্য আটপৌরেদের মোড়ল পরমের ঘরনি কালোশশী। ব্যক্তি চরিত্রের ভ্রষ্টতা, সমাজবিধি অমান্য করার বৈশিষ্ট্য ঘেঁটু গানটিতে ধরা হচ্ছে, সম্ভবমতো সুতীব্র অভিশাপ (কর্তাবাবার কাছে প্রতিকারের আবেদন জানানোর মারফৎ) যুক্ত হয়েছে এই গানে। করালীর অপরাধ সমস্ত কাহার সমাজের পক্ষেই অনুমোদনযোগ্য নয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু তাকে শাস্তি না দেওয়া—বিধিবহির্ভূত বিবাহকে স্বীকার করে নেওয়া, অর্থাৎ শাস্তির বদলে পুরস্কার প্রদান, সমস্তই তো কাহার-সমাজের পক্ষে ভয়াবহ। নিমতেলে পানুর স্বভাবসিদ্ধ কৌশল—এক ঢিলে তিন পাখি মারার কূট বুদ্ধি এই ঘেঁটু গানে হাজির। বনওয়ারী এ-গানের রহস্য ভেদ আর সুকৌশলে পানুকে শাসন করার মারফৎ তার মাতব্বরিকে প্রশ্নাতীত করেছে। পাপবোধ তার আছে। পাপ ক্ষালনের জন্য কালরুদ্রের চড়কের পাটায় মূল 'ভক্ত্যা' হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে অতিরিক্ত আছে যা, গ্রাম-সমাজে সম্মান ও মাতব্বরির মর্যাদা রক্ষার পরিকল্পনা। উপন্যাসের ঘটনাধারা নিয়ন্ত্রণে এই ঘেঁটু গানটির ভূমিকা গভীর। নিমতেলে পানু গোপনে এই গান বেঁধে আটপৌরেদের সঙ্গে যে সম্পর্কের সূচনা ঘটিয়েছে, তার পরিণতিতেই যেন কূটনৈতিক চাপ দিয়ে তাদের কন্যা সুবাসীকে মাতব্বর বনওয়ারীর সঙ্গে বিবাহ সংঘটিত করার ঘটনা ঘটেছে। গানটির প্রভাব বাইরে কতটা ছড়িয়ে পড়ল, পাগলের গানের মতো ছড়িয়ে পড়ল কতটা, তার চেয়ে বেশি এর অন্তর্নিহিত শক্তির ভাঙাগড়ায় লক্ষ করা গেছে। কাহার সমাজের ভাঙাগড়ায় এই ঘেঁটু গানের প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত অনুভূত হয়।

মুকুন্দ ময়রার গানে লোকসমাজের বহির্বৃত্তের অভিঘাত ধরা পড়েছে। একটি গানে তার 'গান্ধীরাজার কথা' আছে। সে-গান বনওয়ারীর নাকি 'মন্দ লাগে নাই'। তবে তারাশঙ্কর এ-গানের বিস্তৃত পরিচয় *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় আনেন নি। উপকথার চলনটিতে যে কাহার-সমাজের ethnic entity বা সাংস্কৃতিক পরিচয়-চিহ্ন তারাশঙ্করের আসল উদ্দেশ্য তার সঙ্গে সর্বভারতীয় রাজনীতিক প্রসঙ্গ মিশ-খেতো না।

বৈষ্ণব ফকিরদের একটি পংক্তি (তাও অপূর্ণ) তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন হাঁসুলী বাঁকে। বনওয়ারীর ভাবনার অনুষঙ্গে এই অপূর্ণ পদটুকু এসেছে।

এ দুনিয়া আজব কারখানা [২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

এই অপূর্ণ পংক্তিটি 'ফকিরী গান' বলতে চান কাননবিহারী গোস্বামী। তারাশঙ্করের বর্ণনায় এ-গান 'বৈষ্ণব ফকির', 'ফকির', 'বাউল', সন্নেসী'—যে কারোই হতে পারে। অবশ্য একটু পরে 'আল্লা-তালার আজ কারখানা' বলেছেন। কাহারদের লোকায়ত দর্শনে সহজ সাধনার প্রভাব পড়েছে। তার প্রমাণ বনওয়ারীর কথায় ভাবনায় প্রকাশিত।

হেঁপো রুগী নয়ান অন্ধকারে মজলিশের সকলের সামনে মারা গেছে। তার সেই মৃত্যু গভীর বিষণ্ণতার ছাপ নিয়ে এসেছে, সেই সঙ্গে যুদ্ধের বাজারে কাহারদের বিপন্নতার ছবিও স্পষ্ট করেছে। সামান্য কেরসিন তাদের নেই—সাপ খোপের হাত থেকে বাঁচার জন্য সামান্য আলো রাতবিরেতে তাও নেই। তেলের অভাবে 'হঠাৎ আলোটা নিবে গেল।' নয়ানের বুকে হাত দিয়ে বাসিনী বউ বসে ছিল—অন্ধকারেই তার মৃত্যু ঘটে, 'বুক থামলেই' চীৎকার করে জানাবে—এই তো রীতি তাদের। 'অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়।' তাই পাগল কাহার গান ধরে—সে গান 'ছড়া কেটে' বলা, উপন্যাসের কথক তেমনি জানাচ্ছেন। কাননবিহারী গোস্বামী সেজন্যই এটিকে ছড়া গান বলেছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে ভরপুর এইগান :

> অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায় রে!
> অন্ধকারেই পরাণপাখি সেই দ্যাশেতে যায় রে!
> চন্দ সূর্য্য লম্ফ পিদীম তাই রে, নাই রে নাই রে
> না থাক, আছে একজনা ভাই,
> এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়
> দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাই রে
> আলোর তরে ভাবনা কেন হায় রে।

[৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

এ-গানে পাগলের মাধ্যমে প্রাণ-পাখির আনা গোনা এ-জগৎ আর না-দেখা পরলোক—উভয়ের মধ্যে যাতায়াতের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। একে কাহারদের লোক-দার্শনিকতা বলেই শনাক্ত করছি। লোকায়ত তথা দেহাত্মবাদী বস্তুবাদী ইহবাদী ভাবনা। বাউল ফকিররা তাদের অনুশীলনমূলক ধর্মে সাধনা ঘোষণা করে। এ হল সহজ এ অবশ্য কাহারদের চর্চার বিষয় নয়। কিন্তু তাদের ভাবনায় প্রান্তিক অবস্থার বিষণ্ণ উপলব্ধি এই গানে হাজির করা হয়েছে। ফলে গানটিকে 'ছড়াগান' বলতে দ্বিধা হয়। এখানে আছে ঘরভাঙাদের উত্তরাধিকারহীন পরিণতির ভবিষ্যতের অন্ধকার অসহায় অনিবার্যতার ঈশারা।

নয়ানের মরণ শয্যের' পাশে বসে পাগল ছড়া-কেটে বলা গানটির দুটি পংক্তি আবার উদ্ধার করেছেন লেখক। প্রকারে হয়তো ছড়া গানই, কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে এ-গান গভীরতর দার্শনিক উপলব্ধির। যে মহাশক্তির দুই চক্ষু সূর্য-চন্দ্রের মতো— সে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে নিয়ে যায়—অসীম রহস্যলোকে।—এই ভাবটি গানটির মধ্যে নিহিত আছে।

সমবেত ভাবে কালারুদ্রতলার গাজনে কাহারদের অংশ গ্রহণের আগে পাগল যে গান গেয়েছে তাকে কাননবিহারী গোস্বামী 'গাজনের গান' বলতে চান। এই গানে কাহারদের লোকসাংবাদিকতার উপাদান ধরা পড়ছে :

> হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই বলিহারি,
> বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ দুয়ারী।

সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরি রে মরি।

[৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

সুবাসী লতার ফুল পরিবে কানে
সুবাস জাগিবে রস বুড়ানো প্রাণে
ও পথে যাস না তোরা বারণ করি—
(বুড়ো আসবে তেড়ে
খেটে হাতে বুড়ো আসবে তেড়ে)

[৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ে নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আটপৌরেরা কোশকেঁধে বনওয়ারীর নেতৃত্ব মেনে নিচ্ছে—সুবাসীর সঙ্গে বিয়ে, তার জন্য নতুন দক্ষিণ দুয়ারী ঘর বাঁধা, গৃহে 'সুবাসী বাতাসে'-র আনন্দঘন পরিবেশ—একটি গণসমাজের গভীর সংবাদ। গাজন অনুষ্ঠানে এরকম গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে বৃত্তাকার সমাজ-শরীর এই তরঙ্গ ভঙ্গটি স্মরণ করছে, অনুমোদনের যোগ্য বিষয় বলে মনে করছে। আড়ালে আছে কৌতুক—স্মিত হাস্যের উপাদানও।

নবান্নের গান-টি নৃত্যগীতিময় আনন্দে উদ্বেল। পাগল এ-গান শুনিয়েছে নবান্নের সন্ধ্যায় মদের আসরে।

ও লবানের লতুন ধানের পিঠে—
আজ কাজ কি মাছের ঝোলে।
নতুন কাপড় খসখসিয়ে বউরা এসেছে—
আঙা লতুন ছাওয়াল লিয়ে কোলে।

[৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

গানটি আনুষ্ঠানিক। আনন্দ উৎসবের, গণ সমাজের।

ভাঁজো উৎসব কাহারদের কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কের আন্তরিক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছে। 'ভাঁজো পাতা' আসলে সরার উপর মাটিতে পঞ্চাঙ্কুরের চারপাশে এক রকম উৎসবের আয়োজন। এর সঙ্গে আছে এক একটি ছোট ছোট দল গঠন করে পরস্পরকে যথাসম্ভব গালাগাল দিয়ে—অন্যের ভাঁজো যে ভালো নয় তা জানাতে কিছুটা বাক্যোবাক্য চালানো হয়। ভাঁজো-র দিন যে যার সঙ্গে ইচ্ছা নাচতে পারে। এদিন কেউ কারো উপর নারী সঙ্গের ব্যাপারে অসূয়া প্রকাশ, আপত্তি জ্ঞাপন করতে পারবে না। এ হল মৃত্তিকাকে উর্বর করার উদ্দেশ্যে—আরও বেশি. ফসল ফলানোর লক্ষ্যে পরিচালিত অনুষ্ঠান। পঞ্চাঙ্কুরের ব্যাপারটিকে স্যর জেমস জর্জ ফ্রেজার *The Golden Bough* গ্রন্থে একে 'Adonis Garden' নামে অভিহিত করেছেন। ভাঁজোর গান এই পটভূমিতে আলোচ্য। দেখাই :

কোন্ ঘাটেতে লাগায়েছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে!
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাই তো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীরই বাঁকে—
বাঁশবনে কাশবনে লুকালছ কোন ফাঁকে!
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
তোমার আ-ঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গো
ও আমার ভাঁজো সখি হে!

[৫-ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

মাথায় ডাঁটি শালুক ফুল মাঝখানে কাশফুল গুঁজে এ-গান হাঁসুলীবাঁকের ঘাট-মাঠে ঘুরে ফিরতে হয়। ভাঁজোর প্রস্তুতি পর্বের গান এটি।

ভাঁজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিবি,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলবি,
পঞ্চুত আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা।

[৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

তারাশঙ্করের ভাষ্য—'এইটুকু গান হ'ল—মন্তরের মত। সবদলকেই গাইতে হবে এটুকু।' আসলে মাটির সরায় পঞ্চআঁকুড়ি-কে ধরিত্রীর শস্যক্ষেত্রের একটি প্রতিনিধি ভেবে তার চারপাশে আনন্দানুষ্ঠান হল ভাঁজো। পৃথিবী এখানে নববধূর মতো। ব্রতধারিণীরা এসময় সম্ভব মতো নতুন কাপড় পরে।

অনুষ্ঠনটির সঙ্গে গানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। প্রস্তুতি যখন চলছে তখন কাহার সমাজের নান্দনিক যাবতীয় কৃত্যের অধিকার যার সেই পাগল কাহার উপস্থিত।— 'সেই চাষের সময় পালিয়েছিল, হঠাৎ কাল—ভাঁজোর আগের দিন সে ঠিক এসেছে।' এসেই ভাঁজোর প্রস্তুতিতে লেগে গেছে। বাজনদারদের 'ঢোলের বোল' নকল করে নিজের মতো পাল্টে নিয়ে গেয়েছে পাগল :

'কাজকাম' 'পাট কাম' থাক্ থাক্ থাক্ থাক্!
নাচ না কেনে মেয়েরা, নাচ্ না কেনে গো!
চল, কোপাইয়ের ঘাট মেখে ঘট ভ'রে আনি,
নে পাঁচ আঁকুড়ির সরা মাথায় সে

[৫-ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

গান এখানে উৎসবটিকে ধরে আছে। গান বিযুক্ত করলে উৎসবের পনেরো আনা অবশিষ্ট থাকে না।

গোপালীবালার সঙ্গে সাঙা করতে চেয়েছিল পাগল। ক্ষণিক উত্তেজনার কথা। বনওয়ারী সুবাসীকে বিয়ে করতে যাবে। গোপালীবালা কেঁদে উঠেছে। বনওয়ারী কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। এসময় পাগল এই এক সমাধান সূত্র বলেছিল। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে আসে তার। ভাঁজোর সন্ধ্যায় গোপালীর সঙ্গে একটু মেতেছিল পাগল। গোপালীবালা সেদিন সাঙা করার প্রস্তাবে এককথায় না বলেছিল। আজ গোপালী দারুণ মাতাল হয়েছে। তাকে সবাই ধরে ভিতরে নিয়ে গেছে। পাগল গেয়েছে :

যে অঙ আমার ভেসে গেল
কোপাই নদীর জলে হে!
সে অঙ যেয়ে লেগেছে সই
লাল শালুকের ফুলে হে!
(কোপাই নদীর জলে হে!)
সেই শালুকে মন মানালাম
সকল দুখো পাসরিলাম
তোমার মনের অঙের মালা

তুমিও দিয়ো ফেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)
নিত্যি নতুন ফোটে শালুক
বাসি ঝরে গেলে হে
(কোপাই নদীর জলে হে!)

[৫-ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

এ গান নিছক ভাঁজোর গান হয়ে থাকে নি—বিষণ্ণ পাগল কাহারের মনোবেদনার রূপ তন্ময় ভাবোন্মাদকে ধরে রেখেছে। এ-গান স্বতন্ত্র। উপন্যাসের আঞ্চলিক পটভূমি কোপাই নদীর জলের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর ধুয়াটি ঘুরে ফিরেছে। এখানে ব্যক্তি-গোষ্ঠী আবেগ আর মৃন্ময় বাস্তব একাকার। একে শুধু ভাঁজোর গান বলা যাবে না। এ গানটি নাকি 'দাঁড়-ঝুমুর জাতীয়'—কাননবিহারী গোস্বামীর মত। (পশ্য: উক্ত প্রবন্ধ; ৩৬৩ পৃ.) দাঁড়-ঝুমুর না টাঁড় ঝুমুর? টাঁড় ঝুমুর অপেক্ষাকৃত আদিরসপ্রধান ঝুমুর। এ-গান সাধারণত গ্রামে না-গাইবার রীতি। পাগলের গানে আদিরস অবশ্য মুখ্য থাকে নি।

ঘেঁটু গান হিসাবে উপস্থাপিত একটি গান *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় দুবার আছে। পুরোনো বনওয়ারীর বাঁধা গান এটি।

তাই ঘুনাঘুন --বাজেলো নাগরী--
ননদিনীর শাসনে,--চরণের নূপুর থামিতে চায় না।
ঘরে থাকিতে মনো চায় না। ও---তাই--ঘুনাঘুন।

[২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

এ গান ঝুমুর-জাতীয়। কৃষ্ণকথার অনুষঙ্গ এখানে যুক্ত হয়ে আছে। ননদিনীর শাসন সত্ত্বেও নাগরীর মন উচাটন, ঘরে থাকতে চায় না। এ-গান বহুদিনের—কাহার সংস্কৃতিতে অন্তর্গত হয়ে গেছে তা। নসুবালা মিত্রগোপালপুর-এ কায়স্থদের বিয়ের অনুষ্ঠানটিতে সোৎসাহে অংশ নিয়েছে। বরের সঙ্গে সামান্য মস্করা করার পর তালি দিয়ে নেচে উঠেছে। সঙ্গে এই গান—

তাইঘুনাঘুন----তাইঘুনা ঘুন।'

[৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

উপন্যাসের একেবারে শেষে—করালীর কীর্তিতে আনন্দিত উৎসাহিত নসুবালা 'নূপুর বেঁধে' পাগলের সঙ্গে এ-গান গেয়ে নেচেছে। প্রথম পংক্তিটিতে আছে 'তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী'। (শেষ পর্ব) গানটি যে-কারণেই হোক তারাশঙ্করের মনোজগতে প্রভাব ফেলে থাকবে। *কবি* উপন্যাসে বসন এ-গানের সঙ্গে ঝুমুর দলে নাচ শুরু করেছে। সামান্য অদল বদল করে সেই গানটিই হাঁসুলীবাঁকে এনেছেন তারাশঙ্কর। *কবি*-র গানটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ ছিল। গতিশীল নৃত্যের গান :

ঝুম ঝুমাঝুম বাজে লো নাগরী ;
নূপুর চরণে মোর! ও সে থামিতে না চায় গো!
তোরা আয় গো!
জল ফেলে কাঁখে তুলে নেগো সখি গাগরী।
রজনী হইল ভোর ; আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুরায় গো!
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো!
ঝুম ঝুমা ঝুম ঝুমাঝুম ঝুমঝুম।

(পশ্য : অচিন্ত্য বিশ্বাস : *তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের কবি* ; রত্নাবলী ; কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ-২০০৫ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯ ; ১৪৯-১৫০ পৃ.]

কবি উপন্যাস গান-মুখ্য। তার একটি গান এখানে আংশিকভাবে উপস্থাপিত করে তারাশঙ্কর খুব তাৎপর্য রক্ষা করেছেন কিনা নির্ণয় করা কঠিন।

পাগল কাহার সমাজের নান্দনিক-প্রতিচ্ছবি। সে ঠিক কাহারদের অন্তর্গতও নয়। পিতা তার এক জাত-বৈষ্ণব। কাহার-সমাজে সে চেয়েছে সামাজিক সাম্য বজায় রাখতে, তার চেষ্টা—সমাজে দ্বন্দ্ব যাতে প্রশমিত হয়, ভাঙন যাতে অবসৃত হয়—এই তার বাসনা। তবে সে চেষ্টা সফল হয় নি। তার আছে গান। সে গান ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মনের আবেগ ও আকাঙক্ষার মূর্ছনা। এর মধ্যে কয়েকটি ঝুমুর ধরনের গান। ব্যক্তিমুখ্য আবেগ-আততি সেখানে প্রধান। করালীর বাড়িতে গিয়ে সে গেয়েছে :

পেমে পাগল হলাম আমি, পেমের নেশা ছুটল না—
হায় সখি গো—সনজে হ'ল ঝিঙের ফুল কই ফুটল না!
[৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছে]

করালী তার হাত ধরে বলেছে—'ঠিক নোক পেয়েছি! করালী ছাড়াও কাহার পাড়ার সবাই তার প্রিয়। সে বনওয়ারীর অন্যতম প্রধান বন্ধু—'মিতে'। এইগানে সমস্ত কাহার সমাজের অঙের খেলার শারীরিকতা, অবৈধ যৌন আসক্তি আর অদিমতার উপর যে প্রেমের তীব্র আকাঙক্ষার রং ছড়িয়েছে—সে প্রেম কতকটা যেন বৈষ্ণবতার আভাষ নিয়ে আসে। কাননবিহারী গোস্বামী ঝিঙের ফুল প্রসঙ্গে একটু ব্যাখ্যান যোজনা করেছেন। তাঁর ভাষা : 'সাঁজে ফোটা হলুদ বরণ ঝিঙে ফুল রাঢ় অঞ্চলের ঝুমুর গানে তরুণ প্রাণে সদ্য-জাগা প্রেমের প্রতীক।' (উক্ত ; ৩৬২ পৃ.) এখানে অবশ্য সদ্যজাগা প্রেম (করালীর পক্ষে) আর সে প্রেমের আকাঙক্ষা চরিতার্থ না হবার বেদনা (পাগলের পক্ষে) একাকার। লোকায়ত উপমা এখানে সামান্য আদর্শায়িত—*বৈষ্ণবতার* দ্বারা বর্ণিল।

ঘর ছাইবার সময় সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা। পাগল ঘর ছাইতে পারে অনেকের চেয়ে ভালো। তাছাড়া শ্রম আর শ্রম অপনোদন—উৎসাহ আর মনোরঞ্জন পাগলের উপস্থিতিতে উভয় ব্যাপারটি সাধিত হয়। হাসি মুখে তার গান কিন্তু ক্ষীণ একটু বেদনার আবেশ নিয়েই আসে।

মন হারিয়ে গিয়েছিলাম কোপাই নদীর তীরে হে-
কে পেয়েছে, ও সইয়েরা, দাও আমাকে ফিরে হে!
[৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

জ্ঞানদাসের পদে আছে কালিন্দীর কূলে গিয়ে ফেরার পথে 'অফুরান' হয়েছে রাধার যাত্রা কারণ 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'। এই গানে পাগল সেই আবহটি লোকায়ত সহজ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছে। বাংলার সংস্কৃতি সাধারণভাবে পাশ্চাত্য অভিঘাতে এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতার সম্মুখবর্তী হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা কেবল দেশগত—পূর্ব পশ্চিম নয়। এ বিচ্ছিন্নতা প্রাচীন-মধ্য আর আধুনিকেরও। আমাদের পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আধুনিকতা প্রাচীন সাংস্কৃতিক উপাদানকে অস্বীকার করেছে। বাংলার নাগরিক রুচিতে এই মূলোৎপাটন ও অহংকৃত আধুনিকতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে এখনও। লোকায়ত স্তরে এই বিচ্ছেদ নেই—ধারাবাহিকতা সেখানে মূল সুর। পাগলের গানে সেই সুরটি স্পন্দিত হয়ে উপন্যাসের তাৎপর্য ব্যঞ্জিত করেছে।

মিত্র-গোপালপুর থেকে ফেরার পথে পানশালা হয়ে ঝকড়া গাছতলার কাছে পরম

ডেকে নিল বনওয়ারীকে। উদ্দেশ্য বোঝা-পড়া করবে। দুই মাতব্বরের সেই নির্ণয়ক সংঘাত ও তার ফলাফল হাঁসুলীবাঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। পাগল এসময় সকলকে ডেকে নিয়ে গেছে সামনে। সঙ্গে গান

গোপনে, মনের কথা বলতে দে গো আঁধার গাছতলায়,
ও হায় ঠাণ্ডা শেতল সাঁজবেলায়।

[৩-য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

যে অন্ধকার অরণ্য আদিম, যার আবেষ্টনীতে জেগে ওঠে বনওয়ারী আর পরমের ভয়ঙ্কর প্রতিশোধস্পৃহা পাগল তাকে তেমন ভাবে দেখে না। আঁধার গাছতলায় তার বোঝাপড়া হয় না—মনের কথা বলার ইচ্ছা হয়। সেই সন্ধ্যায় রক্তের টগবগে উষ্ণতা তাকে টানে না—ঠাণ্ডা শীতল এক উপশমের দিকে নিয়ে যায়। পাগলের গান হাঁসুলীবাঁকের কড়া ধাতের মাটিতে এক পশলা হালকা বৃষ্টি বা আঁধার পরিবেশে হঠাৎ মেঘের আড়াল হওয়া জ্যোৎস্নার মতো মনে হয়।

ছড়া কেটে বলা গান তার রঙের খেলার কথা বলেছে কখনো—

অঙের খেলায় যাই বলিহারি
জেবন দিলেও দিতে পারি
তবু তো ছাড়তে লারি মনের মানুষে

[৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

এ-গান কিন্তু রঙের খেলার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কের স্মৃতিকথা। এ গান গাওয়া হচ্ছে বনওয়ারীর মনের মানুষ কালোশশীর রহস্যঘন মৃত্যুর পর। 'ঝোলা-ঝম্প' নিয়ে গ্রাম ছেড়ে আবার কিছুদিন বেড়িয়ে আসার পূর্বক্ষণে এই গান তার—অঙের খেলার আদর্শকে বলিহারি দিচ্ছে—তবে সে আদর্শ দেহসর্বস্ব প্রেম নয়—দেহাতীত। কারণ কালোশশী বায়ুভূত তখন। মৃত্যুত্তীর্ণ এই প্রেম। বনওয়ারী-কালোশশীর প্রেম, অবদমন আর পাগলের এই ব্যাখ্যান একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে ফেলে দেখার ভূমিকা বলে মনে হয়। পাগলের গান পাগলের প্রতিনিধি নিশ্চয় সেই সঙ্গে বাংলার প্রান্তিক একটি জনগোষ্ঠীর উপর বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাবের ইঙ্গিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আলো-আঁধারে মেশা এই অনাধুনিক—বাংলার বদ্ধ নিম্নবর্গীয় মানুষের বেঁচে থাকার রসদ—আহার ও ঔষধ ছিল। হারিয়ে গেছে। করালীর নতুন ভাঁজো তলায় রেকর্ডের গান এসে চমৎকরিত্বের ঝংকার, আক্রমণাত্মক ধনবাদ আর বাহারী উপকরণ ('হারমণি', বেহালা ইত্যাদি নিয়ে) নিয়ে আসে। লালমুখো 'ম্যান'-রাও আসা যাওয়া করে সেই মূল-চ্যুত নতুন ভাঁজোর আসরে।

নিমতেলে পানুর ছেলে সহসা সর্পাঘাতে মারা গেল। কাহার জীবনের রীতি-বিধি-বাধা অস্বীকার করে করালীর প্রভাবে যারা কারখানায় গিয়েছে, তারা কর্তবাবার মাহাত্ম্য বুঝে অনেকেই ফিরে এল। পাগল সময় বুঝে ধরল গান :

মন চাহে যাও হে তুমি—আমি যাইব না—
কেলি-কদমতলায়, বৃন্দে গো!
মানিক পেলে তুমিই লিয়ো—আমি চাইব না—
কালোমানিক কালায়, বৃন্দে গো!

[৫-ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

কেলি কদম্বের তলে রাধা আর যাবেন না—অভিমান। এই ভাব গোপিনীদের সঙ্গে রাধাকে আলাদা করেছে। পুরাণ-প্রতিমা কতকটা অন্যমুখে সরেছে এখানে। বৃন্দাদূতীর কথায় হাল্কা ভাবে হলেও মাথুর বা অক্রুর সংবাদের চিত্র স্মরণে আসছে এখানে। বৃন্দাকে পাঠানো হয় মথুরায়—কৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে। কৃষ্ণ ফিরে আসেন নি। করালীর টানে যারা চন্দনপুরে (হাঁসুলীবাঁকের বৃন্দাবন ছেড়ে) গিয়েছিল তাদের কেউ কেউ ফিরে আসছে। এই প্রসঙ্গে গানটির প্রয়োগ অভিনবত্ব পেয়েছে। উল্টোরথ বা ফেরৎ গোষ্ঠ যেন—এই ইচ্ছাপূরণের ভাষ্য। রাধার অভিমান তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন লেখক। বৈষ্ণব অনুষঙ্গ এখানে বেশ গাঢ়।

গানে-গানে উক্তি-প্রত্যুক্তির ধারাবাহিকতা তর্জা-কবি-ঝুমুরের লোক-সংরচনে ধরা পড়ে। পাগলের আবির্ভাব যখন তখন ঠিক এমনি পরিবেশ তৈরি করেছেন তারাশঙ্কর। সুচাঁদের চুল বাছছিল নসু। তার চুল বাছার সময় কিছু লোক-সংস্কার সন্নিবেশ করেছেন তারাশঙ্কর। সুচাঁদ কিছুতেই চুল যে তার 'শোণের নুড়ি' মানবে না! আয়না দেখতে বলে নসু। ঘটনা রাত্রের! একটু আগে হ্যারিকেনের কথা আছে। যাইহোক, রাত্রে আয়না দেখলে 'বুড়ো বয়সে কলঙ্ক' হতে পারে! কথাটা শোনার পরই নসুবালা গেয়ে ওঠে :

লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—
কলঙ্কিনী রাই মানিনী—নাম রটেছে দ্যাশে।

[৩য়-পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

এই কুল কলঙ্কের প্রসঙ্গ, রাধিকার শ্যাম-কলঙ্কিনী হবার কথা এই গানে যেন পাখি-করালীর প্রেম-প্রসঙ্গের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। সুচাঁদ আড়াল হয়ে তরুণ এই যুগল পরকীয়া-সাধনরত প্রেমিক-প্রেমিকাকে ছুঁয়ে যায় পুরাণের ইশারা। সহসা অদূরে শোনা যায় পুরুষালি কণ্ঠস্বর। নন্দী-বেশী পাগল গান গাইতে গাইতে—যাত্রার আসরের বিবেকের মতো হাজির হয় পাগল কাহার।

শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে-
ঝাঁপ দিব সই কালী দহে ;
কালীনাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাষে!

[৩য়-পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

সুচাঁদ হেসে উঠল 'রবশ্যাষে' এল। নসু এসময় যা বলে তাতে বোঝা যায়—পাগল নসুর মধ্যে যেন কিছু মস্করার সম্পর্ক আছে। নসুর নারীভাবটি পাগলের ব্যঙ্গের বস্তু। Post modern সমালোচনার ধারায় এই প্রসঙ্গটি সমকামিতার বিষয় বলে ধরা পড়তে পারে। তবে এই চরিত্র দুটির আকর্ষণ-বিকর্ষণের প্রতীক তাৎপর্যও আছে। এই দ্বৈত সঙ্গীত কৃষ্ণকথার আলোছায়ায় হাঁসুলীবাঁকের মানুষগুলিকে একটি রম্য অবকাশ দিয়েছে। নসুর কথা শুনে 'পাখি খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।' এই গানে বাংলার পুরাকথার দুটি প্রান্তিক প্রসঙ্গ একসঙ্গে জড়িয়েছে। রাধাকৃষ্ণের মান কলহান্তরিতার প্রসঙ্গ আর কালীদহে ডুব দিয়ে কালীনাগের প্রেমের পাকে মজার আকাঙ্ক্ষা—বিষবিদ্যক, সর্পবিষ নিবারণকারীদের বিচিত্র সাধন প্রণালী, এর পরিচয় বাংলার মন্ত্রের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কালীয়দমনকথা বিষ-বিদ্যকদের বিষের জন্মকথায় আক্ষিপ্ত হবার বিষয়টি আমার কিছু লেখায় দেখিয়েছি। (পশ্য : "মন্ত্রে মণ্ডিত বাংলার কথা চিত্র" ; 'লোকশ্রুতি' ১৬-তম সংখ্যা ; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র; জুন, ২০০০) কৃষ্ণযাত্রার একটি নাম ছিল কালীয়দমন। একপক্ষের

কলঙ্ক অন্যপক্ষের প্রেমের ফাঁস—এই অদ্ভুত ভাবনার আপতন পাগল কাহারকে হাঁসুলীবাঁকের সঙ্গীত-দূতে পরিণত করেছে। উপকথার টান (narrative যখন কৃত্যে performance)-এর জন্ম দেয়। সেই সক্রিয়তা সমাজকে তরঙ্গায়িত করে।

গান আর উপকথা হাঁসুলীবাঁকে পরম্পরিত। একটি অপরটির পরিপূরক। কখনো উপকথায় যা যুক্ত হবে তার প্রথম ভাষ্য পাই গানে। বসন্ত যখন চৌধুরীদের যুবক প্রেমিকের জন্য 'বানভাসা কোপাইয়ের মত' এগিয়েছিল, তখন 'বসন্তের ভালবাসার ইতিহাস' সমস্ত অঞ্চলে বিখ্যাত হয়েছিল। তৈরি হয়েছিল 'পালাগান'। এর একটি পংক্তি হাঁসুলিবাঁকের উপকথার গদ্যভাষ্যে উপহার পেলাম :

ও—বসন্তের অঙের কথা শোন।

[১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

'সে অনেক কথা।'—সবটা লোকরচনে থাকে না। উপকথায় সব কথা থাকে না। কিছু গান চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। সময়ের স্রোতে যা হারায় না—তার পটভূমিতে নতুন পলি গড়ে। সেই 'পলেন' জমিতে উপকথার শস্য অন্য রূপে অঙ্কুরিত হয়। পাখি, বসন্তেরই গর্ভের সন্তান। তার প্রেমের নিছক কথার কথা নয়। তবে নসু যে ব্যাখ্যাই দিক, শেষ পর্যন্ত তাকেও স্বীকার করতে হল, এ প্রেমও উপকথায় স্মরণীয়।

একি পাকা অঙ লাগল মনে মনে—ও সজনি!

[২-য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

উপকথার পলিতে নতুন গানের ঢেউ।

কিছু গান কাহার কুলের সংস্কার, বিধি-বিধান, নিষেধাদির কথা বলেছে। এগুলি ঠিক উপকথার রম্য-উপকরণ হয় নি, এসব হয়েছে নৈতিকভাষ্য (moral discourse)। নৈতিকতার এই মান ও বৈশিষ্ট্য বাইরে থেকে বোঝা যাবে না। লিখতে চাই কয়েকটি সাঙ্গীতিক উদাহরণ। এগুলির সঙ্গেও পাগল কাহারের সম্পর্ক প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাহার পাড়ার আদ্যিকালের সেইসব গান :

১. জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা কত্তাবাবার মানা।
মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে।
লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারখানা—
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।

[৩-য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

২. হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায়?
কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।

[শেষ পর্ব]

দুটি গানই পাগলের গাওয়া। প্রথমটি সমাজ প্রতিষ্ঠার গান, নীতি আর দ্বিতীয় গান সমাজ উৎসন্ন হবার গান। প্রথমটি মধ্যপর্বের আর দ্বিতীয়টি হাঁসুলীবাঁকের উত্তরকাণ্ডের আভাস। এর সঙ্গে যদি কাহারদের আদিপর্বের উপকথার পদাতিক জীবনের ভাষ্যটি সামান্য পুনর্গঠিত করে লিখি, বুঝতেই পারবো সেই পালকি-বাহকের চলৎচঞ্চল যাত্রী জীবনের ছবিটি স্পষ্ট হয়। ছবি নয় গান—কখনো শ্রম লাঘবের, কখনো শ্রম পরিচালনার, কখনো মনোরঞ্জনের

সুরঝংকার, ধ্বনি-দীপ্ত অস্তিত্ব—রেলপথ এসে যে অপরূপ যাত্রী জীবনের দোলাচঞ্চল আনন্দভূমি থেকে কাহারদের নির্বাসিত করেছে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* এই চালকত্ব আর বাহকত্বের হারিয়ে যাওয়া একটি মানচিত্র উপহার দিয়েছে—গুপ্তধনের স্বর্ণাভ দিগন্তে যাবার পথ-নির্দেশ। 'কাহার পাড়ার আদ্যিকালের গান'। বেশি কেউ জানে না—পাগল এর রম্য-অংশটি জানে :

সরাসরি জল পথে--
জোর পায়ে চলিব।
আরো জোর কদমে
বরেরো পাল্কী—পড়িল পিছনে
আগে চলে লক্ষ্মী—
পিছে এস নারায়ণ

[৩-য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

এ-গান সমবেত জীবনের—আনন্দ উৎসাহের—বৃন্দগান। অন্য বেহারারা ডাকে প্লো-হিঁ প্লো-হিঁ। কেউ উৎসাহে বলে ওঠে (যেমন রতন)—'জোরে ভাই, জোরে ভাই— প্লো হিঁ প্লো-হিঁ'।

এ-গানের অন্য একটি ভাষ্য আছে। তা তৈরি করে নিতে হয়। তাৎক্ষণিক নির্মাণ তা—শ্রমজীবী জনতার স্বাভাবিক নেতৃত্বের 'ডাক' দেওয়ার মতো। বনওয়ারী তার সুলুক জানে। এসময় পাগলকে গান গাইবার অধিকার দেওয়া যায় না। বনওয়ারীর গান, আনন্দ-যাত্রার আয়াস-সাধ্য অংশটিকে সংগঠিত করছে :

বেহারা সাবোধান!
পায়ে পায়ে--পায়ে পায়ে।
ফেলে ফেলে সাবোধানে
এস রে বেহারা
ডাইনে বেঁ-কি-ব
হুঁশ ক'রে—হুঁশ ক'রে
সামনে উঠতি--
আলকাটা নালা ভাই
পিছে টান পড়িছে

[ঐ]

গোটা গানটিতে ঝোঁক প্রধান—সুরের চেয়ে প্লো-হিঁ প্লো-হিঁর স্বরক্ষেপণ। আর হঠাৎ 'কাঁধ—কাঁধ'। অর্থাৎ কাঁধ বদল করতে হবে এবার।

রাঢ় বাংলার ছিন্ন সূত্রে বোনা লুপ্ত ইতিহাসের এই ভাষ্যটি কাহার-জীবনের একটি চমৎকার অংশ উপস্থাপন করেছে। হতে পারে জমিদারের বাড়ির অভিজাত কোন মানুষই এই লুপ্ত ইতিহাসটির অংশ বিশেষ উপন্যাসের পৃষ্ঠায় যোজিত করলেন। তবু, এখানে শ্রমজীবী কাহারদের জীবনচিত্র উপস্থিত হয়েছে—বিশ্বস্ত সেই প্রতিবেদন। যারা বাইরের আদর্শের বিজাতীয় পরকলা বা রঞ্জনরশ্মি ফেলে এই শ্রম-সম্পর্কে শোষণ—কান্না-ঘাম-রক্ত ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পান না, তারা এই জীবন—জীবনচিত্র দেখে ভাববেন জাদুঘরে ঘুরে এলেন। এখনও যদি নলকূপ বসাবার সময় উপস্থিত শ্রমিকদের গান শোনা যায়, যদি যায়

দেখা রেলের গ্যাংম্যানদের হেঁইও হেঁইওর ধ্বনিরূপ—এই জীবনচিত্রের ভগ্নাংশ মিললেও মিলতে পারে। সহানুভূতি বা সমানুভূতি চাই। দরদ।

এক অবিস্মরণীয় চাঁদনী-রাতে পরমকে বিধ্বস্ত করে বনওয়ারী তার মনের মানুষ কালোশশীর কাছে দাঁড়িয়েছিল। মিত্রগোপালপুর থেকে ফেরার সন্ধ্যা। মেয়েদের জন্য মদের ভাগ পাঠানো হয়েছে। পাড়া 'আনন্দে মাতোয়ারা'। এই উদ্দাম পরিবেশকে মিখাইল বাখতিন বলেছেন Carnival পরিস্থিতি। একে তিনি কখনো আবার "Carnivalesque" বলে ব্যাখ্যা করতে চান। এখানে পাওয়া যায় "the varied popular festive life"—যা নেমে আসে মধ্যযুগ-নবজাগরণ পর্ব পেরিয়ে, জীবনের সব মাত্রা, সব বৈচিত্র্য যেন ধরা পড়ে এই উৎসব পরিবেশে 'all the peculiarities of this life have been preserved in carnival'. (পশ্য : *Rabelais and his world*, উক্ত ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ—'Popular-festive froms'. ২১৮ পৃ.) সে এক অবাক করা সময়।—'একপাশ-খাওয়া লাল বরণ মস্ত চাঁদ! হাঁসুলীবাঁকের ওপারে গাছের মাথায় মাথায় আকাশ ফরসা হয়ে উঠেছে, গাছের ডালগুলির পাতাগুলিই নাচছে বাতাসে, কিন্তু মনে হচ্ছে—চাঁদের আলোই নেচে খেলে বেড়াচ্ছে উড়ন্ত প্রজাপতির হিল হিলে পাখনার মত।' গেল তারা কোপাইয়ে—'কাচের পারা জল'। 'দেখতে দেখতে চাঁদের আলো দুধবরণ' হল—'কোপাইয়ের জলে গলানো রূপোর ছটা জেগে উঠল।' এসময় বনওয়ারীর অনুরোধ—'মিহিসুরে এক পদ গায়েন কর কেন?' কালোশশী ধরল গান। সে গান, কাহারদের জীবনকে এক রূপময়ী বর্ণাঢ্যতা দান করল। কে এ-গান রচনা করেছে? জানে না কেউ। এহল একটি জনগোষ্ঠীর স্বাভাবিক রচনা—যেন। তারাশঙ্কর অন্তত তেমন একটি authentic epic গড়ে ওঠার পর্যায়কে ধরতে চান। কালো বউ গাইল।

আমার মনের অঙের ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্মপাতায় কাঁদিলাম হে—
সে জল পাতা নিলে না—
টলোমলো—টলোমলো—
হায় বঁধু হে প'ড়ে গেল—
ও হায়, চোখের জলের মুক্তাছটা মাটির বুকে ঝরে না।
[৩-য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

এরপর নেমে আসে অন্য এক দিক (peculiarities of this life) —দাঁড়ায় পরম। ডুব দেয় কালোবউ, ডুব দেয় বনওয়ারী। পরম তাড়া করে যায়—কালোশশীর মৃত্যু ঘটে। এই গান, ঐ পরিবেশ কাহারদের জীবনভঙ্গির ব্যক্তিগত আকর্ষণ-বিকর্ষণের একটি অপরূপ মাত্রা যোজনা করে।

উপকথা অংশ আর ইতিহাস—দুটি ভিন্ন প্রবাহ নয়। তারাশঙ্কর এই দুই তলকে এক সঙ্গে সমাপতিত করেন নি, আবার পৃথকও করেন নি। একই কালপ্রবাহে একই পরিবেশে দুটি সমাজমন একটি উপকথায় দ্রবীভূত—অন্যটি ইতিহাসে উজ্জীবিত। প্রথম সমাজমন বনওয়ারীতে, দ্বিতীয় সমাজমন করালীতে মিশেছে। কিন্তু দুই-ই অনেকটা পথ এক সঙ্গে চলেছে। একে অন্যের দর্পণে মুখ দেখেছে। উপন্যাসের শেষ পর্বে এই টানাপোড়েন একটি নতুন গানের জন্ম দিয়েছে দেখতে পাচ্ছি। উপকথা যেন গানে পরিণত হচ্ছে। উপকথার এই

লোকগানে পরিণত হওয়া তৈরি করেছে উপন্যাসের উপসংহার। কথা ভেসে যাচ্ছে গানে—সুর চঞ্চল করে তুলছে পটভূমি আর এক নারী-বেশী পুরুষকে, তার পা চঞ্চল হয়ে নেচে যাচ্ছে। সূচনায় অবশ্য এ-গান একা পাগল কাহারের তৈরি। গাইছে সে একাই। জীবনে যার আর কোনো আশা অবশিষ্ট নেই। তার বিষণ্ণ প্রতিবেদন সেই দুটি পংক্তি। একটু আগে উল্লেখ করেছি। আর একবার স্মরণ করছি।

হাঁসুলী বাঁকের কথা—বলব কারে হায়!
কোপাই নদীর জলে—কথা ভেসে যায়।

যখন চারপাশে শুধু গাছ কাটার শব্দ, যখন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কর্তাবাবার যাবতীয় আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রতাপ—বনওয়ারীর মৃত্যু ঘটেছে, একটি প্রাণবন্ত জীবন যা পরের পটভূমি চিরকালের জন্যই ইতিহাসের কালধারে ডুব দিল, তখন আবার সেই হাহাকার। এবার উৎসাদিত মানুষগুলি ঘুরে ফিরছে চার পাশে। 'গাঁয়ে গাঁয়ে, দোরে দোরে—ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে'। পাগল কাহার অবশ্য এই রকমই জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। গ্রামে গ্রামান্তরে পুরোনো দিনের মৌখিক পরম্পরাকে উজ্জীবিত রাখত এই লোকগায়ক। এবার কিন্তু তার সঙ্গী জুটল—নসুবালা। এ-গান সেও নাচতে নাচতে গায়। 'কাঁচা পাকা চুলের বেণীকে লাল ফিতে জড়িয়ে খোঁপা বেধে নূপুর পায়ে' তার সেই নাচ—একটি জনগোষ্ঠীর শেষ হাহাকার final cry হয়ে ধরা পড়ে।

পাগল : হাঁসুলী বাঁকের কথা বলব কারে হায়!
যে বাঁশেতে লাঠি হয় ভাই সেই বাঁশে হয় বাঁশি
বাঁশবাঁদির বাঁশগুলিরে তাই তো ভালবাসি।
নসু : বেলতলায় বাবাঠাকুর কাহার-কুলের পিতা
বাঁশবনেতে থাকত বাহন অজগরো চিতা
পরাণ-ভ্রমরে সে থাকিত আগুলি,
(ও হায়) তারে দাহণ ক'রে মারল করালী!
বাঁশের বেড়া বাঁশের ঝাঁপি তাহারই ভিতর
কাহার-কুলের পরাণ ভ্রমর বেঁধেছিল ঘর।
বাঁশের বেড়ার ঝাঁপি শেষে ভাঙলে মিলিটারি—
কাহারেরা, হায়রে বিধি, হ'ল ভ্রমণকারী।
ঘর-ভোমরার মত তারা ঘুরিয়ে বেড়ায়
দুঃখের কথা বলব কারে হায়।
পাগল : জল ফেলিতে নাই চোখে জল ফেলিতে নাই,
বিধাতা বুড়োর খেলা দেখে যারে ভাই!

[শেষপর্ব]

বাঁশবাঁদির বাঁশ—এ-গানে বহুমাত্রিক। তার প্রথম মাত্রা, হাঁসুলীবাঁকের হত দরিদ্র মানুষ-মানুষীর সংস্কৃতিকে প্রাকৃতিক আবেষ্টনী প্রদান। এই আবেষ্টনী হল কাহার-সংস্কৃতির আলো-অন্ধকারের সরব প্রাণচাঞ্চল্যকে ধরার মতো একটি ক্ষেত্র রক্ষা। দ্বিতীয় মাত্রা, এই বাঁশের শক্তির তারতম্য। প্রথম শক্তি আড়াল রাখার সক্ষমতা। বাইরের অভিঘাত বুক ফুলিয়ে বুক চিতিয়ে সহ্য করার শক্তি। দ্বিতীয় শক্তি সাংস্কৃতিক স্বরগম—বাঁশি। এই আলো-অন্ধকারের আশ্চর্য রকমারি বৈশিষ্ট্য বাঁশবাদির বাঁশগুলির দ্বিতীয় মাত্রা। তৃতীয় মাত্রাটি অভিভাবক

দেবতা (Guardian deity) বা পিতৃস্বরূপ (totem) বাবা ঠাকুরের অবস্থিতি। বাঁশবনের আড়ালেই তার অবস্থান। বাঁশগুলিই—বস্তুত কাহারদের শক্তি আর সংস্কৃতির মাত্রাই তাকে দেবত্বের শক্তি দিয়েছে। বাঁশবনের অজগর-চিতা কিংবা উপন্যাসে প্রথমদিকে যাকে চন্দ্রবোড়া বলা হয়েছে— সেই সাপ তার বাহন। সাপ জীবন-মৃত্যু বিষ-অমৃতের রহস্য—ক্রান্তীয় বিশ্বের চিরন্তন এক প্রতিনিধি। মিশর-মেসোপোটেমিয়া থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ—লাতিন আমেরিকার জীবননীতি ধর্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতীক প্রতিনিধি। চতুর্থ মাত্রাটি কতকাংশে রূপক। বাংলা রূপকথার অনুষঙ্গে গোষ্ঠীসমাজ কেমন করে তাদের জীবনপ্রবাহের উৎস-মূলটি রক্ষা করে—প্রাণ-ভোমরা। প্রাণ-ভোমরাটি রক্ষা করত ঐ সাপ। ঠিক যেন একটি উপকথা। কিন্তু ঐ সাপের মৃত্যু ঘটলে করালী যে কিনা কাহার সমাজের যে অভিব্যক্তি কর্তাবাবার জীবন্ত প্রতিনিধি তার সমান্তরালে আধুনিকের এক 'ডাকাবুকো' সংস্করণ। পঞ্চম মাত্রা হল বাইরের অভিঘাত। এর প্রধান ধাক্কাটি এল বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে। বাঁশবনের ঝাঁপি ভেঙে প্রাণ-ভোমরা থেকে ঘর-ভোমরায় পরিণত হল কাহাররা। রূপকের রহস্য ত্যাগ করে বাস্তবের কঠিন মৃত্তিকায় এসে পড়ল তারা। গোটা উপকথার নির্যাস এই গান।

উপকথার উপসংহার হিসাবে পাগল নসুবালার যৌথ জীবন উপস্থিত করে তারাশঙ্কর আর একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কাহার সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী সমস্ত চরিত্রই নিঃসন্তান। পরম পলাতক, বনওয়ারী উত্তরাধিকারহীন, ঘরভাঙাদের বংশ নেই। সুচাঁদের কন্যা বসন্ত, বসন্তের কন্যা পাখি—আত্মহননের দ্বারা পাখি নিজের অস্তিত্বে ছেদ টেনেছে। বসন্ত উপকথার উপাদান হলেও সঞ্চালক নয়। পা ভেঙে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে ফিরে কোনোক্রমে চলে সুচাঁদের জীবন। জানে, তার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হবে উপকথা। পাগল-নসুবালার যৌথ জীবনও উত্তরাধিকারহীন হতে বাধ্য। একমাত্র সম্ভাবনা অনাগত ভবিষ্যৎ—করালী। সে কি ফিরতে পারে? কোনোদিন? হাঁসুলীবাঁকে করালীর উপস্থিতি দেখে পাগল 'মনে মনে' বেঁধে ফেলে 'নতুন গান'—

> যে গড়ে ভাই সেই ভাঙেরে, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে;
> ভাঙা গড়ার কারখানাতে, তোরা দেখে আয়রে উঁকি মেরে।

ভাঙা গড়ার কারখানা—আসলে জীবননাট্যের নাগরদোলা। তাই বোধহয় পায়ের নূপুর থামতে চায় না নসুবালার। গেয়ে ওঠে হাঁসুলীবাঁকের প্রথম দিকের ঘেঁটুগান—'তাই ঘুনাঘুন'। হাঁসুলীবাঁক যেমন চলতে চলতে বাঁক নেয়—প্রবাহ উৎসমুখে যায় না। কাছাকাছি আসে এই মাত্র।

৬

হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ লিখেছেন-সমালোচকরা ভুলে যান যে, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র 'কাহার-সমাজ' আপনার (তারাশঙ্করের—অ. বি.) কল্পিত একটি সমাজ মাত্র। বাস্তবে এমন কোনও সমাজ নেই। ছিল না।' ("মাননীয় তারাশঙ্কর সমীপেষু", প্রদ্যুম্ন ভট্টচার্য সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য* গ্রন্থভুক্ত : উক্ত; ১০৪ পৃ.) সম্পাদক প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য অবশ্য এই সিদ্ধান্তে সামান্য আপত্তি জানিয়ে গিয়েছেন একটি টীকায়। তারাশঙ্করের 'আমার কথা' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন-'হাঁসুলীবাঁকে কাহাররা আছে। তাদের জীবনযাত্রায় বা সামাজিক বাস্তবতায় আমি অতিরঞ্জন করিনি কিন্তু তবুও বলব যে এর বৈচিত্র্যের যে উজ্জ্বলতা তা আমার কল্পনার অনুরঞ্জনে।' সিরাজের মতামত আর তারাশঙ্করের মন্তব্য কেন এতটা ভিন্নমুখী? একদা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নাকি হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের একটি 'এথনিক গ্রুপ' ভেবেছিলেন, 'বাউড়ি'-দের ব্যবহৃত কিছু শব্দ টুকে রেখেছিলেন—তিনি জানতেন না, 'যারা পাল্কি কাঁধে নেয়', তাদেরই 'কাহার' বলা হয়।'—সিরাজের মন্তব্য। বিষয়টি গুরুতর।

প্রথম কথা কাহার বলে কোনো জনগোষ্ঠী আদৌ ছিল না—এ-ব্যাপারে তারাশঙ্কর নিজেই নাকি ভুল ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কলকাতা মহানগরীর 'ছিন্নমূল মানসিকতা' স্পষ্ট হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শব্দ সন্ধানে। এর সঙ্গে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের পাদটীকার মিল হচ্ছে না। মনে হয় তারাশঙ্কর একসময় কাহারদের স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠী বলে গণ্য করেন নি। পরে সিদ্ধান্ত বদল হয়। বিশেষত 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাঠ খেয়াল করলে মনে হয় কাহার আর বাউরি সমাজ তারাশঙ্করের চোখে অন্তত সে-সময় একই ছিল।

'কাহার' শব্দটি বেশ পুরোনো। স্যর গ্রেভস হাউটন তাঁর *Bengali Sanskrit Dictionary* -তে প্রস্তাব করেছেন— 'the word may be a corruption of *Kandh bhar*, meaning a man who bears burdens on the shoulder'... (পশ্য : এইচ. এইচ রিসলে : *The Tribes and Castes of Bengal*, কলকাতা-১৮৯১; আমরা দেখছি ফার্মা, কে. এল. মুখোপাধ্যায়-এর পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৮; কলকাতা 370 পৃ.) 'কাহার' শব্দটি আছে *শব্দকল্পদ্রুম*-এ। 'কাহারক' বলতে ভারবাহক—*শব্দকল্পদ্রুম* তেমনি অর্থ দেওয়া হয়েছে। (পশ্য . বরদাপ্রসাদ বসু প্রকাশিত ১৮৮৬ খ্রি) *প্রাকৃতকোষ*-এ 'কাহার' শব্দ জলাহারক অর্থে প্রযুক্ত। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর লিখেছেন শিবিকাবাহক কাহারদের কথা। *শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল*-এ একই অর্থে কাহার শব্দের উল্লেখ আছে। নরসিংহ বসুর 'ধর্মমঙ্গল'-এ আছে—'পালিকির কাহার পবন বেগে ধায়'। *আলালের ঘরের দুলাল*, *নবীনতপস্বিনী*-তে কাহারবৃত্তির কথা স্পষ্ট। *নবীন তপস্বিনী*-তে আছে—'কাঁদ ফুলে ঢিপিপানা হয়েছে, ভাল কাহারি কত্তি গিইলি'। সুতরাং কাহার-বলে কোন সমাজ বাস্তবে নেই, কোনদিন ছিল না, বলা সাহসের কথা। বাংলার পশ্চিম অঞ্চলে কাহারদের অস্তিত্ব ছিল—শুধু পশ্চিমই বা কেন সমগ্র বাংলাতেই কাহাররা ছিল। নিচের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিচয় থেকে আমাদের কথা স্পষ্ট হবে।

জেলা	১৮৭২	১৮৮১
বর্ধমান	১,১৫৬	১,৭৪৪
বাঁকুড়া }	১২৪	৫৭১
বীরভূম }	৯৩৮	২,৮৭৩
মেদিনীপুর	১,১৯৩	৩,১৫৬
হুগলি	৯৪৭	১,৪০৯
হাওড়া		২,০০৫
২৪ পরগনা	১০,৪৯১	২,৯২১
নদীয়া	২,৫৮৩	১,৫২৬
যশোহর	৩,৪৬৬	৪,৭০৭
মুর্শিদাবাদ	৩,৪১৬	৪,৭৬৯
দিনাজপুর	৭৫৮	৩,৬৬১
রাজশাহি	৫২০	১,২০৯
রংপুর	৭০৭	৩,৯৩৬
বগুড়া	২১১	৮৬৪
পাবনা	৩৭৬	২,৬৫৬
দার্জিলিং	৪৯	৯৬৪
জলপাইগুড়ি	১৭৮	১,৫৭৭
কুচবিহার	....	১৮৭
ঢাকা	১,৪৩৬	১,৮৯৮
ফরিদপুর	১,৯১০	৩,৮৪২
বাকরগঞ্জ	৫৫৭	৩৬১
মৈমনসিংহ	১৯৯	৪,২৭৩
চট্টগ্রাম	৭	২,০৬৩
নোয়াখালি	১,১৪৮	১,৭৭৬

[সূত্র: রিসলে : *The Tribes and Castes of Bengal* প্রথম খণ্ড : উক্ত; 375 পৃ.]
রিসলের সময় বাংলা অনেক বড়। বিহার উড়িষ্যার বিস্তৃত অঞ্চলের তথ্য সমাবেশ করেছেন তিনি। আমরা লক্ষ করছি ১৮৭২ থেকে ১৮৮১-তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাহারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোথাও দ্বিগুণ তিন গুণ বা তারও বেশি। সংখ্যাবৃদ্ধি পাওয়ার কারণটি বুঝে নেওয়া দরকার। ৪৯ থেকে ৯৬৪ (দার্জিলিং) আর ৭ থেকে ২,০৬৩ (চট্টগ্রাম) বিস্ময়কর বৃদ্ধি। কমেছে ২৪ পরগনা, বাকরগঞ্জ জেলায়। বস্তুত নদী-বহুল অঞ্চলে পালকি-বহন খুব সহজ কর্ম নয়। সম্ভবত নীলকুঠি, অন্যান্য প্রয়োজনে আসা সাহেবদের সঙ্গে সঙ্গে কাহারদের আগমন, জমিদারদের মান-মর্যাদার নির্দেশক হিসাবে পালকি থাকার ব্যাপারটি যেমন যেমন বৃদ্ধি পেল কাহারদের সংখ্যা তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে।

'সেঁজুতি ব্রতের আলপনা আঁকার সময় একটি ছড়ায় পাচ্ছি পালকি কেমন করে সামাজিক মর্যাদার পরিচয় বহন করছে তার প্রমাণ।

দোলায় আসি দোলায় যাই
সোনার দর্পণে মুখ চাই।
বাপের বাড়ির দোলাখানি
শ্বশুর বাড়ি যায়।
আসতে যেতে দুই জনে
ঘৃত মধু খায়।।

[পশ্য : *বাংলার ব্রতপার্বণ* : ড. শীলা বসাক ; পুস্তক বিপণি ; কলকাতা ; ২০০০ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৯৮;১৪৫ পৃ.]

কাহাররা কাল্পনিক কোনো জনগোষ্ঠী নয়। সোনার দর্পণে মুখ দেখা বধূর স্বপ্ন বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ির দোলা আসবে যাবে—পথে দেখা হবে তাদের। আর একটি ব্রতের ছড়ায় আছে একই রকম স্বপ্নাচ্ছন্নতা :

ফাগুন কুনা গুণ ফাগুনা
গুণনিধি হৈল গুয়া লই পান
ঘাটে দোলা পথে ঘোড়া
উঠানে ফাগুন কুনা
খাটালে খাট

[ড. শীলা বসাক : উক্ত গ্রন্থ :৪৭ পৃ.]

ঘাট-পথে দোলা আর ঘোড়া—বাঙালি ভদ্রজনের সম্মান ও প্রতিপত্তির চিহ্ন।

পালকি সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে—বাংলার লোকসমাজের লোকশিল্পের সঙ্গে পালকির সম্পর্ক আছে। এসব বহুদিনের পরিচয় না থাকলে অসম্ভব। পালকির জন্য তৈরি হত দু-রকম নকশি কাঁথা। ১. 'খাট দোলাই' আর ২. 'টোপর কাঁথা'। প্রথমটি পালকির ভিতর পাতার জন্য, দ্বিতীয়টি পালকির উপরে রাখার জন্য। কুমারখালির খাট দোলাই বেশ বিখ্যাত ছিল। (পশ্য: *লোক ঐতিহ্যের দশ দিগন্ত*, তোফায়েল আহমদ। বাংলা একাডেমি ; ঢাকা ; বাংলা দেশ ; ১৯৯৯ ; ১০৪ পৃ.) 'বহুল ব্যবহৃত পালকি ও ডুলি কারুমণ্ডিত' করার প্রমাণও পেয়েছেন তোফায়েল আহমেদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুরূপ কারুমণ্ডিত পালকি-ডুলির পরিচয়ও সংগ্রহ করেছেন। (পশ্য: ঐ ৯৪ পৃ.) পালকি শব্দটি পর্তুগিজ palanquin থেকে এসেছে। ফারসি ফালকি শব্দও বোধকরি পর্তুগিজ শব্দজাত।

আইন-ই আকবরী-তে নবাবি তাবুর বাইরে পালকি বেহারা কাহারদের থাকার স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। (পশ্য : প্রথম খণ্ড, চিত্র নং ৪— The Imperial Camp, পৃ. 50, 11নং অংশ ; আমরা দেখছি—এইচ. ব্লকমান-এর অনুবাদ, যদুনাথ সরকারের সম্পাদিত পাঠ ; *The Ain-I Akbari*, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা; 1993 সংস্করণ) *আইন-ই আকবরী*-তে স্পষ্ট আছে পালকিবাহক কাহারদের সংবাদ, বিবরণ। এরা কাহার (ব্লকমান-এর বানান Kuhar)। এদের সম্পর্কে আবুল ফজল জানাচ্ছেন : 'They form a class of foot-servants peculiar to India. They carry heavy loads on their shoulders, and travel through mountains and valleys. With their *palkis, singhasans, chaudols* and *dulis*, they walk so evenly that the man inside is not inconvenienced lay any

joltings. (ঐ ; 264 পৃ.)। এই 'class of foot servants'-দের সংখ্যা দিল্লির রাজপ্রসাদে ছিল অজস্র (several thousand)। এদের মধ্যে বিশেষ যারা ভালো কাজ করত তাদের ছিল দুটি ভাগ—১. যারা দাক্ষিণাত্য থেকে আসত (from the Dakhin) আর ২. যারা আসত বাংলা থেকে (From Bengal) । কাহার-রা যে কাল্পনিক সমাজ নয় তা বোধহয় আপাতত প্রমাণ করা গেল।

বাংলার কাহাররা মিশ্র সম্প্রদায়। সিরাজের এই উক্তির সামান্য ভিত্তি আছে। বাগ্‌দি-বাউরি-দুলে প্রভৃতি সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেউ কেউ পালকি বহন করলেই 'কাহার' বলে পরিচিত হত। শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ জানিয়েছেন—'বাগ্‌দিরা প্রথমে কী কাজ করিতেন তাহা জানিতে পারা যায় না। এখন এদের অন্যতম বৃত্তি 'পালকি বহন'। (পশ্য : শৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ *বাঙালি জাতি পরিচয়*; সম্পাদক— বিমলচন্দ্র রায় ও অজয় বসু ; সাহিত্যলোক, কলকাতা ; ২০০৬ ; প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ ; ৯১ পৃ.) দুলে-রা বাগ্‌দিদের একটি শাখা। তারা 'সাধারণত ডুলি পালকি বহন করেন'। (তদেব) অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে পরিবেশিত একটি সংবাদ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'আগে দুলে বাগ্‌দিরা পালকি বাহকের কাজ করতেন। পরে এঁদের অনেকেই ভূমিহীন কৃষিমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন।' (ঐ ; ৯৩ পৃ.) ঠিক যেন হাঁসুলীবাঁকের মানুষগুলির জীবন জীবিকার পরিবর্তনের ইতিহাস এখানে।

কাহাররা মিশ্র সম্প্রদায় তার ইঙ্গিত রিস্‌লের বিবরণের একাংশে পাচ্ছি। ছোটনাগপুরে তিনি শুনেছেন ('I have even heard') আসল কাহারদের অভাবে অন্য জাতদের মধ্য থেকে তৈরি করা হয় কৃত্রিম কাহার— 'that they have manufacturcd *(banaya)* Kahars out of Bhuiyas, Rajwars, and the like' (উক্ত; 373 পৃ.) তবে এই কৃত্রিম কাহারদের কাছ থেকে ঠিকমতো কাজ পাওয়া যায় নি। নেসফিল্ড জানিয়েছেন কাহাররা মৎস্যজীবী সমাজ থেকে এসেছে— 'offshoot from one of the fishing castes'(ঐ); এদের ছিল অনেক রকমের পেশা। যেমন :

১. উচ্চবর্ণের মানুষের জন্য জল বহন ('drawing and bringing water for the bath or the table') ;

২. জামা-কাপড় সাজিয়ে রাখা ('taking care of cloths') ;

৩. ঘর-বাড়ি পরিচ্ছন্ন রাখা ('dusting the rooms') ;

৪. আটা মাখা ('Kneading the *chapati* preparatory to cooking it') ;

৫. পালকি বহন ('carrying the palanquin') ।

নেসফিল্ডের মত রিসলে মানেন নি। উচ্চবর্ণের মানুষদের খাদ্য-পানীয় সরবরাহ আর পালকি-বহন একই সঙ্গে একই গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়—মৎস্যজীবী গোষ্ঠী থেকে আসা কোনো জনগোষ্ঠীর পক্ষে ততদূর স্পৃশ্য হওয়ার নজিরও স্বীকার করেন না রিসলে। কারণ— 'the fishing castes have always been regarded as specially unclean'. কাহাররা মিশ্র জাতি ঠিকই, কিন্তু তাদের উৎস বেশ রহস্যময়।

একটি কিংবদন্তি পাওয়া যাচ্ছে বিহার অঞ্চলে। কেমন করে কাহার জাতির জন্ম হল। মগধ-রাজ জরাসন্ধের সঙ্গে কাহারদের সম্পর্ক রচিত হয়েছে ঐ কিংবদন্তিতে। ঈশ্বর গড়ে ছিলেন এক চমৎকার বাগান—গিরিয়াক পাহাড়ের কাছে রাজগির অঞ্চলে। বৎসরব্যাপী খরায় সে-বাগান প্রায় ধ্বংস হল। ঘোষণা করা হল এই বাগানে একরাত্রে গঙ্গার জল এনে দিয়ে যদি

কেউ আগের মতো করতে পারে তাকে দেবেন অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা। কাহারদের প্রধান চন্দ্রাবত এই অসম্ভব কাজ করলেন। অসুরবাঁধ নামের একটা বড় বাঁধ তৈরি করলেন চন্দ্রাবত। তাতে এল পাহাড়তলীর বাওন গঙ্গার জলধারা, সেই বাঁধ থেকে 'চাঁড়'-বেঁধে জলসেচের ব্যবস্থা করলেন চন্দ্রাবত। ঈশ্বর দেখলেন তার কন্যাকে নিচু জাতের চন্দ্রাবতের হাতে সঁপে দেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই! কাক-মুরগি ডেকে উঠল তার চক্রান্তে— কাহাররা পণ রাখতে পারেন নি, এই বলে তামাসা করলেন তিনি। পাছে ঈশ্বর তাদের উপর অত্যাচার শুরু করেন, তারা পালাতে থাকলেন— যে যেদিকে পারেন সেদিকে। এই ব্যবস্থায় যারা বাঁশ ধরেছিল ('those who took the bamboos') তারা হল কাহার, যারা ধরেছিল দড়ি তারা হল 'মগধিয়া ব্রাহ্মণ' আর বাকিরা হল 'ধানুক' আর 'রাজওয়ার'। গল্পে বলা হয়নি এদের নাম কেন হল। ঈশ্বর করুণাবশত সাড়ে তিন সের 'আনাজ' প্রদান করলেন। আজ পর্যন্ত তা-ই হল কাহারদের মজুরি। 'অসুরবাঁধ' আর রাজগিরের সঙ্গে সম্পর্ক আর সেই সূত্রে কাহাররা জরাসন্ধের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে চায়। বোঝা যায়, তারা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অন্তর্গত ছিল না—এসেছে, বাইরের কোন অবস্থা থেকে। অন্যথায় এই কাহিনীকে 'absurd story' বলেই গণ্য করতে হয়।

কাহার সমাজের কয়েকটি উপগোষ্ঠী আছে।

১. রাওয়ানি/ রমানি ; ২. ধুরিয়া ; ৩. ধিমার ; ৪. খারওয়ারা ; ৫. তুরহা ; ৬. যশওয়ার ; ৭. গরহুক বা গরাউয়া ; ৮. বিসরিয়া এবং ৯. মগহিয়া।

গয়ার কাছে রমনপুর নামক স্থান থেকে এরা ছড়িয়ে পড়েছে—এরকম লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। কোন এক সময় রমনপুরের কাহার মাতব্বর দুই বিয়ে করেছিল। এক সতীন যশপুরে যেতে বাধ্য হয়। তার সন্তানরা যশওয়ার গোষ্ঠী বলে পরিচিত হয়। যারা থেকে গেল রমনপুরে তারাই রাওয়ানি বা রমানি। ধুরিয়া-রা নৌকা চালায়, মাছ ধরে আবার অন্য কাজকর্ম বিশেষত কৃষি মজুরের কাজও করে। খারওয়ারাদের উৎস ভূমি খড়িয়াগড় এরকম জনশ্রুতি আছে। এরা প্রধানত পালকি বহনকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছে। তুরহারা মাছ ধরে, কেনা বেচা করে মাছ, আনাজপত্র চাষ আবাদ করে। তারাও সময় সুযোগমত পালকি বহন করে।

কোন কোন অর্বাচীন স্মৃতিতে কাহারদের ব্রাহ্মণ পিতা আর নিষাদ বা চণ্ডাল জননীর সন্তান বলা হয়েছে। (পশ্য : এইচ. এইচ. রিসলে : *The Tribes and Castes of Bengal* : উক্ত ; 370 পৃ.) রিসলের সিদ্ধান্ত : 'the Kahars may perhaps be regarded as a mixed caste, since their ranks have probably been recruited by members of other castes who adopted the same profession. (ঐ) বাংলার বাগ্দি বাউরিদের মহিলাদের সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষের সম্পর্ক ঘটলে—তাদের সন্তানাদি যেমন বাগ্দি বা বাউরি বলে পরিচিত হয়, তেমনি 'children of Kahar women by men of those castes (উচ্চবর্ণের বিভিন্ন গোষ্ঠী—অ. বি.) on condition of performing certain religious ceremonies and giving a feast to the heads of the castes' (উক্ত ; 370 পৃ.) হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজে এইরকম অন্তর্ভুক্তির পরিচয় মিলেছে। বসন্তের কন্যা পাখি— 'বসন্তের ভালবাসার ইতিহাস ও অঞ্চলে বিখ্যাত।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পাখির রূপ হলুদমণি পাখির মতো—উজ্জ্বল। তার কারণও কাহার সমাজে অবিদিত নয়। সাহেবদের সময় থেকেই এরকম ঘটনার পরিচয় মিলছে। 'সেই আমল থেকে কাহারদের কয়েকটা ঘরে রূপ এসে বাসা বেঁধেছে। পরম কাহারদের গুষ্টিটার রঙই সেই আমল থেকে ধবধবে ফরসা। সুচাঁদ

পিসির কর্তাবাবা অর্থাৎ বাবার? রঙ একেবারে সাহেবদের মতো ছিল। সুচাঁদ পিসির রঙও ফরসা। মেয়ে বসন্ত খুব ফরসা নয়। কিন্তু ওর মেয়ে পাখি তো একেবারে 'হলুদ মণি' পাখি...।' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) চৌধুরীবাড়ির কর্তার ছেলের সঙ্গে 'যুবতী পাখির এখনকার মুখের' আশ্চর্য মিল। চোখ-নাক-চুল—একই রকম। এ যেন তারাশঙ্করের নৃতত্ত্ব বর্ণনা।

নৃতত্ত্বের বিচারে নরগোষ্ঠীর পরিচয়-চিহ্ন ধরা থাকে ঐ তিনটি সূত্রে। নৃতাত্ত্বিকরা 'hair form and inheritance'-এর সূত্র প্রয়োগ করে জানিয়েছেন চুলের আকৃতি প্রজনন ভিত্তি নিয়ন্ত্রণ করে। নাকের সূচ্যঙ্ক (Nasal index) আর চোখের রং, অক্ষিপুটের ভাঁজ (Epicanthic fold) প্রভৃতির দ্বারা মানুষের গোত্র নির্ণয় নৃতাত্ত্বিকদের অন্যতম সন্ধানের বিষয়। পাখির রূপ বর্ণনায় এগুলিকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর কাহার সমাজের উপর নেমে আসা উচ্চবর্গের যৌন শোষণকে (Sexploitation)-কে শনাক্ত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য নিম্নবর্গের মনোজগৎকে স্পর্শ করে নি। কারণ মনে হয় হাঁসুলীবাঁকের সমাজটির যৌন সম্পর্কিত বিধিনিষেধ অত্যন্ত শিথিল—এ তাদের 'শাকঢাকা মাছ'।

অবশ্য সবসময় এইরকম অনাচার তাদের সমাজ মেনে নেয় না তা বলাই বাহুল্য। বাইরের আবরণ রাখতে হয়। পাখি যখন বসন্তের পেটে তখন সুচাঁদ খুঁজে আনে 'এক জরাজীর্ণ খোঁড়া কাহারের ছেলেকে'। তাকে ঘুষ দিয়ে 'পাখির পিতৃত্বের দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে' সুচাঁদ বসন্ত আর পাখিকে রক্ষা করেছিল। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) পিতৃত্ব-নিরূপণের ব্যাপারটি সমাজ বিবর্তনের অত্যন্ত গভীর ও বহুমাত্রিক সূত্র। মহাকাব্যে-রূপকথায় পিতৃত্ব নিরূপিত হয় দৈব অনুগ্রহে। কখনো চরু উপহার দেয় যজ্ঞ-পুরুষ—তা খেয়ে রানিদের সন্তান হয়। কখনো নিয়োগ করা হয় সদ্য স্বামীহারা বধূদের উদ্দেশ্যে—সন্তান হয়, তাদের বলা হয় কোনো বিশেষ রাজবংশের উত্তরাধিকারী। এখানে বিষয়টি ধূলি মলিন রূপে উপস্থিত। তবে ইঙ্গিতটি নজর এড়ায় না।

পাগল কাহার হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'পাগলের মা অণ্ড খেলেছিল বোষ্টম আজমিস্ত্রী আখাল আজা দাস বোষ্টমের সঙ্গে।' রাজমিস্ত্রি রাখালরাজা দাস বোষ্টম এসেছিল কাটোয়া থেকে। 'পাগলের গায়ে আছে সেই বোষ্টমের অক্ত।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) বৈষ্ণবরা কাহারদের তুলনায় সামাজিকভাবে সম্মানজনক অবস্থানে বাস করে। কিন্তু রাখালরাজা চলে যাবার পর পাগল পিতৃসূত্রে বৈষ্ণব হয় নি—কাহার কুলে তার অন্তর্ভুক্তি বা 'admisson' ঘটেছে। কাহার সমাজের মিশ্রতার এ আর-এক মাত্রা। রিসলে যেমন বিবরণ দিয়েছেন, একটু উদ্ধার করছি : 'in any case the admission of the children of kahar woman by men of higher castes must have had some effect on the type.' (উক্ত ; 370 পৃ.) পাগল কাহারের ব্যবহারে যে উদাসীন প্রকৃতি ('উদোমাদা'-ভাব), সঙ্গীতপ্রিয়তা, কোন আর্থিক বা সামাজিক সম্পর্কে লিপ্ত না থাকা—গা-ছাড়া ভাব, কাহার সমাজের সংকটে একটু আলতো ভাবে যোগ দেওয়া, আর আনন্দে আবেগ-আততির উচ্ছ্বাস—এসবই এই 'effect on the type' বলে মনে হয়।

সাধারণভাবে কাহাররা কালো। তারাশঙ্করের ভাষায় 'উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা-ভোমরীর মত কালো কাহারদের মেয়ে-পুরুষরা' (শেষ পর্ব) কিংবা উৎসর্গপত্রে বলা কথা গুলি—'তাদের প্রাণের ভোমরা-ভোমরীর কালো রঙ ও গুঞ্জন'। অন্যথায়, কখনো কখনো তাদের মধ্যে 'রূপ'-এর তারতম্য দেখা যায়। পরম-সুচাঁদের ঠাকুরদা বা পাখি কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। তারাশঙ্কর হাঁসুলীবাঁকের দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তন সংযোজনের জন্য কি

এইচ. এইচ. রিসলে একটু দেখেছিলেন? জানিনা। তবে এই বিষয়টির সঙ্গে তারাশঙ্করের বর্ণনার মিল গভীর। কেমন করে হাঁসুলীবাঁকের নরনারীর মধ্যে নতুন অভিঘাত এসেছে তার বিবরণ একটু লিখেছি। রিসলে লিখছেন : 'The physical appearance of the caste rather bears the view that they are of mixed descent. Their features often approach the Aryan type, but they generally have darker complexions than are met with among the higher castes'. (উক্ত ; 370 পৃ.) বিষয়টির অন্য কিছু ব্যাখ্যান থাকা সম্ভব। নারীরা এই সমাজে সিদ্ধান্ত নেবার মতো অবস্থায় আছে। সুচাঁদ তো উপকথার ধারক— সমাজের পরিচালক বললেই ঠিক বলা হয়।। কর্তবাবার বছরশালী পুজো ছাড়া অন্য পুজো কখন করতে হবে—তার নির্দেশ তার মাধ্যমেই আসে। সমাজের সমস্ত মানুষের উপর তার ধর্ম সাংস্কৃতিক অধিকার। জমি বন্দোবস্ত নিতে হলে আরো একটা পাঁঠা উপহার দিতে হবে কর্তাবাবার উদ্দেশ্যে—বনওয়ারীকে মনে করিয়ে দেয় সুচাঁদ। বাঁধভাঙা কোপাইয়ের মতোই কাহার মেয়েরা রীতি নিয়ম শৃঙ্খলা আমান্য করে অং-এর খেলায় মাতে। এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার নিশ্চয় কতকটা স্পষ্ট হয়। আর তাদের প্রাধান্য আভাসিত হয় গর্ভস্থ সন্তানকে স্ব-সমাজের অন্তর্গত রাখার মধ্যে।

বর্ণব্যবস্থার উচ্চাবচতা ক্রমিক অধঃক্ষিপ্ত করতে থাকে পাপ, লোভ আর আকাঙ্ক্ষার বিকৃতি। বনওয়ারীও যে সে-কথা ভাবে না তা নয়। তবে তার ভাবনা অন্য খাতেও বয়। লেখক জানাচ্ছেন বনওয়ারী সেই ভাবনা—'পাপ পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, সে বুঝতে পারে মেয়েলোকদের সতীত্বের মূল্য। কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছেন সৎজাতেরা, তাঁদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে।......কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথায়?' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) তবে ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শ তারা এড়িয়ে চলে। কালোশশী ছিল ব্যতিক্রম। পরমের অনুপস্থিতিতে (পরম জেল বাস করছিল যখন) 'চন্ননপুরে বড়বাবুদের দারোয়ান ভূপসিং মহাশয়ের সঙ্গে লোক জানাজানি করেই ভালোবাসা করেছিল।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পরম জাঙলের 'নফর দাসের বোনের বাড়িতে সন্ধ্যে কাটাত!' (ঐ) 'পশ্চিমে সাউ তামাকের কারবার' করা একজন—নয়ানের বাবার বাবার বাবা অমাই-এর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রীকে আশ্রয় দিয়েছিল। প্রেত হবার পর অমাই নাকি বলেছিল—'সাঙা করিস না'—'তাহলে ঘাড় দুমড়ে দোব।' তামাক ব্যবসায়ী মানুষটির আশ্রয়ে ('ভদ্রলোকের আশ্চয়ে') থাকলে কোন ক্ষতি হবে না! (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) হেদো মণ্ডলের সঙ্গে সায়েবডাঙ্গার জমি তৈরির সময় সুচাঁদ কথা বলছিল। নয়ান হেঁপো রুগী, পাখির সঙ্গে 'ছাড়বিড়' না করে তার সঙ্গে করালীর বিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি—এই ছিল তার মত। নয়ান 'নামের মরদ নামে থাকুক। পাখির উঠতি বয়স, কিছু ওজগার টোজগার করে লে।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীও রুগ্ণ 'নয়ানের একটি সাঙা দেবে' ভেবেছে। 'মেয়েটির রীতিকরণ একটুকুন চনমনে', বদনাম আছে। 'তা থাক, নয়ানের মায়ের ভবিষ্যৎ ভেবেই এমন মেয়ে সে ঠিক করেছে। নয়ান যদি সেরে না ওঠে, তবে ওই মেয়েই রোজগার করে নয়ানের মাকে খাওয়াবে।' (২য় পর্ব সাত পরিচ্ছেদ) এই দৃষ্টিভঙ্গি নারীদের স্বেচ্ছাবিহারকে আর্থিক বা অন্যবিধ স্বার্থে মেনে নেওয়া। আদিতে এখানে নারীদের অধিকার ধরা পড়েছে বলে মনে হয়।

কাহার ছাড়াও হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় আছে আরও বেশ কিছু মানুষ। লেখক তাদের উপর আলো কম ফেলেছেন। তবে এই সব মানুষ মিলিয়ে একটি বড় সমাজ-শরীর তৈরি

হয়েছে উপন্যাসে। হাঁসুলীবাঁকে ভদ্রজন যারা তারা হল—১. কুমার-সদ্‌গোপ ; ২. চাষি-সদ্‌গোপ ; ৩. গন্ধবণিক ; ৪. নাপিত ; ৫. তন্তুবায়। এদের মধ্যে চাষি-সদ্‌গোপদের সঙ্গে নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়েছে কোশকেঁধে কাহাররা। এই কাহারদের রিসলে চিহ্নিত করেছেন চাষি আর পালকি বেহারা হিসাবে –'a large cnltivating and palanquin-bearing caste'(উক্ত ; 370 পৃ. এছাড়া পাশাপাশি থাকে আরও কিছু মানুষ—হাড়ি, ডোম বা মুচি।—'জাঙলে ঘর কয়েক হাড়ি ডোম আছে, মুচি আছে, আগে তারাই করত জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়দের জমি।' কাহারদের সঙ্গে শ্রমের প্রতিযোগিতায় 'আজ তারা হটে গিয়েছে।' একসময় চাষবাস তেমন জানত না কাহাররা—এখন 'তাদের চেয়ে ভাল চাষী 'মুনিষ' এ চাকলায় নাই।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) মহিষ ডহরীর বিল অঞ্চলে যে গ্রাম—হাঁসুলীবাঁকের পূর্বপারে সেখানে আছে ডোমদের বসত। রামকালী ডোম-এর বাড়ির উপর দিয়ে চলে গেছে ভয়ঙ্কর জলস্তম্ভ। 'মহিষ ডহরীর ডোমপাড়ার ধারে'—'রামকালী ডোমের ঘরের উপর' কি আক্রোশে এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটল তা কাহাররা জানে না। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) আছে সাঁওতাল কৃষি শ্রমিক। তারা সাহেবডাঙার জমিতে চাষ করে। কাহাররা তাদের সঙ্গে পেরে ওঠে না। গ্রামের বাইরে সাহা বাবুদের পানশালা। সেখানে মদ খেতে গেছে জেলে, সাঁওতাল, বাগ্‌দি, ডোম, হাড়ি, বাউরি, কাহার সবাই। তবে যে যার জাতের নিয়ম মেনে চলে তারা। পরম ডোমদের সঙ্গে আসরের মাঝখানে গিয়ে মদ খেলে বনওয়ারী সিদ্ধান্ত করে 'এ তো পরমের ডোমে জাত দেওয়া হল।' (৩-য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) বস্তুত জাত-নীতির অন্যতম সূত্র inter-dining. এখানে সে নীতি অমান্য করেছে পরম। একটু পরে তীব্র সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে তারা। পরম পরাস্ত হয়—জিতে বীরের গৌরবে প্রেমিকার কাছে পৌঁছয় বনওয়ারী।

বাউরিদের সামান্য সংবাদ পাচ্ছি পাখির মারফৎ। কোঠাবাড়ি না করার নিয়ম কাহার সমাজের। করালীর কোঠাবাড়ি তৈরির ব্যাপারে সমাজে তরঙ্গ উঠেছে। পাখি বলেছে—'চন্নপুরের বাউরীরা কোঠাঘর করেছে—হারু বাউরী, শম্ভু বাউরী, কানাই বাউরী।' [৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

হাঁসুলীবাঁকের দক্ষিণ-পূর্বে ঘোষগ্রাম। সেখানকার দাসবাবু বনওয়ারীর প্রশংসা করেছে চন্দনপুরের বাবুদের কাছে। বোঝা যায় অন্য যে-সব জনগোষ্ঠীর সঙ্গে কাহারদের নিত্য সম্পর্ক তাদের সকলের উপর আলো ফেলতে না চাইলেও তারাশঙ্কর একটি নিরালম্ব বিচ্ছিন্ন সমাজ গড়ে তুলতে চান নি। জাঙলের ঘোষদের সঙ্গে কাহারদের সম্পর্ক অনেকটাই পারিবারিক আবেষ্টনী তৈরি করেছে। সে সম্পর্ক জাত-নীতি আর পারিবারিক সংস্কারের মধ্যে অদ্ভুত এক বিনিময় রচনা করেছে। 'বনওয়ারী বড় ঘোষের চেয়ে অনেক বড়, তবু 'জাতে ছোট' বলে বউয়েরা ওকে কাহার দেওর বলে।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) 'বামুন-বউ লাল ঠাকরুণ' চন্দনপুরের মহিলা। অভিজাত এই মহিলার সঙ্গে 'দিদি' সম্পর্ক গড়েছিল পাগল কাহার। একাদশীর পারণ উপলক্ষে পাগলকে প্রসাদ দিতে ভুলতেন না লাল ঠাকরুণ। চন্দনপুরের কারো বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে ছাঁদা নিতেন—'কাহার ভাইকে খাওয়াব'-বলে। (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) নসুবালা মিত্রগোপালপুরে উঠতি অবস্থার কায়স্থবাড়িতে বিয়ের খবর পাওয়া মাত্র সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। 'এ অঞ্চলে বিয়ে বাড়িতে নসুবালার বাধা নিমন্ত্রণ। ও নিজেই নেয় নিমন্ত্রণ। গিয়ে হাজির হয়।' ঝুড়ি নামিয়ে মেয়ের বেশে তার উপস্থিতি। কথা—'এলাম মা ঠাকরুণ, দিদি ঠাকরুণরা। এঁঠোকাটা ফেলব, পাটকাম করব, গান শোনাব। নাচব। যাবার সময় একখানি শাড়ি লোব, খাবার লোব, গুণগান করে নাচতে নাচতে বাড়ি যাব।' (৩য় পর্ব, চার

পরিচ্ছেদ) ফেরার পথে অনেক কিছু আদায় করে আনন্দে চনমন করতে করতে আসছে। বরকে বলেছে—'দাদাবাবু, কাহার বলে আমি ননদ পেটারি পাব না কি? তা হবে না, সে ছাড়ব না আমি—হ্যাঁ।' [৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

নীলকর সাহেবদের কাছে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কোনো অর্থ বা তাৎপর্য ছিল না। তাদের কাছে—'বামুন নাই, কায়েত নাই, সদ্‌গোপ নাই—সব এক হাল।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) তা হোক, তাদের ব্যবহার, বীরত্বপূর্ণ জীবন-চর্যা—সবই যেন কাহারদের স্মৃতিতে উপকথার রঙবাহার হয়ে আসে। রিসলে লিখেছেন : 'many of whose members are employed as domestic servants by Natives and Europeans' (উক্ত) পরিচ্ছেদের সূচনায় এই বিষয়টি পরিসংখ্যানের দ্বারা দেখিয়েছি। বাংলার বিস্তৃত অঞ্চলে কাহারদের সংখ্যা বৃদ্ধি নীলকুঠি প্রতিষ্ঠা, জমিদারি ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করি। তারাশঙ্কর এই পরিবেশের একটি আঞ্চলিক বিবরণ দিয়েছেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকের একটি বিশ্বাসযোগ্য চিত্র এটি।

পালকি বেহারা হিসাবে কাহারদের ভূমিকা তাদের ভূমি-নির্ভর সংস্কৃতিতে প্রবেশের পরেও সামান্য থেকে গেছে। এহল 'ভাঙা পালকি আমল'। এখন আর দরবারে পালকি নিয়ে বসে থাকার বৃত্তি নেই। তাদের এখন ডাক পড়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে। উঁচুজাতের বিশিষ্ট জনকে নিয়ে গঙ্গা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া (তাদের ভাষায় 'জ্ঞান গঙ্গা')—মাত্র এই দুটি কারণে। পালকিও সবার কাছে থাকে না। মিত্রগোপালপুরের কায়স্থরা উন্নতিশীল—তবু তাদের পালকি নেই। পালকি নেওয়া হয় চন্দনপুরের মুখার্জি মহাশয়দের কাছ থেকে। 'মতির ঝালর দেওয়া কিংখাবে মোড়া' সেই পুরোনো দিনের পালকি যাতে 'ডাঁটে থাকত রূপোর মকর মুখ, কি বাঘের মুখ, কি সিংহের মুখ।'—এখনকার পালকি তেমন নয়। তবু, 'কাহারদের কপাল ভাল—বিয়ে রেল রাস্তায় নয়, গাঁয়ের পথে।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) সেই ষোল বেহারার পালকি দুটি ফেরৎ পাঠানোর রীতি জানা গেল। 'পালকি দু-খানির জন্য দুটি বড় মাছ বাবুদের সম্মানী দিতে হবে।' সম্মানী—বিয়ে সাদিতে মাছ; জ্ঞানগঙ্গা নিয়ে যেতে হলে 'ঘি-ময়দার সিধে'। (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এর মধ্যে আছে গ্রাম গ্রামান্তরের মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। এর মধ্য দিয়ে কাহারদের জীবন বাস্তব একটি চমৎকার পটভূমি খুঁজে নিয়েছে।

৭

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : পুরাণ-প্রসঙ্গ

পুরাকথা myth—উপন্যাস পুরাকথা নয়। সমাজের বাস্তব পরিসরে উপন্যাসের হাঁটা চলা। একটি সুনির্দিষ্ট কালখণ্ডে কোন একটি সমস্যার উত্থাপন জটিলতার বহুস্তরীয় মাত্রাকে দেখানো আর পরিণতি—যুক্তির দ্বারা, যুক্তিসিদ্ধ ঘটনার পরম্পরিত শৃঙ্খলে উপস্থাপন উপন্যাসের মর্ম। ফর্স্টার এজন্যই লিখেছেন—'The plot, then, is the novel in its logical intellectual aspects; it requires mystery, but the mystries are solved later an...' (*Aspects of the Novel*, উক্ত; 95 পৃ.) উপন্যাসে উত্থাপিত রহস্য আসতেই পারে কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত পরিণতি না দেখালে উপন্যাস শিল্পের মান ও দায়িত্ব রক্ষিত হবে না। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* এমন উপন্যাস যা এই সরলীকৃত সমাধানকে কতকটা যেন অস্বীকার করে। হাঁসুলীবাঁকের রচনারীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ থাকে শিল্প কাঠামোর অন্য কিছু স্তর। একাধারে তা কালচেতনার সরল ঋজু ভঙ্গিটিতে আঘাত করে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথার* কালচেতনা বৃত্তীয়। তা আবর্তনশীল। নিমতেলে পানুর ছেলেটি যখন সাপের কামড়ে মারা গেল তখন কাহার-সমাজ নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করেছিল এ মৃত্যু দৈব অভিশাপ। খুঁতো পাঁঠা ছিল নিমতেলের সুতরাং পিতার পাপ পুত্রে অর্সেছে। কিন্তু বছর তো অতিক্রান্ত! এক বছরের মধ্যেই তো শাস্তি আসার কথা! হাঁসুলীবাঁকের পুরাকথার নিহিত সত্য বনওয়ারীর ভাবনায় প্রতিভাত হয় তখন—'বছর পার হয়েছে, তাতে দণ্ডকাল ফুরায় নাই। জন্মান্তরে শাস্তি হয়, যুগ পার করে শাস্তি হয়, আদিকাল থেকে হাঁসুলীবাঁকের কর্মফলে কোন্ শাস্তি কবে আসবে কে জানে! তবে আসবে নিশ্চয়।' (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই কালচেতনা পুরাকথাশ্রয়ী। সুচাঁদ কাহারনী আটচল্লিশ সাল শেষ উনপঞ্চাশ সাল শুরুর কথায় মন্তব্য জুড়েছিল : 'বিধেতার তো চুলও পাকে না, দাঁতও ভাঙে না। তার কি? বছর পার করলেই খালাস। সেই আদ্যিকাল থেকে—তারপর কতকটা অভিনয় করে তার প্রত্যয়—'মাথায় চুলের সংখ্যা হয়—তার আর সংখ্যে নাই।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) অনাদি অনন্ত যে কাল তার মাঝখানে চড়কের পাটার মতো এক অদ্ভুত বৃত্তীয় পরিস্থিতিতে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র কথাবস্তু আবর্তিত হতে থাকে।

হাঁসুলীবাঁকের আলোচনায় তাই কিছু ভিন্ন মানদণ্ড প্রয়োগ করতে হয়। আমাদের মনে পড়ে ১৯৫৭ নাগাদ নর্থপ ফ্রাই লিখেছিলেন সাহিত্য সমালোচনাকে হাঁটতে হয় নৃতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়ে। এই তিনটি বিষয় কখনও আবার একাকার হয়ে পড়ে : '...The three subjects of anthropology, psychology, and literary criticism are not yet clearly separated, and the danger of determinism has to be carefully watched'. (*Anatomy of Criticism* ; প্রিন্সটন, নিউ জার্সি, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৭, 108 পৃ.) একই রচনায় আর একটু পরেই তিনি লেখেন : 'Social and cultural history, which is anthropology is an extended sense, will always be a part of the context of criticism.' (ঐ, 110 পৃ.) এইভাবে, *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* আলোচনা করতে হয় ভিন্নতর কোনো মানদণ্ডে। নিছক সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ড নয়—এ-গ্রন্থ

আলোচনার জন্য দরকার পড়ে সমাজ ও সংস্কৃতির গভীর রহস্য সম্পর্কে ধারণা, সংস্কৃতির ইতিহাস আর নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব আর পুরাকথার আন্তঃসম্পর্ককে না জানলে—*হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* বোঝা যায় না।

তরুণ গবেষক শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত লিখেছেন : 'হাঁসুলীবাঁক'-এর কাহিনীর মূল উপজীব্য মিথ বনাম রিয়্যালিটির দ্বন্দ্ব' (পশ্য : *মিথ পুরাণের ভাঙা গড়া* ; পুস্তক বিপণি, এপ্রিল ২০০১; ১১৭ পৃ.) মিথ আর রিয়্যালিটি—ক্রিস্টোফার কডওয়েলের জীবনভাষ্য হতে পারে কিন্তু এ দুই সর্বদাই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে অবস্থান করে না সম্ভবত। ক্লদ লেভি স্ট্রাউস যে গভীর উপলব্ধির সাহায্যে বলতে পারেন পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের পুরাকথাই যে-কোনো মানুষের কাছে কোন-না-কোন তাৎপর্য নিয়ে আসে, অথচ ব্যক্তির লেখা কবিতা অত্যন্ত ভালো অনুবাদ মাধ্যমেও তেমন কোনো তাৎপর্য তৈরি করতে পারে না—অনুবাদ ব্যর্থ হয়; সেই উপলব্ধির মূল রহস্য ভেদ না করে এরকম সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তাঁর সূত্র...'Poetry is a kind of speech which cannot be translated except at the cost of serious distortions; whereas the mythical value of the myth is preserved even through the worst translations.' একই মত রুশ অবয়ববাদী ভাষাতাত্ত্বিক রোমান জেকবসনের। তিনি খোঁজেন কবিতাত্ব—যা কিনা ভাষার একটি বিশেষ সজ্জা পদ্ধতি—শব্দ সাম্রাজ্য অদল বদল করে অর্থ ও তাৎপর্য গড়ে ওঠার রহস্যময় সম্ভাবনা। ভাষাতত্ত্ব আর নন্দনতত্ত্বের সেই অপরূপ বিবেচনা—এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রকাশিত হলে নতুন স্থিতিস্থাপকতার দিকে যেতে বাধ্য। অন্যপক্ষে লেভিস্ট্রাউস থেকে রোলা বার্থ যেভাবে পুরাকথার বিচার করেন তাতে ভাষার চেয়ে সমাজ-ই মুখ্য। ভাষাতাত্ত্বিক সঞ্চালন অপেক্ষা সমাজ-পরিবারের বিবর্তনের এক একটি আদল structure পুরাকথার মূল চরিত্র- বৈশিষ্ট্য তৈরি করে। প্রত্যেক সমাজই অনুরূপ বিবর্তনের অভিজ্ঞতায় অগ্রসর হয়। তাই অনুবাদ নয়—ইঙ্গিত মাত্র মানুষের স্মৃতিসরোবরে অভিঘাত ছড়াতে পারে। সেই রহস্য বাস্তবকে অতিক্রম করে যায়। আমরা বলতে চাই রিয়্যালিটি যেখানে থমকে দাঁড়ায় সেখানে আলো ও আঁধারের এক অদ্ভুত রহস্যময় ভুবন শুরু হয়। সেই ভুবন উপকথার—পুরাবৃত্তের—mythology-র। বস্তুত বাস্তব আর পুরাকথার অতিবাস্তবের মিল নেই। সুতরাং শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী যেভাবে *হাঁসুলীবাঁককে* বুঝতে চান—তা ইতিহাসের সরল রৈখিক (linear) গতিতে দেখা। এই ইতিহাস-ব্যাখ্যান আমাদের কাছে সব থেকে পরিচিত হয়েছে মার্কসীয় দর্শনের মাধ্যমে।

হেগেলীয় দ্বন্দ্বমূলক ইতিহাস ব্যাখ্যান এক ধরনের উল্লম্ফনের আকস্মিকতার ইঙ্গিত দিয়েছিল। মার্কস তাঁর *দর্শনের দারিদ্র্য আর দারিদ্র্যের দর্শন* গ্রন্থে দেখালেন দর্শন আর সমাজ বিবর্তনের ইচ্ছাপূরণ ভিন্ন কোনো কোঠা বা কাঠামোর বিষয় নয়। জাগতিক ঘটনার ব্যাখ্যান নয়—বদলের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মার্কসের ইতিহাসচিন্তা উঠে এসেছে। মার্কস দেখিয়েছেন ইতিহাস অগ্রগমনশীল—ক্রমশ দ্বন্দ্ব-মিলনাত্মক সামাজিক বর্গ-সংঘাতের ফল। তাঁর চিন্তায় দ্বন্দ্ব-মিলনাত্মক ঘটনার মধ্যে এক একটি বর্গ প্রধান হতে থাকে—যা অন্য এক সামাজিক কাঠামোর জন্ম দেয়। আদিম সাম্যাবস্থা থেকে দাসব্যবস্থা, রাজতন্ত্র গড়ে ওঠা আর সামন্ততন্ত্রের উত্তরণ, সামন্ততন্ত্রের গর্ভ থেকে উঠে-আসা ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ—এই পর্যন্ত সমাজবদলের ইতিহাস মার্কস প্রায় অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন। এরপর পৃথিবী যা আছে তার ব্যাখ্যা দর্শনের কাজ নয়—যেমন হওয়া উচিত তেমন অবস্থার দিকে পরিচালনার আকাঙ্ক্ষা

সঞ্চার, মার্কসীয় দর্শনকে দর্শনের সারস্বত খোলসটিকে বদলে দেয়—মার্কসীয় দর্শন হয় সংগঠিত মানব সমাজ বিবর্তনের প্রজ্ঞা-প্রসূন। পুঁজিবাদ বিকশিত হয় সাম্রাজ্যবাদে, কখনো ফ্যাসিবাদে। মার্কসীয় চিন্তার বিকাশমান ধারায় এই প্রস্তাবনা লেনিন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ব্যাখ্যাতাদের। মার্কস ভেবেছেন পুঁজিবাদ বিকশিত হয় সমাজতন্ত্রে, সমাজতন্ত্র বিকশিত হবে সাম্যবাদে। দ্বন্দ্বের ভিত্তি ও অভিমুখ বদলে যায় এইসব সমাজ পরিস্থিতিতে। দেখাই।
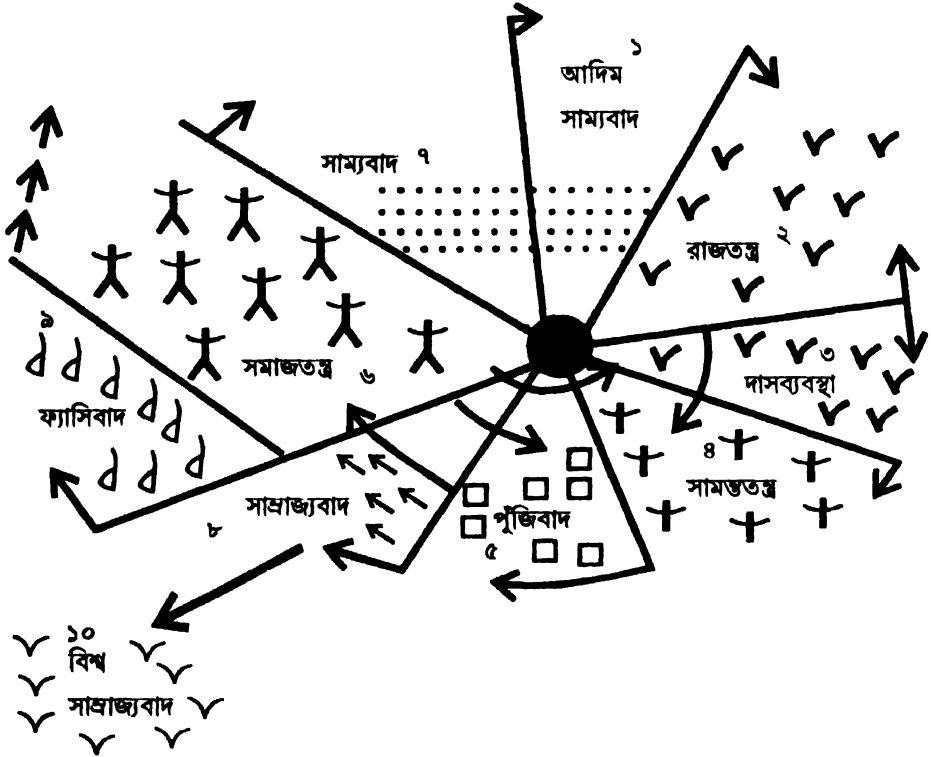
বিবর্তন চিত্রটিকে আমরা রৈখিক রাখিনি বৃত্তাকার করেছি, কারণ আদিম সাম্যবাদ (১) আর অনাগত সাম্যবাদ (৭) একই রকম বর্গহীন পরিস্থিতি—মার্কসীয় বিশ্লেষণে 'classless socoety'। এ-দুটির অভিমুখ প্রকৃতিকে শাসন করার সক্ষমতায়—মানুষ এই পর্যায়ে প্রকৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্বমিলনাত্মক পরিবেশ তৈরি করে। রাজতন্ত্র আদিম সাম্যাবস্থা থেকে অধঃপতিত মানুষের সঙ্গে মানুষের বর্গীয় দ্বন্দ্বের ফলাফল ও শাসকবর্গের প্রাধান্য। এই বর্গীয় ব্যবধানের একটি তীব্র অমানবিক রূপ দাস ও দাস প্রভুর দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি। রাজতন্ত্র আর দাস ব্যবস্থাকে জল-অচল সম্পর্কে ধরা যায় না। কারণ দুটি ব্যবস্থায় বিনিময় ছিল। রাজতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্রেও অনেক মিল ও দ্বন্দ্ব-নিরপেক্ষ পরস্পর নির্ভরতা ছিল। সামন্ততন্ত্রের কালোচিত পরিণতি পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের দুটি অভিমুখ—১. সাম্রাজ্যবাদ ২. সমাজতন্ত্র। সাম্রাজ্যবাদে স্বাভাবিক বিকাশ না ঘটলে পুঁজিবাদ কখনো জাতি বা অন্য কোনো দ্বেষ-দ্বন্দ্বকে অবলম্বন করে ফ্যাসিবাদ (বা নাজিবাদে)-এ পরিণত হয়। খুব সীমিত ক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রে পরিণত হয় এমনও দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত অভিমুখ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ

বা আধুনিক বিশ্বায়ন পরিস্থিতি। এভাবে যে গতি তাকে মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical materialism) বলে অভিহিত করেন।
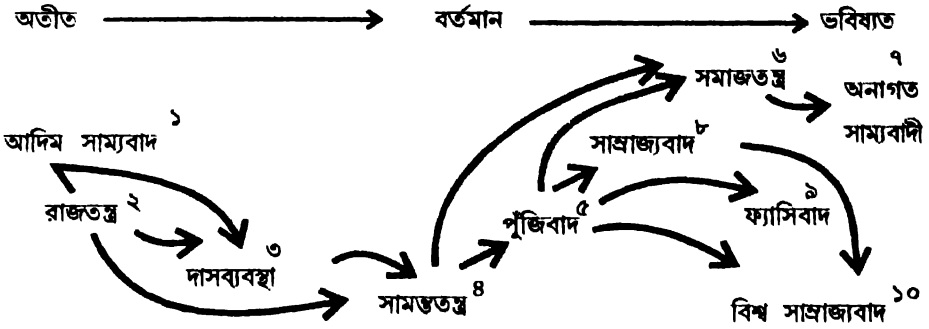
প্রকৃত প্রস্তাবে এ যেন এক গতিশীল ঐতিহাসিক পরিস্থিতি। অতীত থেকে ক্রমে বর্তমানে আসার পথটি মোটা রেখায় যেমন সরল দেখাচ্ছে, বস্তুত তেমন সরলরেখা সর্বত্র অঙ্কিত হয়ে থাকে নি। আমরা অনাগত সাম্যবাদ আর আদিম সাম্যবাদকে যদি একটি আদর্শ (ideal) পরিস্থিতি ভাবি তাহলে পূর্ববর্তী ছকটিকে বোঝা যাবে। আদর্শ, তবে তা একটা কল্পনা, আর কতটা বাস্তব কতটা প্রমাণ ও প্রয়োগ সম্ভব—বলা কঠিন।

পুরাণকথায় এইরকম কোনো সুনির্দিষ্ট কালচেতনা অনুপস্থিত। লোকসাধারণের বিশ্বাসের ইতিহাসকে স্পর্শ করে থাকে তা, ফলে কতটা সত্য আর কতটা আকাঙ্ক্ষা, কতটা বস্তুগ্রাহ্য আর কতটা মানবচেতনায় স্বপ্নাচ্ছাদিত—কতটা সংস্কার আর কতটা পরম্পরা তা ইতিহাসের মতো সহজে ভেঙে দেখানো যাবে না। সুতরাং পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার নবজাগরণ পরবর্তী ইতিহাসবোধের সঙ্গে পুরাণ প্রসঙ্গ ঠিক মেলানো যায় না। পুরাণ-বিশ্বের একটি আদি স্তরের কথা পাই গ্রেকো-রোমক পুরাণ ও পুরাণ ব্যাখ্যানে। অর্কিডিয়ার রাজা লাইকাওন (Lycaon)-এর সময় পিলাসগুস (Pelasgus)-দের জন্ম হয়—তারা মানুষ কিন্তু তারা দেবতাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতেন ('were guests and shared the same table with the gods for their justice and piety, and they openly met at the gods')। (পশ্য : জন পিনসেন্ট : *Greek Mythology* ; দি স্ট্যাণ্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানি লি., ১৯৮২; প্রথম সংস্করণ ১৯৬৯; 41 পৃ., প্রথম কলম) দেবরাজ জিউসকে ছলনা করায় লাইকাওন-কে নেকড়ে বাঘে পরিণত করে দেন জিউস, শুধুমাত্র লাইকাওনের ছোট ছেলে রক্ষা পায়। তার নাম নিকটিমাস (Nyctimus) ; ধরিত্রীদেবী তাকে বাঁচিয়েছিলেন। জিউসের ডান হাত ধরে আড়াল করেছিলেন নিকটিমাসকে—এরপর নামে অঝোর বাদল। 'Then he overwhelmed the earth with rain'. (উক্ত; 41 পৃ., দ্বিতীয় কলম) জিউস রাজা লাইকাওনকে নেকড়ের মুখোশধারী পুরোহিতে (the wolf-piest of zeus-এ) পরিণত করেন। আর এভাবে রাজকীয় প্রতিষ্ঠা ('the sacred kingship) পৌরোহিত্যের নিম্নস্তরীয় বাস্তব পটভূমি ('was down-graded to a priest hood')-তে নেমে আসতে বাধ্য হয়। জিউসের পুরোহিতরা একসময় বৃষ্টির জাদু করতেন—বস্তুত এই ধারণা পুরাকথায় পরিণত হয়েছে কারণ আরকেডিয়া পাহাড় অঞ্চল আর লাইকায়েউস (Lycaeus) পর্বত শৃঙ্গই গ্রিসে বৃষ্টিপাতের কারণ। 'The priest was infact a rain maker ; for there was a spring on Mount Lycaeus which flowed in summer as well as winter'. (উক্ত) গ্রিসে

বৃষ্টি না হলে জিউস পুরোহিতরা ওক গাছের ডাল ঘষে আগুন জ্বেলে কৃত্রিম মেঘ তৈরি করতেন—'a mist arose, which turned into a cloud, which attracted others and brought rain to Arcadia'. দেবতার সঙ্গে খানাপিনা আনন্দ করতে করতে আমোদ আহ্লাদ মস্করা করতে করতে মানুষের অধঃপতন আর রাজা থেকে পুরোহিতে পরিণত হওয়া স্পষ্ট ইতিহাসের রেখাচিত্র নয়—এ হল গূঢ়ার্থে ইতিহাস। সমাজ বদলের চিত্রিত রূপায়ণ। ভাষা নয় কল্পনা ও রূপকের আখ্যান রচনা, আদল (structure) সন্ধানের প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে এতে দেখি কাহিনী কেমন করে ঘটনার অনুকরণের জন্ম দেয়—জন্ম নেয় কৃত্য বা জাদু। জেমস জর্জ ফ্রেজার একে বলেছেন magical control over nature—প্রাকৃতিক ঘটনার জাদু নিয়ন্ত্রণ।

ভারতীয় পুরাণ নিয়ে এইরকম কাজ খুব বেশি নেই। দুটি বিশেষ গবেষণাকর্মের সন্ধান দিচ্ছি। ১. এ গ্রন্থের নাম সকলেই জানেন। ডি. ডি. কোশাম্বীর *Myth and Reality/ Studies in the Formation of Indian Cultures*. ২. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *Ancient Indian Rituals and Their Social contents*. গ্রন্থটি আগে রচিত। ১৯৬২-তে প্রকাশিত। কোশাম্বীর বইতে নারায়ণকে জলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে দেখানো হলেও তাঁর বিবেচনায় এই শব্দ সংস্কৃত-মূল নয়। 'The word nara (plural) for 'the waters' is not Indo-Aryan.' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জল শয়ানে থাকা দৈব সত্তা—'The etymology seems to be 'he who sleeps upon the flowing waters (nara) and this is taken as the steady state of Narayana.' (*Myth and Reality/Studies in the Formation of Indian Culture*; পপুলার প্রকাশন প্রা. লি.; মুম্বাই; ১৯৮৩; ২০ পৃ.) নারায়ণের প্রথম তিনটি অবতার—মৎস্য-কূর্ম-বরাহ। কোশাম্বী লক্ষ করেছেন এই তিনটিই আদিতে টোটেম-ভাবনার পরিচায়ক ('Fish, Tortoise and Boar—surely related to primitive totemic worship'—উক্ত; 21 পৃ.) আর, এর সঙ্গে প্লাবন-পুরাকথার আশ্চর্য মিল দেখাচ্ছেন কোশাম্বী—'At any rate, the flood-and-creation myth (so natural in a Monsoon country.' এই তিন আদি অবতারের সঙ্গে প্লাবন-পুরাকথা আমাদের সংস্কৃতির আদি কালের দ্বন্দ্ব মিলনাত্মক প্রক্রিয়াটি স্পষ্ট করে। এ হল 'নারায়ণ' শব্দের সংস্কৃত ভাষায় প্রবিষ্ট হবার প্রক্রিয়া—'The later apearance in Sanskrit only means that the peaceful assimilation of the people who transmitied the legend was late'. (উক্ত) প্লাবন কথা—গ্রিক পুরাণ থেকে ভারত পুরাণকথা পর্যন্ত myth-এর একটি অপরিহার্য উপাদান।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ফ্রেজারের সাক্ষ্য মেনে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী জাতির ভূমিকা আর ধরিত্রীর অস্তিত্বকে সমধর্মী ভাবার জাদু বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করতে চান। তাঁর ব্যাখ্যা—'The motive behind this curious rite may easily be explained in terms of imitative magic. Earth requires seed in the form of water, just as a woman requires seed or semen to produce a child'. (*Ancient Indian Rituals...*; মনোহর বুক সার্ভিস; দিল্লী; ১৯৭৫; 111 পৃ.) ডব্লু. ক্রুকের *Popular Religion and Floklore in North India* গ্রন্থের একাংশে (১৮৯৬), উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে দুর্ভিক্ষের সময় (১৮৭৩-৭৮) গোরক্ষপুর জেলার একটি কৃত্যের বর্ণনা পাচ্ছি। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—রাত্রিতে নারীদের কৃষিকর্মের ('women stripping themselves

naked at night and dragging the plough over the fields'.—উক্ত; 112 পৃ.) চুনার জেলায় লোকসমাজ অনাবৃষ্টি দূরীকরণের একটি কৃত্য (ritual) পালন করে থাকে— সেখানকার নাপিত বৌ (barber's wife)—ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের ডেকে আনে চাষের অভিনয় করে। সবাই মিলে মাঠে যায়—তখন রাত নটা কি দশটা। আর তারপর 'Three women of a cultivator's family stripped off all their cloths; two were yoked to a plough like oxen, and the third held the handle'. (ঐ) কৃষি. বৃষ্টি আনার জাদু- ক্রিয়া আর নারীর সক্রিয়তা এখানে সমাপতিত।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় যখন জলস্তম্ভকে ইন্দ্ররাজার দিগভ্রান্ত ঐরাবতের শুঁড় বলে ব্যাখ্যা করে বনওয়ারী—তখন কি একই ভাবসত্য এসে হাজির হয় না? একটু স্মরণ করি : 'দেবলোকের হাতী ইন্দ্ররাজার বাহন। জল দেন ইন্দ্র রাজা। হাতীতে চড়ে মহারাজ সাত সমুদ্র ঘুরে বেড়ান, তার বাহন মেঘের সাত সমুদ্র থেকে শুঁড়ে জল টেনে নিয়ে ছিটিয়ে দেয় চারিধারে—ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো-ঝরো।...কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইন্দ্ররাজার হাতীটা ক্ষেপে উঠে পিলখানা থেকে শিকল ছিঁড়ে বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেঘের সাত সমুদ্রে! তখন মেঘ কালো হয়ে তোলপাড় করতে থাকে। মনে হয়, দিন বুঝি রাত হয়ে গেল। তখন সেই ক্ষ্যাপা হাতী নামিয়ে দেয় চার লম্বা শুঁড় মাটি পর্যন্ত, দোলাতে দোলাতে চলতে থাকে। যেদিকে যায়, সেদিকে এমন জল দিয়ে যায় যে, মাঠ-ঘাট ভেসে সে এক প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়।' (৫ পর্ব, চার পরিচ্ছেদ)। পুরাকথা আর প্রাকৃতিক ঘটনার আপতন। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি-স্থিতি -প্রলয়ের প্লাবন চক্রের ইঙ্গিত আনতে চান তারাশঙ্কর। তার নায়ক —উপন্যাসের Protagonist বনওয়ারীর স্থির প্রত্যয় : 'বান না এলে শেষ হবে না হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। প্রলয়ঙ্কর বান।' (শেষ পর্ব) কি বলব একে? উপন্যাসের মোড়কে চিরকালের পুরাণ প্রতিমার ভাষ্য? নাকি নর্থ্রপ ফ্রাই-এর মতো বলতে হবে এই বিষয় বিশ্লেষণ করতে হলে নৃতত্ত্ব (anthropology), মনস্তত্ত্ব (psychology) আর সাহিত্য সমালোচনা (literary criticism)-কে একটি তলে আনতেই হবে। না, মার্কসীয় বস্তুধর্মী ইতিহাসের রৈখিকতার সূত্রে এই কথাশিল্পকে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

পুরাকথায় কৃত্য আর স্বপ্নের ভাষিক সমাপতন লক্ষ করেছেন নর্থ্রপ ফ্রাই। তাঁর বর্ণনা— 'The union of ritual and dream in a form of verbal communication in myth.' (*Anatomy of Criticism* ; উক্ত; 106 পৃ.) আর এখানেই বোধহয় ইতিহাসের গূঢ় সূত্রের সঙ্গে পুরাণের মৌল পার্থক্য। রোলা বার্থ যখন বলেন পুরাকথা হল এক ধরনের সংযোগ পদ্ধতি ('myth is a system of communication') আর সেই সংযোগের শেষে থাকে কোনো মহৎ বার্তা—'a message' আর পুরাকথা হয়ে ওঠে তাদের কথা—বা ভাষ্য যা কিনা কালপ্রবাহে হারিয়ে গেছে। এ যেন কোনো জনগোষ্ঠীর মগ্ন-চৈতন্যের বাণী ঝঙ্কার। যুগাতীতের সমাপতন। যে যুগ ছিল তা এক আদর্শ-অতীত, যে যুগ আসছে তা এক অনাগত অনিবার্য ভবিষ্যৎ আর যে যুগ চলমান তা সংকটে দীর্ণ। স্বর্গ থেকে পতনের— আদি বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট, অভিশপ্ত পিলাসগুসদের মতো, নাকি লাইকাওনের মতো রাজা থেকে পুরোহিতে পরিণত হবার বাধ্যতা? *হাঁসুলীবাঁকের উপকথার* বনওয়ারীকে এজন্যই মনে হয় পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে বাংলার উপন্যাসে ভ্রাম্যমাণ এক রহস্যময় মানুষের মতো। দেবলোকের সঙ্গে যার সম্পর্ক নিবিড় —চেনা পৃথিবীর দৈব প্রতিনিধি।

এডমাণ্ড লীচ একটি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন পুরাকথা সম্পর্কে। তাঁর মতে পুরাকথা যখন

কৃত্যকে আশ্রয় করে তখন শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। নৈঃশব্দ্য থেকে শব্দে আসা—মৃত্যু থেকে জীবনে আসার মতো। হিন্দু পুরাণে ভগীরথের গঙ্গাবতরণের সময় এজন্যই বেজে ওঠে শঙ্খ আর সগর রাজার ষাট হাজার সন্তানকে পুনর্জন্মের জন্য গঙ্গা-ভাগীরথী ভগীরথের শঙ্খধ্বনির অনুসরণ করেন। লীচ স্মরণ করেছেন লেভি স্ট্রাউস উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার আদিম জনজাতিদের দৈব শব্দ শৃঙ্খল—কালাবাস ('calabash') নামক 'instrument of music'-এর মারফৎ যা তৈরি হয়। (পশ্য : এডমণ্ড লীচ : 'Levi-Strauss'; লণ্ডন; ১৯৭০; ৪7 পৃ.) আদি নৈঃশব্দ্য ধ্বংস হয় পবিত্র 'ওঁ' শব্দের দ্বারা। এই প্রণব নাদ ছড়িয়ে পড়ে। চরাচর মুখর হতে থাকে। সুচাঁদ কাহার যখন অন্ধকারকে শব্দশৃঙ্খলে বেঁধে তার সৃষ্টি বিবরণ শুরু করে তখন এমনি এক পরিবেশ তৈরি হতে থাকে।

'গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না।' সৃজন-আবর্তন চিরকাল ছিল—তাতো মানুষের জ্ঞান ও উপলব্ধি-নিরপেক্ষ— লোককথা, উপকথা বা পুরাকথা, সৃজন-আবর্তনের ভাষ্য। গল্প হল এই ভাষ্যের অনুগত। নৈঃশব্দ্যের মাঝখানে মানবিক শব্দ-অর্থের এক নিজস্ব নির্মাণ। পাখিকে সুচাঁদ তাই বলে—উপকথা 'হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) লোকজীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে লিপ্ত বলেই উপকথা চর্চিত হয়। কাহার সমাজ এর মধ্য দিয়ে নিজেদের যুক্ত করতে পারে সুদূর অতীত কোনো আদর্শ (ideal) অবস্থার সঙ্গে। চর্চা না থাকলে, উপকথা বলা না হলে, ধারবাহিকতা ছিন্ন হলে—উপকথার মৃত্যু হবে। পাখি প্রশ্ন করে—'তবে যে বললে, সৃষ্টি ছিল না তখন। চন্দ না, সূয্যি না, পিথিমী না, মানুষ না, পশু না, পক্ষী না'—একে বলতে পারি আদি শূন্য অবস্থা—primordial void। বৌদ্ধ দর্শনে তাকে ভাবা হয়েছে অর্জনের আদত লক্ষ্য, সাধনার প্রকৃত তাৎপর্য সেই শূন্যতার বোধকে অনুভব করা। নির্বাণ বলতে তারা তেমনি এক আদর্শ সমাধান ভেবেছেন। সুচাঁদ অবশ্য আনন্দবাদী। তার মনোজগৎ রূপকে আশ্রয় করতে চায়। মহাশূন্যতা আর নৈঃশব্দ্য বোঝাতে তার ভাষা ভঙ্গিকে আশ্রয় করে। দেখতে পাই তারাশঙ্কর তাঁর কথাশিল্পে সুচাঁদের প্রকাশ-আগ্রহটি তুলে ধরেছেন। পাখির জিজ্ঞাসার উত্তরে সুচাঁদ বলেছে—হ্যাঁ লো, হ্যাঁ। ছিলই না তো, কিছুই ছিল না। কিছু কিছু না, তারপর কিছু-না থাকার ব্যাপকতা এবং গুরুত্ব বোঝাবার জন্য শেষে দীর্ঘ করে টেনে বলে—কি-ছু—ই না—ব'লে দু-হাত নেড়ে দিলে।' তারপর বলল—'অন্ধ-কা—র, আঁ-ধা-র, থম থম করছে। চোখ দুটো তার বিস্ফারিত হয়ে উঠল। শরীরে রোম খাড়া হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর হ'ল গভীর থমথমে, বললে—আঁধারের মধ্যে শুধু কালারুদ্দের চরক ঘুরছিল বন্-বন্-বন্-বন্-বন্-বন্। বলে সে হাতখানি তুলে ধরলে। ইঙ্গিতে সেই আদিকালকে যেন দেখিয়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল। সৃষ্টির আদিকাল পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে দিলে তার আঙুলের ইঙ্গিতকে।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) শব্দ আর নৈঃশব্দ্যের এই মধ্যবর্তী রূপতৃষ্ণা সুচাঁদকে বর্তমান কালকে সৃষ্টির আদিকালে প্রসারিত করতে পারে—চায়। হাঁসুলীবাঁকের পুরাণ-প্রতিমার বিশ্লেষণে এই প্রকার প্রক্রিয়াটি বুঝে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

পুরাণ-প্রতিমা শব্দটি archetype বা archetypal image. নর্থপ ফ্রাই বিষয়টি নিয়ে বেশ গভীর আলোচনা করেছেন। মালার্মে যাকে বলেছিলেন 'symbolisme' তা হয়তো রূপক, সেখানে কোনো দিব্য নেই। শব্দের তাৎক্ষণিক অভিঘাত ('immediate impact of sounds') অর্থকে যখন ক্রমে ক্রমে আরো ভালোভাবে ব্যক্ত করে ('the sense of a growing richness of meaning unlimited by denotation') তখন সেই শব্দ ও

অর্থের মাঝখানে 'symbolisme'-তে পরিণতি পায়। পুরাণ-প্রতিমা এই দুই প্রান্তিক পরিস্থিতিকে স্পর্শ করতে চায়। হয়ে ওঠে মধ্যস্থ। পুরাণ প্রতিমা শুধু শোনা বা শোনানোর বস্তু নয়—তা হল চিত্রধর্মিতা। নর্থ্রপ ফ্রাই এটি বোঝাতে দুটি লাতিন শব্দ প্রয়োগ করেছেন—১. 'mythos' আর ২. 'dianoia'. 'Mythos' হল যা কানে শোনা যায় ('the sense of movement caught by the ear') আর 'dianoia' হল তাই যা একই সঙ্গে চোখের সামনে ভাসিয়ে তোলে একটি রূপ '(the sense of movement caught by the eye') পুরাণ প্রতিমা এই দুইয়ের চমৎকার সমাপতিত ধ্বনি-রূপ। যে ভঙ্গিতে সুচাঁদ আকাশে আঙ্গুল তুলে তার কালাতীত ইঙ্গিতটিকে ছড়িয়ে দেয় নর্থ্রপ ফ্রাই যেন সেই ইঙ্গিতটিকেই চিহ্নিত করতে চান ঐ ব্যাখ্যানের দ্বারা।

'Symbolisme'-এর মারফৎ মালার্মে একটি শব্দের অর্থবোধকে আশ্রয় করতে চান। প্রশ্ন তাঁর এর মানে কি? ("what does this mean?") তবে মালার্মে ব্যক্তিরচিত কাব্য ভাষা সম্পর্কে শব্দটি যখন প্রয়োগ করেন তখন তাঁর লক্ষ্য থাকে কাব্যসত্যকে বুঝে নেওয়া। নর্থ্রপ ফ্রাই এই অর্থবোধকে ছুঁড়ে দেন মহাকালের গর্ভে; ফলে পুরাকথার সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে। পুরাকথায় যে ভাষা প্রযুক্ত হয় তা রূপকধর্মী। এমন কথাও লেভি স্ট্রাউস লিখেছেন যে বক্রোক্তি (Trope), লক্ষণা (Metonymy), রূপক (Metaphor) আসলে অলঙ্কৃত ভাষা (Figurative Language)-র প্রাণ। তা নাকি সৃষ্টি হয় অর্থ দ্যোতনার আগেই! রুশোর উল্লেখ করে লেভি স্ট্রাউস জানিয়েছেন—'Figurative Langeuage was the first to be born, proper meanings were the last to be found.' (*Totemism*'; মূল গ্রন্থ ফরাসি ভাষায়, প্যারিস থেকে ১৯৬২-তে প্রকাশিত, ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ সংস্করণ, লণ্ডন, ১৯৬৪ : 175 পৃ.) পুরাকথায় থাকে ভাষা ও অর্থ বিপর্যয়ের চিহ্নও। কার্তিক আর স্কন্দ—একই চরিত্র, কিন্তু দুটি ভিন্ন পুরাণকথার ভাষ্য। কৃত্তিকারা মানুষ করেছেন বলে কার্তিক, মাথা স্খলিত করা হয়েছে বলে স্কন্দ। আবার ষড়ানন এই নামটি থেকেই অন্য এক কার্তিকের কাহিনী হয়ে ওঠে। গজানন যেমন গণেশ সম্পর্কিত কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। লেভি স্ট্রাউস তাই লেখেন—'Things were called by their true name only when they were seen in their true form'. পুরাকথায় এইভাবে বিনিময় তৈরি হতে থাকে—শব্দ আর অর্থ, ধ্বনি আর ব্যঞ্জনা, রচনা ও ফলাফল, কথা এবং কৃত্যের ধারাবাহিক সমাপতন।

ম্যাক্সমুলার প্রায় একই ধরনের একটি মত প্রচার করেন। তাঁর মতে ভাষার অর্থ বিপর্যয় থেকে পুরাকথার জন্ম। উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী যেমন। উষা সূর্যোদয়ের আগেকার আলো। অনিরুদ্ধ হল প্রথম উদিত সূর্যের আলো। এ দুইয়ের দেখা হয় না কখনও—তাই উষা-অনিরুদ্ধের প্রেম বিরহে ছাড়া পরিণতি পেতেই পারে না। ড. সুজিত চৌধুরী তাঁর *প্রাচীন ভারতে মাতৃপ্রাধান্য : কিংবদন্তীর পুনর্বিচার* গ্রন্থে উষা-অনিরুদ্ধের কাহিনীর একটি আঞ্চলিক রূপ উল্লেখ করেছেন। শ্রীহট্ট-কাছাড় অঞ্চলে 'উষা-ভাষাণী' নামক সেই অনুষ্ঠান বেশ গুরুত্বপূর্ণ ; অনেকটাই তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র ভাঁজোর অনুরূপ সে অনুষ্ঠান।

সাহিত্যে যখন পুরাকথার প্রয়োগ ঘটে তখন তা বহুস্বরিত হয়ে দেখা যায়। *আরণ্যক* উপন্যাসে সাঁওতালদের উপকথার 'বন্য-মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা 'টাঁড়বারো'-কে উপস্থাপন করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (*আরণ্যক* ; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা.

লি.; কলকাতা; পেপারব্যাক সংস্করণ, ষোড়শ মুদ্রণ; ১৪০৮ বঙ্গাব্দ; ১৬৩ পৃ.)—এ অনেকটা তেমনি। *আরণ্যক*-এ অবশ্য কথক সত্যচরণের মাধ্যমে বিভূতিভূষণের আত্মপ্রক্ষেপ ঘটেছে। সেখানে দেখছি অরণ্যচারী মানুষের টোটেমধর্মী দেবতা 'টাঁড়বারো'-র পাশাপাশি সর্বভারতীয় সংস্কৃত পুরাণচেতনাও ধরা আছে। আর আছে অত্যন্ত রোমান্টিক একটি মানুষের উপলব্ধির পুরাণ-প্রতিমাও। তৃতীয়টিকে অনেকটাই ব্যক্তিগত কল্পনার পুরাকথা-পরিণতি ভাবা চলে। রঘুবর প্রসাদ নামক আমিনের মুখে শোনা 'সরস্বতী কুণ্ডী'-র কাহিনী বলা : 'ও মায়ার কুণ্ডী'—রাত্রিতে 'হুরী-পরীরা নামে; জ্যোৎস্না রাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় পাথরের উপর, রেখে জলে নামে।' এ সময় তাদের দেখলে তাকে জলে ডুবিয়ে মারে' তারা। 'মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে থাকে। সার্ভেয়ার ফতেসিং দেখেছিল—তার লাস পাওয়া যায় কুণ্ডীর জলে! (*আরণ্যক*; উক্ত; ৭৩ পৃ.) মনে পড়ে আরভিং স্টোনের *Lust for Life*-এর শেষাংশে ভ্যানগঘের সঙ্গে পরীদের অনন্যসাধারণ রূপ বর্ণনার কথা। নাম তার মায়া ('Gust Maya'; বলেছে সে—'For you, Vincent, that is all'.—আরভিং স্টোন : *Lust for Life* ; মান্দারিন, আমরা দেখছি, ১৯৯৬ সংস্করণ; প্রথম সংস্করণ—১৯৩৪; 352 পৃ.) তার সঙ্গে দীর্ঘ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে জীবন-মায়া সঞ্চার করেছেন লেখক—'Across her face went a flash of infinite sadness and compassion'. (ঐ; 353 পৃ.) তার লেবু-রঙ এক ঢাল চুল—'rich mass of lemon yellow hair' (ঐ; 354 পৃ.) আর প্রেমিকা-সুলভ ব্যবহার, স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝখানে এক ফালি আলোর রেখার মতো—সূর্যাস্তের দিগন্তে আলোর মায়ায় তাকে দেখার মধ্য দিয়ে ভিনসেণ্ট ভ্যানগঘের যাবতীয় অচরিতার্থ স্বপ্নের রং ঝরে ঝরে পড়তে থাকে। স্টোন-এর ভাষা—'The sun was slipping down the other side of the heavens. The earth was hot from the beating rays of the day'. (357 পৃ.)

সাহিত্যে প্রযুক্ত পুরাণ-প্রতিমার কিছু রূপান্তর সম্ভাবনা দেখিয়েছেন নর্থ্রপ ফ্রাই :

১. পুরাণ-প্রতিমা যেখানে অবিকৃত অবস্থায় থাকে (undisplaced myth)। এর আবার দুই রকম হতে পারে। ক. ইচ্ছাকৃত (desirable) আর খ. অনিচ্ছাকৃত (undesirable)।
২. রোমান্টিকতার প্রয়োজনে আনা পুরাণ-প্রতিমা। আর
৩. বাস্তবতার প্রয়োজনে আনা পুরাণ-প্রতিমা। (পশ্য : *Anatomy of Criticism;* উক্ত; 139-140 পৃ.)

টাঁড়বারোর কথার সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় জীবনচর্যার তপোবন-সংস্কৃতির অনুষঙ্গ মনে রেখেছেন বিভূতিভূষণ। তাই তাঁর উপন্যাসের নাম *আরণ্যক*। উপনিষদ-সম্পর্কিত ভাবাদর্শের এই প্রয়োগ ইচ্ছাকৃত (desirable) পুরাণপ্রতিমা নিশ্চয়। সত্যচরণ যখন ভানুমতীকে জিজ্ঞেস করে ভারতবর্ষের কথা সে জানে কিনা, তখন সে মাথা নাড়ে—না, সে ভারতবর্ষকে চেনে না। 'চক্‌মকি টোলা' ছেড়ে তো সে কোথাও যায় নি। উল্টে প্রশ্ন করে সে—'ভারতবর্ষ কোন্ দিকে?' (*আরণ্যক* ; উক্ত; ১৬৪ পৃ.) দোবরুপান্নার সঙ্গে তাদের পূর্বপুরুষদের সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে অন্য এক ভারতবর্ষ খুঁজে পেয়েছে সত্যচরণ। অনুভব করেছে 'বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই' (*আরণ্যক* ; উক্ত, ১০৭ পৃ.) তার বিবেচনায়—বিজিত আদিম অনার্যরা আজ তার সামনে মূর্ত হয়েছে। বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি সত্যচরণ, বনোয়ারী আর

পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং ; আর অন্য পক্ষে দোবারুপান্না, ভানুমতী, জগরুপান্না বিজিত জাতির প্রতিনিধি। আজ 'উভয় জাতি' 'সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি' দাঁড়িয়ে। মনে হল তার— 'ইতিহাসের এই বিরাট ট্র্যাজেডি যেন' তার চোখের সামনে সেদিন সন্ধ্যায় অভিনীত হল। (উক্ত; ১০৭ পৃ.) ইতিহাস তবে দুই পুরাণ প্রতিমার মুখোমুখি শক্তি পরীক্ষার ইতিহাস। তাই 'হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন। অমায় ক্ষমা করিও। (উক্ত; ১৩২ পৃ.), বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেও সত্যচরণ শেষ পর্যন্ত মদগর্বী বিজয়ীই থেকে যায়।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা আরণ্যক-এর ন্যূনাধিক দশ বছর পরে লেখা। বিজয়ী আর্য-অভিমান অপেক্ষা অন্ত্যোদয়ের প্রতি তারাশঙ্করের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আগ্রহও তাঁকে অবশ্যই স্বতন্ত্র পথের পথিক করেছে। বিভূতিভূষণের সমবেদনার মোহাঞ্জন অপেক্ষা তারাশঙ্কর আয়ত্ত করেছেন বাস্তবদৃষ্টি। আর তাই তাঁর হাঁসুলীবাঁকে পাচ্ছি বহুমাত্রিক পুরাণ-প্রতিমার লক্ষণ ও বর্ণাঢ্য উপস্থিতি।

কিছু পুরাণ-প্রসঙ্গ হাঁসুলীবাঁকে বাইরের সন্নিবেশ। 'কাহার কুলের পেল্লাদ' বলে যখন করালীকে বনওয়ারী বিশেষভাবে নির্দেশ করে (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) কিংবা সুচাঁদ আর করালীকে রূপকথার অনুষঙ্গে শয়তান বা রাজপুত্র ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করা হয় (শেষ পর্ব)—তখন বিষয়টিকে কাহারদের নিজস্ব পুরাণ-নির্মাণ বলে মনে হয় না। সুচাঁদ সম্পর্কে হাঁসুলীবাঁকের কথক লিখেছেন : 'এই কথা সে নিজের ভাষায় বলে। সম্ভবত হাঁসুলীবাঁকের উপকথার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে নিজে হল আদ্যিকালের বুড়ী। করালী হল দৈত্য কিংবা শয়তান—কিংবা সে-ই হ'ল রাজপুত্র, নতুন কালের মাতব্বর।' [শেষ পর্ব]
এখানে পুরাণ-প্রসঙ্গ প্রতিমায় পরিণত হয় নি। চিন্তার সমান্তরলতাও তৈরি হয় নি। এখানে পুরাণ প্রসঙ্গ undesirable পর্যায়ে গেছে।

নয়ানের না, বাসিনী-বৌ যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে অভিশাপ বর্ষণ করে ঠিক তখন হাঁপানীর রোগ যাকে দুর্বল করেছে, সেই নয়ান অক্ষম কল্পনার মারফৎ সেই অভিসম্পাতকে পুরাণ-প্রসঙ্গে অলঙ্কৃত করতে থাকে :

> 'নয়ান ব'সে ওই ন্যাড়া মাথা, গলায় রুদ্রাক্ষ, ধবধবে পৈতে, পরনে গেরুয়া, পায়ে খড়ম—কত্তাঠাকুর যেন মনশ্চক্ষে দেখছে।' তার মনে হচ্ছে—কত্তাঠাকুর চেয়ে আছেন 'করালীর ঘরের দিকে। পায়ের তলায় পড়ে আছে সেই বিরাট চন্দ্রবোড়া'—মন্তব্য তার 'করালী যাকে মেরে বাহাদুরি নিয়েছে। সে কি মরে? বাবার সাপ সে! কত্তার বাহন। সে বেঁচে উঠেছে। লক লক ক'রে জিব নাড়ছে। বাসরঘরে ওই সাপ ঢুকবে।' [২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

এখানে নয়ানের মনশ্চক্ষু পুরাণ-প্রতিমাকে তিনটি প্রকারে দেখতে পাচ্ছে।

১. কত্তা ঠাকুরের রূপ স্পষ্ট হচ্ছে এখানে। নেড়া মাথা, গেরুয়া-বসন পরা, পায়ে খড়ম কত্তা ঠাকুরের গলায় রুদ্রাক্ষ। পায়ের নীচে সাপ। একটি নতুন দেবমূর্তি (folk deity) যেন। এই কল্পবিশ্ব—হাঁসুলীবাঁকের মৌল কথাবস্তুর সঙ্গে মিলে মিশে আছে।
২. কত্তার বাহন চন্দ্রবোড়া সাপটি অমর। তাকে মারা অসম্ভব। তার মধ্য দিয়ে বংশ গতির অগ্রগমন ঘটে। সুতরাং সাপটি অমর।
৩. কত্তার বাহন সাপটি বাসরঘরে ঢুকবে—এটা তখনই সম্ভব, যখন কাহারদের পুরাকথার সঙ্গে মনসার পুরাণকথা এক ধরনের বিনিময়ে আসে। যার ফলে মনসার পুরাণকথার মতোই লোহার বাসর ঘরেও সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে আর সাপ সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করে বাসরঘরে। বেহুলা এখানে পাখি হলে করালী লক্ষ্মীন্দর।

—তৃতীয় প্রকারটি নয়ানের ইচ্ছাপূরণ (wish fullfilment) বলেই মনে হয়। ঘটনার পরিণতি নয়ানের ইচ্ছার আনুগত্য করে নি। করালীও সাপের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি মোটেই। তবে তার কোঠাবাড়িতে চাঁদসদাগরের গড়া লোহার বাসরঘরের ক্ষীণ একটি সমান্তরাল অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। সাপ এ-উপন্যাসে বহুবার বহু মাত্রায় উপস্থিত। সুচাঁদ যখন বলে, 'মা-বসুমাতাকে অয়েছেন মাথায় করে।'—(৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ)—তখন সেই 'পিতিপুরুষের' কথা একটি অন্য কাহিনী কাঠামোর ইঙ্গিত আনে। এভাবে, নানা রকম পুরাণ প্রসঙ্গ হাঁসুলীবাঁকে এসেছে। 'মা মনসার বেটি' এই চন্দ্রবোড়াটিকে কত্তাবাবার বাহন ভাবার মধ্য দিয়ে পুরাণের নবরূপায়ণ ঘটেছে। শ্রীমতী চন্দ্রমল্লী একে বলেছেন—'বেলগাছে বসা উপকথার ব্রহ্মদৈত্যের' সঙ্গে কাহারদের কত্তাবাবা (তাঁর ভাষায় 'বাবা ঠাকুর')-র মিল অমিল দুই-ই আছে। 'রূপকথার সেই চরিত্রের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে তারাশঙ্কর এই 'বাবাঠাকুর'কে তৈরি করেছেন।' (*মিথ পুরাণের ভাঙাগড়া* : উক্ত; ১২১ পৃ.) পার্থক্য তাঁর মতে দুটি—

১. কত্তাবাবার পৈতের সঙ্গে অতিরিক্ত আছে 'রুদ্রাক্ষের মালা'; আর—

২. 'তার পোশাকের রঙ গেরুয়া'। (উক্ত)

তিনি এও বলেছেন 'পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকাংশেই পঞ্চানন-শিব বাবাঠাকুর নামে পরিচিত'। বাবাঠাকুর আর কাহারদের কর্তাবাবা তার কাছে তাই একাকার।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দৌলতপুর গ্রামের দেবতার নাম গ্রামবাবা। তাঁর দেহবর্ণ লাল, কতকটা স্থূল, চোখমুখ ভয়ঙ্কর—'গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও যজ্ঞোপবীত'। (ধনঞ্জয় রায় : *লোকসংস্কৃতি : লৌকিক দেবতা*; দধীচি; বালুরঘাট; ১৪১১ বঙ্গাব্দ; ২৫-২৬ পৃ.) ড. গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর বিখ্যাত বই *বাংলার লৌকিক দেবতা*-য় পঞ্চানন্দ আর পাঁচু ঠাকুর 'অপ দেবতা'। (*বাংলার লৌকিক দেবতা* ; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ—১৯৮৭; প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬ ; ২৬ পৃ.) পঞ্চানন আর কত্তাবাবা ঠাকুরের কোনো মিল নেই। পঞ্চানন 'রক্তবর্ণ দিগম্বর' দেবতা। 'বাবাঠাকুর' নামে এক 'লৌকিক' কিন্তু 'আঞ্চলিক নন' এমন দেবতার কথা লিখেছেন ড. বসু। ইনি দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পূজা পান। এর 'গলায়'-ও 'যজ্ঞোপবীত ও রুদ্রাক্ষের মালা', 'রুদ্রাক্ষের তাগা'ও কখনো কখনো পরে থাকেন। (পশ্য- : উক্ত গ্রন্থ; ৫০ পৃ.) আর আছে 'পায়ে খড়ম' অনেক রকম বাহন তাঁর ('বামন, গোভূত, মামদো, ঘোটক, ব্যাঘ্র, মৃগ, বৃষ, ভল্লুক এমনকি বৃশ্চিক')—তবে সাপের উল্লেখ পেলাম না। ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা বাঁকুড়ার অনেক গ্রামেই 'বাবাঠাকুর' নামের দেবতা পেয়েছেন। মোট পাঁচটি গ্রামে। (পশ্য : *আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি* ; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়; বর্ধমান; ১৯৯২; ৭৩ পৃ.) ড. কামিল্যা একটি কিংবদন্তি জুড়ে দিয়েছেন, সূত্র উল্লেখ করেন নি। 'সাধারণ পূজারী ব্রাহ্মণেরা' মনে করেন : '*পঞ্চানন্দ বলি-লোভী শিব ঠাকুর। সব দেবতার নামেই বলি হয়। শিবের হয় না। হঠাৎ একবার শিবের বলির ওপর খুব* লোভ হলো। অমনি তাঁর দেহে মনে ঘটে গেল এক বিরাট পরিবর্তন। শিবের এই পরিবর্তিত রূপ হলো পঞ্চানন।' [ঐ; ৭৮ পৃ.]

রাঢ় বাংলার গুপ্তবিদ্যা নিয়ে একটি ইংরেজি বই লিখেছিলেন বিশিষ্ট নৃতাত্ত্বিক প্রবোধকুমার ভৌমিক ; *Aucultism in Frintz Bengal*। ড. দেবব্রত ভট্টাচার্য এই বইখানার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন। 'প্রত্যন্ত বাংলার গুপ্ত বিদ্যা'। সেই গ্রন্থে দেখলাম

'মুনিশ' নামে এক বিচিত্র দেবতার বিবরণ। ইনি বেশ প্রভাবশালী পূর্ব পুরুষ দেবতা। '*পরিবারের লোকজনকে মুনিশ প্রায়ই স্বপ্নে দেখা দেয়।*' (পশ্য : *প্রত্যন্ত বাংলার গুপ্তবিদ্যা*; দেজ পাবলিশিং; কলকাতা; জানুয়ারি ১৯৯৪; ১১৯ পৃ.) ভালোভাবে পুজো না দিলে মুনিশ অত্যন্ত অখুশি হয়। 'কাঠের খড়ম পরে গভীর রাতে বাড়ির নানা খানে ঘুরে বেড়ায় মুনিশ। পোশাক সাদা। 'পুকুরের ধারে হঠাৎ মুনিশের খড়মের' শব্দ অনেকেই পেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই দেবতা 'বড়ই কল্যাণকর'। (পশ্য : ঐ; ১২০ পৃ.) মুনিশের সঙ্গে কাহারদের কত্তাবাবার মিল আছে। যেমন :

১. বনওয়ারীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। 'খট খট শব্দ করে পিছনে কে এল? বনওয়ারী বুঝতে পারলে তিনি কে? কর্তা আসছেন। আর ভয় নাই।' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এ অবশ্য দিবাস্বপ্ন। আসল স্বপ্ন ছিল শেষ রাত্রের।—"সমস্ত 'আতি' ভাবনায় ঘুম হয় নাই। ভোর 'আতে' চোখ লেগেছিল খানিক—তা তোমার সঙ্গে সঙ্গে স্বপন হয়ে গেল। দেখলাম যেন, ঠিক কত্তা এসে দাঁড়িয়েছেন মাথার 'ছিয়রে'।" [ঐ]

২. কত্তাবাবা থাকেন নীলের বাঁধের উত্তরে। নীলের বাঁধ—পুকুর।

৩. কত্তাবাবাও কাহার সমাজের ভালো মন্দকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করেন। 'এই বেল গাছটিতে ব'সে রুদ্রাক্ষের মালা জপ করে, আর গোটা হাঁসুলীবাঁকে তাঁর দৃষ্টি দেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে মানুষের ঘরে সুখ শান্তি উছলে পড়ে, মাঠে ফসল লুটিয়ে পড়ে, পশ্চিম আকাশের ঝড় সসম্মানে হাঁসুলীরবাঁকের পাশ কাটিয়ে চলে যায়।' অন্যপক্ষে 'কোপ দৃষ্টি হানলে এর উল্টো হয়।' 'ঘরে ঘরে দুঃখ, ঝগড়াঝাটি, লাঠালাঠি, মনে মনে অসুখ, গাঁয়ে গাঁয়ে বিবাদ, আকাশে অনাবৃষ্টি, মাঠে অজন্মা, মাথার উপর ঝড়, কোপাইয়ের বান' [৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

তাহলে চন্দ্রমল্লী যে রুদ্রাক্ষের প্রসঙ্গটি তারাশঙ্করের সংযোজন ভাবছেন তা ঠিক নয় দেখা যাচ্ছে। আর বাবাঠাকুরের চেয়ে কত্তাবাবার মিল বেশি সম্ভবত 'মুনিশ' নামক অভিভাবক দেবতার (guardian deity-র) সঙ্গেই বেশি। তবে সাপের প্রসঙ্গটি তারাশঙ্করের সংযোজন। এই সৃজনশীলতার উপাদানেই *হাঁসুলীবাঁকের উপকথার* পুরাণ-প্রতিমার বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি গাঢ় হয়ে দেখা যাচ্ছে।

কর্তাবাবা আর শিবকে একই দেবতা ভাবা ঠিক নয়। শিবের প্রতিনিধি হাঁসুলীবাঁকে আছেন—কালারুদ্র। তিনি জাঙলের গ্রাম দেবতা। কালারুদ্র সম্পর্কে কাহারদের ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা কম নয় 'সায়েবডুবির দহ' বা 'যখের দহ' হাঁসুলীবাঁকের শেষ দিকে। ডাইনে মহিষ ডহরি বাঁয়ে কালারুদ্রের আশ্রিত গাছ। 'কত্তার দহ' বলে কাহাররা। তারাশঙ্করের বর্ণনা পড়লে কখনো মনে হয় কালারুদ্র আর কর্তাবাবা একই দেবতা। যেমন এইখানে : 'কত্তা এই দহে চান করেন। কালারুদ্র ওই দহে চান করেন। কালারুদ্র ওই দহে জল শয়ানে আছেন।' [৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

পরক্ষণেই তারাশঙ্কর জানিয়েছেন 'কাহারেরা বছরে চারবার' কালিদহে নামে।

১. গাজনের সময়। তখন 'কালারুদ্দের শিলারূপ'-টি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

২. 'জল শয়ানে' রেখে আসে।

৩. 'কালারুদ্দের বেটী মা-মনসার বারি'—ওখান থেকে নিয়ে আসে তারা।

৪. সেই 'বারি' ডুবিয়ে রেখে আসে।

অন্য সময় দহের কাছে ঘেঁসে না তারা। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়ে আসে শিব আর

কালারুদ্র একই দেবতা। কালারুদ্রের শিলারূপ আর তার কন্যা মনসা—এই কথা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট।

কালিদহে কর্তাবাবা স্নান করলেও তার ক্ষেত্র নদীর পূর্ব বাঁকে —হাঁসুলীবাঁকের পূর্ব সীমায় নয়। কাহাররা হাঁসুলীবাঁকের দক্ষিণ দিকটি আগলে আছে—আছে বাঁশবন। সেখানে নীলকরদের একটি পরিচ্ছন্ন শান্ত কাচ স্বচ্ছ সরোবর—কাহাররা বলে 'নীলের বাঁধ'। তার কাছাকাছি বেলবৃক্ষের উপর কত্তাবাবার স্থান। কালিদহে বাস করে একটি ভয়ঙ্কর 'আদ্যিকালের বুড়ো কুম্ভীর'। এ হল হাঁসুলীবাঁকের পুরাণ তথা Myth তৈরির কল্পনার ক্ষেত্রসীমা।

কর্তাবাবা আর কালারুদ্র যে ভিন্ন দেবতা, তার প্রমাণ বনওয়ারীর কল্পনায়—নিষেধাজ্ঞা আর বিশ্বাসে। 'সনসনে' 'আত্তিকালে' হঠাৎ গিয়ে হাজির হতে নেই কর্তাবাবার থানে। কারণ—'বাবা খেলা করেন এখন, কখনও তপ জপ করেন, কখনও খড়ম প'রে খট খট ক'রে বেড়ান, কখনও বেল গাছের ডালটি ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকেন 'কালারুদ্দু' বাবার দরবারের দিকে চেয়ে।' (২য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী ঐ অবস্থায় কর্তা বাবার থানে যাবার আগে 'হাততালি' দিয়ে আগমনের কথা জানান দিয়ে তবে যায়। এই অংশটুকু থেকে স্পষ্ট হচ্ছে কর্তাবাবা আর কালারুদ্র দ্বৈত-দেবতা (dual deity)। আর একটি জায়গায় উপন্যাসের বর্ণনা থেকে কথাটি আবার বুঝতে পারি। দেখাই :

> 'বাবা কালরুদ্দু--কর্তাঠাকুরের উপরওয়ালা—বাবাঠাকুরের বাবা। 'লারায়ণের যেমন 'লারদ', বাবা কালারুদ্দুরের তেমনি ন্যাড়া-মাথা গেরুয়া-পরা খড়ম-পায়ে দণ্ড-হাতে কর্তাঠাকুর।' [২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ]

রিসলে লিখেছেন, কাহাররা ধর্মক্ষেত্রে প্রধানত শৈব। কেউ কেউ শাক্ত। তাদের মধ্যে বৈষ্ণবদের সংখ্যা খুব কম। 'Most of them are worshippers of Siva or the Saktis, and the proportion of Vaishnavas among them is very small.' (*The Tribes and Castes of Bengal* , উক্ত; 372 পৃ.) কার্তিক মাসে শুক্লা সপ্তমীতে এদের একটি উৎসবের বর্ণনা পাচ্ছি, রিসলের সংগ্রহ থেকে। তার সঙ্গে ভাঁজোর সামান্য মিল পেলাম। আছে তাদের বিচিত্র লোকদেবতাও। যেন—ডাক, বন্দি, গোরাইয়া, সোখা, শম্ভুনাথ, রাম ঠাকুর আর বিশেষ করে আছে 'ধরম রাজ' আর 'কর্তা'। আমাদের দৃঢ় অনুমান, এই কর্তাই হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজের অভিভাবক দেবতা।

কর্তাবাবাই কাহারদের সমস্ত কাজকর্মে অভিভাবক স্বরূপ। 'কত্তার আজ্ঞে' নিতে হয় সব শুভ কাজে। জমি নিতে চায় বনওয়ারী—সুচাঁদের পরামর্শ জমি নিলে কর্তাবাবার উদ্দেশ্যে একটি পাঁঠা যুক্ত করে দিতে হবে। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) বহুদিন আগে যখন ছিল না কোনো পাপ পুণ্যের বোধ তখনও কাহাররা কর্তার কাছেই নির্ভর করত সমস্ত ব্যাপারে। চুরি করতে যাবার আগে পুরুষরা ('মরদেরা') 'কত্তার ঠাঁইটিতে পেনাম ক'রে তবে যেত'। মেয়েরা 'অঙে'র খেলায় মাতার আগে 'কত্তার গাছতলায় একখান সিঁদুর' উৎসর্গ করে তবে যেত। কখনো হত স্বপ্নাদেশ। গুপীর কর্তাবাবা কর্তাবাবার কাছে মাথা ঠুকে প্রার্থনা করেছিল—চেয়েছিল প্রত্যাদেশ—'ই পরিবার নিয়ে আমি কি করি?...' গুপীর কর্তামায়ের অঙ হয়েছিল ওই পাড়ার একজনের সাথে।' কর্তাবাবার স্বপ্নাদেশ পেয়ে গরুমারা বিষ দিয়ে সেই বউকে মেরে ফেলেছিল গুপীর পূর্বপুরুষ। (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) ভাববার কারণ নেই, এই দৈবসত্তা বাস্তব। যার মনে এই দৈব সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ আছে—তার কাছে

কর্তাবাবার ভূমিকা নেই—'মহিমা' থাকার সম্ভাবনা নেই। উপন্যাসে এর প্রমাণ যথেষ্ট। মাইতো ঘোষ এই নবনির্মিত পুরাণ প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না—করালীও যথেষ্ট বিদ্রোহী।

কর্তা সম্পর্কে সুচাঁদের বানানো (কিছু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া) পুরাকথায় একটি ব্রত কথার আদল আছে। ব্রতকথায় যেমন সংকটগ্রস্ত নায়ক বা নায়িকা অন্য ব্রতধারি/ব্রতধারিণীদের জিজ্ঞাসা করে—এই ব্রত করলে কি হবে? উত্তর যা পাওয়া যায় তাই কর্তা বাবা সম্পর্কে কাহারদের মনোজগতে তৈরি হওয়া উপকথায় ভাষারূপ পাচ্ছে। 'কত্তা ঠাকুরের কোপ দৃষ্টিতে কাঁচা জীবন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, মুখের গ্রাস যায় উড়ে, ভরা নৌকা যায় ডুবে; আবার কত্তা ঠাকুর তুষ্ট হেসে মিষ্টি হাসি হেসে 'পেসন্ন দৃষ্টিতে' চাইলে—মরলে 'জীয়োয়', হারালে পায়, নিরুদ্দেশ ঘরে ফেরে, এক গুণ হয় দশ গুণ।' [৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নয়, গোটা সমাজ বা সমাজের কোনো অংশ যদি কর্তাবাবার নির্দেশ উপেক্ষা করে তার পরিণতি ঘটবে ভয়ঙ্কর। উঞ্ছবৃত্তিধারী, চুরি-ডাকাতিতে যুক্ত অনিশ্চিত জীবন তাদের কত্তাবাবার নির্দেশেই স্থিতিশীল হয়েছে—পেয়েছে কৃষিকর্মে যুক্ত হবার পরিসর। এ সময়ও কত্তাবাবার ভূমিকা উপকথায় স্মৃতিপুঞ্জিত হয়েছে। শ্রাবণ মাসের এক 'ঘুরঘুট্টি আত', আকাশে যখন 'অল্প ছিল ছেলানি ম্যাঘ'—আটপৌরে কাহাররা ডাকাতি করতে বের হবার সময় কত্তা 'বাবাঠাকুরের হুকুম' হয়েছিল—'চুরি ছাড়, চাষ কর।' মানে নি আটপৌরে কাহাররা। মেনেছিল কাহারদের অন্য অংশ—কোশকেঁধেরা। ক্ষুব্ধ কর্তা বজ্ররূপ দেখালেন—মাঠ পার হবার সময় 'কড় কড় করে বাজ' পড়ল দহের ধারে। তাও মানল না আটপৌরে-রা। চারবার ক্ষমা করলেন কর্তা। এর পরেও কথা না মানায় আটপৌরেদের 'তিনজনা' ধরা পড়ে যায়। কর্তার মধ্যে এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা, শাস্তি বিধানের উপকরণ কাহারদের সামাজিক সংহতি আর ন্যায় নীতি সম্পর্কে ধারণার বিবর্তনের ফল বলে মনে হয়। এই বিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে উপকথা বা myth নির্মাণের মারফৎ। কর্তাকে ঘিরে কাহারদের স্বপ্ন ও বাস্তব—কালচিহ্ন ও কল্পনার ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট আবর্তন কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছে।

অনিশ্চিত জীবন থেকে কৃষি-জীবনে প্রবেশের ক্ষেত্রে কর্তাবাবার ইতিবাচক নির্দেশ যেমন ছিল তেমনি ছিল শিল্প শ্রমিকের জীবনের দিকে যাত্রার ক্ষেত্রে নেতিবাচক নিষেধাজ্ঞা। চন্দনপুরের কারখানায়, রেল লাইনে কাজ করতে যাওয়া চলবে না। পাগলের গানে সেই নির্দেশ : 'ওপথে যেয়ো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।' কারণ ম্লেচ্ছ কারখানায় যুক্ত হলে জাতি ধর্ম যায়। মেয়েদের পক্ষে আর ফেরা সম্ভব হয় না। 'মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে'—। (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ)। সুতরাং কর্তাবাবাকে বলতে হবে একটি প্রাক-আধুনিক জীবনসংস্কৃতির আধ্যাত্মিক পরিণতি। সমাজ বিবর্তনের প্রাক পুঁজিবাদী বাতাবরণটিতে তার দৈব-রহস্য আর ক্ষমতার অস্তিত্ব সীমাবদ্ধ।

রেলপথ আর কারখানার সঙ্গে যুক্ত হবার পর করালী কর্তাবাবার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য দেখায় নি। ফলে তার যুক্তি ও সক্রিয়তা কর্তাবাবাকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছে। তার মধ্য দিয়ে এক myth-বিরোধী প্রত্যয় ধরা পড়েছে। কর্তার কাজকর্মের রহস্যভেদ করার বাসনা তার। কৌতূহল। কালু নামের কুকুরটির মৃত্যু যেখানে উপস্থিত সমস্ত কাহারদের মনে একটিই সিদ্ধান্ত তৈরি করেছে : 'কর্তা বোধহয় খড়ম সুদ্ধ বাঁ পাটা কুকুরটার গলায় চাপিয়ে

চেপে দিলেন' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ)—তখন করালী সে কথায় আমল দেয় নি। বাঁশবনে আগুন দিয়ে দেখেছে—বনওয়ারীকে ডেকে বলেছে : 'ওই ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে!' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই দুঃসাহস—আধ্যাত্মিকতার রহস্যযবনিকা ছিঁড়ে ফেলার সক্রিয়তা তার অর্জিত হয়েছে রেল লাইনের কুলি গ্যাঙে কাজ করে। 'রেল লাইনে আটাশ মাইলে'—ঠিক এরকম একটি ঘটনার কথা তার জানা। কাহারপল্লীর ঘেরাটোপের বাইরে যে বিস্তৃত পৃথিবী তাকে চিনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে বদ্ধ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সংস্কার ভাঙার সক্ষমতা তৈরি হয়—শেষ হয় উপকথা বা myth-এর জগৎ। প্রলয় ঝড়ের মধ্যে করালী যখন 'তেরপলের লম্বা জামা আর মাথায় টুপি পরে'—কারখানা-সংস্কৃতির আর্থিক পারঙ্গমতা আর সংবাদের (information-এর, কারণ কলকাতা থেকে আসা আবহাওয়ার পূর্বাভাষ তার জানা—এই information-এর) শক্তি আছে বলেই সে সুচাঁদকে বলে—'বাবা ঠাকুরের ডিঙে উল্টাচ্ছে। বেল গাছ উপড়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে'...(৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) পুরাকথার জগৎটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চিরকালের জন্য যেন শেষ হয়ে গেল। বনওয়ারীর ভাবনা—'হাঁসুলীবাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতা পুরুষ চ'লে গিয়েছেন।' আর ট্রাজিক অনুভবশীল প্রশ্ন—তবে আর কি রইল তাদের?' (ঐ) একটি প্রতীকের মতো কাহার সমাজের রক্ষাকর্তা দেবতার এই চলে যাওয়ার ইঙ্গিত অবশ্য উপন্যাসের শুরুতেই ছিল। চন্দ্রবোড়ার মৃত্যুকেই মনে হয়েছিল ইঙ্গিত। তারও আগে—চন্দ্রবোড়ার শিসের ব্যাখ্যাই ছিল কর্তাবাবা রুষ্ট হয়েছেন কোন কারণে।

সামান্য সময়—ইতিহাসের দৃষ্টিতে সামান্য কয়েকটি বৎসর। কিন্তু তার মাঝখানে ছিল যে জীবনের বর্ণাঢ্যতা *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় তারই চিত্ররূপময় গদ্যভাষ্য—তারাশঙ্কর। আর এখানে উপকথার বিন্যাস, স্মৃতি-বিস্মৃতির রূপাভিসার ঘটেছে। এই অভিসারের মাঝখানে myth নির্মাণের ভূমিকা অত্যন্ত গভীর, ব্যাপক। তবে, সব পুরাণধর্মী বিষয়গত উপাদানই একান্ত কাহারদের তৈরি নয়। এই myth-পরম্পরার কিছু প্রকারভেদ আছে।

১. কাহারদের নিজস্ব নির্মাণ। উপন্যাসের প্রকৃত মৌলিক উপাদান এখানে।
২. কাহারদের উপর এসে পড়া অন্য উপাদান। যা তাদের লোকস্মৃতিকে উদ্বেজিত উচ্ছল করে।
৩. সাধারণ-ভাষ্যে উঠে-আসা, হাল্কা ভাবে বলা, উপন্যাসের কথক বা লেখকের সন্নিবেশ।
৪. পুরাণের আদি দ্বন্দ্ব যখন সহসা কাহিনীর বৈশিষ্ট্যকে বুঝতে বা সাহায্য করতে পারে। তৈরি হয় উপন্যাসের নতুন পুরাণ-নিষ্ণাত ব্যাখ্যা।

এ পর্যন্ত যে আলোচনা করেছি তাতে কাহারদের উপকথার গভীর ও ব্যাপক প্রভাবশীল পুরাণ-নির্মাণের দিকেই মনোযোগ পড়েছে বেশি। এর মধ্য দিয়ে কাহারদের সমাজব্যবস্থার বিবর্তনের ছবি ধরা পড়েছে। লেভি স্ট্রাউস দেখিয়েছেন একটি বদ্ধ সমাজের বিপরীতমুখী টানাপোড়েন পুরাণ-প্রসঙ্গে ধরা পড়ে। কোশকেঁধে আর আটপৌরেদের বিভাজনে অভিভাবক দেবতার নির্দেশ মানা বা না-মানার ভূমিকা গড়ে তুলেছে তাদের পুরাণ-কথা।

'মা-মনসার বেটি' সুবৃহৎ সাপটি কাহারদের কর্তাবাবার বাহন। এই ভাবনাটি সুচাঁদের মুখে, নয়ানের মা বাসিনী-বৌ-এর মুখে কয়েকবার এসেছে। এটি মনসা-উপকথার সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে যুক্ত নয়। তাই একে কাহারদের নিজস্ব মিথ-নির্মাণ বলে ধরতে হবে। অন্যপক্ষে

মনসার বারি তোলাও পূজান্তে কালিদহের জলে ফিরিয়ে দেওয়া কাহারদের লোককৃত্য (folk ritual) বলে গ্রহণ করতে আপত্তি নেই। মোট কথা, মনসা-সংক্রান্ত উপকথাগুলি *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় প্রক্ষিপ্ত নয়।

বর্ষ শেষের সময় বনওয়ারীর ভাবনা 'আটচল্লিশ সাল শেষ হলেন, উনপঞ্চাশ সাল এলেন'—খানিকটা আরোপিত মনে হলেও একে অস্বাভাবিক বলব না। একটু পরে এই ভাবনার অনুষঙ্গে 'উনপঞ্চাশের পবনে আর পবননন্দনের 'বিক্যমে' অর্থাৎ বিক্রমে কাহারপাড়ার এবার আর দুর্দশার সীমা রইল না'—ভাবনাটি অবাস্তব। (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এখানে দুটি পুরাণ-অনুষঙ্গ। ১. উনপঞ্চাশ পবন আর ২. পবনন্দনের বিক্রম। প্রথম প্রসঙ্গটি যথেষ্ট পারিভাষিক ধ্যান-ধারণার ফল। হনুমান যে পবন-নন্দন তা হাঁসুলীবাঁকের বনওয়ারীর জানা থাকা অসম্ভব নয়—তবে এভাবে ভাষাটা লেখকের আরোপ বলে মনে হয়।

যমদূত আর শিবদূত— প্রসঙ্গটি অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য জাতীয় অর্বাচীন পুরাণের। পাপীর পাপ শিব-নামে খণ্ডায়, শিবস্থানে মারা গেলে পাপীর আত্মা মুক্তি পায়—এই ধারণা মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যধারায় অল্প বিস্তর পাওয়া যায়। বনওয়ারী যখন ভাবে—'তোমার দয়ায় পাপীর পাপ খণ্ডায়, যমদূতের হাত থেকে পাপীর পরাণ পুরুষকে ছিনিয়ে শিবদূতেরা কৈলাসে নিয়ে যায়।' (২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ)—তখন কিন্তু কাহারদের পুরাণ চেতনায় এই ভাব-বিশ্বাস খানিকটা যেন বহিরঙ্গের মনে হয়। এভাবে ভাবা কি বনওয়ারীর পক্ষে সম্ভব? সন্দেহ দূর হয় না। বাস্তবতা আর যুক্তির দাবি, মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিকতার সম্ভাব্যতার কথা মনে আসে।

কাহার সমাজের মাতব্বর বনওয়ারী তরুণ অবাধ্য করালীকে একটু বোঝাবার চেষ্টা করেছে একটি কাহিনী বলে। কাহিনীটি বিশ্বাসযোগ্য—উপকথার অন্তর্গত, উপন্যাসের পুরাণ-প্রসঙ্গ এখানে সৃজনশীল। 'ধরমের পথে থাকলে বাবাঠাকুর আদেক এতে এগিয়ে দেন আহার্য। 'দোপর-তিনপোর এতে নিজে এসে খাবার ধরে দেন। বলেন—'বেটা, ধরণের পক্ষে থেকে আজ ভাত জোটে নাই, লে খা।' (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) বাবাঠাকুর যে কাহারদের প্রত্যেকটি কাজের দিকে লক্ষ রাখেন—তার সেই সর্বদর্শী (Omniscient) শক্তির প্রতি কাহারদের বিশ্বাস দৃঢ় হয় এই পুরাণধর্মী কাহিনীতে।

গোপালীবালাকে বেশ লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিত করে এঁকেছেন তারাশঙ্কর। সুবাসীর সঙ্গে বিয়ের আগে গোপালী কেঁদে উঠেছিল। পাগলদের কাছে সমস্যার সমাধান পেতে চেয়েছিল বনওয়ারী। পানু বুদ্ধি দিয়েছিল—দশটা টাকা দিয়ে তাকে ঘর সংসার ধার মহাজনী করতে বললেই সব ভুলে যাবে গোপালী। বনওয়ারী দশটাকা নয় কুড়ি টাকাই দিয়েছিল। 'আজলা-ভরা ঝকঝকে টাকা'-য় মন ভুলেছিল তখনকার মতো। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এর কিছুদিন পরে যখন যুদ্ধের বাজার, সব কিছুর দাম বাড়ছে চড় চড় করে, মাঠে কাজ করতে করতে একবার বনওয়ারী ঐ টাকায় ধান আর আখ কিনতে বলেছিল। লাভ যা হবে গোপালী নেবে। তারপরে বলে—'তবে যদি অভাব অনটন পড়ে, লোক তোমার কাছে চেয়ে খাবে। তুমিই তো ঘরের গিন্নী, তুমিই তো লক্ষ্মী আমার, তোমার দৌলতেই তো সব। আমি তো ভিখিরি, খাটি, খাই।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এখান 'অন্নদামঙ্গল'-এর পুরাকথা বনওয়ারীর মুখে আক্ষিপ্ত হয়েছে। শিব পার্বতীকে অসন্তুষ্ট রেখে বিশ্বজুড়ে ভিক্ষাবৃত্তি করেও ক্ষুধা মেটাতে পারলেন না। শেষে অন্নদা-রূপিণী পার্বতীর দেওয়া অন্নে মিটল তাঁর ক্ষুধা।

নর্থ্রপ ফ্রাই লিখেছেন পুরাণ-প্রতিমা সাহিত্যে প্রযুক্ত হলে তা অনেক মানুষের মধ্যে সহজে ছড়িয়ে পড়ে, হয় বেশি মাত্রায় 'communicable'। কারণ 'a large number of people in a given culture happen to be familiar with them.' (*Anatomy of Cirticism* ; উক্ত; 102 পৃ.) কাহিনীটি বাঙালি পাঠকের পরিচিত। কিন্তু সন্দেহ হয় বনওয়ারী-গোপালীবালার কাছে এ-কাহিনীর খুব তাৎপর্য ছিল কিনা। একে তাই কাহার সমাজে অক্ষিপ্ত পুরাকথা বলেই গ্রহণ করছি।

লেখকের ভাবনার পরিচয় আক্ষিপ্ত পুরাকথা ও পুরাণ-প্রতিমাতে ধরা পড়ে। বনওয়ারী করালীচরণ (কোন কোন সময় 'করালী কিঙ্কর') নাম দুটির আড়ালে বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রসঙ্গ থাকতে পারে। বনওয়ারীর গো-সম্পদের প্রতি আসক্তি, চারণ বৃত্তির প্রতি বিশেষ নজর (শেয়াল-এর হাত থেকে বাঁচার কৌশল তরুণ রাখাল কাহারদের শেখানোর মধ্যে স্পষ্ট) প্রভৃতিতে মনেই হয় তার ভূমিকাটিকে ঘিরে অনেকটাই যেন কৃষ্ণকথার কাহার-প্রতিম ভাষ্য গড়ে তুলতে চান তারাশঙ্কর। এর সঙ্গে যদি গোপালীবালা নামটি মিলিয়ে নিই তাহলে আমাদের ভাবনা বেশ সমর্থন পায়। করালীচরণকে যখন কাহারদের মধ্যে নবীন যুগের নটবর ভাবা হয়েছে—তখন মনে হয় বনওয়ারীর সঙ্গে কৃষ্ণকথা সামান্য এগিয়ে থেমে গেছে। তার বদলে নতুন কৃষ্ণ-কথার নায়ক হয়ে উঠেছে করালী। সুচাঁদের সূত্রে বনওয়ারীকে করালী পাখি 'মামা' বলে ডাকে। করালী আগে ডাকত কাকা পরে পাখির সঙ্গে বিয়ের পর ডাকে মামা। সেই সূত্রে সুবাসী তার মামিমা। মনে করিয়ে দিই—কৃষ্ণ-রাধার সম্পর্কও তাই। অর্থাৎ *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় পাচ্ছি কৃষ্ণকথার একটি হাল্কা ছায়া। এর ফলে কাহিনীটি পুরাণ-নিষ্ণাত হয়ে উঠেছে, বলাই বাহুল্য। করালীর বাঁশিবাদন সেটির প্রতি পাড়ার তরুণীদের আকর্ষণ বিশেষত সুবাসীর—এ প্রসঙ্গে মনে হয় নতুন আর একটি মাত্রা। আর একটি কথা লিখে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। কর্তাবাবার বাহন চন্দ্রবোড়াটিকে হত্যা করার ঘটনাটি করালীর তরুণ বয়সের দুঃসাহসী বীরগাথার অন্তর্গত। ঠিক যেন কৃষ্ণের কালীয় দমন। বাংলার মনসা কৃষ্টির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের একাংশ মন্ত্রযানী। সাপের মন্ত্রের একটি অংশে বিষের জন্মকথা বলা থাকে। সাধারণ সেই কথা 'আদ্যের কথা' বলে পরিচিত। কিছু আদ্যের কথায় কালীয় দমনের ফলে বিষের জন্ম ঘটার প্রসঙ্গ স্পষ্ট হয়েছে। করালীর প্রসঙ্গ এভাবেও কৃষ্ণকথার অনুগত।

উপন্যাসে পুরাণ প্রসঙ্গে মহা প্লাবনের কথা আলোচনার সূচনায় দেখিয়েছি। গ্রিক পুরাণ-কথায় আগুনকেও বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রমেথিউস মানুষের জন্য আগুন এনে সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছিল। পুরাকথায় সাধারণভাবে বেঁচে থাকা—মরে যাওয়া, সমিধ আর ছাই এরকম বহুবিধ দ্বান্দ্বিকতা থাকে। এর মধ্যে কখনো ঘটে অদ্ভুত সব ব্যাপার; ম্যাকস গ্লুকমান্ 'Rituals of Rebellion' বলে যাকে অভিহিত করেন। প্রমেথিউস এই বিদ্রোহের অন্যতম রূপ কিভাবে চিত্রিত হয়েছে তার সামান্য বিশ্লেষণ করেছেন জন পিনসেন্ট। 'For in retaliation Zeus either hid fire away or withheld it from the ash trees from which men extract it by fire sticks, which they rub together until the hidden fire is revealed. But Prometheus, like a good culture hero, stole it from heaven where it can be seen in sun and stars, and from which it descends in lighthing.' (*Greek Mythology* ; উক্ত; 39 পৃ.) ভারতীয় পুরাকথায় আগুনের মারফৎ সভ্যতার বিকাশ, পবিত্র অগ্নি সংগ্রহ ও রক্ষার কৃত্য, যজ্ঞাগ্নি থেকে নায়ক বা নায়িকার জন্ম—যজ্ঞাগ্নির মারফৎ দৈত্য বা রাক্ষসদের দূরে

সরানোর ইতিবৃত্ত প্রচুর। কখনো খাণ্ডববন দগ্ধ করার কাহিনীতে বোঝা যায় একটি যুগ শেষ হল। দ্বন্দ্ব ঘন নাগ-অসুর আর কৃষ্ণার্জুনের এই কথা—পৃথিবীর যে কোন মৌলিক কাহিনীর মতো। ইন্দ্রের বজ্র আর বাড়বাগ্নির কথা—ভারতীয় পুরাণের চমৎকার বৈচিত্র্য ও বিষয়-গৌরবের পরিচয় বহন করে।

হাঁসুলীবাঁকে আগুন বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ তৈরি করেছে। বস্তুত জল আর আগুন—প্রকৃতির এই দুই শক্তির মাধ্যমে যেন সৃষ্টি আর ধ্বংসের আবর্তন চক্রকে তুলে ধরেছে হাঁসুলীবাঁকের সাধারণ কাহার সমাজ। আকাশ জুড়ে নেমে আসা বর্ষা বাদল—মেঘের মাঝখানে বাসিনী-বৌ যখন দেখতে পায় করালীর মারা চন্দ্রবোড়া সাপটি লক লক করছে, তখন আগুন প্রসঙ্গ *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় ঢুকে পড়ে।—'নয়ানের মা সেই দুর্যোগ ভরা আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চীৎকার করে উঠল হঠাৎ—বাহনের মাথায় চেপে নাচো বাবা। লক লক করুক তোমার বাহনের জিভ!' (২-য় পর্ব; ছয় পরিচ্ছেদ)। নিছক উপমা নয়—এ হল প্রকৃতির ঘটনার সঙ্গে পুরাণের উপাদানের সমাপতন। জলস্তম্ভের সূত্রে বনওয়ারীর মনে পড়ে ইন্দ্রের কথা। ইন্দ্র জল বৃষ্টি আনেন—আবার তাঁর আছে 'বজ্জডণ্ড অর্থাৎ বজ্রদণ্ড'—যার সাহায্যে 'মেঘের সমুদ্রে আঘাত' করে বৃষ্টি আনার চেষ্টা চলে। তখন সেই আঘাত বজ্রপাত হয়ে ওঠে। 'তা থেকে ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি।' এই আগুন পাপীদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণীর মতো। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এরকম সাবধানবাণী প্রতীকের মতো একদা আট পৌরেদের জীবনে নেমে এসেছিল। 'কড়কড় করে বাজ' পড়ে 'শিমুল গাছের পাশে তাল গাছের মাথায়'—'বাবার দহের ধারে'—চুরি করতে যাওয়া, কর্তাবাবার নিষেধ অগ্রাহ্য করা কাহারদের ভয় দেখাতে চেয়েছিলেন দেবতা। আটপৌরেরা শোনে নি। ফল—পুলিশের হাতে ধরা পড়া।

ভাঁজো উৎসবের রাত্রে বনওয়ারী পরমের ঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল। গোটা গ্রাম তখন ভাঁজোর আনন্দে মাতোয়ারা। বনওয়ারী ভূতগ্রস্তের মতো চলল পরমের ভিটের দিকে। 'কে যেন তাকে ঘাড়ে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।' (৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) কে? কোনো অশরীরি শক্তি? কর্তাবাবা? সেক্ষেত্রে বনওয়ারীকে মনে হয় কর্তাবাবার জীবন্ত সচল প্রতিনিধি। তার ইচ্ছা আর পাপবোধ, প্রত্যয় আর অবদমিত মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সেই অদ্ভুত রাত্রিতে প্রকাশিত হয়। তার স্বাগত ভাষণের অংশ বিশেষ : 'তুমি নিজে মাহাত্ম্য দেখাও বাবা। হাঁক মারো বাবা! বাঁচিয়ে তোল তোমার বাহনকে, তাকে বল বাবা, আকাশে তুলুক ফণা—করালী, এই পাপ করালীর কোঠা ঘরের মাথা নিশ্বেসে জ্বালিয়ে দিক বাবা, আর জ্বালিয়ে দাও পরমের ঘর'...(ঐ) ইচ্ছাপূরণ কিন্তু হয়নি বনওয়ারীর। পরমের ঘরের বদলে রমণের ঘরে আগুন লেগে যায়। লাগিয়েছিল কিন্তু বনওয়ারীই। জ্বালাবার সময় বলেছে—'জয় বাবাঠাকুর—জয় বাবাঠাকুর—কালোবউ, অপরাধ নিয়ো না, বাবা ঠাকুরের হুকুম।' (ঐ) বনওয়ারীর এই বিড় বিড় করা কথা সবাই শুনেছে। ইচ্ছা আর বিশ্বাস—এখানে একাকার। পরমকে শেষ করা, পরমের ভিটেতে আগুন দেওয়া কোশকেঁধে বনওয়ারীর ইচ্ছাপূরণ—আসলে সে বিশ্বাস করতো কালোশশীর প্রেত ঘুরে ফিরছে ঐ নির্জন পড়ো ভিটেতে। আশা ছিল, এই আগুন হবে তার ক্ষমতা বৃদ্ধির নিদর্শন। কিন্তু মাতাল বনওয়ারীর সামান্য ভুল হয়ে গেল। পরমের পরিত্যক্ত ভিটে নয়—আগুন লাগল 'রমন কাকা'র ভিটেতে। কদিন আগে জল হয়েছে—ভিজে চালায় আগুন বেশি ছড়ায় নি।

করালীর সঙ্গে ঝাকড়া গাছতলায় যে ভয়ঙ্কর লড়াই হল তাতে যা ঘটা স্বাভাবিক, তাই ঘটল। বনওয়ারী হেরে গেল। তারপর বনওয়ারী 'অরণ্য-বানরের মতো' হাহাকার করল কতক। হঠাৎ চমক ভাঙল তার—একটা শেয়াল হাঁ করল কাছাকাছি—'তার মুখে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল।' তার মনে হল এটি মোটেই শেয়াল নয়। 'বাবাঠাকুর চর পাঠিয়েছেন।' (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) আগুনের ইঙ্গিত। চকমকির চোঙা নিয়ে 'খড়ের নুটিতে আগুন ধরিয়ে' দেওয়ার বাসনা তার—অসম্পূর্ণ থেকে গেল সেই প্রয়াস। তবু, জল আর আগুনের এক ধারাবাহিক পরম্পরা—হাঁসুলীবাঁকের পুরাণ-প্রতিমায় শেষবারের মতো সামান্য কেঁপে উঠল বুঝি। নেমে এল বিস্মরণশীল 'কুয়াশার আস্তরণ'।

উর্বশী পুরূরবার কাহিনী বিশ্লেষণ করে ডি. ডি. কোশাম্বী অগ্নি-উৎপাদনের আদি কথা বিচার করেছেন। আয়ু আর অগ্নি—অরণি আর গন্ধর্ব—প্রভৃতির সমাপতন—ক্রমশ তাঁর মতে 'natural interpretation of the whole myth' (*Myth and Reality/Studies in the Formation of Indian Culture* ; উক্ত; 49 পৃ.) জল আর আগুনের শৃঙ্খলে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* তেমনি একটি প্রান্তিক শ্রমজীবী জনসাধারণের মনোজগতের নানা বাঁকের পরিচয় দিতে দিতে নতুন নতুন interpretation-এর দিকে এগিয়ে গেছে।

৮

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : কৃষকের বারমাস্যা

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ভূমি-চুম্বিত উপন্যাস। ভূমি ব্যবস্থা—ভূমি-নির্ভর মানুষের সংস্কৃতি এ-উপন্যাসের মর্মবস্তু। মৌজা বাঁশবাদির জমি 'মোটমাট আড়াই শো বিঘা' ; জাঙল গ্রামের সীমানায় আবাদি জমি 'তিনহাজার বিঘা', পতিত জমি অনেক। বাঁশবাদির ঘর তিরিশেক কাহারদের নিয়ে উপন্যাসের মূল কাঠামো তৈরি হয়েছে। বাকি জাঙল— সেখানে অন্যরকম মানুষও আছে। জাঙলের মূল জনগোষ্ঠী সদগোপ। একসময় গোটা বাঁশবাদি মৌজা ছিল 'পতিতভূমি'। '১২৫০ সালে' বাঁশবাদি-সহ জাঙলের পতিত জমি বন্দোবস্ত নেয় নীলকর শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স। নীলকরদের কুঠি, পুকুর, নীল পচানোর চৌবাচ্চা,নীল চাষের এলাকার সাধারণ নাম কুঠিডাঙা বা সহেবডাঙা। চন্দনপুরের ব্রহ্মণবাবুরা কয়লার ব্যবসায়ী—'তারা হঠাৎ জমির উপর নজর দিয়েছেন।' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) জমি কিনছেন, কিছু প্রজা বিলিও করবেন—এখবর পরম আগে পায়। পরে পায় বনওয়ারী। কর্তাবাবার অনুমতি নিয়ে ছাগ উৎসর্গ করে জমি পেতে দরবার করে সে। সেই জমি পাওয়া গেল সাহেবডাঙায়। চন্দনপুরের বাবুরা দুইভাবে জমি বন্দোবস্ত করেছেন। প্রথম, সেলামি নিয়ে, দ্বিতীয়, বিশ সেলামিতে। সেলামি দিয়ে জমি নিয়েছে সদগোপরা—বনওয়ারী জমি নিয়েছে বিনা সেলামিতে।

বনওয়ারী জমি নেবার সময় ভেবেছিল কথাটা সকলকে জানানো দরকার। কাহারদের কাছে একথা গোপন রাখা 'মাতব্বরের যোগ্য হবে না'—'অধর্ম হবে'। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) জমি চাষ করার আগে জমি 'কাচা'। দিনে কাহারদের অন্যরকম কাজ থাকে। সবাই সদগোপ মনিবদের কাছে কাজ করে। বর্ষা আসার আগেই ঘর ছাওয়ার কাজ চলছে। রাত্রে 'জমি কাচার কাজ' চলে। শুক্লপক্ষ—চাঁদনি রাত, সেসময় জমি তৈরির বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর। জমিতে ''পাথরের 'থাক' অর্থাৎ স্তর'' ছিল—সাধারণ ভাবেই 'কড়াধাতের মাটির দেশ'—'কোদাল কি টামনায় কাটে না, কোপ দিলে কোদাল-টামনারই ধার বেঁকে যায়; গাঁইতির মত যে যন্ত্র সে দিয়ে কোপ দিলে তবে খানিকটা কাটে কিন্তু প্রতি কোপে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ে।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ)। বনওয়ারী কাহারদের স্বাভাবিক মাতব্বর—কাহাররা তার জমিতে বিনা মজুরিতে কাজ করে, কেবল দৈনিক মদের মূল্য—দু জ্বালা মদ তারা নেয়। এইভাবে বনওয়ারীর জমি মোটামুটি তৈরি হয়।

জৈষ্ঠে প্রথম বর্ষার পর সময়ের চাষ—'বাতের চাষ' দিতে হয়। কাহাররা জানে— ''এসময় একটা 'বাতের চাষ' বিঘে ভুঁই দু গাড়ি সারের সমান।'' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কাহাররা যে জমি চাষ করে তাতে তাদের ভূমি-সম্পর্ক কতটা নিবিড় বোঝা যায়। সকলের নয়। পাশেই আটপৌরেদের মাতব্বর পরমের জমি। চাষে তাদের মন নেই। যথারীতি তার জমি—'যে ডাঙা, সেই ডাঙা।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) আবার সদগোপরা যে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছে তা তারা নিজেরা তৈরি করে না—তারা নগদ পারিশ্রমিকে সাঁওতাল কৃষি শ্রমিকদের নিয়োগ করে। সদগোপদের পাশাপাশি আছে চন্দনপুরের বাবুদের নিজস্ব জমি

তৈরি। সে অনেকটা পাশ্চাত্য ফারমিং-এর মতো। আছে তাদের 'চাষবাবু'। আর 'দেড়শো সাঁওতালের টামনার কোপে বাবুদের কাজ এগিয়ে চলেছে'। [২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

কৃষিকর্মের এই রকম অনেক আন্তরিক সংবাদ তারাশঙ্করের বর্ণনায় উপস্থিত। বনওয়ারীর চাষ অনেকটাই যেন অস্থায়ী ঝুম চাষের কালোচিত পরিণতি। ''ভাদ্র মাসে কতকটা 'তে পেখে' অর্থাৎ তিনপক্ষীর কলাই, কতকটা খেসো মুগ, কতকটা বরবটি ছিটিয়ে যা ফসল হবে তার ভোগ দিতে হবে 'বাবাঠাকুরের থানে'। 'মুগসিদ্ধ বরবটি সিদ্ধ আর এক বোতল পাকি মদ।'' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) গোটা কলাই দিতে হবে 'কালারুদ্দুর পুরুত মশায়কে'। আর ভাগ পাবেন চন্দনপুরের বাবুরা—তার 'নতুন মালিক বাড়ি'। জাঙালের মনিবরা দু পুরুষের—ঘোষ বাড়ি, তাদেরও দিতে হবে ভাগ। ভাগ দিতে হবে পাড়ার সকলকে। 'প্রথম বছরের ফসল' এমনি করে সবাইকে দিয়ে খেতে হয়। কৃষির সূচনার এই রীতি। গণসমাজের সামূহিক উৎপাদনের আদি রূপটি বুঝিয়ে দিচ্ছে যেন।

কাহারদের নীল কুঠির জীবন পরিধি ভেঙে যাবার পর তাদের ব্যাপক অনিশ্চয়তার কথা সুচাঁদের উপকথার বৃত্তে ধরা পড়েছে। নীলকর সাহেবদের প্রতিপত্তি 'মনন্তরা'র রাত্রে ধ্বংস হল, জাঙলের চৌধুরীদের হাতে গেল ক্ষমতা। উপকথার কল্পনায় 'যখের ধন' পেয়ে বেবাক জমিদারি 'হক হুকুক' কিনতে থাকে চৌধুরী। কাহাররা পড়ল 'অত্যন্তরে'— ঘর নেই, দুয়োর নেই—'আশ্চয়' নেই, চাকরি নেই। তাদের তো আর প্রয়োজন নেই—দরকার নেই লাঠিয়াল বা পালকি বাহক। 'চাকরান জমি' কাহারদের হাত থেকে খাস হয়ে গেল। সারারাত হাহাকার করল তারা। তখন আশ্বিন মাস—দুর্গাপূজা চলছে। দৈবী মহিমাই বলতে হবে—নবমীর দিন চৌধুরী বললেন, ভিটেগুলোতে থাকুক কাহারবা—চাকরান ভোগ করুক। চাকরান বলতে কি বোঝায় তা অনেকেই জানবেন। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার এ এক প্রাচীন পদ্ধতি। কার্ল মার্কস যাকে বলেছেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি—এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশান। এর আদলটি হল পারস্পরিক সহযোগিতা ভিত্তিক এক বিশেষ বহু-পেশা ও বৃত্তির জীবন। গ্রামবাসীরা সকলে এসব বৃত্তিতে যুক্ত থাকে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ছুতোর-কুমোর-কামাররা, নাপিত-বায়েন বা অনুরূপ বৃত্তিধারী যারা কৃষকদের সাহায্য করে, তাদের কাজে লাগে যেসব দ্রব্য তা যোগান দেবার দায়িত্ব ঐসব বিভিন্ন বৃত্তিধারীর। প্রত্যেকের জন্য ভূমি নির্দিষ্ট থাকত। একে বলা হত চাকরান। ব্রাহ্মণদের জন্য ভূমি থাকত—ব্রহ্মাত্র, দেবস্থলের জন্য থাকত নিষ্কর জমি—দেবত্র। মুসলমান শাসকদের সময়ও এরকম রীতি চালু ছিল। মসজিদের জন্য, কবর খানার জন্য জমি থাকত—ওয়াকফ সম্পত্তি। কোথাও থাকত পীরোত্তর জমি। ড. নির্মল কুমার বসু তাঁর *হিন্দু সমাজের গড়ন* (বিশ্বভারতী, ১৩৯১ ; প্রথম সংস্করণ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) বইটিতে পুরী জেলার অনেক বৃত্তিজীবী মানুষদের দেখিয়েছেন—সবাই চাকরান ভোগ করত। তারাশঙ্করের *গণদেবতা*-য় এ ব্যাপারে আধুনিক বাজার-ব্যবস্থার সঙ্গে কিছু সামাজিক টানাপোড়েনও দেখা যায়। 'নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার—সবাই বাৎসরিক ধানের বন্দোবস্তে খুশি থাকতে পারেন নি—সকলেই বলেছেন নতুন এক বাজারি অর্থনীতির কথা।' (''আর এক আরম্ভের ভূমিকা'' : অচিন্ত্যবিশ্বাস ; *তারাশঙ্কর সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*-গ্রন্থভুক্ত ; উল্লেখিত; ১৮২ পৃ.) বাৎসরিক ধানের বন্দোবস্ত চাকরান-প্রথার পরিবর্তিত রূপ। কাহারদের বাস্তু থেকে উচ্ছেদ করা হল না—এটুকু চাকরান থাকল। 'কালেকস্মিনে পাল্কির দরকার হলে

বইতে হবে।' (১ম পর্ব পাঁচ পরিচ্ছেদ) অন্য জমি তারা পাবে না। 'কৃষাণি-মন্দেরী' করতে হবে তাদের।

কাহাররা তখন কৃষিকর্ম জানত না। পরে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল সদগোপ মনিবদের জীবন। সদগোপ মনিবদের মাঠে খাটতে খাটতে দু প্রজন্ম যেতে না যেতেই তারা হয়ে পড়ল চাকলার শ্রেষ্ঠ কৃষি শ্রমিক। চাকরান ভোগ করার পূর্বশর্ত চিরাচরিত রীতি মান্য করা। করালী চিরাচরিত রীতি ভেঙে যখন কোঠাবাড়ি গড়ছে তখন শর্ত ভাঙা হচ্ছে। সুচাঁদ ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করেছে কোঠাবাড়ি গড়া কত্তাবাবার নিষেধ। চৌধুরীদের ভাবনা একটু ভিন্ন। ক্ষয়িষ্ণু জমিদার ব্যবস্থার একটি চরিত্র চিত্র পাওয়া গেছে চৌধুরীদের ক্রিয়াশীলতায়। 'ঘর ভেঙে ঘর করতে হলে চৌধুরীদের হুকুম নিতে হয়। মুখে বললেই হুকুম হয়ে যায়--একটাকা নজর দিতে হয়।' (৪র্থ পর্ব দুই পরিচ্ছেদ) শাশুড়ী বসন্তের মাধ্যমে সে টাকা করালী পাঠিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এই 'নজর' দিয়ে কোঠাবাড়ি করার কোন রীতি তো নেই—চাকরান বাস্তুজমিতে কোঠাবাড়ি করার রীতিই নেই! তাই পড়ন্ত 'চৌধুরী বাড়ির ভাঙা দালানের নোনা-ধরা ইঁটের দাওয়া থেকে' পাঠানো হল 'আটপোরে পাড়ার নবীন মাহিন্দারকে'। সে গিয়ে দাঁড়ালো 'পূর্বপুরুষদের ঘুণ-বাঁশের লাঠি হাতে'। কিন্তু করালী তার কথা মানে নি, হাত মুচড়ে দিয়ে বলেছে আইন কানুনের সুস্পষ্ট কথা। 'সেটেলমেণ্ট' হয়েছে—'পরচা' আছে--বাস্তুভিটেতে 'যেমন ইচ্ছা ঘর' করার কায়েমি অধিকার আছে তার! খাজনার পরিবর্তে 'একটি বেগার' বা তার মজুরিও দিতে পারে সে। কিন্তু ঘর সে যেমন খুশি করতেই পারে! বস্তুত 'সেটেলমেণ্টের সময়' চৌধুরীরা চাকরানের ক্ষেত্রে তেমন শর্তই রেখেছিল—'পাল্কী-বহনের দাবির বদলে মজুর বেগার' পাওয়াই ছিল তাদের ইচ্ছা। এই পরিবেশ ইংরেজ শাসনাধীন কৃষিব্যবস্থার বাস্তব। হাঁসুলী বাঁকে এই সব যুগান্তর-চিহ্ন নানাভাবেই অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর।

কেমন করে বনওয়ারীর বাবা তারিণী ঘোষদের সঙ্গে যুক্ত হল, তার একটি রূপকথাধর্মী কাহিনী লিখেছেন তারাশঙ্কর। কোপাইয়ের বানে একটি বেশ বড় কাঠ পেয়েছিল তারিণী। বুড়ো ঘোষকর্তার মৃত্যুর পর ঘোষদের পরিবার সঙ্কটগ্রস্ত, ছেলে থিয়েটার করে ফেরে—'মেয়ে সেজে বক্তৃতা' দেয়। অনেক রাত্রে বিধবা মা খাবার বদলে দিলেন 'ভাঙা থালায় এক মুঠো সত্যি সত্যি ছাই'। ছেলে সেই রাত্রে নিরুদ্দেশ হয়। ঘোষগিন্নিকে তারিণী দিয়েছিল ঐ কাঠ—ছুতোর ডেকে করা হয় ঢেঁকি। 'এই হ'ল সম্বন্ধের সূত্র।' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) তারিণী যেত চন্দনপুর ধান আনত, চাল দিয়ে আসত। ঘোষ গিন্নীর-রা ধান ভানতেন। আরও নানা রকম সাহায্য করত তারিণী। 'নিতান্তই একতরফা ব্যাপার।' মজুরি পেতেন ঘোষ গিন্নীরাই! ঘোষ ফিরে এলেন পাঁচ বছর পরে। উপার্জন করেছেন প্রচুর। ঘোষরা কিনলেন জমি। ঘোষের মা 'তারিণী আমার বড় ছেলে' বলে চাষে যুক্ত করলেন। হাল বলদ কিনে দিলেন তারাই। 'সৎ জাতির সেবা করে' অভাবিতপূর্ব পুরস্কার পেল অনিশ্চিত পেশার কাহার পরিবার একটি। অন্যদের নিশ্চয়ই একই রকম কাহিনী। তবে এখন আর বনওয়ারী 'আগের মত সরাসরি' ঘোষ বাড়িতে 'ঢুকতে পারে না'। এখন আর বড় ঘোষকে উপদেশ দেবার কথাও ভাবে না। এক সময়কার একতরফা সাহায্যকারী তারিণীর পুত্র বনওয়ারী স্থায়ী কৃষিশ্রমিক হয়ে গেল। উপন্যাসের শেষে এই উপকারের প্রতিফল হাতে হাতেই পেয়েছে বনওয়ারী। মৃত্যুর আগে জেনে গেছে সে : 'ঘোষেরা'—'এতকালের মনিব ভাগের জমি ছাড়িয়ে' নিয়েছে! [শেষপর্ব]

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার মানবিক দিকটির কথা আগে লিখেছি। এর ফলে তৈরি হয় অন্যোন্যসম্পর্ক—নানা শ্রেণী ও বর্গের পরম্পরিত সহযোগী সম্পর্ক। অন্যপক্ষে এর আড়ালে মনুষ্যত্বের হীন অপমানের ছবিটিও অস্পষ্ট থাকে না। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র কৃষকদের অবস্থা কেমন একটু দেখাই।

১. কর্তার পুজোর একটু দেরি হওয়ায় রতনকে তার মনিব বলে—'ওরে বেটা গুয়োটা কাহার'—কর্তার পুজো করে 'কেডামাতন' করে বেলা বাড়িয়ে এসেছে। তার 'জাওন'— যে শুকিয়ে যাবে। 'জাওন' অর্থাৎ ভিজিয়ে রাখা মাটি, দেয়াল তোলা বা সংস্কার করার পরিকল্পনা নিয়ে ভেজানো। তীব্র ভর্ৎসনার সময় 'রতন ঘাড় হেঁট করে কান টানতে' থাকে। এ হল 'সবিনয় অপরাধ স্বীকারের ভঙ্গি।' শুধু তাই নয়—পাশাপাশি সামান্য হাসি দরকার। 'নিঃশব্দে দন্তবিকাশ।' অর্থাৎ 'তিরস্কারের অন্তর্নিহিত সদুপদেশ এবং স্নেহ' সে বুঝেছে। (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) অবশ্য বিপদে আপদে মনিবরা সাহায্যও করেন। কখনও 'মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে' আপ্ত বাক্য বলেন তারা। তবে প্রায়ই পড়ে 'আষিড়ে' কিল—'কিল খেয়ে' অবশ্য তার 'অভ্যেস হয়ে যেয়েছে। মারলেও কিছু হত না।' এই ছিল প্রহ্লাদের সমাধান।

২. আখের গুড় তৈরির 'শালে' আছে সবাই। হঠাৎ বৃষ্টি। রতন হেদোকে বলল 'মুনিব মশায়, আধ মন গুড়ের মানতে বাবার মন উঠল না। এক মণ মানত করেন।' কালারুদ্রের উদ্দেশ্যে 'আধ মন গুড়ের শরবৎ' ইতিমধ্যেই মানত করেছিল সে। উদ্দেশ্য বৃষ্টি যেন থামে। তা না হলে তো গুড় নষ্ট হবে। দাস মনোবৃত্তির কাহার, এছাড়া আর কিই বা বলতে পারত সে। হেদো মণ্ডল অবশ্য 'কাহার' নয়, ফলে 'মানত করলে জল থামে' এ-বিশ্বাস তার নেই। এসময় রতন আবার 'মুনিব মশায়' বলে বিরক্ত করার অজুহাতে তাকে কয়েকটা কিল বসিয়ে দিলেন। রতন কিল খেয়ে রাগল না। ভিজে যাওয়া কল্কেতে আগুন দেবার কর্তব্য মনে পড়ল তার—'দ্যান, কল্কেটা খসিয়ে দ্যান, আগুন ক'রে দিই।' [২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

৩. হেদো মণ্ডলের ক্রোধ তুলনাহীন। চীৎকার করে আর কিল মারে। রতন জানে সেই কিল ভয়ঙ্কর। 'একটি কিলেই পিঠখানি বেঁকে যায়, দম আটকে যায়।' এর 'ওষুধ'—'দম বন্ধ করে থাকা' 'আর চুপকরে থাকা' ব্যাপারটা অনেকটাই যেন 'পিতলের পিচকারি দিয়ে' বাতাস ভরা 'বল'-এর মত। (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এভাবে কিল হজম করতে থাকলে একসময় হেদো মণ্ডলের কাশি ওঠে—দম আটকে যায়।

৪. নিমতেলে পানুর মুনিব নরেন্দ্র বা পাঁকু মণ্ডল। আলু চুরি করছিল পানু। মাটির তলে লুকিয়ে রাখা আলুগুলি তুলে গামছায় বেঁধে বলে নরেন্দ্র : 'ভাল করে দেখে খোঁড়্ রে বেটা, দেখে খোঁড়্, বাদ দিয়ে চললি যে, তাতে তোরই লোকসান।' (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) শেষে, 'নজরের জরিমানা' ঘোষণা করে নরেন্দ্র—এই আলু কটির ভাগ পানু পাবে না। ভাবটা এই—কিছু হয় নি। কিন্তু পানু বোঝে সব। পাঁক দিয়ে শোষণ-অবিশ্বাস আর নিয়ন্ত্রণ—সবই হল। হেঁদো মণ্ডলের তুলনায় ভিন্ন কৌশল।

৫. পরস্পর কথা বলার সময় মনিবদের ঐশ্বর্য—প্রতাপই একমাত্র বিষয় থাকে না। প্রহ্লাদ পানার কাছে জেনে নেয় তার 'মুনিবের চাল-বাছুরটার ক দাঁত হল'? 'এবার জোয়াল গতাবে?'—কি না? তেজ কেমন হবে। পানু বলে 'বেপয্যায় ত্যাজ!'

'লেঙুড়ে হাত দেয় কার সাধ্যি?' সংবাদ বিনিময় হয় তাদের—একের মনিব অন্যের মনিবের কাছে কেমন টাকা পাবে—সে টাকা কিভাবে 'মাটি থেকে তুলতে হবে'! আলুর ফলন বাড়াতে কার মনিব 'খোল' আর রসায়নিক সার ('সালপেট আলুমিনি') দিয়েছে। 'কাঠাতে ফলন—দুমণ' হবার সম্ভাবনা। [২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

—মানুষ গুলির স্বতন্ত্র মন কেমন যেন মাটিতে মিশে গেছে। কৃষি-ব্যবস্থার এই অন্যতম বাস্তব।

গ্রামদেশের অজস্র আদান-প্রদান, অর্থনীতির পরিচয় তারাশঙ্কর দিয়েছেন। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এই আর্থ-সামাজিক বাস্তব একটি অন্যরকম মাত্রা এনেছে। উপন্যাস মানব জীবনের গদ্যময় বাস্তব (prosy reality)-কে তুলে ধরে। এই বিনিময়, আদান-প্রদানের মারফৎ সেই রকম এক বাস্তব উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে হাঁসুলীবাঁকে। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :

১. কর্তার পুজোয় খরচ কত হল তার হিসাব দিয়েছে পানু। মুখে মুখে হিসাব—'লগদ তিন টাকা বারো আনা দুপয়সা।' আর দ্রব্য সামগ্রী লেগেছে অনেক—'দুটো পাঁঠা, একটা ভেড়া, বারোটা হাঁস, দশ-বারো সের চাল।' শেষ দ্রব্য দিতে হয়েছে 'বায়েন কর্মকাব পুরোহিত মহাশয়দের সিধা' হিসাবে। (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) মন্তব্য করেছেন কাহিনীর কথক—'সকাল বেলা থেকে তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত মজুরি খেটে যারা পাঁচ আনা রোজ পায় অর্থাৎ মাসিক ন টাকা ছ আনা মাত্র' তাদের কাছে এই খরচ যথেষ্ট—অনেক, প্রায় সমোরোহ—'রোমাঞ্চকরও বটে।' [ঐ]

২. কখনো অন্যরকম কাজ করে তারা। ঘর ছেয়ে দেয়। এর মজুরি ভিন্ন। 'ঘর ছাওয়াবার মজুরিও বেশি।' [৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৩. মানপত্র নিয়ে মাইতো ঘোষকে দ্রুতপদে ট্রেন ধরিয়ে বনওয়ারী বখশিস পেয়েছিল দু আনা। তা থেকে 'ছ' পয়সার মুড়ি, দু-পয়সার পাটালী' কিনেছিল বনওয়ারী। দু-আনা আট পয়সা। (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) হিসাব ঠিক আছে। বস্তুত হাঁসুলীবাঁকে এক পুরোনো কালেব আর্থ-সামাজিক বাস্তব চমৎকার ধরে দিয়েছেন তারাশঙ্কর।

৪. বনওয়ারীর জমিতে সুচাঁদ খাটে। অন্যদের মজুরি নগদে না দিলেও সুচাঁদকে দিতে হয়। 'চৌদ্দ পয়সা নগদ' (অর্থাৎ তিন আনা দু পয়সা), সেই সঙ্গে দিতে হবে 'জলখাবার মুড়ি'। বনওয়ারী দু' পয়সার বিড়িও কিনেছে—মাঝে মাঝে বিড়ি যোগাতে হবে। 'পুরো একটা বিড়ি না খেলে' সুচাঁদের নেশা হয় না। বড় বেশি কথা বলে সুচাঁদ, যতটা দরদ আশা করে বনওয়ারী ততটা দরদ তার পক্ষে দেখানো আর তেমনি কাজ করা অসম্ভব। তার উপর পয়সার তাগিদ। বনওয়ারী 'একটি দু আনি' বার করে তার হাতে দিল। বলল—'এই এক বেলা খাটুনির দামই দিলাম'—ওবেলা আর আসার দরকার নেই। (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) সম্ভবত কাজে ফাঁকি দিয়েছে বলেই এই সিদ্ধান্ত; তবু সুচাঁদকে প্রাপ্য মজুরি একটু বেশিই দিল বনওয়ারী। প্রতিশ্রুতি মতো দেবার কথা ছিল চৌদ্দ পয়সার অর্ধেক সাত পয়সা। এক আনা তিন পয়সা। একটা পয়সা বেশির কারণ হয়তো 'জলখাবার মুড়ি' থেকে বঞ্চিত করেছে তাকে। হিসেবি বনওয়ারী—হিসেবি তার স্রষ্টাও।

৫. চন্দনপুরের বাবুদের বাড়িতে দুধ দিতে যায় 'সাবি বেনোদা'। তাদের সঙ্গে সামান্য

কথাবার্তা চলে বনওয়ারীর। 'চার পয়সা সের দুধ'। বনওয়ারীর দুধের পরিমাণ নিত্য চারসের। সেই দুধে জল দিয়ে পাঁচ সের করে সরল-স্বভাব গোপালীবালা। সাবি বলেছিল 'গেরস্তরা বলছে বেজায় জল দিছস দুধে। জল একটুন কমিয়ো কাকী।' 'ভালোমানুষ' গোপালীর উত্তর ছিল 'জল তো সেই এক মাপেই দি'। বনওয়ারী মেয়েদের বলে পথে ঝরণার জল আরও কিছুটা যেন না মেশায় তারা। মানে, আগে যতটা মেশাতো তার চেয়ে যেন বেশি না মেশায়! দুধ নিয়ে যাবার মজুরি একসেরে এক পয়সা। 'দৈনন্দিন পাঁচ পয়সা হিসাবে পায় সাবি আর বেনোদা।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) এই মেয়েগুলির মাধ্যমেই কখনো কিছু ডিম পাঠায় বনওয়ারী। সব ডিম মনিববাড়িতে পাঠায় না।

৬. সারা বছর 'জাঙলের সদগোপদের কিল খেয়ে' মাথলা এবার চাষ করে পেয়েছে 'পাঁচ আড়ি ধান!' উপরন্তু অত্যাচার—সীমাহীন অমানবিক অকল্পনীয় অত্যাচার। মাথায় পাচন বাড়ি মেরে কেটে দিয়েছে মনিব। কারণ, সে মনিবের মুখের উপর বলেছিল 'কৃষাণি করতে লারব।' সঙ্গে সঙ্গে মনিব বলেছিল পাঁচ টাকা পাবে সেটা শোধ করতে হবে। মাথলা করালীর সঙ্গে মিশে নতুন দিনের হাবভাব যুক্তি শিখেছে। বলল—'মশায়, আপনি যদি টাকাই পাবেন, তবে আমি পাঁচ আড়ি ধান ফেরত পেলাম কেনে? হিসেব ক'রে আপুনিই তো দিয়েছেন।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এ প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। তাই পাচনের বাড়ি।

৭. হাঁসুলীবাঁকের হিসাবপত্র মুখে মুখে—মনিবদের খেয়াল খুশিতে চলত। অধিকাংশই শোষণের আড়াল ব্যবস্থা। 'জাঙলের মণ্ডল মহাশয়দের সঙ্গে কারবার' কিরকম বসনের ভাবনা আর অভিজ্ঞতার নিরিখে তার সামান্য পরিচয় পাই। একমণ ধান নিলে দেড় মণ দিতে হবে। 'শোধ না গেলে সুদে আসলে এক হয়ে আবার সুদ টানে।' চক্রবৃদ্ধি সুদ আরকি। বেশির ভাগ সময় এই বিনিময় টাকায় হয় না—হয় দ্রব্যে। কাহার-সদগোপ সমাজে বিনিময় মাধ্যম অধিকাংশ সময়ই ধান। ধার নয়—বাধ্যতামূলক অবস্থায় নেওয়া দাদন। 'সারের উপর দাদন, দুধের উপর দাদন'। নগদ টাকার বিনিময় করার অবস্থা নেই কাহারদের—তাই 'নগদ সার কেনা বেচা হয় টাকায় তিনগাড়ি, চারগাড়ি' আর দাদনের ক্ষেত্রে দর দাঁড়ায় 'সাড়ে পাঁচ গাড়ি'। গরু পোষে কাহাররা, গোরব সার দিয়ে দাদন শোধ করতে চাইলে এমনি করেই শোষিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই তাদের। দুধ দিয়ে দাদন মেটাতে হলেও একই অবস্থা। 'টাকায় ষোল সের দুধ।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এক সের দুধ চন্দনপুরে চার পয়সায় বিক্রি হয়—আমরা দেখিয়েছি। (পশ্য: ৫নং অনুচ্ছেদ) একটাকা ষোল আনা। তাই ষোল সের। কিন্তু দাদন শোধের ক্ষেত্রে দুধকে বিনিময়-মাধ্যম করলে 'দুধের দর দিতে হয় টাকায় বাইশ সের।' উপরন্তু পাঁচ টাকার বেশি দাদন থাকলে দাম আরও নামে—তখন 'দর দিতে হয় চব্বিশ সের।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এই একতরফা হিসাব—শোষণমূলক ব্যবস্থার চূড়ান্ত এক পরিস্থিতি।

৮. পালকি বহন করে, রায়বেঁশে নাচ করে কোশকেঁধে আর আটপৌরে-রা মজুরি বকশিস মিলিয়ে যা পেল তারও বিবরণ বেশ সবিস্তারে দিয়েছেন লেখক। পালকি পিছু ষোল টাকা—দুটি পালকি টেনেছে ষোল জন—প্রাপ্য ৩২ টাকা। তার উপর বকশিস পাঁচ টাকা (পালকি প্রতি আড়াই টাকা)। প্রত্যেক পালকি বাহক পেয়েছে

একখানা করে গামছা। আর 'দু গোলা অর্থাৎ দু জালা মদের মূল্য' পেয়েছে কোশকেঁধেরা। আটপৌরেরা পেয়েছে বারোটাকা পারিশ্রমিক—তারা ছিল ছজন। এক গোলা মদের দাম। বনওয়ারী ভাবনা—'মদের দিক দিয়ে পরমেরা বেশি পেয়েছে।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) ভগ্নাংশের হিসাবে চব্বিশ ভাগের এক ভাগ বেশি। তারাশঙ্কর পাকা হিসেবি, কুশলী কাহিনীকার।

৯. গরু পোষে কাহাররা। কখনও ভদ্রলোক 'গাই-গরু কিনে কাহারদের পালন করতে দেয়'। কাহাররা পালন করে। 'গাই বাচ্চা প্রসব করে'—তখন কাহাররা দুধ পায়, 'বাছুরটির অর্ধেক স্বত্ব' লাভ করে। ভদ্রলোক বাছুরটি খরিদ করে---'দু'টাকা চারটাকা'য়। অর্ধেক দাম পায় কাহাররা। ভদ্রলোক না কিনলে গো-হাটায় বিক্রি করে—'পাইকার ডেকে'। সে টাকাও ভাগ করে নেয়। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)। গ্রামীণ কৃষি-সংস্কৃতির এমন বহুমাত্রিক রূপ আর কোনো উপন্যাসে এমন সৃজনশীলতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে কিনা জানি না।

১০. সায়েবডাঙায় প্রচণ্ড খেটে বনওয়ারী ফসল ফলিয়েছিল প্রচুর। সেই ধান থেকে কি পাবে, তার সামান্য হিসাব করেছে বনওয়ারী—পাঁচ বিঘে ডাঙার মধ্যে দুবিঘে জমি তৈরি করা গেছে তার, তাতে ধান ফলেছে 'চার বিশ দু আড়ি অর্থাৎ সাড়ে দশ মণ'। একমণ ধানের দর উঠেছে পঞ্চাশ টাকা। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই ধান তার কাছে অভাবনীয় সম্পদ। 'এই সাড়ে দশ মণ তার কাছে হাজারমণের সমান।' এ তো আর কাউকে ভাগ দিতে হবে না। ভাগচাষি কিসানের এতো স্বপ্নে পাওয়া ধন।

সব মিলিয়ে ধান এবার বনওয়ারী পাবে যা তার হিসাবও করেছে। পাঁচ বিঘেতে 'পনের বিশ ধান'। এক বিশ দুমণ দশ সের। অর্থাৎ আঠারো মণ তিরিশ সের মোট। ভাগের জমিতে ধান হবে আরও অনেক। তবে সে ধান ভাগ হবে—'আঠারো বাইশ ভাগ'। 'চল্লিশ ভাগ করে, মনিব পাবেন বাইশ ভাগ, বনওয়ারী পাবে আঠারো ভাগ।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) এ ঠিক আধিয়ারি ব্যবস্থা নয়। যাইহোক, মনিবের দেনা শোধ করে তার প্রাপ্য হবে 'পাঁচ সাত বিশ' নিশ্চয়। কত হবে সর্বমোট? রমণ খুড়ো হিসাব করতে পারে না। সে আটপৌরে। ধান ফলাতো না কখনো—চুরি করতো। 'সামালদারের ঘরে' চোরাই ধানের 'ঠাউকো দাম' পেয়েছে। সে কি করে হিসাব কষবে? সুবাসী নাকি 'চাষী মশায়দের বাড়িতে তিন-চার বছর ধান ভানানী'র কাজ করেছে, সে পারবে হিসাব করতে। সুবাসী হিসাব করে পা ছড়িয়ে বসে হাসতে হাসতে বলে 'এইবার আমি কাঁদব'। কান্না হাসির দোল দোলানো জীবন। আশা নিরাশার দৃশ্য বদল ঘটাতে দেরি হয় না।

১১. প্রলয় বন্যা আর বিপর্যয়ে সব স্বপ্ন চুরমার হল। মাঠময় পড়ে থাকল কেবল খড়। খড় আধিয়ার চাষিরা পায় না। কাহাররা পাবে 'তুষ'। তুষ মাত্র। সায়েবডাঙার পাঁচ বিঘে নতুন জমির মালিক বনওয়ারী খড় পাবে। কিন্তু অন্য কাহাররা কিছুই পাবে না। এক ভয়ঙ্কর অনিশ্চয়তায় কাটতে থাকে কাহারপাড়ার সমস্ত সময়।

রাঢ়বাংলার কৃষক জীবনের বারমাস্যা—স্বপ্ন সম্ভাবনা আর অনিশ্চয়তার সবকটি দিক *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় হাজির। তিনটি কারণে এই স্বপ্ন-সম্ভাবনার ভরাডুবি ঘটল।

১. অমানবিক শোষণব্যবস্থার সঙ্গে সমবেত সংগ্রাম করতে না পারা। কাহারসমাজ সমস্ত ঘটনার পেছনেই অনিবার্য দৈব রহস্য দেখেছে। মেনে নেওয়াই তাদের অভ্যাস।

২. সমাজের অনৈক্য। কোশকেঁধে আটপৌরের মিলেছে—কিন্তু বয়স্ক আর তরুণদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির দূরত্ব অনপনেয় অবস্থার দিকে গেছে। কত্তাবাবার বেলবৃক্ষটি ঠেলে তোলা গেছে ; বহুকষ্টে তার ভিত্তিটি দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আড়াল হয়েছে বিলাতি মাটির দ্বারা। কিন্তু দুই প্রজন্মের দৃষ্টিভঙ্গির দূরত্ব দূর করা সম্ভব হয় নি।

৩. বাইরের অভিঘাত, তারও তিনটি স্তর—(ক) শিল্পায়ন, নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা রেল থেকে টেলিগ্রাফ, গেজেট থেকে টেলিফোন অনেক কিছু মিলিয়ে এক পারঙ্গম সর্বাতিশায়ী অর্থনীতি) ; (খ) মুক্ত সমাজ—শ্রমজীবীদের সচলতা (mobitity) ;বদ্ধ সমাজ দৃষ্টিতে তা ভয়াবহ কিন্তু জাত-কাঠামো ভেঙে শ্রেণী সমাজের বিকাশ অনিবার্য ; সেই অনিবার্যতাকে মেনে নিতেই হল তাদের ; (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা এই সময় যতটা চঞ্চল হয়েছে এর আগে কখনো তেমন ঘটে নি। এশিয়ার আত্মশক্তির উদ্ভব—জাপান আর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র সঙ্গে পূর্ব রণাঙ্গণের যুদ্ধ। প্রথম মহাযুদ্ধে এমন অবস্থা ছিল না। ফল—কালারুদ্রতলা অধিগ্রহণ করে মোটর গাড়ি—উড়োজাহাজের আস্তাবল তৈরি।

এত আঘাত এত পারিপার্শ্বিক চাপ—হাঁসুলীবাঁকের ছবিটি বদলে দিল, চিরকালের জন্য। শেষ হল একটি স্বপ্নে বর্ণিল রামধনুর মতো অপরূপের আখ্যান।

৯

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : কাহার সমাজে আদিমতার উপাদান

আধুনিক জীবনের অভিঘাতে হাঁসুলীবাঁক সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। তার আগেকার পরিবেশটি কেমন ছিল? তার প্রচুর প্রমাণ উপন্যাসে বিধৃত। তবে উপন্যাসে বিস্তীর্ণ যে কৃষকের সমাজ ব্যবস্থার ছবি উপস্থাপিত তাকে বলতে পারি কাহার সমাজের মধ্য যুগ। কাহারদের আদি যুগ—অরণ্য আদিম, রহস্যের অন্ধকারে তাকে চিনে নেওয়া কঠিন। গোটা উপন্যাসটি সেই বাতাবরণকে মিতভাষ্যে এনেছে—মিতভাষ্য তবে অপরিহার্য। বস্তুত এই উপাদানটি না থাকলে উপন্যাসটির মহত্ত্ব তৈরি হত না। জর্জ ল্যামিং-এর চমৎকার একটি বিশ্লেষণ মনে পড়ছে—তিনি দেখেছেন সাম্রাজ্যভুক্ত হবার আগে এশিয়া-আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকা কেমন এক রহস্যালোকে বাস করেছে। আফ্রিকার আবর্তনশীল আদিমতা, যাকে তিনি বলেন 'unhistorical underdeveloped spirit', তা যেন কোন ভাবেই আন্দোলিত হয় না— 'it has no movement to exhibit'.আর তাই বিশ্বপরিক্রমার আসল ভ্রমণ-পথটি হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব—ইউরোপ থেকে এশিয়া—উত্তর থেকে দক্ষিণ কখনই নয়। এই ইতিহাসবোধ দিয়ে বিশ্ব মানবকে বোঝা অসম্ভব। তাই ল্যামিং লেখেন : 'The history of the world travels from East to West, for Europe is absolutely the end of history, Asia the beginning.' [*The Pleasures of Exile* ; জেসপ; লণ্ডন ; ১৯৬০ ; 34 পৃ.]

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপমালায় ছিন্ন হয়ে আসা কৃষ্ণাঙ্গ পরিবারের সাহিত্যিক জর্জ ল্যামিং ঠিকই লিখেছেন ইউরোপের ইতিহাস যখন শেষ তখনই শুরু হয় এশিয়ার ইতিহাস। আর আফ্রিকা? তার তো ইতিহাসই তৈরি হয়নি—পাশ্চাত্যের চোখে তার কোনো সত্যিকার চলন (movement)-ও নেই তাই আত্মসচেতন ল্যামিং-এর হাহাকার ধরা পড়ে তাঁর রচনায়। *In the Castle of My Skin* উপন্যাসে লেখেন তিনি তাঁর গাত্র বর্ণ কেমন করে তাকে এক অপরূপ অনন্য আদিম রহস্যে মুড়ে রেখেছে। 'The earth where I walked was a marvel of blackness'......(*In the Castle of My Skin*, ম্যাক গ্রো হিল, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪ ; 321 পৃ.) তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র* মানুষগুলি এমনি এক দুর্গেই বাস করতো। তারাশঙ্কর দেখেছেন তারা সেই দুর্গ থেকে চিরকালের জন্য চলে গেল কোথায়। প্রশ্ন তাঁর : 'হাঁসুলী বাঁকের বুকের মধ্যে উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা-ভোমরীর মত কালো কাহারদের মেয়ে পুরুষেরা কে কোথায় গেল?' (শেষ পর্ব) এ-প্রশ্ন কেবল তারাশঙ্করের নায়ক বনওয়ারীর নয়—এ যেন ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির সমস্ত সাহিত্যিকেরই। ল্যামিং তাই যখন লেখেন :

> 'my birth began with an almost total absense of family relations, and loneliness from which had subsequentby grown the consolation of freedom'

—তখন তার মনোজগৎটি যেন করালীর বালক বয়সের সঙ্গে মিশে যায়। মা যার চিরকালের মতো কলঙ্ক-চিহ্ন রেখে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেই ভয়ঙ্কর নির্জন রহস্যের উত্তরাধিকার—স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার দলিল দিয়েছে তাকে। করালী যে এমন প্রাণঘাতী

আঘাত দিতে পারল তার নিজের সমাজকে, তার কারণ এই সার্বিক বিবিক্ততা (alienation)। একটু দেখাই লেখকের বর্ণনা :

> লজ্জা এই হাঁসুলীবাঁকের আলো-আঁধারিতে কম। কিন্তু তবুও মায়ের লজ্জাই সবচেয়ে বড় লজ্জা।' (১-ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ)।

মাইতো ঘোষের অত্যাচারে ক্লিষ্ট তাড়িত হয়ে 'বাঁশবাদি ছেড়ে যাওয়ার প্রথম দিনের বেদনার স্মৃতি'-ও তাকে একই রকম বিমর্ষ করে। এই স্মৃতিই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় চন্দনপুরে—আর এই স্মৃতিকাতরতাই তাকে ফিরিয়ে আনে। এ হল একধরনের ঘরে ফেরা— 'Home coming'। যারা করালীর গ্রামে ফেরা অসম্ভব বলে রায় দিয়েছিলেন তাদের ভাবনা মার্কসীয় (আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে পাশ্চাত্য) সরল রৈখিক কালচেতনার লব্ধ জ্ঞান দ্বারা শাসিত— পরাধীন, উদ্ভাবনী শক্তিহীন, ভ্রান্ত। করালীর কথা আর একটু বললে আমাদের কথাটি স্পষ্ট হবে।

পিসীর কাছে মানুষ করালী, প্রায়ই চলে যেত মহিষ-ডহরির বিলে, 'কোপাইয়ের তীরে বনে বনে'। 'খুঁজে বেড়াত তার মাকে'। মা-মা বলে কাঁদত, কর্তাবাবার গাছতলায় এসে খেয়ে নিত 'বাতাসা পাটালি'র ভোগ—'দুধ'। দহের কাছে শিমুল গাছে সাপ আর টিয়ার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব নিরতিশয় প্রাকৃতিক—তাতে সাপের বিরুদ্ধে লড়ত সে। ক্রমে 'মায়ের ইতিহাসের লজ্জা তাকে স্পর্শ করল, তখন মাকে খোঁজা ছাড়লে সে।' (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) মা আর জীবনধাত্রী যে প্রতিবেশ—তাকে খোঁজার মধ্যেই আছে হাঁসুলী বাঁকের দ্বিরাচার। একদিকে রেলপথ টেনে নিয়ে গেল তাকে—সে হয়তো তার মাকে খোঁজারই আগ্রহ। আর অন্যদিকে ফিরে এল সে আবার—হাঁসুলীবাঁকেই, কারণ জীবনধাত্রীকে একটি কাম্য বিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এই নতুন সময়ের সমাজ নায়কের কি আর উপায়! একথা যারা বোঝেন না, তাদের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* পাঠ অসম্পূর্ণ।

ছিল আমাদের ভারতীয় সমাজের আদিম এক রহস্যময় ঘেরাটোপ। তার ছবি ইউরোপীয় উপন্যাস নিজেদের সমাজে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে কোন কোন ব্যতিক্রমী প্রতিভার স্পর্শে সম্ভবত লাভ করেছিল। কমিউনিস্ট চেকশ্লাভিয়া থেকে নির্বাসিত প্যারিস শহরবাসী বিশিষ্ট চেক-ঔপন্যাসিক মিলান কুন্দেরা বলেছেন এই রকম একটি প্রসঙ্গ। ফ্রাঁসোয়া র‍্যাবেলিয়াস-এর 'Gargantua and Pantagruel' -সম্পর্কে তাঁর কথা—এ-হল 'the first great novelistic character that Europe' আর তার পরিণতিতে এক অনিবার্য রহস্য মিশে যায়—বোঝা যায় না, এই উপন্যাসের পাঠ শেষে—একি আনন্দের না বেদনার? 'Should he marry or not?' ("Jerusalem Address : The Novel and Europe" বক্তৃতাটি ১৯৮৫-র ১৩ জুন 'The New York Review of Books-এ ছাপা হয়েছিল। পরে সন্নিবেশিত হয় কুন্দেরার *The Art of the Novel* গ্রন্থে। আমরা দেখছি এর ভারতীয় সংস্করণ ; রূপা অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা ; ১৯৯২। মূল সংস্করণ ১৯৮৮। 159 পৃ.) বস্তুত এই উপলব্ধির রহস্যই উপন্যাস-পাঠের শেষ ফল। এজন্যই কুন্দেরা লিখতে পারেন, 'The novels spirit is the spirit of complexity. Every novel says to the reader : "Things are not, as simple as you think". that is the novels eternal truth.......' ("The Depreciated Legacy of Cervantes" ; কুন্দেরা ; উক্তগ্রন্থ ; 18 পৃ.) বোঝা আর না-বোঝার রহস্য উপন্যাসের গভীর সত্যের ইশারা নিয়ে আসে। পাঠক খুঁজে পায় একটি নিজস্ব বিচরণ-ক্ষেত্র।

ই. এম. ফর্স্টার বিষয়টি তাঁর আলোচনায় এনেছেন। একে তিনি বলেছেন 'fantasy'। তাঁর চমৎকার বিশ্লেষণ থেকে একটু উল্লেখ করব। দিনানুদৈনিকের সাধারণ রংচটা ভাব (the stuff of daily life'), নানান উত্তেজনা ('strained in various directions') এই রহস্যলোকে পথ হারায়, খুঁজে পায় নতুন এক তরঙ্গ। রোমাঞ্চকর রহস্যময় এই উপাদানের আসল শক্তি এখানে :

> 'The power of fantasy penetrates into every corner of the universe, but not in to the forces that govern it—the stars that are the brain of heaven, the army of unalterable law, remain untouched—and novels of this type have an improvised air, which is the secret of their force and charm'. [*Aspects of the Novel*, উক্ত ; 105 পৃ.]

তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকে এই শক্তি ও রোমাঞ্চ বিজড়িত আছে তার আদিমতার ইঙ্গিতে।

কাহাররা বীর অরণ্য আদিম সেই বীরপনা। কখনও 'গুলবাঘা', কখনও বুনো শুয়োর, কখনও আবার কুমির—কোপাইয়েব হড়পা বানে আসে তারা। কাহাররা সেসব মারে। সময় এগিয়ে গেছে। সে সংবাদ তাদের জানা নেই। মরা বাঘের চামড়া জেলার সাহেবকে দেখিয়ে 'জাঙলের ঘোষেরা' বন্দুক নিয়েছে। জ্যান্ত বাঘটা 'মেরেছিল কাহাররাই'—'সেটা দেখিয়ে বন্দুক নিয়েছে গন্ধবণিকেরা।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) তাতে অবশ্য কাহারদের কিছু যায় আসে না। তারা ভালুক মারে—বাঘ মারে, মারার উৎসাহে। 'লাঠি সোঁটা খোঁচা বল্লম তীর ধনুক' নিয়ে তাদের সেই আদিম বীরত্ব অন্য কিছুর প্রত্যাশা করে না। শিকার শেষে 'নিজেদের বীর্যে মোহিত হয়ে প্রচুর মদ্য পান করে' তারা। বুনো শুয়োর মারার কৌশলও তাদের অত্যন্ত প্রাচীন। বঁড়শিতে টোপের মতো কলা বা পচুই মদের 'ম্যাতা' গেঁথে রাখে। তারপর টোপ গিলে বঁড়শি ছাড়াতে গিয়ে শুয়োরের অবস্থা হয় সঙ্গীন।—'একদিকে বঁড়শি আটকায় জিভে, অন্যদিকে দড়ি পরানো খুর আটকায় বাখারিতে, বেটা শুয়োর নিতান্তই শুয়োরের মত ঠ্যাঙ তুলে তিনপায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।' (ঐ) কাহাররা এসে মারে আর তাদের 'ভোজন যতে লাগিয়ে দেয়।'

এই সব শিকার পদ্ধতি আদিম। কাহাররা যে জীবন পার করে এসেছে তার জের বাকি থেকে গেছে এখানে। কখনও আসে ছোটমাপের মেছো কুমির। সে খুব বেশি হয় না। হাঁসুলীবাঁকে হড়পা বানে এসে পড়ে কখনো—'বাবুভাইদের মাছভরা পুকুরে' এসে পড়ে তারা। জাঙলের বাবুরা বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে—কিন্তু কুমিরের কিছু হয় না। কাহাররা 'কালিদহে এসে যাওয়া 'মানুষ গরু-খেকো বড় কুমির' এসে পড়লে কিন্তু নেমে পড়ে 'সর্বাঙ্গে হলুদ মেখে', 'কোদাল কুড়ুল' নিয়ে—'লাঠি সড়কি' আর 'বাঁশের ডগায় বাঁধা শক্ত দড়ির ফাঁস' নিয়ে। নদীর ধারের গর্তে অবরুদ্ধ করে কিংবা ফাঁস পরিয়ে বেঁধে—কখনও আবার মহিষের পাল জলে নামিয়ে বাধ্য করে ঘড়িয়ালটিকে বের হয়ে আসতে। এর পর শুরু হয় 'কুম্ভীর বধের পালা'। কুমিররা দক্ষ হতেও পারে—নাও হতে পারে। 'কাহারদের মতন' ঠিক 'শিবঠাকুরের অনুচরের নৃত্য' বলেই মনে হয়। (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই উৎসাহ তাদের—আদিম জীবন পরিধিরই স্মৃতি ছাড়া কিছু নয়।

আদিম উদ্দাম সেই জীবন। খাদ্য সংগ্রাহক (food gatherer) সমাজের প্রতিনিধি কাহাররা কাটিয়ে এসেছে এক বীর যুগ—পশুদের সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। এই রকম সংগ্রামের স্মৃতি পুঞ্জীভূত হয় তাদের উপকথায়। সেটি কিছুতেই ভুলতে চায় না তারা।

'এ বিষয়ে শিক্ষাও তাদের পুরুষানুক্রমিক '। অর্থাৎ টিকে থাকার শিক্ষা। দাঁতাল শুয়োর তারা প্রায়ই মারে। কখনো সেই শিকারে শিকারীও আহত হয়। এরকম অবস্থাই তো স্মরণীয়। রোমঞ্চকর। জীবন যুদ্ধের প্রেরণা। অনুরূপ পরিবেশে দেশের লোক এসে দেখে যায় তাদের—'দাঁতালটাকেও দেখে, আবার জখম মানুষটাকেও দেখে।' (১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে—বনওয়ারীর বাপের আমল যখন, বাঘ মারার জন্য শক্ত বাঁশের খাঁচা বানিয়েছিল সবাই। তরুণ বনওয়ারী-প্রহ্লাদ-রা। খাঁচায় বাধা ছিল টোপ—একটি পাঁঠার বাচ্চা। তিন দিনের দিন 'বাঘ বন্দী হল'। তার পর তাকে মারা হল। ঘোষকর্তা গুলি করে মারলেন—বাকিরা উৎসাহে অদ্ভুত সব কাণ্ড করতে লাগল। কেউ বাঘকে মারল ঢিল, কেউ লাঠি দিয়ে দিল খোঁচা—কেউ বাঘটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল 'মনের আনন্দে'। শিকারী-জীবন থেকে ভ্রষ্ট কাহাররা এখনও সেই সব স্মৃতিচিত্র উপকথার মধ্যে রক্ষা করে। আদিমতার অন্ধকারে অফুরান তরঙ্গভঙ্গের চিত্র এসব।

কাহারদের জীবনে অরণ্য, অরণ্যের অন্ধকার আর সংস্কার আজও খেলা করে। 'কত্তার থানে' 'আটপৌরে পাড়ার উত্তর প্রান্তে ঝাঁকড়া বটতলা' পার হয়ে সন্ধ্যায় প্রদীপ নিয়ে চলেছিল বনওয়ারী। বাবার স্থানে 'ধুমুল' দিতে হবে। হঠাৎ সেখানে দেখা দেখা হল কালোশশীর সঙ্গে। কালোশশী তার প্রেমিকা। তার সঙ্গে 'অঙের' সম্পর্ক তার। কিন্তু একদিকে ধর্ম সংস্কার— culture আর অন্যদিকে কামনা-বাসনা—nature. বনওয়ারী দিশাহারা। কালোশশীর সঙ্গে দুটো কথা বলেই মনের ভিতরকার অন্ধকার যেন উথাল পাথাল হয়ে দেখা দিল। 'হঠাৎ প্রদীপের আলোটা নিবে গেল।' স্বাভাবিক ভাবে নয়—'বাতাস নয়, ফুঁ দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে দিলে কালোশশী।' আর ব্যাকুলতাভরা আকুতি নিয়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকার—বনওয়ারীর হাতটা টেনে নিল কালোশশী। তারশঙ্কর লিখেছেন : 'প্রদীপটা নিবে যেতেই অন্ধকার ছুটে এল যেন কোপাইয়ের মুখ থেকে হড়পা বানের মত। সেই তমসার মধ্যে মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী এবং কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) যে আরণ্যক সংস্কৃতির পরম্পরা হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের পশুশিকারের উত্তেজনায় উতরোল করে, তাই তাদের নরনারীর সম্পর্কে বাধা-বন্ধন-হীন উদ্দামতার ভূমিকা তৈরি করে।

উক্ত ঘটনার প্রতিক্রিয়া কাহার সমাজে বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারী। আটপৌরে কাহাররা এই ঘটনা নিয়ে ঘেঁটু গান গেয়েছে, সে-গান অবশ্য নিমতেলে পানুর বাঁধা। নিমতেলে পানু বনওয়ারী কালোশশীর কাছাকাছি আসা, প্রদীপ নিয়ে যাওয়া এসব দেখেছিল। প্রহ্লাদ-রতন বনওয়ারীদের সঙ্গে পানু আসছিল জাঙলের দিকে। সেসময় সামান্য কথার ভাঁজে পানু ইঙ্গিত করে বনওয়ারীর অঙের খেলার ব্যাপারে। নরনারীর যথেচ্ছ যৌন সম্পর্ক—আদিম ব্যবস্থার কালোচিত পরিণতি মনে হয়। সেই সন্ধ্যায় পানু যাচ্ছিল আটপৌরে পাড়ায়—'তার এক ভালবাসার লোকের সন্ধানে।' (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই পরিবেশ কাহার সমাজের আদি কালের ধারাবাহিকতা। যেমন করে তারা শিকার ব্যাপারে আহ্লাদিত হয় তেমনি তাদের অনাবৃত প্রেমাকাঙ্ক্ষা—'ভালবাসা, সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়াপড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা। (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) অনাবৃত অবারিত যৌন-আকাঙ্ক্ষা ও সম্পর্ক কাহার সমাজে ভাঙা গড়ার ভূমিকা নিয়েছে। হাঁসুলী-বাঁকে উপস্থিত অঙের সম্পর্কগুলির মধ্যে প্রধান দুটি—১. করালী আর পাখির ; ২. বনওয়ারী আর কালোশশীর। দুটি ঘটনাই সমাজের অন্তর্গত মাতব্বর পরিবারগুলির

উত্থান পতনের সঙ্গে যুক্ত। করালী আগামী দিনের অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্ব ; পাখি অবক্ষয়িত ঘরভাঙাদের পরিবারের শেষ পুরুষ রুগ্ণ নয়ানের স্ত্রী। এই অঙের খেলার পরিণতি ঘরভাঙাদের ঘর শেষ হয়ে যাবার দিকে অগ্রসর হয়েছে। বনওয়ারী কোশকেঁধেদের মাতব্বর। তার সঙ্গে একদা ক্ষীণ অঙের খেলার সম্পর্ক ছিল নয়ানের মা বাসিনী-বৌয়ের। সে সম্পর্ক খুব বিস্তারিত হয় নি—বনওয়ারী একসময় বাসিনী-বৌয়ের পা ধরেছিল এমন ইঙ্গিত আর আমৃত্যু প্রগলভ অভিসম্পাতে বাসিনী-বৌ সেই ঘটনাকে বার বার স্মরণ করেছে। কালোশশী আটপৌরেদের মাতব্বর পরমের ঘরনি। বনওয়ারী কালোশশীর পরকীয়া প্রণয় সম্পর্কের ফল আটপৌরেদের মাতব্বর পরমের চিরস্থায়ী দেশত্যাগ, তাদের বনওয়ারী নেতৃত্ব মেনে নেওয়া সর্বোপরি কালোশশীর মৃত্যুতে লক্ষিত হয়।

কাহিনীর অগ্রগতিতে বনওয়ারীর অবচেতন মনের খেলা দেখতে পাই। কালোশশীর প্রেত-যোনি প্রাপ্তি যে অনিবার্য—তাতে বনওয়ারী বিশ্বাস করে। বস্তুত প্রেত সম্পর্কে লোক সমাজের ভাবনার ভুবন—অবচেতনা মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই অবচেতন য়ুং প্রস্তাবিত সামূহিক নির্জ্ঞান-এর অন্তর্গত—সামূহিক নির্জ্ঞান collective unconscious এরকম পরিবেশে সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিবাহ। বনওয়ারী-সুবাসীর বিয়ের মধ্যে দিয়ে তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে :

১. সুবাসী কালোশশীর বোনঝি। দেখতে অনেকটাই কালোশশীর মতো। হাব ভাব একই রকম।
২. কাহারদের দুই ভাগ—আটপৌরে-কোশকেঁধে ; এই দুই বর্গের মিলন প্রস্তাবে সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ের শর্তটি যুক্ত করা হয়।
৩. কাহার পুরুষরা সাধারণত এক-পত্নীক। একজন স্ত্রী বর্তমানে অন্য স্ত্রী-গ্রহণ তাদের স্বাভাবিক রীতি-সংস্কার নয়। কাহার মেয়েরাও সতীনের ঘর করেনা। এই অবস্থায় বনওয়ারীর সঙ্গে সুবাসীর বিয়ে নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশকে ইঙ্গিত করছে।

অর্থাৎ কালোশশীর সঙ্গে সম্পর্কই যেন সুবাসী-বনওয়ারীর বিবাহে বিবর্তিত হল। বিবর্তিত না বলে প্রসারিত হল বললেও পারতাম। লেভিস্ট্রাউস আদিম সমাজে মৈত্রীর পূর্বশর্ত হিসাবে নারী বিনিময়ের ভূমিকা দেখেছেন। স্ত্রী-দাতারা প্রায়ই স্ত্রী-গ্রহীতাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়—অধীনতা স্বীকার করে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি কিছুটা আধুনিক। কাহারদের সমাজে নারী প্রাধান্য আর ক্ষমতায়নের কিছু প্রভাব আছে। সুচাঁদ-বসন্ত-পাখি অনেকটাই নারী সমাজের প্রতিপত্তির পরিচায়ক। এই প্রতিপত্তি পুরুষদের বহুপত্নী গ্রহণের দ্বারা শেষ হয়ে গেল। বনওয়ারী এই নতুন সময়ের নায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত।

অন্যপক্ষে, করালী যখন সুবাসীকে বিয়ে করে—তখন বনওয়ারীর প্রতিপত্তি সম্পূর্ণ অবসিত হয়েছে। অর্থাৎ সুবাসী হয়ে উঠেছে আটপৌরে আর কোশকেঁধেদের পরাভূত সামগ্রিকভাবে কাহার-সমাজের বদ্ধ আদিম সংস্কার, সমাজজাতির হবার চিহ্ন। বহু পত্নী গ্রহণ বনওয়ারীর মতোই করালীর মধ্যেও লক্ষিত হয়। এখানে অত্যন্ত আদিম যুগের কোনো প্রবণতা থাকতেও পারে। অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি বহুপ্রচলিত একটি ব্যাখ্যান—করালী আসলে আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি—সম্পূর্ণ মানতে পারছিনা। ইতিহাসের এই রকম একমাত্রিক একরৈখিক গতি মার্কসীয় শেষ দুই দশকের ঘটনা তা প্রমাণ করে না। সমাজতন্ত্র থেকে কোথাও সাম্যবাদী সমাজ তৈরি হয় নি! প্রায় সর্বত্রই পুরোনো ব্যবস্থা (মার্কসীয়

দৃষ্টিতে) ফিরে এসেছে। এমনকি কোথাও পোপের শাসন কোথাও মক্কার এক্তিয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! তাই লিখতে চাই—করালীর ভূমিকা, তার গ্রামে ফেরার বিষয়টিকে একমাত্রায় ধরা সঙ্গত হবে না। করালী পাখিকে যখন বলে 'জানিস, পৌষ মাসে একটা ইঁদুর দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারোমাস পৌষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশি হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।'—তখন তার মধ্যে শুধু চন্দনপুরের যুদ্ধের চাকরিতে যুক্ত গ্যাঙের সর্দার কথা বলে না—তাকে আদিম আরণ্যক পুরুষের প্রতিনিধিও মনে হতে থাকে। (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) পৌষ মাসের ইঁদুরের মতো করালীর সঙ্গে 'বুনো শূয়োরের মত' আক্রমণ করে এল বনওয়ারী—'দুই বীর হনুমানের মত' শুরু হল লড়াই। এখানে উপমাগুলিতে জৈবিক রূপারোপগুলি নিছক অলঙ্কার বলে মনে হয় না।

পানু যেদিন কৌতুকছলে পরমের স্ত্রীর সঙ্গে বনওয়ারীর অবৈধ প্রেমের ঘটনা বলছিল, সেদিন তারাশঙ্কর বর্ণনা দিয়েছিলেন হাঁসুলীবাঁকে কেমন আদিম যুগের উপাদান ঘুরে ফিরে আসে।—বাঁশবাদির বাঁশবনে আজও জমে আছে আদিম কালের অন্ধকার।

> সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাদির কাহারপাড়াকে আচ্ছন্ন করে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কাহারদের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক চলে. ওদের চোখেও তখন জেগে ওঠে সেই আদিম যুগের অর্থাৎ অগ্নি-আবিষ্কারের পূর্ব যুগের চোখের অন্ধকার-ভেদী আরণ্য-জন্তুর দৃষ্টি শক্তি।' [২য় পর্ব. এক পরিচ্ছেদ]

কাহারদের এই 'অগ্নি-আবিষ্কারের পূর্বযুগের' অন্ধকার-ভেদী দৃষ্টি বলতে তারাশঙ্কর সুদূর অতীত ভাবসত্যের উপাদানের দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। অঙের খেলার আড়ালে যখন মৌল দ্বন্দ্বগুলি ঘনিয়ে ওঠে—তখন বীর হনুমানের কথা লিখেছেন লেখক। পরমের সঙ্গে বনওয়ারীর দ্বন্দ্বের সময়—'উপকথার রাত্রে দাঁতালে দাঁতালে' যুদ্ধের মতো—'গাছের মাথায় হনুমানের দলে বীরে বীরে' যুদ্ধের কথাও মনে পড়ে। সুচাঁদের উপকথা আছে—'হাঁসুলীবাঁকে মাঝে মাঝে মরদে-মরদেও খুনো খুনি 'অক্তগঙ্গা' হত সেকালে।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) করালী-বনওয়ারীর দ্বৈত সংঘাতের সময়ও মনে পড়েছে বুনো শূয়োর বীর হনুমানের কথা। যুদ্ধ শেষে পরাজিত বনওয়ারী বুক চাপড়েছে 'আরণ্য বানরের মতো'। [৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ]

ফ্রয়েডের সন্ধানে যে অরণ্য-আদিম পরিবেশ স্পষ্ট হয়, তার প্রতিরূপ যেন অনেকটাই তারাশঙ্করের *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় উক্ত যৌন প্রতিযোগিতার মধ্যে ধরা পড়ে। লিখেছেন ফ্রয়েড—'in primaeval times men lived in small hordes, each under the domination of a strong male'. (*Moses and Monotheism* ; মূল জার্মান থেকে ক্যাথেরিন জোনস অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে ; প্রকাশক দি হোগার্থ প্রেস লি, লণ্ডন ; ১৯৫১ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৩২ ; 130 পৃ.) এই পুরুষ প্রধানটির অবস্থান ছিল অত্যাচারী সর্বাতিশায়ী ক্ষমতার কেন্দ্রে। 'The strong male was the master and father of the whole horde'–তার ছিল সীমাহীন ক্ষমতা, ছিল অত্যাচারের প্রবণতা। দল (horde)-ভুক্ত সমস্ত মহিলারা তার অধীন থাকতে বাধ্য হত। এরা তার স্ত্রী বা কন্যা (the wives and daughters in his horde) কিংবা অন্য কোন দল থেকে জোর করে নিয়ে আসা—'robbed from other hordes.' পশুজগতেও আছে এরকম। তারাশঙ্কর হনুমান দলের বীর বা গোদা হনুমান আর সন্ন্যাসী হনুমানদের দলের কথা লিখেছেন এই উপন্যাসে। এ তাঁর

গভীর প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের পরিচয় বহন করছে। সিংহের দলে এইরকম ব্যাপার আছে বলে প্রাণীবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। এই ধরনের অত্যাচারী সর্বাতিশায়ী পুরুষ নেতৃত্বের নাম তারা দিয়েছেন আলফা-মেল (alfa-male)। এসব দলে পুরুষ সন্তানের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। দলপতি তাদের হত্যা করত, মুষ্ক-ছিন্ন করত কিংবা পাঠাতো দূরে ('They were forced to live in small communities'. (ঐ; 131 পৃ.) কখনো এসব ছেলেদের একজনকে মা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করত— 'protected by his mother's love', আর ঐ অত্যাচারী পিতার মৃত্যুর পর তাকেই দলের অধিকার লাভ করতে দেখা যেত।

ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ আর তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজের দ্বন্দ্ব সংঘাতময় পরিস্থিতি প্রায় মুকুর-ধর্ম পায়। একটি অন্যটির পরিপূরক যেন। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন দলের সম্ভাব্য প্রতিযোগী পুত্রস্থানীয়কে নির্বাসন আর সেই পুত্রের ফিরে এসে দলপতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ পৃথিবীর নানা প্রান্তের বহু লোক-পুরাণ গড়ে তুলেছে। রামায়ণ-কাহিনীও হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিশ্লেষণ করা যায়। ফ্রয়েডের ভাষায় : 'An echo of the expulsion of the eldest son, as well as the favoured position of the youngest, seems to linger in many myths and fairytales.' (ঐ ; 131 পৃ.) রাম-বনবাস আর ভরতকে রাজা করা এরকমই পুরাকথার নির্মাণ—আদিম সমাজের সাংস্কৃতিক চিহ্নবাহী দৃষ্টান্ত। করালী-র কোঠাবাড়ি ভূমিসাৎ করা আর তাকে গ্রামত্যাগে বাধ্য করা (পরমকেও প্রায় একই ভাবে) বনওয়ারীর কাজ। এ-কাজ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। আর শেষে করালীর গ্রামে ফিরে আসা—এই টানাপোড়েনের কাহিনীও যেন একই আদলে গড়ে ওঠে— ছড়িয়ে পড়ে।

চন্দনপুরে করালীর মদের আসর বসেছিল। কথায় কথায় বলল করালী—'মামলা যদি থাকে তো আমার সাথে ওই নয়না শালোর।' ইচ্ছা তার—'ঠেঙা আনুক, লাঠি আনুক, নিয়ে যাক পাখিকে কেড়ে।' পাখি বলেছিল—তা সে কেন মেনে নেবে! যে-ই আসুক, কিছুতেই করালীকে ছেড়ে যাবে না সে। নসু এ-সময় যা বলে, তাতে বোঝা যায় কাহার সমাজে নারী এখনও একই রকম পুরুষের অধীন। 'লাঠি-সোঁটা মেরে নিয়ে যেতে ক্ষ্যামতা থাকলে' নারীর অধিকার বর্তায় তারই হাতে।

আদিম রাত্রির মধ্যে কাহারদের চোখের দৃষ্টি কাজ করে—এরকম একটি বিবরণ আগে উল্লেখ করেছি। সেই অন্ধকারে কাজ করে আধিভৌতিক আধিদৈবিক বিভিন্ন বিশ্বাস। এ-বিশ্বাস ভেসে এসেছে সুদূর অতীতকাল থেকে। লোকসংস্কারের এই মাত্রা তারাশঙ্কর অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে যোজনা করেছেন। কখনো তা ব্যক্তির বিশ্বাস ও ভয়তরাসের অন্তর্গত। যেমন :

> সন্ধ্যার আঁধার তখন আস্তে আস্তে ঘনিয়ে আসছে। বাঁশবনের তলায় জমেছে অপদেবতার ছোঁয়াচ-লাগা থমথমে ভর-সনজেরে মুখ-আঁধারি। সেই অন্ধকারের মধ্যে চুপি চুপি বনওয়ারী এসে উঠল বাবার থানে। [২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

কখনো আবার তা সামূহিক— গণচেতনা সঞ্জাত। যেমন :

> 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় দিন গেলে যে-রাত্রি নেমে আসে, তার সঙ্গে জাঙল-চন্নপুরের রাত্রির অনেক তফাত। বাঁশবন জোগান দেয় তার তলায় লুকিয়ে-থাকা আদ্যিকালের অন্ধকার রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে। [২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

এই আধিভৌতিক আধিদৈবিক ভাবনার অনুষঙ্গ বহুস্তরীয়।

কাহারদের মনোজগতে কত যে ভূত-প্রেত খেলে বেড়ায়। কয়েকটির কথা লিখছি :

১. বা-নাউলী : অপদেবতা। 'বাঁশ বনে পাতা উড়িয়ে নেচে বেড়ায়।' [২য় পর্ব চার পরিচ্ছেদ]

২. পেত্যা : 'আলেয়া। নদীর ধারে ধারে 'দপ্ দপিয়ে' অর্থাৎ দপদপ করে জ্বলে বেড়ায়'। [ঐ];

৩. শাকচুন্নি : শ্যাওড়া-শিমুলের মাথায় ডাক শোনা যায়। [ঐ] ;

৪. গেছো পেত্নী : 'বাঁশবনে ক্যাঁ-কাক ক্যাঁ কাক ডাক' উঠলে কাহাররা 'মনশ্চক্ষে' দেখতে পায়—'গেছো পেত্নী বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকাচ্ছ, আবার ছেড়ে দিচ্ছে,—সেটা উঠে যাচ্ছে সোজা উপরে ' [ঐ] ;

৫. ছোকরা ভূত : ঐ। [ঐ] ;

৬. বা-বাওড় : ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যদিয়ে 'ভূত' কখনো ইসারা করে দিয়ে যায়। বনওয়ারী তেমনি ভাবে। [৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ] ;

৭. 'ভুলো' 'দিক ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে'। এদের প্রভাবে পড়লে 'অপমৃত্যুর সম্ভাবনা'। [৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ] ;

৮. নিশি : 'রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধ'রে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে!' [ঐ]

ভূত প্রেতের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ কাহারদের। 'মনশ্চক্ষে' তাদের দেখতে পায় তারা। সবাই পায় না। ঘূর্ণি হাওয়ার মধ্যদিয়ে বা-বাওড়ের মধ্যে যে কালোশশীর অতৃপ্ত আত্মা ইশারা করে গেল জানে বনওয়ারী—পাশেই ছিল বসন, সে বুঝতে পারে নি। রমণের স্ত্রী হাঁটতে চলতে গিয়ে যখন পড়ে অজ্ঞান হয়—সবাই বোঝে জ্ঞান ফেরার পরেও কেন 'ঘোরের মধ্যেই প'ড়ে' আছে সে। 'উপকথার শিক্ষা' তাদের— orally transmitted knowledge. 'এলোচুলে লঙ্কা নুন পেঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত খেয়ে শুয়েছিল' দুপুরে—ভরা দুপুর বেলায়। 'শনিবার অমাবস্যে'র দিন ভর দুপুরে—যথারীতি ধরেছে কালোশশীর অতৃপ্ত আত্মা। কাল ক্ষণ তো মিলেইছে—উপরন্তু অন্যায় লোভ আর চুল এলোমেলো রাখা তার বিরুদ্ধে গেছে।

কালোশশী কেন প্রেতযোনি পেল সে প্রশ্নের জবাব উপকথায় অত্যন্ত স্পষ্ট। প্রথম কারণ, তার মৃত্যু ঘটেছে অপঘাতে। দ্বিতীয় কারণ, অঙের খেলায় সাধ মেটেনি তার। যার এমন হয় সে তো বারবার তার পরিচিত পৃথিবীতে, ছেড়ে-যাওয়া প্রিয় মানুষদের কাছে আসবেই! তৃতীয় কারণ, কামনার টানে 'বাম্ভণ' তুল্য 'ছত্রি' জাতির ভূপ সিং মহাশয়ের সঙ্গে দিন কাটিয়েছে—রক্ষিতার মতো জীবন কাটিয়েছে! এই কাজ কাহার মেয়েদের করার কথা নয়। 'লঘু-গুরু জ্ঞান হারিয়ে' এই কাজ করার অপরাধে তাকে পেত দশা পেতে হয়েছে। চতুর্থ কারণ, বাবার থানে ধূপ প্রদীপ সে অপবিত্র করেছিল। স্থান মাহাত্ম্য মানে নি। কথাটি সকলের জানার কথা নয়—নিমতেলে পানু জানত। আজ তার ভয় নেই, পুত্রশোকে কাতর মানুষ। তার ব্যাখ্যানও সে তাই যোগ করতে দ্বিধা করে নি। [৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

উপকথায় আছে প্রেতলোকের আরও অদ্ভুত সব সংবাদ। প্রেতের নাম প্রত্যক্ষ বচনে (direct speech)-এ বলতে নেই। অপঘাতে মৃত্যু হয় নয়ানের বাবার বাবার বাবা। চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের ছুঁড়ে দেওয়া থালার আঘাতে মারা গেছে সে। আর 'তাইতে মরল

বাড়ি এসে। তা'পরেতে তিনি তাই হলেন।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)। সাপকে যে কারণে বলতে হয় 'লতা'—শাঁখা ভেঙে গেলে বলতে হয় 'শাঁখা বেড়েছে', চাল শেষ হলে বলতে হয় 'চাল বাড়ন্ত', 'যাই' বলতে নেই বলতে হয় 'আসি'—এ অনেকটা তাই। বস্তুত অবাঞ্ছিত জিনিসকে নাম ধরে ডাকলে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে—প্রকৃতির চার পাশে দেখা না গেলেও তারা তো আছেই! আর—অবাঞ্ছিত অমঙ্গলজনক ঘটনার কথাও বলতে হয় সুভাষণ রীতি (euphemism)-র দ্বারা। এ এক ধরনের মন্ত্রের মতো—অব্যর্থ তুক ; লক্ষ্য অবাঞ্ছিত ঘটনাটি আর না ঘটুক।

অমাই নাম ছিল সেই অপঘাতে মৃত মানুষটির। তার বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে ছিল তার অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত (super natural) সংযোগ। তারাশঙ্করের উচ্চস্তরের রচনারীতি এই অধিবাস্তবের পরিচয় দিয়েছে। যারা ভাবেন, জাদুবাস্তবতা (magic realism)-এর সন্ধান করার জন্য লাতিন আমেরিকার সাহিত্য পাঠ না করে উপায় নেই, তারা হাঁসুলীবাঁকের ভাষ্যকে একটু নতুন ভাবে পড়ে দেখুন। এসব ক্ষেত্রে অন্য এক পৃথিবী কেমন আলো অন্ধকারে ঝুলে থাকে—তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকে তা দেখতে পাবেন পাঠক। ঐ বিধবা মহিলার সংসার ছিল মৃত স্বামীর প্রেতাত্মার সঙ্গে—প্রায় নির্ভয়ে, পরোক্ষ বচনের মারফৎ এক অপরূপ সংযোগ-পদ্ধতির দ্বারা। যেখানে সেখানে—'ঘরের সাঙায়', 'বাড়ির পাঁদাড়ে', 'গাছের ডালে' পা ঝুলিয়ে বসে থাকত সেই প্রেত। লোকে ভয় পেত, ভয় পেতনা তার বিধবা 'পরিবার'। ছেলে কাঁদত যখন পরিবার বলত—' পোড়া মুখ মানুষ মরেও সুখ দিলি না, জ্বালাতে এলি?' ছেলেকে চুপ করাতে বলত। আশ্চর্যের কথা—'ছেলে উঠে যেত সাঙার ওপরে দিব্যি ছেলে দোল খেত বাতাসে।' [৪র্থ পর্ব , দুই পরিচ্ছেদ]

সেই প্রেত বিধবা বৌটিকে দিত উপদেশ—'সাঙা করিস না, তাহলে ঘাড় দুমড়ে দোব।' কখনও জল নেই, রাত্রিকালে ('এত এতে') জল আনবে কি করে—বলত সে : 'এক কলসী জল—কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া জল' এসে পড়ত ঐ প্রেতের মাধ্যমে। দূরে যাওয়া আসা তো কাহার-ভূতদের পক্ষে অসম্ভব কর্ম নয়। ইচ্ছা গতি তাদের। 'কাঁদির আজবাড়িতে ভোজের মেঠাই মণ্ডা' খেতে সাধ গেল রাসপূর্ণিমার দিন। অনুরোধ করার পর বাঁশ বাদাড়ের মধ্যে 'এক চ্যাঙাড়ি' 'লুচি-পুরি-মিষ্টি-মোণ্ডা' এসে হাজির হল!

কাহার সমাজের 'ভৌতিক লোকের ইতিকথা' এইভাবে পাওয়া যায় সুচাঁদের মারফৎ। এখন তাদের আগের মতো এমন সহজভাবে পাওয়া যায় না। 'দেবভক্তি' কমে গেছে—'আধ্যাত্মিক জীবনে' এসেছে পরিবর্তন। ভূত প্রেত চন্দনপুরে গেলে সেখানকার ছোকরা বাবুরা বন্দুক দিয়ে পাহারা দেবে! জাঙলে এলে মোড়ল মহাশয়দের ছোকরারা ঠেঙা লাঠি নিয়ে আসবে! সুতরাং যুক্তি প্রতিপত্তি আধুনিকতা নাগরিক মন যেখানে— তারা সেখান থেকে চলে যাবে। তারা যাবে হাঁসুলীবাঁকের মাঠে বিশ্বাস আসক্তি আবহমানতা আর গ্রামীণ পটভূমিতে ; শ্মশানের হাড় গোড় নিয়ে বাদ্য বাজাবে, নদীতে বিলে মাছ ধরবে, আর চিতার আগুন নিয়ে লুফে লুফে খেলা করবে—'ইগাছের মাতা থেকে হুপ করে ভেসে' যাবে 'উ গাছে'। [৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

অবাঞ্ছিত প্রেতকে আসার পথে বাধা দেবার অনেক উপায়। আছে নানা রকম তুক। মৃত আর জীবিতের মধ্যে এই সব আধিদৈবিক-আধিভৌতিক সম্পর্কের সিঁড়ি গড়ে নেয় তারাই গোপালীবালা মারা গেল—ছমাসও সতীনের ঘর করল না। মৃত্যুর পর তার গুণপনা ইনিয়ে বিনিয়ে বলেছে নসুবালা। ঠিক যেমন নয়ানের মৃত্যুর পর বলেছিল। 'দোষের কথা নাই, সব

গুণের কথা।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) আজও একই ভাবে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদল নসুবালা। 'মাটির মানুষ', 'সোনার পিতিমে', 'মুখে ঝরত অমিত্তি', 'হাতে ছিল কোপাইয়ের ঠাণ্ডা পরশ' এই সব। সুবাসীকে দিল পরামর্শ—সিঁদুর ঢেলে দে—সতীনের মাথায় সিঁদুর দে, বল—সোয়ামীর দাবী ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি সিঁদুর দিলাম, আমার সিঁদুর তুমি বজায় একো।' (৫ম পর্ব ছয় পরিচ্ছেদ) মৃতের সঙ্গে এমনি সংযোগ কাহার সমাজের সামূহিক মনস্তত্ত্বে ধরা পড়ে। যে চলে গেল তার সঙ্গে সংযোগ—শুধু মনস্তাত্ত্বিকই বা বলি কেন আদিম সংস্কৃতির একটি চমৎকার অকর্ষিত ভূমি বলে মনে হয়। কালাধারটি হঠাৎ তারাশঙ্করের মনশ্চক্ষে ধরা পড়েছে। গোপালীকে দাহ করে ফেরার পথে 'সাতবার সাত জায়গায় কাঁটা' দিয়েছে বনওয়ারী। 'প্রেতাত্মা পিছনে পিছনে আসে যে!' মায়া তো সহজে কাটানো যায় না। বনওয়ারী বলল—'গোপালীবউ, তুমি তো পাপ কিছু কর নাই, স্বগ্‌গে তোমার ঠাঁই হবে। ঘরের লোভ তুমি ছাড়।' [৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

প্রেতলোকের পাশে আছে দেবলোক। সে অবশ্য খুব দূরের কিছু নয়। প্রেতরা যে খেলে বেড়ায় হাঁসুলীবাঁকের মাঠে, হাড়ের বাদ্যি বাজায় তাদের সঙ্গে কালারুদ্রের সম্পর্ক নিবিড়। কর্তাবাবা কালারুদ্রের প্রতি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, নিজেই খড়ম পায়ে খট খট করে হেঁটে ফেরেন—জানান দেন। বিভিন্ন সময়। তাদের মধ্য দিয়ে দেবলোক-মর্ত্যলোক আর প্রেতলোক অতি সন্নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকে হাঁসুলী বাঁকে। আর এখানে থাকে ভয় আর ভক্তির পরম্পরিত এক অভেদ্য সম্পর্ক। বনওয়ারী কত্তাবাবার আটনে যাবার আগে হাতে তালি বাজিয়ে তাঁকে 'সতর' করে তবে ঢোকে। চেনা আর অচেনা যায় মিশে। তারাশঙ্কর জানান 'ভূত প্রেত যত নিষ্ঠুর—দেবতা তত দয়াল। এই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়েই চলে হাঁসুলীবাঁকের দিন রাত্রি।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কাহার সংস্কৃতি এই সামঞ্জস্য গড়ে নি—এ তাদের আদিম সংস্কারের উত্তরাধিকার।

ব্রনিসলো ম্যালিনোস্কি তাঁর একটি চমৎকার বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন কেমন করে আদিম জনগোষ্ঠীগুলির ধারণায় জীবন ও মৃত্যু বিচিত্র ভূমিকা তৈরি করে। তাঁর ভাষায় মৃত্যু হল অন্য জগতে প্রবেশের সিংহদ্বার। 'Death is the gateway to the other world in more than the lateral sense'. মানুষ তো বাঁচে জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর ছায়াকে সঙ্গে নিয়ে। 'Man has live life in the shadow of death, and he who is faced by death turns to promise of life'. *(Magic, Science & Religion and other Essays* ; ডাবলডে এঙ্কোর বুকস ; গার্ডেন সিটি ; নিউইয়র্ক ; ১৯৪৮; 47 পৃ.) জীবনের এই রহস্যালোকে কাহার-সমাজের আদিমতার বৈশিষ্ট্য বিজড়িত।

'অসুরের কাঁড়ি' সম্পর্কে যে পুরাকথা হাঁসুলীবাঁকে প্রসিদ্ধ তার সঙ্গে কাহার সমাজের প্রকৃতি-লগ্ন সংঘর্ষ আর উচ্চবর্গীয় মানুষদের পুরাণ-চেতনার বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে। যে জমি তারা চাষ করে তা প্রায়ই কুমারী-ভূমি। নতুন করে চাষ করা নয়—একেবারেই প্রথম চাষ। মাটিও কড়া ধাতের। পাথরের স্তর এলে তো কথাই নেই। তাই এই গল্প তৈরি হয়েছে। মাটি খুঁড়ে পাওয়া পাথরে যদি পৈতের মতো দাগ থাকে তাহলে তা হবে 'অসুরের কাঁড়ি'। বিশ্বাসটা হল এই : 'অসুরের হাড় জমে পাথর হয়ে গিয়েছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন তাদেরই হাড়।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) সুচাঁদ বলে—'পাথরের মধ্যে কোথা কোন্ দেবতা আছে, অসুরের কাঁড়ি আছে, তাতে চোট মেরে কাজ নাই।' তবে বনওয়ারী একথা স্বীকার করে না। 'বনওয়ারীদের আমলে ওসব বিশ্বাস চলে গিয়েছে।' বস্তুত, কৃষি জীবনে

প্রবেশের পর থেকে পাথরের সঙ্গে লড়াই করে রাঢ় বাংলার কাহারদের যে ভূমি তৈরির কাজটি করতে হয়—ফলে পাথরকে দেবতা ভেবে জমি তৈরি বন্ধ রাখা তো সম্ভব নয়। এভাবেই আদিমতার খোলস খসে পড়ে কখনো—জীবনের প্রয়োজনেই।

সর্বপ্রাণতা বা animism হল সর্বত্র প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে ভাবনা। শুধু তাই নয়—প্রাণের মূল সত্তার চলন, এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়কে স্পর্শ করা সর্বপ্রাণতার লক্ষণ। মাটি যেখানে 'আচোটা' সেখানে চাষ করার আগে আদিম মনের মানুষ বনওয়ারীকে তাই 'হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম' করতে হয়। বলতে হয় মনে মনে 'তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মার্জনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) সঙ্গে ছিল 'বাবাঠাকুরের পুজোর ফুল'—সেটি কোচড় খুলে নামিয়ে দিল সেখানে। আকাঙ্ক্ষা মাটিতে যেন পাথর না বের হয়—জন্তু জানোয়ার না বেরিয়ে আসে। হাততালি দিয়ে বলে বনওয়ারী, 'কীটপতঙ্গ, সাপ-খোপ' সরে যাক সবাই। আমাদের মনে পড়ে মির্চা এলিয়েডের সন্ধানী বিশ্লেষণ। তাঁর দেওয়া একটি তথ্য থেকে জানি ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ উনডেনী পাহাড়ের আসপাশে উমাটিল্লা-রা মার্কিন সৈনিকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহ দমনের পর রেড-ইণ্ডিয়ান উমাটিল্লাদের দলপতিকে বন্দি করে। স্মোহাল্লা নামের সেই দলপতি বলেছিলেন : তোমরা আমাকে চাষ করতে বলছ? কিন্তু মাটি তো মা—মাকে কেমন করে ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করব আমরা! মৃত্যুর পর এই মাটিই তো আমাকে দেবে আশ্রয়। তোমরা বলছ আমরা যেন ঘাস কেটে ফসল ফলাই। কিন্তু মায়ের চুল কি করে ছিঁড়ে ফেলতে পারি আমরা! (*Myths, Dreams, and Mystries* ; নিউইয়র্ক ১৯৬০ ; আমরা দেখছি শঙ্কর বসু মল্লিক আর গৌরী ভট্টাচার্য সম্পাদিত *পুরাকথার স্বরূপ*, বেস্ট বুক্স ; কলকাতা ; নভেম্বর, ১৯৯৩ ; ১০০ পৃ.) স্মোহাল্লা আর বনওয়ারী-র আদিম মন ('Savage mind'—লেভিস্ট্রাউস যেমন ভাবেন) একই ভাবে ভেবেছে, কিন্তু তাদের আচরণ অন্যরকম। স্মোহাল্লাদের জীবন যাপন খাদ্য সংগ্রাহকের, তারা চাষ করে না; বনওয়ারীর জীবন-জীবিকা খাদ্য-উৎপাদকের—চাষকে তারা ধর্ম বলে জানে। দুটি জনগোষ্ঠীই কিন্তু মাটিকে মা বলে জানে। পৃথিবীর দুই প্রান্তের সম্পূর্ণ ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ তারা—কালেও ভিন্ন। তবু এই মিল বস্তুত আদিম ভাবাদর্শের—সর্বপ্রাণবাদিতার।

১৮৩৭-৩৮-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পশ্চিম আফ্রিকায় একটি কিশোরীকে বলি দেবার বিবরণ দিয়েছেন স্যর জেমস জর্জ ফ্রেজার। সিওউক্স জাতির এই কিশোরীকে 'পাওনী'-রা হত্যা করে। হত্যা করার পর তার মাংস টুকরো টুকরো করা হয়—'While her flesh was still warm it was cut off in small piecs from the bones....' ('*The Golden Bough\A study in Magic and Religion*',. ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোং ; লণ্ডন ; ১৯৫১ ; মূল সংস্করণ প্রথম প্রকাশ পায় ১৯২২ ; 432 পৃ.) ছোট ছোট ঝুড়িতে এই মাংসগুলি নিয়ে যায় প্রতিবেশীরা—যে যার খামারে নিয়ে যায়। পাওনী দলপতি এবার একটি কাজ করে— 'took a piece of the flesh from a basket and squeezed a drop of blood upon the newly-deposited grains of corn', অন্যরাও তেমনি করে রক্তে মিশিয়ে নেয় তাদের শস্যবীজ। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র বনওয়ারীর কথা পাঠকের মনে পড়তেও পারে। চাষ করতে করতে হঠাৎ বনওয়ারী অনুভব করে তার 'হাতের তালুতে আগুনের মত 'তাই' অর্থাৎ তাপ *ঠেকছে* কিসের।' গোপালীবালা ভীত কিন্তু

বনওয়ারীর নির্দ্বিধ মন—'হুঁ, তাহলে নিয়েছে। 'অক্ত' নিয়েছেন মা-বসুমতী।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) দূরে ছিল হেদো মণ্ডল—না উঠে জিজ্ঞাসা করল : 'নিয়েছে নাকি?' বনওয়ারী খুশি। মা বসুমতী রক্ত নিয়েছেন—এতো ভালো কথা; হেসে বললে—হ্যাঁ।' হেদো মণ্ডল কাহার নয়—তার অনেক আদিম সংস্কারই যুক্তির ধাক্কায় দূর হয়েছে। সে জানে মানত করলে বৃষ্টি বন্ধ হয় না। তবু তার কথা শুনে মনে হয় কৃষি সম্পর্কে তার সংস্কার আদিমতার পরিধির বাইরে নয়। হেদো মণ্ডল উত্তর দিল—'ওতো জানা কথাই। নেবেই। না নিয়ে ছাড়বে না। লাগিয়ে লে, মাটি লাগিয়ে লে।' যে মাটিতে চাষ করা হচ্ছে, সেই মাটিতে রক্তের উপহার—আসলে একটি আদি-সম্পর্কের ইঙ্গিত তৈরি করে এখানে। 'বনওয়ারী একমুঠো মাটি তুলে লেপে ধরলে কপালের ক্ষতস্থানে।' ব্যাপারটি হয়ে ওঠে কৃত্য বা ritual-এর মতো।

সুচাঁদের ব্যাখ্যা এই ঘটনায় উপকথার শিক্ষায় ঋদ্ধ। প্রকৃতি-লগ্ন মানুষের জীবন-সন্নিধি আচরণ আর আকাঙক্ষা এখানে স্পষ্ট। 'মা-বসুমতী যেমন দেন, তেমনি নেন।' দেবেন আহার্য, শেষে দেহভস্মতো পৃথিবীতেই যাবে মিশে। যতদিন বাঁচা—নখ চুল বাড়বে, তা কেটে ফেলতে হবে মাটিতে। অর্থাৎ মানুষের ক্রম বর্ধমান যা কিছু অস্তিত্ব সবই যেন এক ভারসাম্য গড়ে তুলবে—পৃথিবী ঐ বৃদ্ধির উপকরণ যোগাবে, ফিরিয়ে নেবে মানুষের যা কিছু অতিরিক্ত সব। চক্র গড়ে উঠবে—ভারসাম্যের চক্র। 'মধ্যে মাঝে দু-চার ফোঁটা 'অক্ত'—তাও দিতে হবে! বিশেষত চাষের সময়। 'এত মানুষ এত পশু পাখি পেসব করছেন মা, বুক চিরে ফসল দিচ্ছেন' তার তৃষ্ণা মেটানোর জন্য, না, শুধু বৃষ্টির জল যথেষ্ট নয়। তাই উপকথার শিক্ষা—'মায়ের বুকে চোটাতে গেলে 'অক্ত' দিয়ে মায়ের পূজো দিতে হয়!' না দিলে মা কোন না কোনভাবে দু-চার ফোঁটা রক্ত না নিয়ে ছাড়বে না। 'পাওনাগণ্ডা' মিটিয়ে নেবে। এরপর বনওয়ারী যে কাজ করল তাতে তার আদিম মন স্পষ্ট ধরা পড়ল বলাই বাহুল্য। 'রক্তমাখা মাটি মুঠো করে জমির এককোণে পুঁতে দিল—তার স্থির বিশ্বাস, এ লক্ষণ ভাল। রক্ত নিয়েছেন মা—'দুহাত ভরে' দেবেন ফসল।

ম্যালিনোস্কি লিখেছেন, আদিম মানুষ প্রাকৃতিক আর অতিপ্রাকৃতিকের মধ্যে একধরনের ভারসাম্য রচনা করতে থাকে। সেই ভারসাম্য আসলে যুক্তি আর রহস্যের মধ্যে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে আসে। তাই 'in his relation to nature and destiny' সে চেষ্টা এক ধরনের সক্রিয়তার কৌশল প্রয়োগ করতে। 'Primitive man recognizes both the natural and the supernatural forces and agencies, and he tries to use them both for his benefit'. (*Magic, Science, and Religion* ; উক্ত ; 32 পৃ.) প্রাকৃতিক শক্তি আর অতিপ্রাকৃতিক রহস্য—দুটিই তার চাই, কিন্তু কাজকর্ম ভুলে গিয়ে নয়। শুধু মাত্র প্রার্থনা বা জাদু-বিশ্বাসকে সে অবলম্বন করে না ('He never relies on magic alone')—আর তাই যুক্তিকে সম্পূর্ণ ভোলে না। বনওয়ারীও ধরিত্রীদেবীর সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে তার কর্ম-প্রয়াসকে ভুলে যায় না।

১০

বাংলা নদী-নির্ভর উপন্যাস : হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র নদী

নদী—জীবন প্রবাহ। পৃথিবীর প্রধান সমস্ত সভ্যতার ধাত্রী নদী। কোপাই তেমন কোন নদী নয়। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় কোপাইয়ের চিত্র রচনা করেছেন তাঁর গদ্যছন্দে। 'ছায়াবৃত সাঁওতাল-পাড়ার পুঞ্জিত সবুজ' যেখানে প্রসারিত, সেখানে 'আশ্চর্য' নামের এই ছোট নদী। 'প্রাচীন গোত্রের গরিমা' তার নেই। আছে ছিপছিপে একটি তন্বী শরীর। ছোট নদী—অবিস্তৃত। 'তার এপারের সঙ্গে ও পারের কথা চলে সহজে।'

তবে বর্ষায় একটু ভিন্ন চেহারা :

> বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাৎলামি
> মহুয়া মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো—
> ভাঙে না, ডোবায় না,
> ঘরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
> দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
> উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথের ঘোষণা—এই নদীর ছন্দ তাঁকে আজ নতুন সাহিত্যিক উপাচার সাজিয়ে দেবে। 'ভাষার স্থলে জলে' মিশে যাবে তার কাব্যভাষা। 'ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে', হাটে যাওয়া কুমোর ('বাঁকে করে হাড়ি নিয়ে'), গুরুমশাই 'ছেড়া ছাতি মাথায়'—মাসিক তিন টাকা যার বেতন। একসময় তিনি দেখেছিলেন পদ্মা। যে নদী কীর্তিনাশা।

> একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি,
> আর-এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।

পদ্মবিধৌত বাংলার সঙ্গে কোপাই তীরের মানুষ ও প্রতিবেশের তুলনা *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য়* এনেছেন তারাশঙ্কর। সমাপতনই সম্ভবত। তবে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি লিখেছেন প্রায় পনের বছর আগে। রবীন্দ্রনাথের 'কোপাই'-এর রচনা-তারিখ ১ ভাদ্র ১৩৩৯। তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকের প্রকাশ ১৩৫৪।

হাঁসুলীবাঁকের সূচনায় কোপাই আর তার আসপাশের মানুষের সংবাদ আনার একটি নাটকীয় রোমঞ্চকর রহস্যময় পরিবেশ লক্ষ করি। কে যেন বাঁশবাদির জঙ্গলে শিস দিচ্ছে। সে শিসের ফলে ভয় পেয়েছে অনেকে। এসেছেন দারোগা। দারোগা পূর্ববঙ্গের মানুষ। বললেন : 'নদীর ভিতর কোন একটা কিছু হচ্ছে। নদীর ধারে বাস, ভাবনা বারো মাস। ভাবেন, খানিকটা ভাবেন। সন্ধান মিললে খবর দিবেন।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পূর্ববঙ্গের নদী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে জাঙলের ঘোষবাড়ির কলকাতা-প্রবাসী এক যুবকের। পাটের ব্যবসার সূত্রে বাংলার ঐ অঞ্চলে যাতায়াত আছে তার। 'শতমুখে' বলে ফুরোয় না তার নদী অধ্যুষিত জীবনের কথা।—'সে যেন জলের ধারার সাতনরী হার,—হাঁসুলী নয়।' জলের পথ—নদী থেকে জালিকাকার খাল কাটা আর তাতেই নৌকা চলেছে। 'গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে' সেসব 'ছোট নৌকাগুলি' চলে যায় মানুষ নিয়ে। চাষি চলেছে মাঠে—নৌকায়। কেউ যাচ্ছে কুটুমবাড়ি, কেউ চলেছে ইয়ারবন্ধু নিয়ে, বহুড়ি চলেছে

পিত্রালয় ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি—সব নৌকায়। 'মালক্ষ্মীর গলার সোনার সাতনরী' কখনো হয়ে ওঠে 'মনসার গলার অজগরের বেড়'— ভয় সেখানে নিত্য। 'নদীর জলে তুফান জাগে' যখন তখন 'গোলা-গঞ্জ বন্দর-মানুষ গরু কীট পতঙ্গ সব ধুয়ে মুছে' যায়। আবার কখনো আসে আকস্মিক ধাক্কা—'তুফান নাই, ঝড় নাই, বাইরে দেখতে শুনতে সব শান্ত স্থির, কোথাও কিছু নাই—হঠাৎ নদীর ধারের গ্রাম আধখানা কাঁপতে লাগল—দেখতে দেখতে কাত হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল'। এখানকার মানুষকে এক চোখ রাখতে হয় আকাশে, কখন বর্ষা বাদল আসে; অন্য চোখ রাখতে হয় মাটিতে, কখন আসে ভাঙন। এরকম দেশের মানুষ দারোগামশাই—তিনি ডাকপুরুষের বচন শুনিয়ে বলতেই পারেন—'নদীর ধারে বাস ভাবনা বারো মাস'। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, পদ্মা তীরের কথা। 'দেড়শো বছর আগেকার নীলকুঠির ভাঙা ভিত', গুড়ি-মোটা কাঁঠালগাছ, পুরোনো বট গাছ, পোড়ো ভিটে, রাজবংশীদের পাড়া—'টিনের ছাদ-ওয়ালা গঞ্জ', 'ফাটল-ধরা খেতে' যেখানে 'ছাগল চরে'—সব নিয়ে এক ভয় তরাসে মুহ্যমান গ্রাম-দেশ। 'সমস্ত গ্রাম নির্মম নদীর ভয়ে কম্পান্বিত।' কীর্তিনাশা পদ্মার তুলনায় কোপাই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক 'গৃহস্থ পাড়ার ভাষা'য় কথা বলা নদী।

নদীমাতৃক বাংলা। বাংলার নদী তৈরি করেছে ভূমি—ভাঙা গড়ার মাঝখানে জেগে উঠেছে বদ্বীপভূমি। পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ গঙ্গা-পদ্মার বদ্বীপ। আর কত যে নদী তার চার পাশে। বাংলার উপন্যাস সাহিত্য নদীকে বাদ দিয়ে লেখা প্রায় অসম্ভব। কখনো পটভূমি নদী, কখনো নদীই পরিবেশের সঙ্গে মিলে মিশে প্রতীকের রসরূপ গড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে সামান্য উল্লেখ করি।

১. *দুর্গেশনন্দিনী* : মানসিংহের শিবির স্থাপিত হল 'দারুকেশ্বর তীরে' (প্রথম খণ্ড : তৃতীয় পরিচ্ছেদ) ; গড়মান্দারণের প্রাচীন দুর্গ ছিল 'আমোদর নদী'-র ঘেরাটোপে (প্রথম খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ) ; তিলোত্তমা জগৎসিংহকে অনুসরণ করার সময় 'নির্ঝরিণী ক্রমে ক্ষুদ্র নদী হইল ; ক্ষুদ্র নদী ক্রমে বড় নদী হইল'—জগৎসিংহকে আর দেখা গেল না। [দ্বিতীয় খণ্ড : একবিংশ পরিচ্ছেদ]

২. *কপালকুণ্ডলা* : সপ্তগ্রামের পাশে যে স্রোতস্বতী প্রবাহিত হত তা সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল একাদশ শতাব্দী নাগাদ, হুগলীর প্রতিপত্তি বাড়ছিল। (দ্বিতীয় খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ); 'তটমৃত্তিকা খণ্ড' কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে 'নদীপ্রবাহ মধ্যে' ভেঙে পড়ল—কপালকুণ্ডলাকে পেতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে লাফ দিল নবকুমার। দুজনকে আর পাওয়া গেল না। 'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে' হারিয়ে গেল দুজন। [চতুর্থ খণ্ড : নবম পরিচ্ছেদ]

৩. *মৃণালিনী* : লক্ষ্মণাবতীর পাশে 'নদী হৃদয়ে নৈশ সমীরণ' 'খরতর বেগে' প্রবাহিত হয়। 'নাবিকেরা নৌকা সকল তীরলগ্ন করিয়া রাত্রির জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে থাকে।' [দ্বিতীয় খণ্ড : তৃতীয় পরিচ্ছেদ]

৪. *বিষবৃক্ষ* : নদীতে নৌকাযোগে নগেন্দ্রনাথ চলেছে—নদী গঙ্গা হতে পারে কারণ ব্রাহ্মণঠাকুরেরা 'আপনমনে গঙ্গাস্তব' করছিল। সহসা ঝড় এল। [প্রথম পরিচ্ছেদ]

৫. *ইন্দিরা* : 'আমি গঙ্গা কখনও দেখি নাই। এখন গঙ্গা দেখিয়া আহ্লাদে প্রাণ ভরিয়া গেল।.........গঙ্গার প্রশস্ত হৃদয়।'.........। (পঞ্চম পরিচ্ছেদ) দেবদীঘি, কালাদীঘির দেশ থেকে গঙ্গায় নৌকা পথে এসে পড়ল ইন্দিরা।

৬. *চন্দ্রশেখর* : 'ভাগীরথী তীরে, আম্রকাননে' শৈবলিনী-প্রতাপের খেলা দিয়ে কাহিনীর

শুরু। (উপক্রমিকা; প্রথম পরিচ্ছেদ)। লরেন্স ফস্টরের নৌকায় শৈবলিনীকে নিয়ে যাওয়া হল—নৌকা গঙ্গায়। (প্রথম খণ্ড : চতুর্থ পরিচ্ছেদ) ফস্টর শৈবলিনীকে নিয়ে মুঙ্গেরের পথ ধরে নেয়—অস্ত্রের নৌকা, শৈবলিনী-সহ মুঙ্গেরে পৌঁছয়। গুরগণ খাঁ তার নৌকা আটক করে। (প্রথম খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। অমিয়েট নৌকা নিয়ে যাবার পথে জ্যোৎস্না-প্লাবিত গঙ্গার 'বালুকাময় চরে' শৈবলিনীকে দেখে—শৈবলিনী কাঁদছিল। কেন কাঁদে? অমিয়ট জানতে চাইল। খিদে পেয়েছে—বুদ্ধিমতী শৈবলিনী বলল। কিন্তু ব্রাহ্মণী অন্যের ছোঁয়া খাবে কেন? বন্দী প্রতাপ ব্রাহ্মণ। তার সঙ্গে নদীর উপর অমিয়টের বজরায় শৈবলিনীর সাক্ষাৎ হল। (তৃতীয় খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ)। দুজন পলায়ন করল—অগাধ জলে গঙ্গাবক্ষে সাঁতরে চলল তারা—জ্যোৎস্না বিধৌত নদী। (তৃতীয় খণ্ড : ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) নদীর উপরে শৈবলিনী 'জাতিভ্রষ্টা' হতে পারে না—কারণ 'স্বহস্তে পাক করেছে ; 'হিন্দু পরিচারিকা' আয়োজন করেছে ; এক নৌকায় বাস করলেও সেতো 'গঙ্গার উপর'।—শৈবলিনীর এই উত্তরে চন্দ্রশেখর সন্তুষ্ট হল। (ষষ্ঠ খণ্ড ; ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)—গোটা উপন্যাসেই নদী অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করছে।

৭. *রজনী* কলকাতার জগন্নাথ ঘাট হুগলির পথে গঙ্গা-বাহিত নৌকাযোগে হীরালাল রজনীকে নিয়ে যাচ্ছিল। নির্জন চরে নামিয়ে দিয়ে রজনীকে ফেলে পালায় কাপুরুষ হীরালাল। (প্রথম খণ্ড : রজনীর কথা। সপ্তম পরিচ্ছেদ) গঙ্গায় আত্মত্যাগ করতে চাইল রজনী। আমি ডুবিলাম। 'ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না।' (প্রথম খণ্ড : অষ্টম পরিচ্ছেদ) নদীর চরে দৃষ্টিহীন রজনীকে লাঞ্ছনা করতে চেষ্টিত নীচ মানুষটি তাকে তাড়া করছিল, রজনী এসময় গঙ্গায় ডুবে আত্মত্যাগে উদ্যত হয়। তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করল অমরনাথ। (দ্বিতীয় খণ্ড : অমরনাথের কথা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) কলকল গঙ্গা প্রবাহ মধ্যে সৈকতভূমিতে 'অর্ধজলমগ্না' রজনীকে সন্ন্যাসীর অনন্যসাধারণ শক্তিতে দেখতে পায় শচীন্দ্র। [তৃতীয় খণ্ড : শচীন্দ্রের কথা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

৮ *কৃষ্ণকান্তের উইল* : 'দেহাতে' যাবার সময় গোবিন্দলাল 'তরণী সজ্জিত করে দশ দিনের পথ বন্দরখালি যাত্রা' করে। সে তরণী 'অনুকূল-পবনে চালিত' হয়ে 'তরঙ্গিণী তরঙ্গ বিভিন্ন' করে চলল। (প্রথম খণ্ড : ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ) নৌকার চেয়ে ডাক আগে আসে। বন্দরখালি থেকে ফেরার আগে তার আসার কথা জানা গেল। চার পাঁচদিন আগে। ভ্রমর কৌশল করে চলে গেল পিত্রালয়ে। (প্রথম খণ্ড ; চতুর্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ) 'শীর্ণ শরীর চিত্রানদী' প্রবাহিত প্রসাদপুরের পাশে। জেলা যশোহর। (দ্বিতীয় খণ্ড : পঞ্চম পরিচ্ছেদ) চিত্রার তীর থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরে এনেছে গোবিন্দলাল, নিশাকর-সম্ভাষণ করা রোহিণী তার শয়নকক্ষে 'নদী স্রোতোবিকম্পিতা বেতসীর ন্যায়' দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকল। [দ্বিতীয় খণ্ড ; নবম পরিচ্ছেদ]

৯. *রাজসিংহ* : 'নীলসলিলা যমুনার উপকূলে' মহানগরী দিল্লী। [দ্বিতীয় খণ্ড : প্রথম পরিচ্ছেদ]

১০. *আনন্দমঠ* : আনন্দারণ্যের বাইরে 'একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে' প্রবাহিত ; নদীর জল স্বচ্ছ—'নিবিড় মেঘের মত কালো।' ধীরানন্দ সেখানে রেখে এল কল্যাণীকে। সেই নদী তীরের ছোট গ্রামে। মন্বন্তর সেখানে থাবা বসায় নি। (প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) ভবানন্দ যাচ্ছিল—'পথিমধ্যে কলনাদিনী তরঙ্গিণীর কূলে' দেখতে পায় আত্মহত্যার চেষ্টা করছে কল্যাণী—'জীবনলক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা' পড়ে আছে। (প্রথম খণ্ড : সপ্তদশ

পরিচ্ছেদ) গৌরী নামক প্রৌঢ়া বৈষ্ণবীর ঘরে ভবানন্দ কল্যাণীকে নিয়ে গেল। স্থানটি নদীতীর। 'নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত' হচ্ছে। (তৃতীয় খণ্ড : দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) মাঘী পূর্ণিমার কিছু আগে সন্তানদের সঙ্গে যুদ্ধের আগে এডওয়ার্ড প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার শিবিরের কাছেই 'নদীতীরে একটা মেলা' বসে। [তৃতীয় খণ্ড : চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

১১. *দেবী চৌধুরাণী* : 'জ্যোৎস্না রাত্রিতে ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ।' বজরার উপর বীণা বাজাচ্ছিল দেবী চৌধুরাণী। চমৎকার বর্ণনা। [তৃতীয় খণ্ড : চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

১২. সীতারাম : ভূষণা থেকে মহম্মদপুর যাবার পথে নদী। এক পথে নদী পার হতে হয় কেল্লার কাছেই। [দ্বিতীয় খণ্ড : দশম পরিচ্ছেদ]

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে মুখ্যত আর *দেবী চৌধুরাণী-তে* নদীর তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। *রজনী-বিষবৃক্ষ* আর *ইন্দিরা-তেও* সে ভূমিকা কম নয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে *নৌকাডুবি* নদীপ্রবাহকে গভীর ও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে। *গোরা* আর *চতুরঙ্গ*-এ নদীর ভূমিকা প্রতীকধর্ম পেয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের পার্টি ছেড়ে ললিতা বিনয়ের সঙ্গে রাত্রিতে স্টিমার যাত্রা—কলকাতায় ফেরা ; নানা বিপত্তির সময় উত্তেজিত *গোরা*-র গঙ্গাতীর ধরে দ্রুত পদক্ষেপে গোরা, তার প্রীতিভাজন ভক্তদের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান—এসবই গঙ্গার তীরবর্তী। *চতুরঙ্গ*-এ পদ্মার বিস্তীর্ণ চরভূমি—শচীশের উদ্দেশ্যে দামিনীর যাত্রা, প্রত্যাখ্যাত হওয়া প্রভৃতির তুলনা বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে গঙ্গার বিবরণ *শ্রীকান্ত*-এ অনন্যসাধারণ রূপ পরিগ্রহ—করেছে। ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের অভিযানের সেই বিবরণ, নতুনদার বিচিত্র হাস্যকর আচার-আচরণ, কুমার সাহেবের শিকার পার্টিতে বাজি ধরে শ্মশানে রাত্রি কাটানো ইত্যাদি বাংলার গাঙ্গেয় পটভূমির একটু বাইরে—বিহার-সংলগ্ন এই পরিবেশ। *চরিত্রহীন*-এ আছে দিবাকর-কিরণময়ীয় আরাকান যাত্রা—নদী পথে। সেও বাংলার পূর্বতম প্রান্ত স্পর্শ করেছে। *গৃহদাহ* উপন্যাসে শোন নদীর অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। *পথের দাবি*-তে ব্রহ্মদেশে ইরাবতী নদীর অপর পারে শশীকবির আশ্রয়—সেই পথযাত্রার বিবরণ শরৎচন্দ্রের ভূয়োদর্শী অভিজ্ঞতার চমৎকার প্রমাণ বহন করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ইছামতী* নদী-নির্ভর উপন্যাস নয়। নদীতীরবর্তী সমাজ বিবর্তনের চমৎকার চিত্র। এ-উপন্যাস প্রাচীন আর চিরন্তনকে বেঁধেছে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে। শিপটনের নীলকুঠি, ঘোড়ার গাড়ির দৃপ্ত চলাচল—নালু পালের বেসাতি আর সাদামাঠা জীবন কেমন করে বদলে গেল। ভবানী বাড়ুয্যে লেখকের আত্মপ্রক্ষেপ মনে হয়। নদী এখানে বড্ডো ঘরোয়া—মায়াবী এক পরিবেশ তৈরি করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওদিয়া গ্রাম *পুতুল নাচের ইতিকথা*-র পটভূমি। উপন্যাসের নায়ক নদীপথে আসার সময় বাজে-পড়া গাছ আর হারুর মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে পড়াশুনো সেরে গ্রামে ঢুকল শশী—একটি মৃতদেহ নিয়ে। জীবনের এই প্রগাঢ় বৈপরীত্য সংকেতিত হয়েছে *পুতুল নাচের ইতিকথা*-য়। নদীর তীরে আছে একটি ঘাট সেখানে নন্দর পাটের আড়ত হয় কখনো কখনো। মানিকের উপন্যাসে এই পটভূমি নগরের সঙ্গে গ্রামের বাণিজ্যিক সূত্রটি স্পষ্ট করে। নন্দর সঙ্গে বিন্দুর বিবাহ অসম। গ্রাম্য মানুষ গোপাল লাঠি নিয়ে ভয় দেখিয়ে নিজের কন্যার সঙ্গে নন্দকে বিয়ে করতে বাধ্য করে। শশীর মনে এঘটনার স্থায়ী ছাপ পড়েছে। গোপাল তার পিতা। উপন্যাসে দুই প্রজন্মের দৃষ্টি

কোণের পার্থক্য প্রবল। আর আছে একটি তালপুকুর। সেখান থেকে সূর্যাস্ত দেখে বিষণ্ণ বোধ করে শশী—অনিকেত মানসিকতার মানুষ—এই বিষাদ তাকে প্রীত করে। তবুও উপন্যাসের পটভূমিতে নদীটি নদীই থেকে যায়। প্রাকৃতিক একটি পটভূমি মাত্র। মানিক তাকে তেমন ব্যবহার করেন না।

পদ্মানদীর মাঝি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নদী-নির্ভর উপন্যাস। শুধু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে নয়—বাংলা সাহিত্যেও এমন একটি উপন্যাস লেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ। তবে যে অর্থে *তিতাস একটি নদীর নাম* নদী-নির্ভর উপন্যাস সে-অর্থে *পদ্মানদীর মাঝি* নদী-নির্ভর নয়। পদ্মানদীর জেলে জীবন এ-উপন্যাসে আংশিক। মানিক এঁকেছেন মৎস্যজীবী মানুষদের ইলিশের মরশুমি ব্যস্ততার পাশাপাশি জল আর স্থলের দ্বান্দ্বিক রহস্য। কুবেরের স্ত্রী মালা পঙ্গু। নদীর তীরে বাস কিন্তু সে নিতান্ত স্থির ভূমি চিহ্ন হয়ে থাকে—সংসারের টান, মায়া মমতার মতো। কুবেরের কন্যা গোপী। চনমনে মেয়েটিও পঙ্গু হয়ে গেল। মানিক এই দুই প্রজন্মের নারীর মধ্য দিয়ে যেন কুবেরের উপরে চেনা জীবনের ছকে আটকে থাকার প্রয়াস টুকু দেখিয়েছেন। আকুরটাকুরের কাছাকাছি পদ্মার মতো প্রমত্ত বিস্তীর্ণ নদী নেই। অথচ আকুর টাকুরের কপিলা কুবেরের জীবননদীর উচ্ছল জলধিতরঙ্গ। আছে এক অদ্ভুত রহস্যময় মানুষ—হোসেন মিঞা। সে-ই আসল মাঝি—দিক-নির্দেশক পরিচালক।

এ-উপন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য নদী-তীরের জীবনপ্রবাহ নয়—এ-উপন্যাস আসলে বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গভীর সত্যের অভিসারী। বাঙলার জীবন আসলে নদী তীরে ভাঙা-গড়ায় টালমাটাল—অস্থিতিশীল। এই জীবন নদীর জলের মতোই আনন্দ প্রবাহশীল। নতুন নতুন চর বা দ্বীপ জেগে ওঠা আর সেখানে একের পর এক অভিযানের কাহিনী বাঙলার জীবন রহস্যের বনিয়াদ গড়েছে। হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপ তেমনি একটি প্রতীক আয়তন। দুর্নিবার তার আকর্ষণ। হোসেন মিঞা ন্যায় অন্যায় জানে না—মানে না ; তার লক্ষ্য এই দ্বীপে মানুষ বসতি গড়ুক। নদীর প্রবাহ যে দ্বীপ জাগায় তেমনি একটি দ্বীপ, হোসেন মিঞার টানে কল্পনায় দুঃসাহসে ভর করে তৈরি হওয়ার আখ্যানই *পদ্মানদীর মাঝির* মূল। তাই নদী-নির্ভরতার চেয়ে এই অভিযাত্রা (adventure)-ই উপন্যাসটির আসল তাৎপর্য। একে বুঝতে পারেননি আমাদের প্রচলিত সমালোচকবর্গ। কুবের শক্ত হাতে বৈঠা বাইবার সময় এই অভিযাত্রায় সত্যিকার সঙ্গিনীকে পেয়েছে—রহস্যময়ী সেই জীবনবল্লভা—কপিলা।

সমরেশ বসুর *গঙ্গা*, প্রমথনাথ বিশীর *কোপবতী* (কোপাই নদীকে নিয়ে লেখা), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের *মহানন্দা*, হুমায়ুন কবিরের *নদী ও নারী* (পদ্মা এ-উপন্যাসের পটভূমি), রমাপদ চৌধুরীর *বনপলাশীর পদাবলী* (বর্ধমানের খড়ি নদী তীরবর্তী জীবন এ উপন্যাসের আখ্যান তৈরি করেছে), পূর্ণেন্দু পত্রীর *দাঁড়ের ময়না* (রূপনারায়ণ নদী তীরের গ্রাম জীবন), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে* (শীতলক্ষ্যা নদীর তীরের কথা), সৈয়দ শাহাদৎ হোসেন-এর *ঝড়* (মেঘনা নদীর তীরের অনিশ্চিত জীবন), আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর *কর্ণফুলী* (কর্ণফুলী নদীতীরের কথা), শামসুল হকের *নদীর নাম তিস্তা* (বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত তিস্তার কথা), দেবেশ রায়ের *তিস্তা পারের বৃত্তান্ত* (তিস্তা ব্যারাজ গড়ে ওঠার ফলে উত্তরবঙ্গে প্রান্তিক বর্গের মানুষের জীবনে টানা-পোড়েন), সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের *উত্তর জাহ্নবী* (বীরভূম-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান প্রবাহিত ভাগীরথী তীরের জীবন), আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ*—বাংলা নদী-নির্ভর কয়েকটি উপন্যাস)।

[তালিকাটি অসম্পূর্ণ। মূলত আমার প্রিয় গবেষক ড. শুভাশিস দত্তের সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করে তৈরি]

যেভাবেই ধরি, অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* এই ধারায় শ্রেষ্ঠ রচনা। তিতাস-তীরবর্তী জলজীবী মানুষদের জীবন আর চিরকালের জন্য হারিয়ে যাওয়ার ইতিবৃত্ত এ-উপন্যাসের মর্মবস্তু। এ নিয়ে অনেকগুলি সমালোচনামূলক রচনা বর্তমান লেখকের আছে। সেখানকার কথা আবার লিখছি না। উৎসাহী পাঠক সে বইয়ের সঙ্গে পরিচিত বলেই মনে হয়। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র সঙ্গে তিতাসের বেশ কতকগুলি মিল আছে। অমিলও আছে। সেগুলি দেখানো দরকার।

তিতাস একটি নদীর নাম-এর নদীর রূপ *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র নদীর রূপ প্রায় একই রকম। যেমন

> তিতাস : 'দুরন্ত মেখলা নাচিতে নাচিতে কোন্ কালে কোন অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল, বাঁ তীরটা একটু মচকাইয়া গিয়া ভাঙিয়া যায়।' তখন তৈরি হয় তিতাস। 'একপাশে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে—মেঘনার গৌরব মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়।' আর 'অনেক দূর পাল্লার পথ বাহিয়া ইহার দুই মুখ মেঘনায় মিশিয়াছে। পল্লী রমণীর কাঁকনের দুই মুখের মধ্যে যেমন একটু ফাঁক থাকে, তিতাসের দুই মুখের মধ্যে রহিয়াছে তেমনি একটুখানি ফাঁক—কিন্তু কাঁকনের মতই তার বলয়াকৃতি।' [*অদ্বৈত রচনা সমগ্র* · সম্পাদক : অচিন্ত্য বিশ্বাস ; ২০০০ ; দেজ পাবলিশিং : কলকাতা : ৩৯৯ পৃ.]
>
> কোপাই : 'কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় যে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—অর্থাৎ যে বাঁকটায় অত্যন্ত অল্প-পরিসরের মধ্যে নদী মোড় ফিরেছে, সেখানে নদীর চেহারা হয়েছে ঠিক হাঁসুলীর গহনার মত।' [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

তিতাসের সঙ্গে কোপাইয়ের পার্থক্য তিতাস মেঘনা থেকে উদ্ভূত মেঘনাতে মিলিত হয়। কোপাইয়ের উৎস ঝাড়খণ্ড—গঙ্গায় মিশেছে কোপাই। *তিতাস একটি নদীর নাম* একটি সমগ্র নদীর কাহিনী ; কোপাই-এর একটি মাত্র বাঁকের গল্প *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*। তিতাস আবর্তনমূলক— কোপাই-এর এই বাঁকটিও। তিতাস সম্পূর্ণ কোপাই অংশ—তিতাসে সূচনা থেকে পরিণতি, কোপাইয়ে রহস্যময় উৎস থেকে আধুনিকতার দিকে গতিশীলতার ইঙ্গিত। সেদিক থেকে দেখলে *তিতাস একটি নদীর নাম* বৃত্তীয় (cyclic) পরিস্থিতির উপন্যাস, আর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* রৈখিক (linear)। তিতাসের মালোরা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে—তাদের জীবন-প্রবাহ শুকিয়ে গেছে। গড়ে উঠেছে ভূমি-নির্ভর ব্যবস্থা। নতুন জীবন ও জীবিকায় তারা টিঁকতে পারে নি। হাঁসুলীবাঁকের কাহাররাও হারিয়ে গেছে—নতুন জীবন ও জীবিকা গ্রহণ করে নতুন করে বেঁচে ওঠার চেষ্টা করেছে। শেষে, হাঁসুলীবাঁকের পটভূমিতে ফিরে এসেছে করালী। অর্থাৎ পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে টিঁকে থাকার সংগ্রাম তারা ছেড়ে দেয় নি—নেতৃত্ব বদল হয়েছে।

হাঁসুলীবাঁকের কাহার-সমাজ পরিবর্তনকে সহজে মেনে নেয় নি। তাদের মূল চেষ্টা ছিল কৃষি অর্থনীতির মধ্যে নিজেদের স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া। পাশাপাশি করালীর নেতৃত্বে নতুন দলের মধ্য দিয়ে কৃষিব্যবস্থার বিরুদ্ধে এসেছে অভিঘাত। তারা পরিবর্তন চায়। নতুন আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তাদের সাহায্য করেছে। লেখক এই স্থিতি ও গতির শক্তিকে মোটামুটি বর্ণনা করেছেন ; স্থিতির শক্তি বনওয়ারীর প্রতি একটু অতিরিক্ত দরদ প্রকাশ পেলেও

করালীর সম্ভাবনাকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। তিতাসে মালো সমাজ নতুনকে স্বীকার করে নি। তারা নতুন পেশাকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের কেউ ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে পা ফসকেছে—মহিলাদের এই অধঃপতন নৈতিক। হাঁসুলীবাঁকেও আছে অনুরূপ। জল শুকিয়ে যাওয়ায় তিতাস তাদের জীবিকাকে আর নিশ্চিত রাখে নি। 'অনেক মালো পরিবার গ্রাম' ছেড়েছে, অনেকে পালিয়েছে। কেউ গেছে 'বড় লোক'-দের আশ্রয়ে—'মাছ ধরার বড় রকমের আয়োজন' সেখানে। (*অদ্বৈত রচনা সমগ্র* , উক্ত ; ৫৫৯ পৃ.) এই ব্যবস্থা স্বাধীন নয়। Capture fishing নয়—এ ব্যবস্থা পরাধীন, culture fishing. কেউ তাও পায় নি, চলে গেছে 'ধান কাটা'-র কাজে। শহর থেকে বস্তা ভরা মাল আনতে কারো 'কোমর' ভেঙেছে। মোট কথা নদীর সঙ্গে সঙ্গেই হারিয়ে গেছে তাদের জীবন জীবিকা আশা ও আকাঙক্ষা। সর্বরিক্ত সর্বস্বান্ত মালো সমাজের শেষ নারী বাসন্তীর মৃত্যুর পর নতুন একটি চর জেগে উঠল অবশ্যই—সে চর বা space-টিতে কৃষি জীবনের পত্তন ঘটল। নদী যাদের জীবনের অন্যতম বিচরণক্ষেত্র—যারা কৃষক, কাদির বা ছাদিরের মতো যারা কৃষিকর্ম করে, নদীতে যারা কখনো ভাসায় আনন্দের সমাহার—বাইচের নৌকা ; তারা থেকে গেল। অদ্বৈত এই নতুন space-টিকে বেশি বিস্তৃত করতে চান নি। তাঁর দৃষ্টিতে এক ধরনের ধ্রুপদি শিল্পের বিষাদ ঘন পরিণতিকে ধারণ করার সক্ষমতা দেখি। অদ্বৈত এখানে নদী-জীবনের বাইরে ততটাই আলো ফেলেছেন যতটা না ফেললে সে জীবনটি স্পষ্ট করে দেখানোই অসম্ভব হয়। এই সম্পাদনশীলতা তিতাসকে এক উচ্চস্তরের শিল্প গৌরব দান করেছে সন্দেহ নেই। উপন্যাসের শেষে আশা-নিরাশার পরিবেশটি কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, পাঠকের মনে পড়তে পারে।—'*ধানকাটা শেষ হইয়া গিয়াছে। তবে আর একটিও ধান গাছ নেই। সেখানে* এখন বর্ষার সাঁতার জল।.........কিন্তু এখন সে মালো পাড়ায় কেবল মাটিই আছে। সে মালো পাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ-গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়ে সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশাস ফেলে।' (*অদ্বৈত রচনা সমগ্র* ; উক্ত ; ৫৬২ পৃ.) এই ধান ক্ষেতের জীবন বৃত্তে মালোরা নেই।

তারাশঙ্করেও হাঁসুলীবাঁকের পরিণতিতে শেষ হয়ে যাওয়া কাহারপাড়ার বর্ণনা দিয়েছেন।—'কিছুই নাই—কিছুই নাই—হাঁসুলীবাঁকের সে কাহারপাড়া আর কিছুই নাই, আদ্যিকালের বৃক্ষ নাই, মানুষ নাই, জন নাই, পশু নাই, পক্ষীরা পর্যন্ত নাই।.......চারি দিকে শুধু শক্ত বাঁধানো লাল কাঁকরের পথ। আছে শুধু কোপাইয়ের বেড়, হাঁসুলীবাঁকের মাটি, আর পুরানো আমলের পড়-পড় জনহীন ঘরগুলি।' (শেষ পর্ব)—দুটি বর্ণনার মিল পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না নিশ্চয়। তবু, মালোদের তুলনায় কাহাররা অনেক সমর্থ মনে হয়। তার কারণ, নতুন জীবন যাপনে তারা নিজেদের মিলিয়ে নিতে পেরেছে। একটু উল্লেখ করা যাক :

> কাহারেরা এখন নতুন মানুষ! পোষাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল গাঁইতি নিয়ে। [শেষ পর্ব]

এই পরিবর্তনে তারা ভালো থাকে এমন নয়। কিন্তু জীবনের পরিবর্তনের ছকে তারা পা ফেলে। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই ছক বদলের ছবি আঁকেন না।

তিতাসের সঙ্গে হাঁসুলীবাঁকের আর এক পার্থক্য তৈরি হয় ভিতর ও বাহিরের অভিঘাতের প্রশ্নে। তিতাসে অদ্বৈত দেখান বাইরের অভিঘাত অপেক্ষা ভিতরকার ধাক্কাতেই

মালোদের বর্ণাঢ্য জীবনটি কেমন ভেঙে গেল। বাইরের অভিঘাত মূলত দুটি— ১. তাপসীর বাবার মারফৎ চটুল সংস্কৃতির ক্রমিক জনপ্রিয়তা। ২. নতুন আর্থিক পরিস্থিতি— ঋণচক্র ইত্যাদিতে মালোদের উৎসন্ন হওয়া। এর ফলে মালোদের নৈতিক জীবনের মূল্যবোধ গেল ধ্বংস হয়ে—'একখান গুয়া দুই খান' হল। চিরকালের জন্য দূরত্ব ঘটে গেল মানুষগুলির মধ্যে। এটিই শেষ পর্যন্ত ভিতরের ধাক্কার পরিণতি হল। কালোবরণের বাড়ির উঠোনে এই নতুন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটল।

হাঁসুলীবাঁকের অভিঘাত দ্বিমাত্রিক। ভিতরের ধাক্কা এসেছে করালীর কাছ থেকে। সে সামন্তব্যবস্থাকে অমান্য করেছে, অমান্য করেছে কত্তাবাবার নিয়ম। তার শক্তি আর্থিক, সাংস্কৃতিক— চিরাচরিত নিয়ম সে মানে না। দ্বিতীয় অভিঘাত বাইরের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে ভয়াবহ প্রভাব ফেলল তার সঙ্গে আর কোনো অভিঘাতের তুলনা চলে না। তারাশঙ্কর যে কাল পরিধিতে উপন্যাসটি লিখেছেন, সেই পরিধিকে অস্বীকার করতে চান নি। যে যুদ্ধ কাহারদের কাছে প্রথমদিকে রাম রাবণের যুদ্ধ, সাঁওতাল হাঙ্গামা, বর্গির হাঙ্গামার তুলনায় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় নি—সেই যুদ্ধই হাঁসুলীবাঁকের সমস্ত বেড়া দিল ভেঙে। তিতাসে বিশ্বযুদ্ধের নাম মাত্র উল্লেখ নেই। বস্তুত তিতাসে বাংলার সমাজের একটি প্রকৃতিলগ্ন নিজস্ব পেশার মানুষদের জীবন জীবিকার আন্তরিক চিত্রটি এঁকেছেন লেখক। হাঁসুলীবাঁক তেমন নয়। নদীও তাই হাঁসুলীবাঁকে তিতাসের মতো সর্বাতিশায়ী হয় নি। নদী-নির্ভর উপন্যাস ধারায় *তিতাস একটি নদীর নামে*-র সিদ্ধি প্রায় অতুলনীয়।

প্রকৃতির ভূমিকা তিতাসে অত্যন্ত গভীর। তিতাসে মাছ কমে গেলে সাময়িকভাবে মালোরা যায় খলা বাইতে। এই সময় কিছুদিন তারা গোকর্ণ ছেড়ে চলে যায়। উন্মুক্ত জল-বিহারী মানুষের functional region যায় বদলে। প্রকৃতির খেয়ালে—'আচানক' জল কমে যায় তিতাসে। আর তাতেই তাদের পেশা জীবিকা শেষ হয়ে যায়। হাঁসুলীবাঁকে তারশঙ্কর একমাত্রিক পেশাজীবিকা দেখান নি। কোপাইয়ের বন্যা—এক একবার কাহার জীবনে হানে আমূল অভিঘাত। তাদের জীবন বদলায়—বদলায় ঘরবাড়ি আর উচ্চস্তরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের বনিয়াদ। এইভাবেই বন্যা তাদের জীবনে আনে মনন্তরা—উপকথায় আনে বিস্ময়ের বাঁক— শুরু হয় নতুন যুগ। তিতাস আর হাঁসুলীবাঁক এইভাবে তুলনীয় হয়ে আসে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা সেই অর্থে নদী-নির্ভর উপন্যাস নয়। উপন্যাসের মূল চালিকা শক্তি এখানে নদী নয়—নদীবাহিত দয়েম আর পলেন জমি। নদীর ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয় কিন্তু তিতাসের মতো নদীমাত্র নির্ভর জীবন নয় *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র কাহারদের। তবু, উপন্যাসটিতে নদীর ভূমিকা বহু মাত্রিক হয়ে দেখা দিয়েছে। বিষয়টি কেমন ক্রমান্বয়ে দেখাচ্ছি।

১. কোপাই-এর স্বভাব কাহারদের বাড়ির মেয়ের মতো। এরকম ভাবনা রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ*-তেও দেখেছি। তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন কোপাই-এর কালে কালে বদলে যাবার ব্যাপারটি। গ্রীষ্মে যে নদীকে দেখে মনে হয় 'মা-মরা ছোট মেয়ের মতো শুকনো মুখে দুর্বল শরীরে' কোনমতে টিঁকে আছে, সেই নদী বর্ষায় যৌবনে ভরে যাওয়া শরীরে হয়ে 'ওঠে ডাকিনী'। 'একেবারে সাক্ষাৎ ডাকিনী'। এই কূলভাঙা ভয়ঙ্কর রূপ অবশ্য সবসময় হয় না। আবার সে হয় সাধারণ—'কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ করে' এসে বসে। তারাশঙ্করের মন্তব্য—'কোপাই নদী ঠিক যেন

কাহার-কন্যে ।। ১৯ পৃঃ, এক পরিচ্ছেদ]

উপমার এই তাৎপর্য কিন্তু হাঁসুলীবাঁকে নিছক উপমা থাকে নি। বারবার ফিরে এসেছে ভাবপরিকল্পনাটি। করালীর বিয়ের উত্তেজনা চলছে—জমেছে বাজনাদারদের বোল কাটা। বনওয়ারীও ঈষৎ আমোদিত। এমন সময় দেখা গেল কালোশশীকে। 'ঘোর-লাগা চোখে' মনে হল বনওয়ারীর—'কালো বউয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ।' সেখানে সর্বদাই কিছু খেলা করে—'উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়', কিন্তু তার মনের রহস্য বোঝা যায় না সম্পূর্ণ। (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) গোপালীবালা মারা যাবার পর নসুবালা শোক প্রকাশ করেছে। কোপাই নদীর কথা এই সময়ও ভোলে নি নসু। গোপালী কাকী-র 'হাতে ছিল কোপাইয়ের ঠাণ্ডা পরশ, বুলিয়ে দিলে অঙ্গ জুড়িয়ে যেত।' [৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

কালোশশী আর গোপালীবালা কোপাইয়ের দুটি বৈশিষ্ট্য স্পর্শ করে। প্রথম, রহস্য—কোপাইয়ের দহ নিত্য রহস্যময়, চিররহস্যে আবৃত। দ্বিতীয়, মনোরম তৃপ্তি—কোপাইয়ের জল স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া। কাহাররা তেমনি ভাবে। তৃতীয় উপাদানটি অবশ্য সূচনাতেই উক্ত— কোপাই কাহার কন্যেদের মতো খেয়ালি। তার সম্পর্কে পূর্বানুমান করা অসম্ভব।

পাখির ব্যবহারে এই শেষোক্ত (উপন্যাসে প্রথমেই উপস্থাপিত) বিষয়টি লক্ষ করি। পাখির আত্মহননের পর নসুবালার কথা—'পাখির চোখ জ্বলছে।/ জ্বলছে বই কি! কাহার মেয়ে ক্ষেপে উঠেছিল যে! সে যে তখন দু-কূল ভাঙা কোপাইয়ের মত ভয়ঙ্করী।' [শেষ পর্ব]

কোপাই নদীর বন্যা কালান্তরের চিহ্ন। পৃথিবীর সমস্ত পুরাকথাতেই মন্বন্তরের সঙ্গে বন্যার বিবরণ মিশে থাকে। 'প্রলয় পয়োধি জলে' জীবনপ্রবাহ সমস্যায় পড়ে—সমস্যা অতিক্রম করে নতুন সমাধানের দিকে অগ্রসর হয়। হাঁসুলীবাঁকের এরকম প্রবল বন্যা পরিস্থিতি দিয়ে শুরু হয় উপকথা।—'কোপাইয়ের সে 'মনন্তরা'র বানে ডুবে দেশ 'শোশান' হয়ে গেল! কুঠি গেল! সায়ের মশাইরা গেলেন। কাহারপাড়া অনাথা হ'ল।' [২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ]

নীল কুঠি সাহেবরা তাদের এনেছিল। তারা সাহেবদের হয়ে লাঠি ধরে ধান জমিতে নীল বুনতে বাধ্য করত ; সব সময় তৈরি হয়ে বসে থাকত। এক এক দল বইত পালকি। সাহেবরা গেল—সেই জীবন পড়ল সংকটে। 'কাহারেরা চাষকর্ম ভাল করে জানতনা' তখন। তারা চুরি-ডাকাতি করে ফিরত কখনো। শেষে তারাই হল চাষি। কাহারদের জীবনে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে কোপাইয়ের বন্যার বিশেষ ভূমিকা অবশ্যই আছে।

কালান্তরের এই চিহ্ন কোপাইয়ের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে নাকি? বনওয়ারী তেমনি করেই ভেবেছে। সুচাঁদের বলা উপকথা তার উপর প্রভাব ফেলে সবচেয়ে বেশি—'উদাস হয়ে গভীর অন্ধকার-ভরা বাঁশ বনের দিকে তাকিয়ে' তার মনে হয় 'কালে কালে কাল কেমন করে পালটায়, সে জানে কোপাই বেটী। দাঁড়াও গিয়ে কোপাইয়ের কূলে। দেখবে, আজ যেখানে দহ, কাল সেখানে চর দেখা দেয়, শক্ত পাথুরে নদীর পাড় ধসে সেখানে দহ হয়।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) নদীর এই ভূমিকা সক্রিয় দর্শকের মতো। বদলের কার্যকারণে নদী ভূমিকা নেয়—আবার সেই কার্যকারণের ফলাফল তার স্মৃতিতে রক্ষিত থাকে যেন।

বদল সর্বদাই সংকট হয়ে আসে না—স্বাভাবিক পরিবর্তন কাহাররা মেনেই নেয়। ঘর পুড়ে গেলে, চাল ঝড়ে উড়ে গেলে তারা খুব অখুশিও হয় না। 'ঘরের দেওয়াল' 'আধ হাত এক হাত উঁচু ক'রে চাল তোলে' তারা। 'বানে ঘর পড়ে গেলে নতুন করে পছন্দমত ঘর' বানায় তারা। বলে—'মা কোপাইয়ের দয়াতে এ একরকম ভালই হয়েছে।' যাদের ঘর ভাঙেনি, তারা ভাবে 'ঘরখানা পড়লে বাঁচতাম।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) নদী এখানে বদল যা ঘটায় তাকে সহজভাবেই মেনে নেয় তারা। কাহারজীবন নদীর সঙ্গে এভাবেই নিবিড় এক পরম্পরিত সম্পর্কে লিপ্ত হতে থাকে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় যতই অভিঘাত আসুক—তার সম্পূর্ণ নিঃশেষ হবার মতো অবস্থা আসতে পারে না। সব শেষ হবার আগে আসতেই হবে ইশারা। নদীর প্রবল বন্যা ছাড়া সে ইশারা অন্য কিছু হতে পারে না। ভাবনাটি বনওয়ারীর—তার কথা : 'কত্তা বলেছেন, কালরুদ্রের খেমা, হরির বিধান, বান না এলে শেষ হবে না হাঁসুলী বাঁকের উপকথা।' সে বন্যা হতে হবে 'ক্ষ্যাপা কাহার-মেয়ের মত'। (শেষ পর্ব) হলও তাই। মনে হয়, এক্ষেত্রে হাঁসুলীবাঁকের রচয়িতারও কিছু ভূমিকা আছে। পরিকল্পনার ভূমিকা।

৩. কোপাই কাহারদের জীবনধাত্রীর মতো। বস্তুত যুদ্ধ, স্বদেশী আন্দোলন যতই তীব্র হোক—বাজার দর যতই বাড়ুক কোপাই কাহারদের জীবন-জীবিকায় নানা ভাবেই সাহায্য করে। মাঠে মাছ, শাক পাত, মাঠ পুকুর বিল শুকিয়ে গেলেও 'মা-কোপায়ের গর্ভে আছে শামুক গুগলি কাছিম ঝিনুক।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) জীবনকে এইরকম সহায়তা করে বলেই কন্যা বা প্রেমিকার রূপ মনে রাখতে রাখতেই কোপাই তাদের কাছে হয়ে ওঠে মায়ের মতো। বনওয়ারী মৃত্যুর আগে মাতৃস্বরূপ কোপাইকেই স্মরণ করে। তার ইচ্ছা—'আমি যখন বলব রে, তখন যেন কোপাইয়ের কূলে আমাকে তোরা দুজনে ধরে নিয়ে যাস।' কারণ জ্ঞানগঙ্গা না থাকুক—'মা কোপাই তো অয়েছেন'। [শেষ পর্ব]

৪. কোপাইয়ের জল সেচের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে কাহাবরা। দক্ষিণে একটি পুরোনো বাঁধের কথা সামান্য বলে নিয়েছেন লেখক। যখন কোপাই তীরে তৈরি হয়েছে নতুন আবাদি জমি—সায়েবডাঙার মাঠে হাতি ঠেলা ধান ফলেছে, তখন সামান্য জলের অভাবে সে ধান শুকিয়ে যাবে! তাই নতুন করে বাঁধ দেবার কথা ভেবেছে তারা। এর আগেকার বাঁধ ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা আত্মরক্ষার জন্য। এখন বাঁধ দেওয়া হবে জল সেচের উদ্দেশ্যে। নদী স্রোতকে ব্যবহারের মানবিক উদ্যোগ।—'কথা হচ্ছে কোপাইয়ে বাঁধ বাঁধবার। কোপাইয়ের বুকে বাঁধ দিয়ে, কোপাইয়ের জলে মাঠ ভাসিয়ে দিতে হবে। জাঙলের মনিবরা হুকুম দিয়েছেন।' [৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

চেষ্টাটি কিন্তু প্রাকৃতিক নয়—যান্ত্রিক। এই চেষ্টা চিরাচরিত জীবন সংগ্রাম নয় জীবনকে বদলে দেবার জন্য প্রকৃতিকে প্রয়োগ, নিজের মতো করে ব্যবহার, লুণ্ঠনও হয়তো। করালী জানিয়েছে অন্য কথা। চন্দনপুরের ঘাটে সামরিক বাহিনীর লোকরা ঘাঁটি গেড়েছে। তারা 'পাম্প' বসিয়ে জল তুলছে। তাই 'মিলিটারিতে বাঁধ বাঁধতে দেবে না।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীও জানে বাঁধ বাঁধতে গেলে

> কাহারদের লোকশক্তির ক্ষয় হবে। জলের ধাক্কায় মানুষ মরবে কিছু। 'নদীর নীচে' অর্থাৎ down stream-এ যারা বাস করে তারা আপত্তি জানাবে। 'ফৌজদারি' করবে—'আসবে শেখেদের দল'। দাঙ্গা বাধবে।
>
> নদী যখন প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের অনুগত— সহযোগী তখন তার কাছে যা মেলে অন্যভাবে দেখলে, অন্যরকম চেষ্টা করলে তা পাওয়া সম্ভব নয়। মানুষ যখন নদীর প্রতিযোগী তখন সেই প্রকৃতিবিযুক্ত মানুষ অন্তর্দ্বন্দ্বে চঞ্চল— শ্রেণী বা বর্গ কিংবা স্বার্থের টানাপোড়েন সেখানে অনিবার্য।

কোপাই নদীর এইরকম বহুমাত্রিক রূপায়ণ *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সার্থকতা প্রদান করেছে।

উপন্যাসের শেষে ইতিহাস আর উপকথার সমান্তরালতা উত্থাপন করেছেন তারাশঙ্কর। ইতিহাসকে আধুনিক আর উপকথাকে চিরাচরিত উপাদান বলে গণ্য করেছেন তিনি। দুটি বিষয়ই নদীর সঙ্গে সম্মিলিত করে দেখিয়েছেন লেখক। ইতিহাস যেন গঙ্গা—বড় নদী আর উপকথা যেন কোপাই— ছোটনদী। আমাদের দেশের জাতি গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে একধরনের ভাষ্য যোজনা হয়েছে এখানে। Great tradition-এর সঙ্গে litle tradition-এর মিশে যাওয়া—ভারতীয় জীবনপ্রবাহের অঙ্গ। দেশের নানা প্রান্তে যে সমস্ত আঞ্চলিক, আংশিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ক্রমিক আত্মোন্নয়ন চলেছে, তার সঙ্গে দেশের মূল ধারার সম্পর্ক—বিনিময়-ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া নবজাগরণ-উত্তর ভারত চেতনার আসল অভিমুখ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য— unity in diversity, আমাদের আকাঙক্ষা। তারাশঙ্কর এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতেন। তাঁর নানা উপন্যাস সাহিত্যে জাতি গঠনের এই প্রক্রিয়াটি লক্ষ করা গেছে। *গণদেবতা*-র শেষে দেবুপণ্ডিত আর তার মাধ্যমে সমগ্র গ্রাম-সমাজ একটি ঐক্যবদ্ধ তাৎপর্য খুঁজে পেতে চেয়েছে। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বাহ্ণে তারাশঙ্কর নতুন দিল্লীর মবলঙ্কর হলে যে বক্তৃতা দিয়েছেন তার একাংশে বিষয়টি সুস্পষ্ট :

> 'আসমুদ্র-হিমাচল পরিব্যাপ্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আহার, বিভিন্ন পরিচ্ছেদ, বিভিন্ন আবহমণ্ডল। তা সত্ত্বেও এই সব বিভিন্নতার অন্তরালে একটি সর্ব-ভারতীয় ঐক্য সূত্রে সমগ্র ভারতের হৃদয় যেন গাঁথা আছে। এই হল অখণ্ড ভারত-সংস্কৃতি।' [১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৭-তে প্রদত্ত]

বস্তুত, তারাশঙ্কর এই ভারত-চেতনাকে শঙ্করাচার্য থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বিভিন্ন মনীষীর কর্মচেতনা ধর্মদেশনা ও উদ্যোগে লক্ষ করেছিলেন। নদীর দুটি রূপ এই চেতনার দ্বারাই উজ্জীবিত। হাঁসুলীবাঁকের শেষ দিকে এই সমান্তরলতার প্রসঙ্গ এসেছে। একাধিকবার। যেমন :

১. বনওয়ারীর মৃত্যুর পরের কাজকর্ম করল করালী। 'বললে—যাও, চলে যাও সগ্‌গে।' তারাশঙ্করের কথক এরপরই বলছে—'উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল।' [শেষ পর্ব]

২. বালির মধ্য থেকে মাটি খুঁজছে করালী। ইচ্ছা 'নতুন কাহারপাড়া হবে। নতুন বাঁধ দেবে।' আসলে করালী যা করছে তা তারাশঙ্কর লিখেছেন—'উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে।' [শেষ পর্ব]

প্রথম উদ্ধৃতির উপমা কেমন করে বদলেছে দেখাই :

উপকথা	ছোটো নদী	কোপাই
ইতিহাস	বড় নদী	গঙ্গা

এই সমান্তরলতা উপন্যাসটির নতুন এক ব্যাখ্যান তৈরি করে কিনা বিবেচ্য ।

উপকথা আর ইতিহাস কি বিপরীতমুখী কোনো বিষয়? ইতিহাস যেখানে শেষ হয় উপকথা কি সেখানে শুরু হয়? উপকথা কি মানুষের চিন্তার ইতিহাস নয়? উপকথা বা পুরা-কথায় যা থাকে তা কি সম্পূর্ণই যুক্তি-শৃঙ্খলাহীন? পুরাকথাকে যারা 'fallacious history about the past' বলেন তাদের ভাবনা কি মানব সমাজের প্রকৃত তাৎপর্য সন্ধান করে? করা সম্ভব? এইরকম পুঞ্জীভূত বহু প্রশ্ন উঠে আসে। ছোট নদীর মিলিত ধারাই কি বড় নদী নয়? বড়নদীর অস্তিত্ব কি ছোট নদীর জলস্রোত ব্যতিরেকে সম্ভব? আসলে তারাশঙ্করের বর্তমান উপন্যাসে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। করালীর আকাঙ্ক্ষাকে মনে হয় একটু আরোপিত। এ নিয়ে এই মুহূর্তে আলোচনা বিস্তারিত করছি না।

উপকথা বলে হাঁসুলীবাঁকে যা দেখানো হয়েছে তা একটি পুরোনো যুগের সংস্কৃতি প্রবাহ বলেই মনে হয়। এই সংস্কৃতি প্রবাহ মানুষের ইতিহাস রচনার অনেক আগেকার ব্যাপার। বস্তুত, একই কালে বাস করেও সবাই ইতিহাসের একই স্তরে বাস করে না। বনওয়ারী আর মাইতো ঘোষ একই সময়ের মানুষ—কিন্তু ইতিহাসের কালপ্রবাহে যে স্তর বিন্যাস প্রস্তাবিত হয় তাতে দুজন একই স্তরে বাস করে না। এই বহুস্তরতা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ভিন্ন। চন্দনপুরের বাবু আর জাঙালের বাবুরা এক স্তরে বাস করে না। আবার গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যে স্তরায়ণ (stratification) তাও সর্বত্র সমধর্মী নয়। করালী আর বনওয়ারী একই সমাজ বর্গের মানুষ, অথচ তাদের প্রবণতা দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। সুতরাং বনওয়ারীর উপর উপকথা যতটা প্রভাবশীল ততটা আধুনিক জীবন পরিধির প্রতি তার আগ্রহ দেখা যায় না। করালীর মধ্যে এর বিপরীত প্রক্রিয়া লক্ষ করি। এই ভাবে দেখলে মন্তব্যটি হয়তো বেশ খানিকটা গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা চলে। তবে ইতিহাস আর উপকথাকে জল অচল কক্ষে বিভাজিত করে যে দেখা যায় না, সেকথা মনে রাখতেই হবে। নদীপ্রবাহকে উপকথা আর ইতিহাসে বিভক্ত করে দেখানোও একটু কঠিন। জলপ্রবাহ আর সংস্কৃতিপ্রবাহ নিত্য বিবর্তনশীল—সে কখনো থামে না—এগিয়ে চলে। থামে যদি, তবে তার মৃত্যু হয়। হাঁসুলীবাঁকে তেমন ঘটে নি।

১১

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় সাপের প্রসঙ্গ

আমাদের পুরাকথার আদিতে সাপ। জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ মহাভারতের কাহিনীটিকে অদ্ভুত বৃত্তীয় আকার দিয়েছে। শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞে সৌতি উগ্রশ্রবা কাহিনীটি বলেছেন। সে-কাহিনীতে সর্প জাতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব উপস্থিত। নগ্ন ক্ষপণক বেশে তক্ষক উতঙ্ককে বঞ্চনা করেছে সেখানে ; প্রমদ্বরার মৃত্যুতে সংক্ষুব্ধ রুরু সর্প নিধনে ব্যাপৃত হয়েছেন—কারণ তার স্ত্রী প্রমদ্বরা মারা গেছেন। এই মহাদ্বন্দ্বে কদ্রু আর বিনতার কাহিনী বিখ্যাত। সর্প আর সর্পভুক্ পক্ষী—দুই-এর চিরদ্বন্দ্বের মাধ্যমে অমৃত আকাঙক্ষায় সমুদ্র মন্থনের কাহিনী গড়ে উঠেছে। জন্মেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞের কারণ—তাঁর পিতা পরীক্ষিৎ সাপের কামড়ে মারা গেছেন। একে কোনক্রমেই সরীসৃপ সাপের চিত্র বলে ভাবা যায় না। সাপ কোনো সুদূর অতীত কালখণ্ডের টোটেম বা কুলপ্রতীক বলে মনে হয়। মধ্যপ্রাচ্যে অমৃতলোভী সাপের কথা আছে। 'গিলাগামেশ' মহাকাব্যের নায়ক গিলগামেশ অভিযান শেষে অমৃতলতা নিয়ে এসেছিলেন। সেটি সেবন করলে মানুষ চিরজীবী হতে পারবে। কিন্তু গিলগামেশের স্বপ্ন পূরণ হয় নি। সাপ এসে অমৃতলতা খেয়ে গেছে। ফলে মানুষ মারা যায়—আর সাপেরা খোলস বদলায়!

সাপকে অমর ভাবার দুটি প্রাকৃতিক কারণ আছে : (১) সাপের খোলস বদল করার ক্ষমতা। মানুষ ভেবেছে এ পুনর্জীবন লাভ ছাড়া কিছু নয়। (২) সাপ ছমাস প্রায় না খেয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শীত-ঘুম দেয়। সুতরাং সাপ পৃথিবীতে মৃত্যু আর জন্মে ফিরে আসার কার্য-কারণ জানে বলে ভেবেছে আদিকালের মানুষ। সাপ সম্পর্কে পুরাকথার একটি আদল আমাদের লোকজীবনে আছে। সাপ অমৃত পাবার আশায় অমৃত কুম্ভ রাখার স্থানটিতে কুশাসনে লেহন করেছিল—তাই তাদের জিভ চেরা। অমৃত পায় নি বলেই সাপ বিষের অধিকারী—এভাবনাও বাংলায় মনসা-সংক্রান্ত পুরাকথায় আছে। বিষের জন্ম হবার কাহিনী বাংলার মন্ত্রযানীদের মধ্যে বেশ প্রচলিত। এর দু-তিনটি কাহিনীমূলের আভাস পেয়েছি। যথা :

১. দ্বিতীয়বার মন্থন করেছেন শিব, তা থেকে বেরিয়েছে গরল, প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই গরল কণ্ঠে ধারণ করেছেন তিনি। বিষপান করার পর উদ্‌গীরণ করে দেন তিনি। বিষ চলে য়ায় পাতালে। পার্বতীর বিরহজ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিল্ববৃক্ষকে কোল দিয়েছেন শিব। তাঁর স্খলিত বীর্য নেমেছে পাতালে। সেই বীর্য থেকে মনসাকে রূপে গড়ে তোলেন পাতালের বৃদ্ধ নির্মাণি—বিশ্বকর্মা। মনসাকে বিষের অধিকার দেওয়া হল। সাপের অধিকার।

২. কালীয় দমন করেন বালক কৃষ্ণ। কালীয় সর্পের বিষ থেকেই বিষের জন্ম। পুষ্প চয়ন করতে গিয়ে কেলি কদম্বের ডাল ধরে কালীয় নাগের দমন ঘটান তিনি। প্রাসঙ্গিক একটি মন্ত্রাংশ :

সেই কালীদহ কূলে আছে
কাল কদমের গাছ।

তারি ডাল ধরে কানাই
কালীদহে দিলেন ঝাপ।।

[পশ্য : ''মন্ত্রে মন্ত্রিত বাংলার কথাচিত্র''-প্রবন্ধ ; অচিন্ত্য বিশ্বাস ; 'লোকশ্রুতি' ; ১৬ সংখ্যা ; ২০০০ ; ৭৯ পৃ.]

৩. যোগ আর তন্ত্রে আছে মূলাধার-চক্রের কথা। সেখানে তিন নাড়ির সমাবেশ ঘটে। এই ত্রিবেণীর ঘাটে নেতা-ধোপানী কাপড় কাচেন। শরীরের বিষ শোধন করেন তিনি। এরই সঙ্গে মূলাধার চক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অনেকটাই যেন সাপের মতো শীতঘুমে আচ্ছন্ন—কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। ত্রিবেণীর ঘাটে কাপড় কাচার সময় সূর্য আর চন্দ্রের প্রসঙ্গ আছে। যোগ সাধনার পারিভাষিক শব্দ এসব : চন্দ্র অমৃত, সূর্য বিষ—দাহিকা শক্তি। নেতা ধোপানী কাপড় কাচার অবসরে সমুদ্রে ভেসে আসা বিষ দেখতে পান। পশ্য :

ওপার ধোপানি কাপড় কাচে।
পদ্মপাতায় বিষ আসে।।

কিংবা—

লাত্যান ধোব্যান কাপড় খাঁচে
মন পবনের খারে।
বেটি মরা ছেলে জিন্দো
করে ছেলে মারে।। [সূত্র : ঐ ; ৮৫ পৃ.]

—এই সমস্ত টুকরো ছিন্ন পুরাকথায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে। বাংলার মতো ক্রান্তীয় অঞ্চলে সাপের সঙ্গে নিত্য সংগ্রাম করেই আমাদের জনজীবন শত সহস্র বৎসর ধরে টিকে আছে। ফলে সাপকে বাদ দিয়ে বাংলার লোকজীবনের চলে না। বাংলার নিজস্ব পুরাণ মনসামঙ্গল। এর সঙ্গে আদিম টোটেম ভাবনা যেমন জড়িয়ে আছে, তেমনি আছে সমাজ-বিবর্তনের বহু প্রসঙ্গ। বিশেষত কৃষিকর্মের সঙ্গে সাপ জড়িয়ে গেছে। ছয় মাস মৃত্যুর দেশে থাকা লখিন্দরের ফিরে আসা, নেতার সাক্ষাৎলাভের পর স্বর্গযাত্রা—মনসা, বিশেষত মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে নিয়ে আসা, বেহুলার এই সক্রিয়তা মনসার ব্রতধারিণীর কৃত্য। অন্যপক্ষে এর আড়ালে একটি প্রতীকের দোলাচল আছে। শস্য বোনার পর তার মৃত্যু ঘটেছে—অঙ্কুরিত হবার পর ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে তা। পরে শস্য কেটে গোলাজাত করার মধ্য দিয়ে ছমাসের পথ পার হয়ে ডুবে যাওয়া সম্পদসহ ফিরে আসা। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি *বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল*-এর ভূমিকায়। উৎসাহী পাঠক দেখে নেবেন সে বই।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য় সাপের প্রসঙ্গ অত্যন্ত গভীর, ব্যাপক—এক গহন রহস্যালোকের ইঙ্গিত নিয়ে আসে। উপন্যাসের সূচনায় 'জন্মেজয়ের সর্পসত্র' যজ্ঞের মতোই কাণ্ড করে করালী। 'কত্তাঠাকুর'-এর 'লীলাখেলার নিরাকরণ' করতে চায় সে। গোটা সমাজ যখন ভাবছে শিস দেবতার ক্রোধের কারণে ঘটেছে, করালীর কুকুরটিও মেরেছেন তিনিই—পানুর খুঁতো পাঁঠা উৎসর্গ করা হয়েছিল বলেই এত ক্রোধ তার—তখন করালী কুকুরের মৃত্যুর কারণ জানতে চাইছে। বাঁশবনে আগুন দিয়েছে—'বাঁশের ঝাড়ের মাথা থেকে আগুনের উত্তাপে ধোঁয়ায় ক্লিষ্ট অবসন্ন হয়ে এলিয়ে নীচে পড়ছে একটা প্রকাণ্ড সাপ।' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) মহাভারতেও এমনি যজ্ঞাগ্নির আকর্ষণে সাপ উড়ে এসে পড়েছে।

যাইহোক, সাপের এই মৃত্যুকে সহজভাবে নিতে পারল না কাহার সমাজ। তাদের মনে হল ঐ সাপ তাদের দেবতার বাহন। আর তাকে হত্যা করার অপরাধ-মোচনের চেষ্টা গোটা উপন্যাসে বার বার ঘুরে ফিরে এল। করালী এই ভাবনাকে মেনে নেয় না—সে বনওয়ারীকে ডেকে বলে : 'ওই ওই দেখ, তোমার কর্তা পড়ছে বাঁশের ডগা থেকে।' [ঐ]

কাহিনীর সূচনায় যে সাপটি মারা গেল—উপন্যাসের কোথাও কিন্তু সে মারা যায়নি। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য প্রথম সংস্করণ ('আনন্দবাজারে' প্রকাশিত, শারদীয় ১৯৪৬-পাঠ) পড়ে বলেছিলেন সাপটি যেহেতু কাহারদের টোটেম তাই এর মৃত্যু হতে পারে না। তারাশঙ্কর পরের গ্রন্থিত সংস্করণে বেশ বিস্তারিত করেছেন কাহিনীটি আর সেখানে এই ইঙ্গিতটি আরও স্পষ্ট করেছেন। কাহারদের প্রাণ ভোমরাটি যে সাপ রক্ষা করেছে আধুনিক সময়ের টান ও চাপ তাকে মেরে ফেলতে চাইলেও তার মৃত্যু হতে পারে না। কাহারদের মনে সাপটি দৈব। গিলগামেশ থেকে শুরু করে বাংলার মনসাকথা—সর্বত্রই এই চিরজীবিত সাপ। তাকে ব্যক্তি করালীর সক্রিয়তা সহজে মারতে পারে নি। পাখি করালীর সঙ্গী। অবিশ্বাসের প্রতিমূর্তি, বলেছিল—'সাপ আবার বাবা হয়!' সুচাঁদ বলেছিল, উপকথার দৈব রহস্যের ইঙ্গিত : 'ওরে আমাব বাবাঠাকুরের বাহন রে! ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুব যে 'ভোমন' করেন।.....' 'এরপর আর অবিশ্বাসের কিছু থাকে না।' [১ম পর্ব তিন পরিচ্ছেদ]

সাপেব মৃত্যু হাঁসুলীবাঁকের কাহার পল্লীতে এক অভাবিতপূর্ব ভয়েব জন্ম দিল। এই ভয় তাদের উপকথার নির্মাণ ও বিনির্মাণকে নানাভাবে গড়ে তুলল। শুরুতে যাকে ভাবা হয়েছিল কর্তাবাবা, পরে সেই সাপটি নির্দিষ্ট হল কর্তাবাবার বাহন। সুচাঁদের সেই নির্মাণ ও বিনির্মাণ চলার মধ্যে সুচাঁদই তৈরি করল নতুন এক ভাষা : 'উনি যদি কত্তার বাহন না হন, কি মনসার বেটি না হন তো আমি কি বলেছি!' (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) অনির্দিষ্ট অনিশ্চিত পুরাকথা—স্মৃতিধার্য মৌখিক পরম্পরা, কিছুটা সময়ের সংকটকে যেন নতুন ভাবে নতুন চেহারায় রূপ দানের আকাঙ্ক্ষা থেকে গড়ে তোলা। সাপ সম্পর্কিত পুরাকথার স্বরূপ যাই হোক, কাহারদের উপর তার প্রভাব সীমাহীন। বনওয়ারীর মনোজগতে এই প্রভাব ক্রিয়াশীল। 'মনের মধ্যে সাপ মারার সেই স্মৃতির বেদনা যেন ঘন হয়ে উঠেছে।' [১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

ফ্রয়েড বিষয়টিকে একটি বিশ্লেষণের মধ্যে এনেছেন। এহল মানব জীবনের আদি পাপের অন্তর্গত—পিতৃহত্যা (Patricide)-এর স্মৃতি। তাঁর বর্ণনা : 'It is a reasonable surmise that after the killing of the father a time followed.....The memory of the father lived on during this time of the "brother horde". A strong animal, which perhaps at first was also dreaded, was a substitute.' [*Moses and Monotheism* ; উক্ত ; 132-133 পৃ.]

পিতৃহত্যার পর যে অপরাধবোধ তা ক্রমে টোটেম-এর সঙ্গে মিলে মিশে যায়। এসব ক্ষেত্রে সমাজ টোটেম-প্রাণীর সঙ্গে অদ্ভুত দ্বৈত সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ভয় আর ভক্তি। ফ্রয়েড একে উভবলিতা বলেছেন। করালী যতই বলুক, এমন সাপ অনেক দেখা গেছে রেল পত্তনের সময়, মাইতো ঘোষ যতই বলুক, আসামের জঙ্গলে এর চেয়ে বড় সাপ দেখা যায়—বনওয়ারী আর তার কাহারবর্গের কাছে এ আত্যন্তিক ভয় আর শ্রদ্ধার বস্তু। আর তাই বনওয়ারীর নির্দেশ—'দাহ হবে বাবার বাহনের। কাহার পাড়ার সবাইকে চান করতে হবে।' [১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

জাতসাপ—একটি বিচিত্র ভারতীয় ধারণা। জাতি-কাঠামো বর্ণ ব্যবস্থার এক রকম চলন এই ভাবনায় ধরা পড়ে। সাপের শ্রেণী বিভাজন জাতি-কাঠামোর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। যে সাপের বিষ-শক্তি যত বেশি, যে যত আক্রমণাত্মক সে তত উঁচু স্তরের। এই ভাব পরিকল্পনা ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার প্রভাব সীমায় কাহারদের অস্তিত্বকে অভ্রান্তভাবে চিহ্নিত করে। তারা অস্পৃশ্য, কিন্তু ভাবজগতে তাদের খেলা করে বর্ণ-ব্যবস্থা জাতি কাঠামো। কাহাররা তাই বিশ্বাস করে 'আল কেউটে-রা জাত সাপ। 'জাত সাপ নাকি ব্রাহ্মণ, ওদের মেরে তাই সম্মান ক'রে আগুনে 'ডাহ' অর্থাৎ দাহ করে।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এটি অবশ্য বাংলার জনমানসে বেশ প্রচলিত সংস্কার। তারাশঙ্কর হাঁসুলীবাঁকের মানুষদের ভাব-বিশ্বটি তুলে ধরার জন্য এটি বেশ চমৎকার উত্থাপন করেছেন। সাধারণত কেউটে ওদের তাড়া করে—ওরাও কেউটেকে তাড়া করে মারতে ভয় পায় না। কর্তাবাবার থান পরিষ্কার করতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে তিনটে আলকেউটে। 'বাবাঠাকুরের থানে কেউটের' অর্থ অন্য রকম হল। চন্দ্রবোড়া সাপটি নিশ্চয় ছিল বাবার বাহন (সুচাঁদের ব্যাখ্যানে ওরা প্রশ্ন তোলে না) আর এগুলি নিশ্চয় তার 'সঙ্গী সাথী'। বনওয়ারী তাই বলল ওগুলোকে যেন কেউ আঘাত না করে। সাপও, কাহারদের গায়ের গন্ধে কাছে ঘেঁষে না আর—একটু ফণা তুলে মাটিতে ছোবল মেরে চলে গেল। সাপ আর মানুষের এই শত্রু সম্পর্ক আসলে ফ্রয়েড-ভাষিত ambivalance বা উভবলিতার একটা দিক। অন্যদিক অবশ্যই ভক্তি। বনওয়ারী যে সাপ তিনটিকে 'হাত জোর করে প্রণাম' করে এ হল সেই ভক্তির প্রণাম।

'লরে-লাগে অর্থাৎ নরে-নাগে বাস করতে নাই'—এই হল সূত্র। বনওয়ারী মনে করিয়ে দেয়। নাগ তিনটিকে জানায় সংস্কারটির কথা। তার আদিম বিশ্বাস মানুষের ভাষায় সাপদের স্পর্শ করতে চায়। তার মনে এই বিনিময়কে কখনোই একমুখী মনে হয় না। সাপগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ তৈরি হয়ে যায় এভাবে। বাবাঠাকুরের সম্বন্ধে তারা তার ভ্রাতৃ বা ভগিনী। তার বিশ্বস্ত উচ্চারণ তাই কাহারদের আদিম মনের (Savage mind-এর) স্পষ্ট প্রমাণ হয়ে আসে।—তোমাদের প্রভু, আমাদের বাবাঠাকুর, তাঁর পুজোটি সেরে লি, তা' পরেতে তোমরা আবার স্বস্থানে পরমেশ্বরী হ'য়ো না কেনে!' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) সরে গেল সাপগুলি। কিন্তু নিশ্চিত হওয়া গেল না। যায় না। 'ও জাতকে বিশ্বাস নাই।'—ভয় আর ভক্তির উভবলিতার প্রমাণ এখানেও।

চন্দ্রবোড়াটির পার্থিব মৃত্যু ঘটলেও কাহার মনে তার মৃত্যু হয় নি। ঘরভাঙাদের শেষ পুরুষ নয়ান এ-উপন্যাসে এক সময় চরম বিধ্বস্ত—স্ত্রী অন্য পুরুষকে গ্রহণ করেছে, মৃত্যুর অপেক্ষা করছে—পাখির প্রেমিক করালীই চন্দ্রবোড়াটিকে মেরেছে, তার মনশ্চক্ষে 'কত্তাঠাকুর' এসে ধরা পড়েন এমন চরম বেদনার লগ্নে। তখন তার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে কত্তার 'পায়ের তলায় পড়ে আছে সেই বিরাট চন্দ্রবোড়া—করালী যাকে মেরে বাহাদুরি নিয়েছে।' সে যাই হোক, করালী যতই বাহাদুরি নিক—সাপটি অমর। 'সে কি মরে? বাবার সাপ সে! কত্তার বাহন। সে বেঁচে উঠেছে।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এই বেঁচে ওঠা এক অর্থে পুনরুত্থান resrrection ছাড়া কিছু নয়।

নয়ান এই বৃহদাকার সাপটিতে আর একটি শক্তি যোজিত করতে চেয়েছে। কল্পনার শক্তি, পুরাণের শক্তি, সংস্কারের শক্তি। তার মনে হয়েছে করালী যে সমাজের রীতি নিয়ম না মেনে আধুনিক অর্থশক্তি আর পেশিশক্তির বশে কোঠাবাড়ি গড়েছে—সেই ঘর, পাখির সঙ্গে কামনার বাসনার পরাকাষ্ঠা সেই ঘর তা ধ্বংস হোক, নয়ান তো তা চাইবেই। সমাজ-

মন সেই কোঠাবাড়ির বিরুদ্ধে, সুতরাং নয়ান ভাবতে থাকে 'বাসর ঘরে ওই সাপ ঢুকবে।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ)। বৃহদাকার সাপ—বাসরঘরে ঢুকবে। মনসাকথায় আছে সুতার সঞ্চার সম্ভব এমনই সূক্ষ্ম সাপ লখিন্দরের বাসর ঘরে ঢুকবে। নয়ান এখানে সাপটিকে শুধু বাঁচিয়েই তোলে নি ইচ্ছামতো রূপান্তরের ক্ষমতা যুগিয়েছে। চন্দ্রবোড়া-টিকে এভাবেই নানা রূপে নানা ভাবে কল্পনা করেছে সবাই। বনওয়ারী ভেবেছে 'বাবাঠাকুরের রজগরটি আমাদেরই ভুল চুকে পুড়ে মরেছে'—পাপের ক্ষালন করতে চড়কে চাপার মানত নিয়েছে সে। (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) নতুন নতুন অভাবিতপূর্ব যা কিছু বিস্ময়ের বস্তু সবই যেন ঐ সাপটিরই রূপান্তর। বিশ্বযুদ্ধের উড়োজাহাজ তাদের কাছে বিস্ময়ের ভয়ের নিশ্চয় কিন্তু যে বিশ্বভাবনা (Cosmogony) তারা জানে, তার নিরিখেই ব্যাখ্যান তৈরি করে নেয়। বনওয়ারীর মনে হয় 'বাবার বাহন ফণা তুলে আবার কোন নতুন রূপ ধরে আসছে নাকি!' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই ভাবজগৎ তারা পরিত্যাগ করতে চায় না, পারেও না। ঝড় বাদল মেঘ বজ্রপাত সব কিছুতেই দেখা যায় ঐ সাপটিকে। নয়ানের মায়ের ব্যাখ্যা—'ম্যাঘের কোণে বাবার বাহন ফণা তুলে উঠেছে। লকলকিয়ে জিভ 'কাড়ছে' অর্থাৎ বার করছে। ফোঁস ফোঁসিয়ে গাজরাচ্ছে। আগুনের আঁচে ঝলসানো অঙ্গের 'ডাহতে' ক্ষেপে উঠে আকাশে মাথা ঠেকিয়ে ঝড় তুলেছে।' [৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

আদিম সমাজ যে-সব সমস্যার মধ্যে পড়ে আর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারে না—তখনই পুরাকথার সৃষ্টি করে। চলমান জীবনপ্রবাহে যা তাদের স্মৃতিধৃত তার সঙ্গে নতুন নতুন পরিস্থিতির অভিঘাত আসে—পুরাকথার পরিবর্তন আর অভিযোজন ঘটতে থাকে। সে-অর্থে পুরাকথা হয়ে ওঠে সৃজনশীল প্রতিক্রিয়ার শক্তি—আত্মরক্ষার আয়োজন। ব্যক্তির জয়-পরাজয়-ক্রোধ-ঈর্ষা-হিংসা-দ্বেষ একটি সর্বাতিশায়ী অনুমোদন লাভ করে পুরাকথার বৃত্তে। নয়ানের মায়ের অভিশাপ তাই কত্তাবাবার বাহন সাপটিকে কাহারদের সর্বজনসিদ্ধ প্রশ্নাতীত বিশ্বভাবনার সঙ্গে মিশিয়ে নেয়। এই সাপ তখন আর সাপ থাকে না—হয়ে ওঠে যাবতীয় শঙ্কা-বিপর্যয়-ভয়ঙ্করের ভূমিকা, কারণ আর ফলাফল। নয়ানের মা-ও তৈরি করে পুরাকথার একটি ভাষ্য—সেটি সুচাঁদের মতো সৃজনধর্মী থাকে না, হয়ে ওঠে ধ্বংসের তীব্রতার সঙ্গে মিশে প্রলয়ঙ্কর। 'যে মেরেছে পুড়িয়ে, তার ঘর দিলে উড়িয়ে।' এই তার চোখে দেখা বিষয়—ইচ্ছাপূরণ (wish fulfilment) হয়ে ওঠে। আর তার প্রার্থনা : 'হে কত্তাবাবা, হে বাবাঠাকুর, তুমি ক্ষেপে ওঠ বাবা। বাহনের মাথায় উঠে দাঁড়াও এইবার। আকাশের বাজ নিয়ে নষ্ট দুষ্টু বদজাতের মাথায় ফেলো বাবা!' এই প্রার্থনায় সব থেকে ভীত হয় বনওয়ারী। সেও তো করালীকে শাসন করে নি। তাই 'বিচিত্ত' বরণ ভয়ঙ্কর সাপটি পুড়ে মরবার দৃশ্যটি তার মনে স্পষ্ট করে ফিরে আসে। মৃত্যুর পর তারই পুনর্জন্ম সে প্রত্যক্ষ করে মেঘের মধ্যে—'তার ফণা, তার জিভ'-দেখা যায় অপার রহস্য আর দুর্যোগের মধ্যেও। [৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

বনওয়ারীর প্রেমিকা কালোশশী। তাকে ঘিরে পরমের সঙ্গে যে তীব্র বিরোধ তার পরিণতিতে চন্দ্রালোকিত অদ্ভুত রাত্রিতে পরমকে চূড়ান্তভাবে হারিয়ে আহত রক্তাক্ত বনওয়ারী এসে দাঁড়ায় কালোশশীর সামনে। ইচ্ছা, একটু গান শুনবে—কোপাইয়ের শীতল জলে ধুইয়ে নেবে দেহের জ্বালা। হঠাৎ এসে দাঁড়াল পরম। বনওয়ারী ডুব দিল কোপাইতে। পালাতে লাগল কালোশশী। কালিদহে চিরকালের জন্য হারিয়ে গেল কালোশশী। বনওয়ারীর চোখে চাঁদনি আলোয় হাল্কা একটি দৃশ্য ধরা পড়ে এ-সময়। পরমের ভয়ে পলায়নরত

কালোশশী 'বুনো বিড়ালীর মত' দৌড়াচ্ছিল, কালারুদ্রের আশ্রিত শিমুল গাছের শিকড় ধরে ওঠার চেষ্টা করছিল। তখন বনওয়ারী দেখল—'শিকড়ের তলা থেকে আকাশের বিদ্যুতের মত এঁকে বেঁকে মাথা তুলে' দাঁড়াল একটা কিছু। কি, ভালো করে বোঝার আগেই কালোশশী হারিয়ে গেল। আকাশে চন্দ্রালোক—'ঝিকমিক করছে বালুর কণা', সেখানে হারিয়ে গেল কালোশশী। কিন্তু তখন আর একবার দেখতে পেল বনওয়ারী—'দিগন্তের মত আঁকাবাঁকা' সেই রহস্যময় প্রাণীটি—'শিমুলবৃক্ষের তলা থেকে বেরিয়ে কালো বউয়ের বুকের উপর মাথার উপর দুলে উঠেছিল, সেটা এখনও মুখ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে।' সেটিও যেন 'দেখছে দহের জল' 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছে'। (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) প্রথমে যাকে বিদ্যুতের মতো দেখেছে, একটু পরেই দেখেছে দিগন্তের মতো—বনওয়ারী শেষে তাকে দেখলো সাদা গোখরো। রূপান্তরশীল কত্তার বাহনের নতুন একটি চেহারা ছাড়া কিছুই নয়। বনওয়ারী বোঝে 'কত্তাবাবার ক্রোধ'। স্থির বিশ্বাস কালোবউ কেন মারা গেল তা সে বুঝেছে। 'বাবার বাহন! বাবার বাহন!' [ঐ]

কালোশশীর সঙ্গে বনওয়ারীর প্রেম—'অঙে'র সম্পর্ক, এ মোটেই কাহার সমাজের বেনিয়ম নয়। সুচাঁদের উপকথার আদি যুগ থেকেই অঙের খেলা চলে আসছে। এমনকি এক সময় অঙের সম্পর্কের মানুষের কাছে যাবার পথে কাহার মেয়েরা কর্তাবাবার কাছে সিঁদুর রেখে অনুমতি নিত। কিন্তু কালোশশী যে কর্তার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার প্রদীপ, ধুনো দেবার জন্য বনওয়ারী যাচ্ছিল, তার সঙ্গে কর্তার থানের কাছেই মিলিত হয়েছে! এই অসংযত আচরণ, প্রদীপটিকে নিবিয়ে দেওয়া—সেই সঙ্গে বনওয়ারীর অশুদ্ধ কাপড়েই সন্ধ্যার প্রদীপ ধুনো দেওয়ার সবই তো কর্তার অধিকারকে অস্বীকার। তাই কালোশশীর মৃত্যু। এমনি একটি যুক্তি ভেবে নেয় বনওয়ারী। কালোশশীর পাপ হলে তার অর্ধেক দায়িত্বতো বনওয়ারীরও! তাই এক চিরন্তন ভয়ের ধাক্কা বনওয়ারীর মনে ঢেউ তোলে। এই ভয় আত্মগ্লানি থেকে মুক্তি সে কখনই পায় নি। সর্বদাই কর্তার বাহন ঐ সাপটি দুলে যায়। রূপে রূপান্তরে কালে কালান্তরে। যখনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে বনওয়ারী সাপটিকে দেখেছে—'বাবার বাহন সেদিন কাল বৈশাখীর মেঘের মধ্যে ফুঁসিয়ে উঠেছিল। সেই বিচিত্র বরণ ফুটে উঠেছিল সাদা-কালো মেঘে মেঘে।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) নতুন নতুন অনিশ্চয়তায় পেয়েছে কর্তার বাহনের ইতিবাচক ভূমিকাও। করালীর মারফৎ বিশ্বযুদ্ধ এভাবেই নতুন একটা শঙ্কার বিষয় হয়েছে কাহার সমাজে। জানে বনওয়ারী এই আকর্ষণেই কাহার সমাজ হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাতন্ত্র্য। আর তাই, আজ নতুন সঙ্কট-পরিস্থিতিতে বনওয়ারী খুঁজে পায় সাপের শিসের মানে—'শিস দিয়ে সাবোধান করে দিচ্ছিলেন হাঁসুলী বাঁকের কাহার কুলকে—সাবোধান!' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কর্তাবাবা তাদের অভিবাবক দেবতা (Guardian deity) সাপ কুলপ্রতীক (totem) সুতরাং এই ব্যাখ্য সর্বাতিশয়ী হয়ে ধরা পড়ে।

উপন্যাসের শেষ দিকে একের পর এক সর্পঘাতে মৃত্যু ঘটেছে। প্রতেকটি মৃত্যুকেই অনিশ্চিত অসহায় ভয়ের সঙ্গে দেখেছে হাঁসুলীবাঁকের মানুষ। করালী এই ভাবজগতের বাইরে—সে mythology-র প্রভাব এড়িয়েছে। ফলে সাপ তার কাছে শুধুই সাপ। কদিন আগেই দেখেছে 'এমনি একটা চন্দ্রবোড়া' তার সাহেবের গুলিতে মরেছে। তার সাফ কথা, মাথলার ছেলেটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পরামর্শ ছিল—'এবার যদি এমন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো মিলিটারী হাসপাতালে। সাপের বিষের ইনজেকশন আছে।' (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী এই পরামর্শে বিরক্ত হয়। সাপ আর নিয়তি তার কাছে

একাকার—কপালের লিখন না থাকলে সাপে কামড়ায় না। বস্তুত করালী আর বনওয়ারী একই সময়ে বাস করে—মোটামুটি একই ভূগোলে চলা ফেরা করে, কিন্তু তাদের বিশ্বাসের কালচিহ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাপ বনওয়ারী আর কাহার সমাজের চোখে পবিত্র। 'মা বসুমাতাকে অয়েছেন মাথায় করে'—তেমন মহাসর্প সুচাঁদের উপকথার শিক্ষা। আর আছে নীতিবোধ—'লাগে লরে' অর্থাৎ নাগে-নরে একত্রে বাস করা সম্ভবপর নয়।' যে এলাকায় তারা বাস করে সেখানে আদাড়ে, পাঁদাড়ে, ঘরে, মাঠে—সর্বত্রই সাপ। সাপ কোথায় নাই? দেখা হলে ওরা হাতাতালি দেয়, বলে—'চ'লে যা, চ'লে যা।'—প্রণাম করে। তাছাড়া সাপের উপর অত্যাচার না করলে তারা কিছু বলে না। 'সূয্যিকে সাক্ষী এখে' ওরা ছোবল দেয় অত্যাচারিত হলেই। ঠিক যেমন মনসাকথায় আছে! [৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

কাহার পরম্পরায় আছে সাপসংক্রান্ত বিচিত্র আখ্যান। 'নয়ানের মা ঘাস কাটতে গিয়ে ঘাসের সঙ্গে একটা কালো সাপের বাচ্চার মুণ্ডু কেটে নিয়েছে'—একদিন। কেটে ঝুড়িতে ফেলার পরও সাপের ধড় 'এঁকে বেঁকে আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছিল।' কিংবা তাদের পুরোনো দিনের কাহিনী—পরমের বাবার ধৈর্যের কথা। রাত্রে ঝড় বন্যার মধ্যে তার বিছানায় একটা মাঝারি খরিস কেমন করে ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে চলে গেল সেই কথা। সাপ শত্রু আবার বন্ধুও।—'মানুষের উপকার করেন ইঁদুর ধরে। বাস্তু হয়ে কল্যাণ করেন ভিটেয়।' (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এই পরম্পরিত সম্পর্কের ভাঙন শুরু হয়েছে করালীর মাধ্যমে। সে-ই দেবতার মায়াবী যবনিকা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। 'নিরাকরণ' করেছে। তার আগুনে ঝলসে গেছে চন্দ্রবোড়া সাপটি।

ম্যালিনোস্কি লিখেছিলেন আদিম মানুষ সম্পূর্ণই অযৌক্তিক ব্যবহার করে না। জাদু শক্তির উপর ভরসা করে ঠিকই আবার চাষও করে। অর্থাৎ তার মনে বিজ্ঞানের আকাঙক্ষা যুক্তির অভিলাষ, সক্রিয় সাবধানতা সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয় না। এই জন্যই বনওয়ারী সাপের ভয় নিবারণের জন্য কেরসিন তেল প্রার্থনা করে ঘোষ কর্তাদের কাছে। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। খোঁজ করে মিহিজামের সর্পবিষ নিবারক হোমিওপ্যাথিক ওষুধ—ব্যর্থ হয়ে ফিরেই আসে। বলে নিই অধুনা ঝাড়খণ্ডের দুমকা জেলার মিহিজামে বিদ্যাসাগর মহাশয় হোমিওপ্যাথি চর্চা করতেন—শেষ পর্যন্ত সেই ছিল তাঁর ঠিকানা। তাঁর বংশধর পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক। তিনি সাপের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছিলেন। হাঁসুলীবাঁকের বনওয়ারী সেই ওষুধ পেতে চেয়েছিল পায় নি। প্রান্তিক মানুষ, এ সময় কত্তাবাবা ছাড়া আর কার কাছেই বা ভরসা করবে? সুতরাং তাকে ব্যবহার করতে হয় হাঁসুলীবাঁকের এক একটি পরম্পরাবাহিত তুক।

মাথলার ছেলেকে দংশেছে 'নিস্কেলে' অর্থাৎ 'ঘোর কৃষ্ণ' রঙের একটি সাপ ; খবর এনেছে রতনের ছোট ছেলে টেবা। 'মোটা কাঁকুড়ির মতো চেহারা। মাথলা রতনের ছেলে। ছেলেটি তার নাতি। কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল। হাতে কামড়েছে সেই কালকেউটে। প্রথমদিকে টেবার ভাইপো সাপটিকে ছাড়ে নি। টেনে বার করেছে। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীর কাছে যে খবরটা নিয়ে আসে তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ('মেরে তাড়িয়ে' দেওয়া) হল নিয়ম। সেটি করা যায় নি। এরকম করলে নাকি খবর দিতে আসা লোকটি যদি ছুটে পালায় তবে 'রোগীর বিষও ঘরে নামতে আরম্ভ করে।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) একাজটি করে নি বনওয়ারী, তবে অন্য তুকটি ঠিকই আছে। 'কাছাটা' তার 'ঠিকই আছে। খুলে গেলে শিকড়ের ওষুধ 'কাজ' করত না। এত 'ওস্তাদি তুক' দিয়েও—না, কিছুই করা গেল না। 'বাবাঠাকুরের রোষ'—'সেই বাহনের দাঁতের দংশন।'

এর আগেই রাত্রে সাপের কামড়ে মরেছে নিমতেলে পানুর ছেলে। তখন মধ্যরাত। ঝড় বাদল উথাল পাথাল করছে চারপাশে। টানা অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে বাসিনী বউ। কাহারপাড়া ধ্বংস হোক, 'নি-মনিষ্যি কাহারপাড়ায়' একা সে নেচে বেড়াবে। 'জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে' সমস্ত কাহার পাড়া দেখেছিল কর্তার আশ্রিত বৃক্ষটি কাত হয়ে গিয়েছে! খবরটা দিয়েছিল করালীই। সেই ভয়াবহ রাত্রিতে ঘরভাঙা নয়ানের ঘরই পড়ে যায়। পানুর ছেলেটা মারা গেল চন্দ্রবোড়ার চাপেই সম্ভবত। 'স্বভাব মন্থর গতিতে' চলেছিল সেটি। আর পানার ছেলে মারা গেল কিছু পরেই—'ঠিক যেমন ভাবে মরেছিল করালীর কুকুরটা'। তেমনি 'চোখ ফেটে রক্ত' পড়েছিল, 'শরীরে চাকা চাকা রক্তমুখী দাগ' দেখা দিয়েছিল, নাক মুখ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়েছিল। (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কেন এমন হল? কুকুরের উচ্ছিষ্ট পাঁঠাটা পানুর ছিল—কিন্তু জ্ঞানত সে সেই পাঁঠা কত্তার থানে বলি হিসাবে পাঠায় নি। অথচ তার উপরই পড়ল কোপ। বৎসর ঘুরে যাবার পরও? ম্যাকস গ্লুকমান দক্ষিণ আফ্রিকার আদিম জনজাতিদের পুরাকথা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি সূত্র দিয়েছেন—অনিয়মই এখানে নিয়ম। কাহারদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি ঘটে থাকবে। দেখিয়েছেন গ্লুকমান, জুলু বা সোঙ্গা জনজাতির মধ্যে ঔপনিবেশিক প্রভাব পড়েছে, বদল ঘটেছে যথেষ্ট, অথচ তারা নিজেরা তেমন 'পরিবর্তনমুখী আন্দোলন' করেনি—ফল, তাদের জীবনের পরিবর্তনগুলি আকস্মিকের সমাপতন হয়ে এসেছে তাদের মিথ (myth) ভাবনায়। [পশ্য: শঙ্কর বসু মল্লিক ও গৌরী ভট্টাচার্য : *পুরাকথার স্বরূপ* ; বেস্ট বুকস ; কলকাতা ; ১৯৯৩ ; ১৫১ পৃ.]

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা পুরাণ নয়। উপন্যাস। তাই তারাশঙ্কর এখানে সাপ-সংক্রান্ত বিপতীপ ভাষ্যই একত্র করেছেন। করালী-বনওয়ারী বাসিনীবৌ-সুচাঁদ চারজন সাপ দেখেছে চার ভাবে।
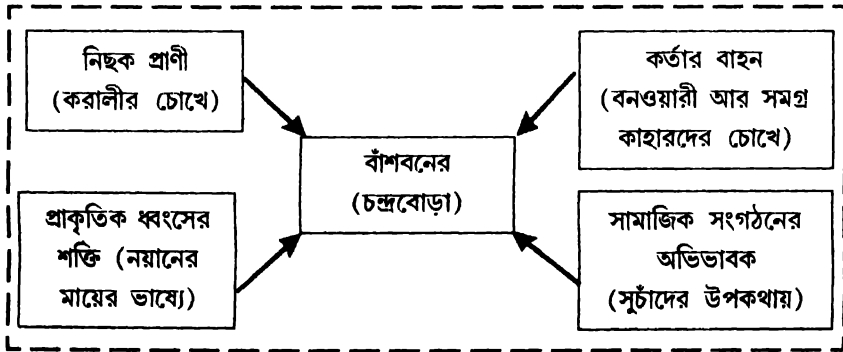
তবে করালী ছাড়া বাকি তিনটি ভাষ্যই অল্প বিস্তর একই ভাবনার ফলাফল হয়ে দেখা দেয়। সাপটি ধীরে ধীরে কাহার সমাজের ভালো মন্দের সঙ্গে মিশে যায়—তার মৃত্যু রচনা করে একটি শ্রমজীবী আদিম কর্ষণজীবী সমাজের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ভূমিকা।

১২

কাহার সমাজের নিয়তি : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯—১৯৪৫) পৃথিবীকে দিয়েছে প্রবল এক অভিঘাত। পৃথিবী বদলে গেছে। সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলো আর ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকে নি—স্বাধীন হয়েছে। ইউরোপ আর বিশ্বব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি, বিশেষত পশ্চিম-ইউরোপ আর একমাত্র নিয়ন্তা থাকে নি ; নতুন শক্তি হিসাবে পূর্ব-ইউরোপ উত্তর-এশিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ডে রুশী সোভিয়েতগুলি আত্মপ্রকাশ করেছে। আর সব চেয়ে বড় কথা, যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়েও বিশ্বব্যবস্থার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই প্রবল অভিঘাত বাংলার প্রান্তিক একটি ছোট অঞ্চলের মানুষগুলিকে চিরকালের জন্য উৎসন্ন করে দিল। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় সেই ঘটনাপ্রবাহের বেশ চমৎকার ভাষ্য রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়ার কথা ছিল না। কাহার সমাজ একটি বদ্ধ প্রতিবেশে বসবাস করে। তারা স্বেচ্ছা-নির্বাসিত থাকতে চায়। চন্দনপুরের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ থাকলেও সেখানে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে ছিল প্রবল আপত্তি। আর ছিল বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে উপেক্ষা। তাদের কিছুই হবে না এরকম ভাবনায় বনওয়ারী ছিল সম্পূর্ণ দৃঢ়চিত্ত—অবিচল। কেন এরকম কমঠবৃত্তি? খুব স্পষ্ট হয় না—দুর্জ্ঞেয় মনস্তত্ত্ব। তবে তারও কিছু কারণ ভাবা সম্ভব।

(১) কৃষিজীবী কাহাররা জানে মাঠের ফসল ফললেই তাদের জীবন সুনিশ্চিত থাকবে। জাঙলের সদগোপদের মঙ্গল হোক, 'তাদের লক্ষ্মীর বাড়বাড়ন্ত' হোক, কাহাররা 'তাদের মা-লক্ষ্মীর 'পাঁজের' অর্থাৎ পদচিহ্নের ধুলো কুড়িয়ে' নিতে পারলেই হবে। তাতেই কাহাররা সুখে থাকবে। সেজন্য কাহাররা যুদ্ধ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে না।'যুদ্ধে কাহারদের কিছু যায় আসে না।' [২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

(২) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি আছে বনওয়ারীর। 'তেরশ বিশ একুশ সাল'-এ আরম্ভ হয়ে বেশ কিছুদিন ছিল সেই যুদ্ধ। সমাজের অন্যান্য বর্গের পরিবর্তন হয়েছিল তখন। চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা কয়লার কারবারে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল ; মাইতো ঘোষ পাট কয়লা বিক্রি করে অনেক মূলধন বাড়িয়েছিল। জাঙলের চৌধুরীবাবুরা উৎসন্নে গেল এই সময়। বিশেষত সদগোপরা চাষি থেকে বাবুতে পরিণত হল।—বনওয়ারী জানে। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের আগে কাহাররা যেমন ছিল পরেও পরেও প্রায় তেমনি থেকে গেল।

(৩) বনওয়ারী প্রথমদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকেও তেমনি সাময়িক সমস্যা বলেই ভেবেছিল। এমন তো অনেকই হয়েছে। বর্গির হাঙ্গামা হয়েছে—লোকে ভয়ে 'পোড়া মালসা মাথায় দিয়ে জলে গলা ডুবিয়ে' বসে থাকত। হয়েছিল সাঁওতাল হাঙ্গামা'। সিঁদুরে মুখ রাঙিয়ে—'কালো যমের মত' বিদ্রোহী 'সাঁওতালরা বাধিয়েছিল প্রবল গণ্ডগোল। বস্তুত বিশ্বযুদ্ধকে কাহাররা এরকমই একটি সাময়িক সংকট বলে ভেবেছিল। যে তরঙ্গ তাদের স্থায়ী কোনো সমস্যা তৈরি করবে না। (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) যুদ্ধের কথা শুনে তাদের বরং মনে পড়ে 'রাম-রাবণের যুদ্ধের পাঁচালী'-র কথা। কাল যতই এগিয়ে যাক—হাঁসুলীবাঁক ছিল 'সেকালে'। 'সেই রাম-রাবণের যুদ্ধের কালে।' (ঐ) অর্থাৎ নতুনকে দেখার দৃষ্টিকোণ কাহাররা আয়ত্ত করতে পারে নি।

৪. রেলপথ যখন বসল তখন কাহাররা একরকম দূর থেকেই দেখেছিল সেই ঘটনা। তাদের 'অন্ন ঘুচলে'ও সেই ঘটনা কিছুটা দূরে থেকে দেখা ছাড়া বিশেষ উপায় ছিল না তাদের, দরকারও ছিল না। তাদের তখন পেশা পরিবর্তিত ; পালকি বহন অপেক্ষা কৃষিকর্ম-গোসেবা-গোচারণ প্রভৃতির দিকে তাদের মনোযোগ বেড়েছে। তাই রেল যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটাল তাতে নজর পড়ল না। তারা কেবল স্মৃতি-ধার্য ঘেঁটুগান তৈরি করেই কিঞ্চিৎ ভুলে থাকল। বিশ্বযুদ্ধের টানে রেল লাইন 'ডবল' হল যখন, তখন কাহাররা যুদ্ধের প্রভাবটি বুঝল। কারখানাও ভীমের পুত্র ঘটোৎকরের মতো দ্রুত বিবর্ধমান হল। যে কারখানাকে অলক্ষ্মীর পুরী ভেবেছিল তারা—তাকে আর রোখা গেল না। যুদ্ধই ঘটাল এসব। 'যুদ্ধের ঢেউ এমন ভাবে কখনও বোধহয় হাঁসুলীবাঁকে আছাড় খেয়ে পড়ে নাই!' (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) যুদ্ধের অভিঘাত যে এমন প্রবল হবে কাহাররা বোঝে নি। এই অপ্রস্তুতি তাদের যুদ্ধ থেকে দূরে রেখেছে—শুধু তাই নয়, যে জীবন ছিল তাদের তা ছিল বৃক্ষপ্রতিম। শস্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকা তাদের জীবিকা—শস্যের মতোই মাটিতে মূল প্রবিষ্ট ছিল তাদের। ছিল না সামাজিক সচলতা—social mobility.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেন এমন প্রবল অভিঘাত হানল? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত ছিল অর্থনৈতিক। মূলত বাজার দর বেড়েছিল তখন—বনওয়ারীর তেমনি মনে পড়ে। কাপড় হয়েছিল 'ছটাকা জোড়া'। 'ধানের দর হয়েছিল চারটাকা।' (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) অন্যপক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ছিলনা। আর্থিক দিকটি, বিশেষত বাজারদরের প্রসঙ্গ উপন্যাসের পৃষ্ঠায় সবিস্তারে লিখেছেন তারাশঙ্কর। প্রথমে সেই বিষয়গুলির কথা লিখি।

ক. 'আঠারো আনা' ছিল ধানের দর হয়েছে 'পাঁচ টাকা'। বেড়েছে সাড়ে চার গুণ প্রায়! (৫ম, পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কিছু পরেই জানা গেল 'যুদ্ধের গতিকে দুমাসের মধ্যে ধান পাঁচ টাকা থেকে দশ বারোতে উঠেছে।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) বৃদ্ধি আড়াই গুণ প্রায়। 'চারটাকা সাড়ে চার টাকার উপরে ধানের দর' ভূভারতেই ছিল অভাবিত পূর্ব। তাই হল। (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) উপন্যাসের শেষ দিকে দেখছি ধানের মণ হয়েছে 'চল্লিশ টাকা'। (শেষ পর্ব) আঠারো আনার তুলনায় এই বৃদ্ধি ৩৫.৫৫ গুণ! ভূভারতেই ছিল অভাবিতপূর্ব। তাই হল। [৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

খ. 'চালের দর'ও বেড়েছে প্রচুর—'ষোলটাকা' মণ। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) পরেও একই কথা, বিস্ময়ের সংবাদ চালের মণ ষোল টাকা ! (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) শেষ পর্বে চালের মণ হয়েছে 'চব্বিশ টাকা'।

গ. অন্যান্য জিনিসের দামও বেড়েছে ভয়ঙ্কর। খড় (ছিল 'চল্লিশ টাকা কাহন' হয়েছে 'একশো দুশো টাকা'!—অর্থাৎ আড়াই গুণ থেকে পাঁচ গুণ বেশি) ; বাঁশ (ছিল টাকায় আটটা এখন হয়েছে টাকায় দুটি করে!) ; ছাগল (দুটাকা থেকে দশটাকা হয়েছে ; গাই দশটাকা থেকে হয়েছে তিরিশ টাকা) ; বলদ (পঁচিশ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে একশ টাকা)।

ঘ. অন্য জিনিসের দাম যখন অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন কিন্তু হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের নগদ দিন-মজুরি তেমন বাড়ে নি। ছিল পাঁচ সিকে (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ), হয়েছে দেড় টাকা (শেষ পর্ব) এ হল চন্দনপুরের মজুরি। হাঁসুলীবাঁকের কাহাররা যদি সেখানে যায় তবেই পাবে এই মজুরি। কিন্তু সদগোপ প্রভুদের অধীন

কাহাররা তো তাও পায় না। তাদের সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী অন্যায় অমানবিক শোষণ ব্যবস্থার মৌরসি পাট্টা।

তবু বলব, এই আর্থিক পরিবর্তনের চেয়ে আরো কিছু অভাবিতপূর্ব ঘটনার ধাক্কা এসে লাগল হাঁসুলীবাঁকে। সেই ঘটনাগুলিও বৃহত্তর অর্থে আর্থিকই। যুদ্ধের অর্থনীতির ব্যাপক আলোড়ন বিলোড়ন তা। তার ভয়ঙ্কর পেষণযন্ত্রে ধ্বংস হয় সমস্ত বৈচিত্র্য—সব একাকার হয়ে যায়।

বিশ্বযুদ্ধ এবার এতটা প্রবল অভিঘাত নিয়ে আসার কারণ পূর্বরণাঙ্গন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এশিয়া মহাদেশে এমন ছড়িয়ে পড়ে নি। জাপানের অর্থনৈতিক শক্তির বিস্ময়কর উত্থান আর সামরিক শক্তির পারঙ্গমতা—পূর্ব এশিয়ার নানা স্থানে শক্তি প্রদর্শনের আকাঙক্ষা, জাপানের অক্ষ-শক্তিতে যোগ দেওয়া এই যুদ্ধের গতি বদলে দিয়েছিল। জাপান কর্তৃক ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ প্রশান্ত মহাসাগরের পার্ল হারবার আক্রমণের মধ্য দিয়ে পূর্ব এশিয়ায় এই যুদ্ধের সূচনা। জাপান চেয়েছিল এশীয় রণাঙ্গনে আমেরিকা আর ব্রিটেনের বাহিনীকে সম্ভব মতো ব্যস্ত রাখতে, এর ফলে ইউরোপে জার্মান ও ইতালীয় বাহিনীর সুবিধা হবে। পার্ল হারবারের পতনে মার্কিন সৈন্যবাহিনী প্রথম প্রত্যক্ষ পরাজয় বরণ করল। এরপর ৮.১২.১৯৪১ থেকে ১৫.২.১৯৪২—মাত্র তিনমাসের যুদ্ধে জাপান বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করল মালয় উপদ্বীপে। ব্রিটিশ বাহিনী পরাজিত হল। ৮. ২. ১৯৪২ সিঙ্গাপুর আক্রমণ করল জাপানিরা, ১৫. ২. ১৯৪২ তারিখে সিঙ্গাপুর দখল করল তারা। জাপানের আক্রমণে ব্রহ্মদেশও রক্ষা পেল না। ১৯৪৩ সালের মে মাসে ব্রিটিশ বাহিনী (৭৭ তম ভারতীয় ব্রিগেড) সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হল। ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবল উন্মাদনা তৈরি হল। দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল গুজব। জাপান যে যুদ্ধে ব্রিটিশদের হারিয়ে দিচ্ছে এই ভাবনা ছড়িয়ে পড়তে তৈরি হল স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিগুলির বিপুল উদ্দীপনা। এ অবস্থায় দুটি ঘটনা বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনকে কতকটা যুক্ত বা বিযুক্ত করল।

১. ১৯৪১ সালের ২২ জুন ভোর চারটেয় রাশিয়া আক্রমণ করল জার্মান বাহিনী। ফলে রাতারাতি যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে গেল। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা সাম্যবাদীরা একবাক্যে জার্মান ও ইতালীয় শক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধকে সমর্থন করতে শুরু করল। এর আগে এ-যুদ্ধ ছিল সাম্যবাদীদের চোখে সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষার লড়াই। তখন স্তালিন-হিটলারের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি ছিল! ১৯৪১-এর ২২ জুনের পর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হয়ে গেল 'জন যুদ্ধ'। বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র লিখল : 'আজ সোশ্যালিজম ও সোভিয়েট দেশ এক; সেখানে দেশ রক্ষা মানে নভেম্বর বিপ্লবের লাভ ও গৌরবকে রক্ষা করা; তাই দেশভক্তিই সেখানে আজ শ্রেষ্ঠ বলশোভিজম এবং বলশেভিকরাই শ্রেষ্ঠ দেশভক্ত।' (৪ নভেম্বর ১৯৪২ ; 'জনযুদ্ধ') এরকম বিচিত্র কথাবার্তার মারফৎ তারা সাময়িকভাবে বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সমর্থন করতে শুরু করে—ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ জাকিয়ে তোলে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসও ব্রিটিশ সরকারকে সৈনিক দিয়ে সাহায্য করতে চায়। পূর্ব রণাঙ্গনে যে ৭৭ নং ভারতীয় ব্রিগেড যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তার ভূমিকা ছিল কমিউনিস্টদের 'জনযুদ্ধ'-সংক্রান্ত প্রচার আর কংগ্রেসের কার্যকলাপের মধ্যে। এ-বিষয়টি এই বইতে বিস্তৃত করার হেতু দেখিনা। আমরা কেবল যেটুকু না বললে নয় লিখলাম।

২. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের সীমা অতিক্রম করে ভারতে প্রথম

স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী। শুধু তাই নয়, সুভাষচন্দ্র আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও সাময়িক পদার্পণ করেন, দ্বীপ দুটির নাম দেন 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপ। 'ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ' রুশ প্রকাশিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসে সামান্য হলেও উল্লেখিত হয়েছে। (পশ্য: ভক্তির মাৎসুলেনকো : *দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*; প্রগতি প্রকাশন; মস্কো; ১৯৮৭ সংস্করণ ; মূল রুশ থেকে বঙ্গানুবাদ ; ২২৬ পৃ.) ভারতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সমস্ত তথ্যই লুকিয়ে ফেলেছিল ব্রিটিশরা—ফলে বাংলার কমিউনিস্টরা পূর্ব রণাঙ্গনে ব্রিটিশদের সাহায্য করেছে বিপুল উদ্যমে, সামান্য জনসমর্থনও পেয়েছে কোথাও কোথাও।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ যে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর তা অনেকেই জানতে পারে নি। তার বহুবিধ কারণ ছিল—এই বইতে সে-বিষয়ে আলোচনার অবসর নেই। যুদ্ধ যখন চলছে তখন কলকাতায় জাপানি বোমারু বিমানের হামলা হয়। তারপর শহরে নিষ্প্রদীপ (Black out) করা, ভূগর্ভে বাঙ্কার তৈরির উদ্যোগ প্রভৃতি শুরু হয়—কলকাতায় ব্যাপক সংখ্যক ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যরা উপস্থিত হয়, জন সুরক্ষার ব্যবস্থা, সেবাকার্য প্রভৃতির উদ্যোগ নেওয়া হতে থাকে৷ জাপান যদি মালয়-সিঙ্গাপুর-নিউগিনি ইন্দোনেশিয়া (তখন বলা হত 'নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজ')-র মতো, সর্বোপরি ব্রহ্মদেশের মতো ভারতে ঢুকে পড়ে তাহলে কী হবে? ব্রিটিশরা এই সময় তাদের defence mechanism-এর কারণেই কাটোয়া অহমদপুরের রেল পথটিকে জোড়া (double) করা, পাশে একটি বড় রাজপথ তৈরি করা—বর্তমান ঝাড়খণ্ড অবধি চলে যাবার একটি গোপন ব্যবস্থা তৈরি করে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় এই উদ্যোগের ইতিবৃত্তটি ইঙ্গিতে সেরে—এর ফলাফলটুকু সবিস্তারে উপহার দেওয়া হয়েছে। খুব স্বাভাবিক, ইতিহাস তিনি লিখবেন না। তারাশঙ্কর দেখাবেন ইতিহাসের প্রথম অভিঘাতটি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কাহারদের জীবনে আনল এমন কিছু ব্যাপার, যা তারা কখনো ভাবে নি। যেমন :

(১) **বিচিত্র উপকরণের দাম বৃদ্ধি। চাহিদা তৈরি** : 'মসনের তেল'-এর দরকার হবে যুদ্ধে, 'ওর দরটা খুব বেশি চড়াবে'। সংবাদপত্রের মারফৎ একথা জেনেছে সদ্‌গোপ মহাশয়রা। বনওয়ারীরা চমকে উঠেছে। 'ধান-চাল -কলাই-পাকড়, গুড়-আলু, এসবের চেয়ে দর বাড়বে মসনের। 'প্যাটের' খাদ্য নয়, গায়ে মাখবার 'ত্যাল' নয়, পরবার কাপড়ের তুলো নয়'—অথচ এই রকম একটি আপাত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এমন দর বৃদ্ধির সম্ভাবনা, চাহিদা বৃদ্ধি—কাহারদের জানা ছিল না। (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এইভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বদ্ধ অন্য-নিরপেক্ষ হাঁসুলীবাঁকের কৃষি সমাজে এল অভাবিতপূর্ব তরঙ্গ।

ধানের দাম বেড়েছে—তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে খড়ের দাম। বনওয়ারী স্বীকার করেছে—'যুদ্ধ! কাল যুদ্ধ রে!' [৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

(২) ***গোরু সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধের সমাপ্তি। যুগান্তরের লক্ষণ*** : যুদ্ধ এসে পড়ায় কাহারদের চিরকালের বহু মূল্যবোধ গেছে ভেঙে। তারা গোপালন করে। কিন্তু গোরু তারা কসাইদের বিক্রি করে না কখনো। গো সম্পদ রক্ষা করার এই মনস্তত্ত্ব হিন্দু ভাবাদর্শ বলেই মনে হয়। উপন্যাসের শেষে যখন দেখি গোরু বিক্রি হচ্ছে দশের জায়গায় তিরিশ টাকায় আর বলদ বিক্রি হচ্ছে 'পঁচিশ টাকার বদলে একশো টাকা'য় আর তাও 'দুধের দাম নয়, হেলের শক্তির

দাম নয়, মাংসের দাম' তখন বুঝি যুদ্ধ, সৈন্যবাহিনীর কিচেন-ক্যান্টিনের টানে বাংলার চিরকালের গ্রাম-সংস্কৃতি কেমন করে ভেঙে পড়ল। বনওয়ারীও বোঝে—'যুদ্ধ কাহারদের গোসেবা, দুধ বিক্রি ভুলিয়ে দিলে, ও ব্যবসাটাই ঘুচিয়ে দিলে।' [শেষ পর্ব]

(৩) **রেশন ব্যবস্থা—গণবিতরণ ব্যবস্থা আর সেই অনুষঙ্গে চিরাচরিত প্রভুদের অধিকার, দুর্নীতির সুযোগ তৈরি** : বিশ্বযুদ্ধ গ্রামীণ উৎপাদনব্যবস্থা, রাজার অর্থনীতি, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য উৎপাদন সামগ্রীর উপর আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল। ফলে কেরসিন তেল, চিনি, কাপড় প্রভৃতি বহু বিচিত্র বস্তু রেশন ব্যবস্থার আওতায় এল। ব্রিটিশ শাসকরা এই নীতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের সৈন্যদের গ্যারিসনে সাপ্লাই ঠিক রাখার চেষ্টাই করেছে; আর তার সঙ্গে যুক্ত করেছে গ্রাম শহরের প্রভাবশালী বিত্তবান্‌দের। কাহারদের প্রভু সদ্‌গোপদের বড় ঘোষ হয়েছেন জাঙলের রেশনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। চন্দনপুরে গড়ে তোলা ইউনিয়ান বোর্ডের সদস্যও হয়েছেন তিনি। এর ফলে কাহাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে পড়েছে। ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক—'কুনিয়ান', মিহিজামের হোমিওপ্যাথিক ওষুধ—যাতে সর্পভয় দূর হয়, বিষ নিবারণ হয়, কেরসিন, চিনি কিছুই পায় নি কাহাররা। এ ব্যবস্থা দূর করা—নীতিসম্মত ব্যবস্থার দাবি করা বনওয়ারীর পক্ষে সম্ভব হয় নি। একাজ করেছে করালী। এমনকি বনওয়ারীর রেশন কার্ডটিও শাশুড়ী বসনের মাধ্যমে পাঠিয়েছে করালী। এমন যে করা যায়—বনওয়ারীর ছিল কল্পনার অতীত। করালী যেহেতু যুদ্ধের কাজে নাম লিখিয়েছে, তাই সে তেল, চিনি, আটা, ঘি, কাপড়—'পায় জলের দামে'। [৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

(৪) **ব্ল্যাক মারকেট—কালো বাজার** : কাহাররা এরকম বিচিত্র ব্যবস্থার কথা কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি। 'যুদ্ধের জন্য কেরসিন তেল' অমিল। ট্যাক্সের অনুপাতে নির্দিষ্ট হয়েছে কেরসিন তেল। কাহাররা ট্যাক্স দেয় বেগার শ্রম দিয়ে—ট্যাক্সের পরিমাণও তাদের বেশি নয়। সাধারণ সেবামূলক ব্যাপার (service) তাদের জন্য নেই—রাস্তাঘাট নিয়ন্ত্রণ করে ইউনিয়ন বোর্ড (করালীর ভাষায় 'নিউনাইন বোর্ড')। আর কেরসিন তেল যা পায় তা সবই নেয় জাঙলের বাবুরা। খোলাবাজারে কেরসিন মেলে তবে দাম দিতে হয় 'পাঁচগুণ'। এই অদ্ভুত ব্যবস্থা 'চোরাই বিক্রি'—'বেলাক মারকাটি' করালী জানায়। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এই বাজার অর্থনীতির দুধারী তরোয়াল হাঁসুলীবাঁকের নগদ পয়সায় কিছু কিনবার ক্ষমতাহীন মানুষগুলোকে উৎসন্ন করছে। বাবাঠাকুরের বাহনের রোষের হাত থেকে বাঁচতে সামান্য কেরসিন, একটু সাবু-চিনি, কুনিয়ান—কিছু না হলে তো চলে না! কিন্তু বনওয়ারী ঘোষকর্তার কাছ থেকে ফিরে আসে সামান্য কিছু স্তোকবাক্য শুনে। 'ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়তে তেল পাচ্ছে না।' সুতরাং!

বাবাঠাকুরের বিল্ববৃক্ষটি পড়ে যাবার পর—ঠেলে তোলার শপথ নেয় বনওয়ারী। এর সঙ্গে সঙ্গে কর্তার আশ্রিত গাছের ভিতটি মেরামত করার জন্য কালোবাজারের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। —'বিলাতী মাটির জন্যে চৌদ্দভুবন' দেখতে হল। 'বিলাতী মাটি 'কন্টোল' হয়েছে।' শেষ পর্যন্ত তিনগুণ দাম দিয়ে যোগাড় হয়েছে দুবস্তা মাটি। [৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

(৫) **অভিনব সংযোগ ব্যবস্থা** : করালী চন্দনপুরে শোনা গল্প শুনিয়ে উপস্থিত সকলকে মোহিত করছে। গোপালীকে শ্মশানে দাহ করে ফেরার পরে এই দৃশ্য দেখে বনওয়ারী খুব রেগে যায়। তার ক্রোধের কারণ সুবাসী 'সান কেড়ে' 'অর্থাৎ ঘোমটা দিয়ে' বসে তার কথা

শুনছে। 'বিনা কারণে' ঘোমটা দেয়া তার—'একদৃষ্টে চেয়ে আছে করালীর দিকে'। করালী তরুণ তরুণীদের কাছে আকর্ষণীয় বই কি। আসলে তার ক্ষমতার উৎস তথ্য। চন্দনপুরে আসা অজস্র সংবাদ তার জানা। তথ্যের এই ক্ষমতাই করালীকে শক্তি যুগিয়েছে। এর আগে সে কালরুদ্রের শিমূল গাছের উপর উঠে গ্রামকে ঝড়ের পূর্বানুমান জানিয়ে সাবধান করে দেয়, সাইক্লোনের সংবাদও জানিয়ে ফেরে সেই। এসব খবর চন্দনপুরে আসে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে। আজ সে সংবাদের নির্যাস সবাইকে শোনায়।—'সায়েব লোকে যুদ্ধ লাগিয়েছে—ইংরাজ আর জার্মানীতে। কামান বন্দুক বোমা, জার্মানী জিতছে, ইংরেজরা হারছে!' (৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) এই অভিনব তথ্য আদান প্রদান করেই চন্দনপুরে মুখার্জিরা বড়লোক, এর মাধ্যমেই ঘোষ কর্তারা টাকা উপার্জন করতে পারে। এই তথ্য-শক্তি সকলকেই ক্ষমতায়নের দিকে টানে। ছোট জাত বলে দূরে থাকে না কেউ। করালী সম্ভব মতো আযত্ত করেছে তথ্যের শক্তি। এই সংযোগ পদ্ধতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।

(৬) **রেলপথ, উড়োজাহাজ, মোটর পথ—নতুন যোগাযোগ ব্যবস্থা** : রেলের কাজ যুদ্ধের সামিল হল, যুদ্ধের 'কোম্পানী' (করালী তেমনি ভেবেছে—ব্রিটিশ সরকার) রেল-লাইন কিনে নিল। এরজন্যই 'এদিকেও অনেক ব্যাপার হবে।' করালী জেনেছে। 'রেঙুন'-এ বোমা পড়েছে! 'জাপুনি না কারা যেন আসছে!' সুতরাং চন্দনপুরের লাগোয়া অঞ্চলে গড়ে উঠবে 'উড়োজাহাজের আড্ডা', তৈরি হবে মোটর গাড়ির 'আস্তাবল'। (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) তৈরি হবে রাজপথ—দূর ছোটনাগপুরের দিকে। দুমকা হয়ে। চার পাশে প্রচুর উদ্যোগ আয়োজন চলতে থাকে। আসে ঠিকাদারবর্গ—বাঁশবাদির বাঁশ কেটে চালান দেয়। চন্দনপুরের 'ঘাটের খানিকটা তফাতে 'উড়োজাহাজের আস্তানা' তৈরি করে মিলিটারির দল। [৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

(৭) **যুদ্ধ আর পোশাক পরিচ্ছদে পরিবর্তন** : করালী হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজকে চমকে দিয়েছে তার পোশাক পরিচ্ছদে। 'যুদ্ধের চাকরি' নেবার পর সে 'কোট পেন্টুলেন প'রে বেড়াচ্ছে। বলে—যুদ্ধের পোশাক।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এখন আর সে 'দিন মজুর নয়'। 'মাস মাইনে'। পায়ে জুতো। 'ফোস্কা পড়েছে, খুড়িয়ে চলছে, তবু জুতো ছাড়বে না।' (ঐ)। যথারীতি এই অকল্পনীয় ক্ষমতার উৎস যুদ্ধ। তরুণবয়স্ক কাহারদল উত্তেজনা বোধ করবেই।

এর অন্যদিকটি প্রত্যক্ষ করেছে বনওয়ারী। গোপালীবালা মারা গেলে তাকে শেষ বারের মতো একটা নতুন শাড়ি দিতে পারে নি বনওয়ারী। বসনের প্রস্তাব ছিল—করালীকে খবর দিলে ও ব্যবস্থা করলেও করতে পারে। বনওয়ারী সে প্রস্তাব মানে নি। 'কালযুদ্ধ' তাকে মরমে মেরে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাপড়ের জোড়া হয়েছিল পাঁচটাকা সাতটাকা। 'এবারের যুদ্ধে কাপড়ই নাই, মিলছেই না।' সুতীব্র বেদনায় বনওয়ারী বোঝে—এবারের যুদ্ধ কত ভয়ঙ্কর, সুদূরপ্রসারী। 'জাঙলে গিয়ে তাঁতীদের ঘর থেকে গামছা কিনে' আনতে হল। 'গামছা পরেই যাক গোপালী। তাই যাক। কি করবে বনওয়ারী! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না।' [৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

হাতি-ঠেলা ধান হল হাঁসুলীবাঁকের মাঠে। স্বপ্ন ছুঁয়ে যায় বনওয়ারীর মনে। সুবাসী হিসাব করতে বসে কেঁদেই ফেলে। আবদার এবার তাকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিতে হবে। বনওয়ারী স্বীকার করে—'আমি নিচ্চয় কিনে দোব, নিচ্চয় দোব।' কিন্তু সুবাসীর চাহিদা 'উড়োজাহাজ পেড়ে 'অঙিন' কাপড়'—'পাখির মতন'। করালী এরকম শাড়িই দিয়েছে

পাখিকে। বনওয়ারীর নগদ টাকার জোর নেই। চন্দনপুরের দত্ত বাবুর দোকানে যায় বনওয়ারী—দত্ত মহাশয় রাজি। ধানের কারবারের সঙ্গে তার আছে 'কাপড়ের কারবারও'। বাকিটা টাকায় নেবেন না—'নেবেন ধানে, পৌষ মাসে'। কিন্তু এখনকার বাজারদরেই ধান দিতে হবে। বনওয়ারী বোঝে ধানের দর আরও বাড়বে। তা না হলে দত্তবাবু এইরকম শর্ত আরোপ করতেন না। উড়োজাহাজ পেড়ে শাড়ি পরে কি করবে সুবাসী—বনওয়ারীকে বলে সুবাসী 'কাপড়খানা প'ড়ে ফুরুৎ করে উড়ে যাব।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বিশ্বযুদ্ধ কাহারসমাজে কেমন চঞ্চলতা এনেছে তার প্রমাণ এখানে পাচ্ছি। ভাবাদর্শ, মনস্তত্ত্ব, লোক ব্যবহার—সব ক্ষেত্রেই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়েছে।

(৮) **আটপৌরেদের উপর প্রভাবের ফলাফল** : কোশকেঁধেদের সঙ্গে মিলনের প্রস্তাব দিয়েছে রমণ। এছাড়া তার কিই-বা করা সম্ভব ছিল? পরম চিরকালের জন্য পালিয়েছে। কৃষিকর্মে আটপৌরেদের প্রবণতা কোনদিনই ছিল না। আজ তাদের অবস্থা সঙিন। বাধ্য হয়ে কৃষিশ্রমিক হওয়া ছাড়া গতি নেই। কিন্তু জাঙলে সদ্‌গোপদের বাড়িতে কৃষাণি করতে হলে কোশকেঁধেদের সক্ষম নেতৃত্ব বনওয়ারীকে জামিন হতে হবে। তা না হলে তাদের বিশ্বাস করবে না কেউ। 'বিলাতে যুদ্ধ লেগেছে। ধান চালের দর বাড়ছে, নুন তেল কাপড়ের দরে আগুন লেগেছে। অনেক দ্রব্য বাজারেই নাই।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) সুরতাং বাঁচার তাগিদেই আটপৌরেরা বনওয়ারীকে আশ্রয় করেছে। যুদ্ধ, অজস্র ভাঙনের মধ্যে গড়নের এই সংবাদটুকু বহন করে এনেছে।

(৯) **লোক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ উৎসাদন** : বিষয়টি দেখা গেছে ভাঁজো উৎসবের সময়। লোকসংস্কৃতির উৎসব কেবল কৌতুক-উৎসবে পর্যবসিত। বনওয়ারীর ভাঁজো কৃষিলক্ষ্মীর আবাহন—উৎসাহ, উদ্দীপনা initiation. এর বহু বিচিত্র অভিব্যক্তি। এখানে সেই বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছিনা। করালী তার কোঠাবাড়িতে ভাঁজোর নামে যা করল তাতে বোঝা গেল সে সম্পূর্ণই উত্তরাধিকার-বর্জিত, বিবিক্ত চরিত্র। তার ভাঁজো কেবল আনন্দের—'এল কলের গানের রেকর্ডের গান।' আর চন্দনপুরের নষ্ট ভ্রষ্ট মেয়েরা এসে নাচা নাচি করল সেখানে। 'দুজনা লালামুখো সাহেব' এল 'ফটোক' তুলল—'ঠ্যাং ছুঁড়ে ছুঁড়ে' নেচে গেল। (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) করালী এখানে ভূমিচ্যুত লোকসংস্কৃতির বিকৃত রূপটিই উত্থাপন করল।

(১০) **কলকাতা ছেড়ে পলায়মান মানুষ—বাসা বাড়ির ভাড়া বাড়ল চন্দনপুরে** : জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা থেকে দলে দলে লোকজন পালাচ্ছে। মাইতো ঘোষের বাংলা বাড়িতে আসবে তার বন্ধুরা। এমন মানুষে ভরে গেল চন্দনপুর। পাগলের মারফৎ বনওয়ারী শোনে 'জাপানীরা খুব যুদ্ধ চালিয়েছে।' কলকাতায় পড়েছে বোমা। সেখানকার লোকজন 'কুকুর বিড়ালের মত' পালাচ্ছে। চন্দনপুরে 'কুঁড়ের ভাড়া পাঁচ গণ্ডা টাকা।' তাও অমিল। জাঙলের সদ্‌গোপদের বাড়িতেও 'দশ-বারো ঘর কলকাতার লোক' আশ্রয় নিয়েছে। এই পরিস্থিতি যাকে বলে সর্বাতিশায়ী আশ্রয়ের সমস্যা—অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি। কাহাররা এই পরিস্থিতিতে উৎসন্ন না হলে সেটিই হত বিস্ময়ের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতের এইসব প্রবল ধাক্কা থেকে কাহাররা নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। করালীর সঙ্গে নির্ণায়ক যুদ্ধে বনওয়ারী শেষ হয়ে গেল। তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে নসুবালা আর পাগল। সেবায় সখ্যে ভালোবাসায় শ্রদ্ধায়। কিন্তু তখন বনওয়ারী আর শূরবীর মানুষ নয়—কুটোর মত তুচ্ছ লোক। ষাট দিন পরে নিজের উঠোনে বসে আলোর প্রবল ধাক্কায় চমকে ওঠে বনওয়ারী। এত আলো! উপকথার অন্ধকার ঘেরাটোপ—বাঁশবাদির

বাঁশবন যুদ্ধের কাজে লেগেছে। বনওয়ারীকে একের পর এক ঘটনার বিবরণ দিয়েছে নসুবালা। বদলের বিবরণ। বেশির ভাগই যুদ্ধ সম্পর্কিত :

১. রাস্তা হচ্ছে। 'কাটোয়া দুমকা হয়ে চলে যাবে পশ্চিম দেশে।' পাকা সড়ক। রেলপথের পাশে। যারা গড়বে, তাদের জন্য তৈরি হবে অস্থায়ী আস্তানা।

২. বাঁশবন সাফ হয়েছে। বড় বড় গাছও কাটা হচ্ছে। 'আন্নাবান্না' হবে।

৩. বাবার থানকে কেটেকুটে মটরগাড়ির আস্তানা হয়েছে।

এরপর বনওয়ারী বেশিদিন বাঁচে নি। পরিবর্তিত সময় আর কাহারপাড়ায় তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সারা পৃথিবীতেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করলেও হাসুলীবাঁকে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব বেশি পড়ে নি। করালীর মাধ্যমে কিছু কিছু সংবাদ এসেছে, তাতে বোঝা যায় আন্দোলন কত তীব্র হয়েছিল। চন্দনপুরে এসেছে দেশ দেশান্তরের মতোই এই আন্দোলনের ঢেউ। 'অ্যাল লাইন' 'তোলাতুলির পর থেকে বাজার আরও লাফিয়ে চড়ছে।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) জাঙলের ঘোষবাবুরা রেশন দুর্নীতি করছে—করালীর ইচ্ছা স্বদেশী বাবুদের মাধ্যমে তা বন্ধ করতে পারে সে। কাহিনীর একটা সময় হয়েছেও তাই।

যুদ্ধ প্রসারিত হয়েছে দেশ-চেতনায়। চন্দনপুরও আর সব বাবু মহাশয়দের গ্রামে শহরে লেগেছে 'গান্ধী রাজার কাণ্ড কারখানা'। সেই কাণ্ড কারখানা অন্য রকম এক যুদ্ধ অবশ্যই। কাহাররা তার হদিশ জানে না। 'লাইন তুলছে, সরকারী ঘর দোর জ্বালাচ্ছে ; পুলিশ-*মিলিটারিতে গুলি করেছে, গুলিখেয়ে মরছে, তবু ভয়-ডর নাই।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ)* অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। এ হল ১৯৪২-এর ৯ আগস্টের পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

কাহাররা বিশ্বযুদ্ধ আর স্বাধীনতার যুদ্ধে তারতম্য বোঝে না। তাদের আশঙ্কা—যাকিছু অভিনব, আগে হয়নি সবই তাদের বিপক্ষে যাবে। তারা এমনি একটি ভয়ের মনস্তত্ত্বে (fear psychosis)-*এ ভোগে। করালীর মতো ব্যতিক্রম বাদে।* আর তাই তাদের মাতব্বর যুদ্ধ শেষের আগেই দেহ রাখে। যুদ্ধ শেষ হবার পর করালী ফিরে আসে হাঁসুলীবাঁকে। চন্দনপুরের মুকুন্দ ময়রা যুদ্ধ নিয়ে গান বেঁধেছিল।

সায়েব লেগেছে লড়াই
যাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্‌খাগোড়াই—
ও হায়, মরব মোরাই উল্‌খাগোড়াই।

এটুকুই মনে ছিল বনওয়ারীর। ময়রা জানে অনেক—চন্দনপুরে গ্যাজেটে আসা খবর। বনওয়ারীর সে-গানের সবটা মনে ছিল না—যা মনে ছিল, সেই কথাই তুচ্ছতিতুচ্ছ সবহারা মানহারা এই মানব সম্পদের অভিজ্ঞতার নির্যাস হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধ তাদের সম্পূর্ণ *উৎসাদন করে ছাড়ল। করালী নতুন* হাঁসুলীবাঁক গড়ুক—তা কখনোই সুচাঁদ-বনওয়ারীর মুখর জীবনভঙ্গিটি ছুঁয়ে থাকবে না।

১৩

হাঁসুলীবাঁকের প্রকৃতিলগ্ন কাহার সংস্কৃতি

কাহার পল্লির প্রতিবেশ বদলে যাবার পর—পরাজিত মৃত্যুকামনায় বিষণ্ণ অপেক্ষাতুর বনওয়ারীর চোখে এসে লাগে নতুন সময়ের আলোর ধাক্কা। তখন বনওয়ারীর মনে হয় অনেক কিছুই নেই—অনেক শব্দ অর্থে মোড়া জীবন-প্রবাহ, যা তারা রচনা করেছিল। নেই। বনওয়ারী অনুভব করে—'খাঁ খাঁ শুধু চারিপাশের দিক দিগন্তই করছে না। হাঁসুলী বাঁকের বেড়ের মধ্যে হাঁসুলীবাঁকের উপকথার পুরী বাঁশবাদি গ্রাম—সেও যেন খাঁ খাঁ করছে।' এই শূন্যতা কেবল প্রাকৃতিক নয়—'ঘর গুলি রয়েছে কিন্তু কলরব নাই, গরু নাই, বাছুর নাই, ছাগল নাই, ভেড়া নাই, মেয়েরা কলহ করছে না, বাঁধের জলে হাঁস চরছে না, ছেলেরা খেলা করছে না, কি হল? এমন কি কাহারপাড়ার কুকুর গুলোও দেখা যায় না।' (শেষ পর্ব) কাহারদের যে জীবনপ্রবাহ তৈরি হয়েছিল তা শুধুমাত্র মানুষের নয়—সে-জীবনে পশু পাখি আছে, বৃক্ষ লতা আছে। মৃত্তিকালগ্ন এই জীবন—প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক তার।

উপন্যাসের সূচনার দিকে নয়ানের মা একদিন নিমতেলে পানুর উঠোনের নিমগাছটিকে অভিশাপ দিচ্ছিল। সে গাছটি বড়—তাতে এসে বসে কাক, চিল, আর হনুমান সেখান থেকে এসে লাফিয়ে পড়ে ঘরভাঙাদের চালে। তাই বাড়ন্ত গাছটিকে মানুষের মতো ভেবে নিয়ে অভিশাপ। প্রকৃতি জগতের সঙ্গে অনবছিন্ন এক সম্পর্ক তাদের।—'বাঘ-শূয়োর-সাপ-ঝড়-বান—এসব থেকে বাঁচাতে বলে না বনওয়ারী, বনওয়ারীকে তুমি এইসব অন্যায় কারণ থেকে বাঁচিও।'—বনওয়ারী এভাবেই প্রার্থনা করে কত্তাবাবার কাছে। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই প্রার্থনার মধ্যে আছে নিবিড় প্রকৃতিলগ্নতা। পশু বা প্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক—তাকে তারা সহজভাবেই নেয়। প্রকৃতির সঙ্গে রুক্ষ প্রকৃতির মাটির সঙ্গে তাদের বলিষ্ঠ উদ্যম অকর্ষণ যোগ্য জমিকে কেমন করে চাষযোগ্য করে তোলে তার প্রমাণ উপন্যাসে প্রচুর। এক্ষত্রে উপকরণ বা হাতিয়ার (tools) তাদের খুব আধুনিক নয়—রেল কোম্পানিতে কাজ করার সূত্রে করালী বনওয়ারীকে এনে দেয় গাঁইতি, তাতে সামান্য সুবিধা হয়। না থাকলেও যেন তেমন আক্ষেপ ছিল না।

বনওয়ারী পূর্বানুমান 'জল ঝড় প্রচণ্ড একটা হবে লাগছে।' কথা হচ্ছিল গোপালীবালার সঙ্গে। গোপালী বিস্মিত। কিন্তু বনওয়ারী নিঃসন্দেহ। তার বিশ্বাস প্রকৃতি পর্যবেক্ষণসঞ্জাত লব্ধজ্ঞান থেকে প্রাপ্ত। *'পিঁপড়েতে জানতে পারে'—প্রকৃতির বিপর্যয়* সংবাদ। এগিয়ে যায় *সে কত্তার থানের দিকে বেল-শ্যাওড়া গাছের গোড়ায়। পিঁপড়ের বাসা চার পাশে। ডিম* নিয়ে উপরে উঠছে। সুতরাং বনওয়ারী বোঝে—'প্রচন্ড জল ঝড় একটা হবে, তাতে সন্দেহ নাই।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বস্তুত 'বৃষ্টি অনাবৃষ্টির *লক্ষণ*' জানার এই *লোকজ্ঞান* বনওয়ারীর আয়ত্তে। জানে সে পিঁপড়ে উপড়ে উঠছে না নিচে নামছে সেটা দেখাই হল আসল। এই লোকজ্ঞান প্রকৃতি-লগ্ন মানুষের। তার নজরে পড়ল 'সড়ক-ফিঙের ঝাঁক' আর কাকরা পিঁপড়ে খাচ্ছে—'ওদের ভোজ লেগেছে'। সবই নির্দ্বন্দ্ব মধুর নয়। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক সমস্ত প্রকৃতিজগতে প্রসারিত—মানুষ তার মাঝখানে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত।

পোষা পশু গোরুদের সঙ্গে বনওয়ারীর সম্পর্ক তারাশঙ্করের কলমের আঁচড়ে বেশ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়। বাছুর আর দুধের কেড়ে নিয়ে গাই দুইবে বনওয়ারী, অপেক্ষা করছে তারা—যারা দুধ নিয়ে যাবে চন্দনপুরে, সাবি বেনোদা। গাইগুলো চিৎকার করে বাছুরের জন্য, বনওয়ারী কপালে হাত বুলিয়ে বলে : 'হচ্ছে, হচ্ছে। মা সকল, ধয্য ধর একটুকুন।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বলে সামান্য হাসে সে। প্রকৃতির মতোই পোষা প্রাণীগুলির সঙ্গে এক নিবিড় অ-বিরোধ সম্পর্ক রচনা করে জীবনের এক সচ্ছন্দ নির্মাণ। আছে পালিত পাখির ডিম—বনওয়ারী গোপালীকে বলে সেই 'ডিমগুলান' সাবি-বেনোদাদের মারফৎ চন্দনপুরে পাঠাতে। মুনিব-বাড়িতে দেবার দরকার নেই। এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের পশুর সঙ্গে মানুষের বহুমাত্রিক সম্পর্কের বুনট ধরা পড়ে।

কত্তার থানে যাবার সময় বসন্ত সঙ্গে যেতে চায়। বনওয়ারী খুশি। কদিন শরীর ভালো ছিল না। বসন্ত হয়তো তাই সঙ্গে যেতে চায়। যাবার সময় বনওয়ারী 'বলদ দুটি এবং গাই কয়টির কাছে' দাঁড়ায়, 'তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে' আদর করে। 'আটকেলে' বলদটি যার রং সাদা—আটটি কালো দাগের ছিটে শুধু, তাই ওরকম নাম ডানদিকে জোড়া হয়। তাই সেটি 'ডাইনের আটকেলে'। এই বলদটি 'বনওয়ারীর বড় ন্যাওটা'। এর সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিনের—'ঘরেরই বাছুর'। বড় হবার পর এড়েটিকে বলদীকৃত করা হয়েছে। সে তো কৃষির প্রয়োজনে। অন্যথায় পশুটির সঙ্গে বনওয়ারীর সম্পর্ক যথেষ্ট নিবিড়। 'বলদটা তার হাত চেটে মাথা নেড়ে নানা ভঙ্গিতে আনন্দ প্রকাশ করতে থাকে। পালিত পশুদের সঙ্গে এই অপূর্ব ভাব বিনিময়—ভালবাসার আদান প্রদানের মারফৎ 'বনওয়ারী একটু প্রসন্নতার স্পর্শ পেল'। [৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

গো-সম্পদ ভারতীয় সমাজ কাঠামোতে অত্যন্ত প্রাচীন একটি ভাবাদর্শ নির্মাণ করেছে।। ভারতীয় দেব-ভাবনার বহুমাত্রিক প্রসাধন গো-সম্পদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কপিলা গাভী, কামধেনু প্রভৃতির মাধ্যমে পবিত্র গাভী প্রসঙ্গ গোপালক সমাজ আদর্শের পুরাকথা। *Pastoral সমাজের অন্যতম দেবতা কৃষ্ণ। যাদব সমাজের এই কিশোর নেতৃত্ব* সর্পভীতি দূর করেছেন কালীয় দমন করে, বর্ষণক্লিষ্ট প্রাকৃতিক বিরোধ বিপর্যয় অতিক্রম করেছেন গিরি গোবর্ধন ধারণ করে। বনওয়ারী কৃষ্ণেরই অন্য নাম। সেদিক থেকে ধরলে বনওয়ারীর মারফৎ কাহার সমাজের রাখালিয়া উপাদানটি সংহত হয়েছে বলেই মনে হয়। তার প্রার্থনায় ধরা পড়ে চিরাচরিত ভারত চেতনাই। মনে মনে ভাবে সে—'মা ভগবতী, তোমাদের সেবার তো কখনও ত্রুটি করি না মা, তোমার আশীর্বাদে আমার এই পাপটি খণ্ডে দাও।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কালোশশী মারা গেছে। তার মৃত্যুর কারণ হয়তো কর্তার থানে প্রদীপ-ধুপধুনো দিতে যাবার সময় মিলিত হওয়ার অনাচার আর অশুদ্ধ কাপড়ে সন্ধ্যা দেবার অন্যায়। সেই অনাচার অন্যায়ে তো তারও ভূমিকা আছে। তাই প্রার্থনা, পাপবোধ। যাই হোক বনওয়ারীর পাপবোধ তাকে কাহার সমাজের বাস্তবে এনে ফেলে। সেই বাস্তবে আছে গোপালকের মায়াবী রহস্যের আপতন।

চন্দনপুরের বাবুদের কাছ থেকে ফেরার পথে বনওয়ারী 'পলেনের' মাঠে দেখতে পায় রাখাল ছোঁড়ারা গরু ছাগল ভেড়া চরাচ্ছে। নিশ্চিন্ত তারা—গাছতলায় কড়ি খেলছে। আসতে আসতে চোখে পড়ে তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে একটা শেয়াল আলের পাশে মুখ বার করেছে। বনওয়ারী কিছুটা বিরক্ত। নতুন প্রজন্মের কাহার, এরা করালীর আসরে আড্ডা দেয়—'দিন রাত দ্যাশ বিদেশের আজা-উজীরের গল্প' করে। সেসব গল্পে রোমাঞ্চ থাকতে

পারে কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার কণামাত্র নেই। যে শিক্ষা তাদের বৃত্তির পক্ষে জরুরি তা না থাকলে ঐ রোমাঞ্চকর গল্প কাহিনীতে কোন্ উপকার? বনওয়ারী 'কুলকর্মের কথা' থেকে বিচ্ছিন্ন ছোকরাদের হাতে কলমে শিক্ষা দিতে চাইল। ডেকে উঠল—'লিলে—রে—লিলে রে! এই ছোঁকড়ারা!' রাখালরা চকিতে চঞ্চল হয়ে খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শেয়ালটাকে দেখতে পেল—হৈ-হৈ করে ছুটল সবাই। বনওয়ারী এবারও বিরক্ত। কারণ শিয়ালের ধূর্তামির সঙ্গে এভাবে পাল্লা দেওয়া যাবে না। শিয়ালটা ছুটে পালাচ্ছে যখন, তখন বুঝে নিতেই হবে—'আসল শিকারী পিছন দিকে কোথাও আছে নিশ্চয়।' সবাই একদিকে ছুটলে অবসর মতো সেই আসল শিকারী শিয়াল এসে নিয়ে যাবে ভেড়া। এজন্যই তো ওদের বলে 'পণ্ডিত মহাশয়'। সত্যি, নালার ওপার থেকে লাফ দিয়ে সশব্দে এসে পড়ল বনওয়ারী। আর 'নালার কুল-ঝোপ থেকে সড়াৎ করে বেরিয়ে পালাল' ঐ ধূর্ত শিয়াল। ভেড়া ধরতে যাচ্ছিল। 'বনওয়ারী ঠিক হাত পাঁচেক দূরে লাফিয়ে' পড়েছিল। (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এরপর সামান্য হাসি মস্করা, ধূমপানের পর বনওয়ারী ফিরে চলল। এইভাবে রাখালিয়া (Pastoral) বৃত্তিটা ভালো মতো শিখিয়ে দিল বনওয়ারী। প্রকৃতিলগ্ন জীবন জীবিকার বর্ণাঢ্য পরম্পরার একটি অংশ স্পষ্ট হল এইভাবে।

হনুমানদের বিচিত্র ব্যবহার নিয়ে হাঁসুলীবাঁকের লেখক যে গভীর আন্তরিক সংবাদ দিয়েছেন তা নিয়ে এর আগে উপযুক্ত জায়গায় আলোচনা করেছি। হনুমানরা নিজেদের দ্বন্দ্ব সংঘাতে জাঙল-বাঁশবাদির প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। 'গোটা গ্রামের চাল তছনছ হয়ে যায়।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) মাইতো ঘোষের 'বাংলা কুঠি' খানা 'এবার ছাওয়াবার কথা নয়'। হনুমানের 'সন্ন্যেসীর দলে যুদ্ধ লেগে ধমাধম লাফিয়ে ঘরখানার চাল একেবারে তছনছ করে দিয়েছে।' ফলে কাহারদের চাল ছাইতে হয়েছে। এই অবস্থায় বিরক্ত হয়ে মাইতো ঘোষ প্রবল 'আক্রোশে গুলি করতে চেয়েছিলেন।' কিন্তু সে কাজ করতে বাধা এসেছে ঘরে বাইরে। ঘোষ 'বাড়ির লোক' আর 'গ্রামের লোক' আপত্তি জানিয়েছে। কারণ স্বাভাবিক। 'হনুমান রামচন্দ্রের বাহন'। সারা ভারতের এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিক (খুব সম্ভব কাহারদের) নিজস্ব পুরাণ প্রসঙ্গ। তাদের ধারণা দুভাবে ধরা পড়েছে; যেমন : (১) রামচন্দ্র হনুমানদের দিয়ে গেছেন 'গাছের ডাল এবং ঘরের চালের রাজত্ব।' সুরতাং আপত্তি করা যাবে না। শুধু কি তাই, রামচন্দ্র দিয়ে গেছেন 'মানুষের ফসলের একটা ভাগও'। হনুমানদের হত্যা করতে উদ্যত হবার মানেই হল রামচন্দ্রের নীতি ও আধ্যাত্মিক শাসনের বিরুদ্ধতা করা। (২) হনুমানরা হল পবন-নন্দন। 'ওঁদের মারলে পবন ঠাকুর মেঘ আনবেন না'—ফলে অনাবৃষ্টি হতে বাধ্য।

দুটি পুরাণ প্রসঙ্গই রামায়ণ-কথার প্রসারিত রূপ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিতে হনুমানদের 'উনি' বলা হয়েছে—নাম না করে পরোক্ষবচনে সম্বোধনটি সুপ্রচীন টোটেম সংস্কৃতির অঙ্গ হতে পারে। হনুমানের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলে আজও ভারতের নানা প্রান্তে গণশোক প্রকাশ আর অনুষ্ঠান করার ঘটনা আকছার হতে দেখি। এই রীতিই কাহাররা স্মরণ করে থাকবে। বনওয়ারী মাইতো ঘোষকে হাত জোড় করে নিরস্ত করে বলেছে তিন দিনে ঘরখানাকে ছাইয়ে দেবে— গোটা কাহার পাড়ার সবাই। হনুমান যে ক্ষতি করেছে তা পূরণ করবে কাহাররা। কারণ, 'জল না হলে জাঙলের সদ্‌গোপরা তবু বাঁচবেন, ঘরে ধান আছে, টাকা আছে। কিন্তু কাহারদের যে সর্বনাশ।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) প্রকৃতি-লগ্ন কাহাররা পারিপার্শ্বিকের সমস্ত সত্তাকে মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ভাবনার বিশ্বব্যবস্থায় বাস করে। সাপ বা

হনুমান থেকে গোরু—কেউ সেই ভুবনের বাইরে নয়। সকলকে নিয়েই তাদের অস্তিত্ব। এই ভারসাম্যের শিক্ষা অনাধুনিক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে হতে পারে। তবে এই ভারসাম্য আধুনিব যন্ত্রসভ্যতা এখনও আয়ত্ত করতে পারে নি বলেই মনে হয়।

প্রবল ঝড়ের সময়, আকাশ ভেঙে আসছে যখন ইন্দ্ররাজার বাহন—জলস্তম্ভ আসছে ধেয়ে, তখন প্রহ্লাদ-বনওয়ারী সায়েবডাঙার মাঠে কাজ করছিল। 'মাঠের মধ্যে রব উঠল—পালা—পালা—পালা—।' (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ)। কিন্তু নিজেরা বাঁচলেই তো হবে না। মাঠে চরছে যে সব গরু, তাদেরও ছেড়ে দিতে হবে বনওয়ারী বলে উঠল : 'গরু খুলে দে, হাল থেকে গরু খুলে দে। গোবধ হবে?' (ঐ) তখনও বনওয়ারীর নেতৃত্বে কাহাররা ততটা আধুনিক হয় নি—মাংসের দামে গরু বিক্রির কথা স্বপ্নেও ভাবে না তারা। তারপর যে বর্ণনা দিয়েছেন তারাশঙ্কর তাতে কাহারদের সমাজ ও জীবন পরিধিটি স্পষ্ট বোঝা যায়। একটু উল্লেখ করি :

> খোলা পেয়েই ভয়ার্ত গরুগুলো উর্ধ্বশ্বাসে লেজ তুলে ছুটল, ডাকছে—হাম্বা—হাম্বা। গাই ডাকছে বাছুরকে। বাছুর ডাকছে গাইকে। ছাগলগুলো চেঁচাচ্ছে। ভেড়াগুলো নীরবে ছুটছে। হাঁসগুলো পাঁক পাঁক শব্দ ক'রে জল থেকে উঠে ঘরে গিয়ে ঢুকছে। চকিত হয়ে ভয়ার্ত পাখিগুলো এক সঙ্গে কলরব ক'রে ডাকছে। গাছের শাখায় হনুমানগুলো ডাল আঁকড়ে ধরে ভয়ে কাঁপছে।' [৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

প্রকৃতি-লগ্ন কাহার-মন, সকলকেই সহানুভূতির সঙ্গে দেখল বনওয়ারী। জাঙলের আমবনের আশ্রয়ে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল।

সাধারণভাবে এই রকম ঘটনার মাঝখানে কাহাররা প্রকৃতির সঙ্গে, প্রকৃতির গাছপালা লতাগুল্ম, পশু-প্রাণী-পাখিদের মাঝখানেই বাস করে। তবে গোটা উপন্যাসে সামান্য ব্যতিক্রম দেখা গেছে দুটি ক্ষেত্রে। প্রথম করালীর পোষা কুকুরটি তার ব্যক্তিগত শখের অন্তর্গত। এর সঙ্গে কাহারপাড়ার ভাবনা সহানুভতি খুব নিবিড় হয়ে আসে নি। মৃত্যু দেখে বরং এক ধরনের চাপা তৃপ্তিই দেখা গেছে। ভয় পেয়েছে তারা, কিন্তু সে ভয় যতটা অজানা আশঙ্কা সঞ্জাত ততটা কিন্তু কুকুরটির প্রতি ভালাবাসা থেকে আসে নি। কুকুর মানুষের শিকার জীবনের প্রথম থেকেই বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছে। কুকুরই প্রথম animal domestication -এর পর্যায় সূচনার সহায়ক। কুকুরের আনুগত্য মহাভারতে মহাপ্রস্থানের কথায় বিখ্যাত। তবু, করালী সমাজ-ছাড়া 'ডাকাবুকো'—তার পোষা কুকুর অনেকটাই তার প্রতিপত্তির ভূমিকা হয়ে দেখা গেছে। এর সঙ্গে কাহার সংস্কৃতি ঐক্য বোধ করে নি। হতে পারে কুকুর-পোষা তাদের কাছে পাশ্চাত্য ব্যবস্থার অনুকরণ বলেই মনে হয়েছে। কালুয়ার নাক মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে ঘটল 'একটা বীভৎস কাণ্ড'। চোখ দুটো ফুলে ফেটে গেল—'সমস্ত কাহারপাড়া দৃশ্যটি দেখে শিউরে উঠল।' বনওয়ারী ডেকে উঠল—'কর্তা!' সকলের মনে হল 'কর্তা বোধহয় খড়ম সুদ্ধ বাঁ পাটা কুকুরটার গলায় চাপিয়ে চেপে দিলেন।' [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

উপন্যাসের শেষে প্রসঙ্গটি আবার একটু স্মরণে এনেছেন তারাশঙ্কর। নিমতেলে পানুর ছেলেটি মারা গেছে চন্দ্রবোড়ার চাপে। 'ঠিক যেমন ভাবে মরেছিল করালীর কুকুরটা তেমনি ভাবেই চোখ ফেটে রক্ত পড়ল, শরীরে চাকা চাকা রক্তমুখী দাগ বার হল। নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত গড়াল।' (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) পানু অবাক, তিক্ত বেদনায় বলে নয়ানের মা : 'কে করলে বেহ্মহত্যে কার পরাণ গেল রে? পানা তো খুঁতো পাঁঠার বদলে ভাল পাঁটা

দিয়েছিল রে! যে ডাকাবুকো বাবার বাহনকে মেরেছে, তার কিছু হলো না কেনে রে!' (ঐ)। এ-প্রশ্নের জবাব নেই কাহার সমাজের। যে-কোনো বিপর্যয়ের উপকথা-নির্ভর ব্যাখ্যা তাদের আছে। তারা জানে এই সব বিপন্নতার পিছনে একটাই কারণ—কত্তাবাবা ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তার ক্রোধ কখন কিভাবে হবে তা তারা জানে না। করালী যেহেতু এই ভয় ভাবনার অতীত—তার মন যেহেতু কত্তার শাসন মানে না, তাই তার উপর দণ্ড নেমে আসবে কিনা সে প্রশ্নের উত্তর তাদের জানা নেই। যাইহোক, কুকুরটিকে কাহাররা করালীর মতোই তাদের মনোজগতে রক্ষা করে নি।

তারাশঙ্করের আত্মকথার সামান্য প্রক্ষেপ মৃত কুকুরের সমাধি দেবার উদ্যোগের ঘটনাটিতে লক্ষ করি। গ্রামে ঢোকার মুখেই একটি কুকুরের সমাধির কথা লিখেছেন তারাশঙ্কর। উপরে 'আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা' :

"সমাধি মোদের ভুকুর
আমাদের ভালো কুকুর।"

গৃহপালিত পশুর প্রতি এই দরদি মনোভাব তারশঙ্করেরও ছিল। তিনিও পাখির ছানার মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়ে সমাধিফলক লিখেছিলেন। (পশ্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'আমার সাহিত্য জীবন' ; *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা*-গ্রন্থভুক্ত। নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা.) লি.; কলকাতা ; ১৩৯৪ ; প্রথম সংস্করণ ১৩৮৭ ; ২৮৯ পৃ.) করালীও তার প্রিয় কুকুরটির 'সামাজ' বা সমাধি দেবার উদ্যোগ করেছিল। নেহাৎই ব্যক্তিগত উদ্যোগ। পাখিও এই ব্যাপারে তাকে সমর্থন করে নি। দুর্গন্ধ হবে—এই ভয় তার। আপত্তি করেছে বনওয়ারীও 'বাড়ির ওঠোনে ভাগাড়' করার ইচ্ছা বা উদ্যোগে তার সমর্থন নেই (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)।

দ্বিতীয় বিষয়টি ব্যাঙ-সংক্রান্ত। সুচাঁদ ব্যাঙকে অসম্ভব ভয় করে। সাপ যাদের দেবতা বা দেবতার বাহন, তারা ব্যাঙকে ভয় করবে কেন? এও একান্ত ভাবেই সুচাঁদের ব্যক্তিগত অনাগ্রহ। করালী 'তার গায়ে ব্যাঙ দিয়ে দেয়।' তাই নাতনি পাখির সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যাপারে তার তীব্র আপত্তি। (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) এ-আপত্তি অবশ্য বেশিদিন টেকে নি। হাঁসুলীবাঁকে সুচাঁদ সমস্ত আনন্দ-বেদনায় যেমন সব চেয়ে এগিয়ে এসে আবেগ ঘনত্ব প্রকাশ করে, ব্যাঙের ঘটনা তাতে একটু ব্যতিক্রমী—অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে সুচাঁদ সমাজ-মনের অভিমুখ নিয়ন্ত্রণ করে, এখানে তেমন কোনো তাৎপর্য দেখা যায় না।

লিখেছি পশুদের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় এক বন্ধনে কাহাররা আবদ্ধ। তার একটি ইন্দ্রিয়ঘনত্ব আছে। চন্দনপুরে গিয়ে বোন সিধুর বাসায় সেই ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশ পায় না বনওয়ারী। তার মনে হয় 'এদের সংসারের ঘরদোরের গন্ধ যেন কেমন কেমন।' কখনোই তাকে আশ্বস্থ করতে পারনি বনওয়ারী। সে গন্ধ 'ভারি কটু গন্ধ, ইঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা আর জলে একটি ভাপানি তেজিয়ান গন্ধ'—অনেকটাই ওষুধের গন্ধের মতো উগ্র—তেজী। (২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) ঠিকই, সিধু এখানে শহুরে রীতিকরণ শিখেছে, তবে 'সভ্যতার ও রীতি'-তরিবৎ তাকে টানে না। বাঁশবাদি কাহার পাড়ায় যে জীবন-পরিধি, তার কথা ভোলে না বনওয়ারী—ভুলতে পারে না। সেখানে মিশে আছে 'গোবর মাটির গন্ধ, গরুর পায়ের গন্ধ, ধানের গন্ধ, কাঠ-ঘুটে পোড়ার গন্ধ, সার গাদার গন্ধ, পচাই মদের গন্ধ, বাড়ীর আশপাশের বাবুর তুলসী গাছের গন্ধ' (ঐ)—একে ছেড়ে কোথাও ভালো লাগে না বনওয়ারীর। এই 'ভারি মিষ্টি প্রাণ জুড়ানো গন্ধ' তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। চন্দনপুরের মতো আক্রমণাত্মক নয়—এ গন্ধ ভিন্ন জীবন নীতির প্রমাণ।

ভাঁজোর রাত্রে বাধা বন্ধনহীন উদ্দাম এক আনন্দ-উৎসব কাহারদের। সে উৎসবে গোরু-বাছুর গুলোকেও জুটিয়ে নেবার অবাক ব্যবস্থা তাদের। 'দুধেল গাইগুলো বাছুর গুলোকে আগেকার কালে এই দিনটিতে বাঁধাই হত না। ওরা পেট ভরে দুধ খেত।' মানুষ যেমন আনন্দে মাতোহারা হবে—গৃহপালিত পশুগুলিও তেমনি পাবে মুক্তির আশ্বাস। এখন সে নিয়ম সামান্য বদলেছে। 'আজ কাল ভোর রাত্রে দুধ দুইয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।' ওরা ইচ্ছা মতো চরে ফেরে—এমন কি 'দু-চারখানা জমির ধান' খেয়ে নিলেও আপত্তি নেই ওদের। মদ 'রসিয়ে' ওঠে—কাহারপাড়ায় ওই মদের গন্ধে এসে পড়ে কাক, কুকুর আর পিঁপড়ে। পচা ভাত ছড়ালে ওরা খাবে। অর্থাৎ, উৎসবের আয়োজনে কেউ বাদ পড়ে না। 'ম্যাতা' 'অর্থাৎ পচুই-ছাঁকা পচা ভাত' দেওয়া হয় কুকুরদের, গরু বাছুর সবাইকে দেয়। ভেড়া হাঁস মুরগি—সবাই পাবে। এই উৎসবের আয়োজনে সবাই আজ কাহারদের সাথী। প্রকৃতিলগ্ন কাহাররা কাউকে বাদ দিতে পারে না। তাদের সংস্কৃতিতে ভারসাম্য আর ঐক্যের বোধটি এমনই ঋদ্ধ।

১৪

সামাজিক সচলতার নানা মুখ : হাঁসুলীবাঁকের উপকথা

ভারতে জাত ব্যবস্থা একটি দুর্মোচ্য সামাজিক সংগঠন। এর সামাজিক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান বিচিত্র। কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোতে একে বাঁধা সম্ভব হয় নি। ইংরেজরা আসার পর এদেশের জাত ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিশেষ তরঙ্গ জেগেছে। এতদিন যা ছিল আঞ্চলিক বিচ্ছিন্ন আর বদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা, তা নতুন এক ব্যবস্থার মুখোমুখি হল। বিশেষত নিচুজাতের মানুষরা সংগঠিত হতে থাকল। তাদের চেষ্টা হল জাতি ও বর্ণের সমীকরণ গড়ে তুলে আত্মোন্নয়নের পথ খোঁজা। এর আগে এমন পরিস্থিতি ছিল না। শূদ্র অতি শূদ্ররা মহাবীর্যবান হিসাবে প্রমাণিত হলে, রাষ্ট্র কাঠামোতে উন্নতি করার অবস্থা তৈরি হলে—বিশেষত কোন সার্বভৌম রাষ্ট্র গড়তে পারলে ব্রাহ্মণেরা তাদের ক্ষত্রিয় হিসাবে গ্রহণ করত। কোন কোন অতিজনপ্রিয় দেবস্থলের পূজারীদের ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য করার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ও পূর্বভারতে এভাবে Black Brahman-দের দেবস্থলের পাণ্ডা হিসাবে অন্তর্ভূত হতে দেখা গেছে। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ড. এম. এন. শ্রীনিবাস দেখেছেন সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে, উচ্চবর্ণের আচার আচরণ অনুসরণ করে, রাজসমর্থন পেয়ে খুব সীমিত অর্থে কোনো কোনো জন গোষ্ঠী আত্মোন্নয়ন করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর *Social Change in Modern India* গ্রন্থে (১৯৭২) একে 'Sanskritization' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। Sanskritization অর্থাৎ সংস্কৃত্যায়ন। এইরকম সংস্কৃত্যায়নের প্রমাণ তেমন পান নি গবেষকরা—ড. স্নেহময় চাকলাদার জানিয়েছেন : 'এ ধরনের সামাজিক সচলতার কোন রেকর্ড নেই।' [*ভারতের জাতব্যবস্থা ও রাজনীতি* ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ; কলকাতা ; দ্বিতীয় মুদ্রণ-১৯৯৫ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৮৭ ; ১১২ পৃ.]

কাগজে কলমে সুস্পষ্ট কোন 'রেকর্ড' না থাকলেও ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় এই প্রণালীর প্রমাণ নিশ্চয় কিছু আছে। বাংলায় যারা 'নবশাখ' বলে পরিচিত—অষ্টাদশ শতাব্দী নাগাদ তারা বহু দেবালয় উৎসর্গ করেছে। দক্ষিণবঙ্গে এই রকম মন্দির উৎসর্গের ঘটনাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে একটি বই লিখেছেন ড. হিতেশরঞ্জন সান্যাল— *Social Mobility in Bengal*. বৌদ্ধ সংস্পর্শের কারণে নবশাখরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা থেকে দূরে হটে যায়—ধীরে ধীরে তারা হিন্দু ভাবাপন্ন হয়, আর তাদের ক্রমশ সমাজে গ্রহণ করা হতে থাকে। এরা হিন্দু সমাজের নতুন শাখা ('নবশাখ') বলে পরিচিত হয়। সমাজ-শরীরে জাত-কাঠামোর ঊর্ধ্বমুখী গতি আর অধোগতি (upward Mobility আর downward Mobility)অনেক সময় একই সঙ্গে দেখা গেছে। জালিক কৈবর্ত-রা নিম্নগামী সচলতা আর হালিক কৈবর্তর ঊর্ধ্বগামী সচলতার দিকে অগ্রসর হয়ে দুটি ভিন্ন জাতে পরিণত হয়েছে। একইভাবে তিলি, আর তেলি গোপ আর সদগোপদের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

১৮৭১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত ইংরেজরা জনগণনা পরিচালনা করতে গিয়ে বিচিত্র এক সমস্যার মুখে পড়েছিল। সারা দেশেই নিচুজাতের লোকজন জনগণনার সময় আত্মপরিচয় দিয়েছে অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের সঙ্গে সমীকরণের মারফৎ। কোথাও নিজেদের জাতি নামকে তারা অগৌরবাত্মক ভেবেছে—নতুন নতুন নাম প্রস্তাব করেছে। সারা দেশে প্রবল চঞ্চলতা

দেখা গেছে এর ফলে। ও'ম্যালী ১৯১১-র জনগণনার প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন, শুধুমাত্র বাংলা প্রেসিডেন্সিতে জাতিগত অবস্থান, নাম পরিবর্তনের জন্য যত আবেদনপত্র জমা হয়েছিল তার 'ওজন ছিল প্রায় দেড় মণ'। (সূত্র : স্নেহময় চাকলাদার, উক্ত ; ১১৩ পৃ.) কিছু উদাহরণ দিয়েছেন স্নেহময়বাবু। তামিলনাড়ুর ভেল্লালা-রা দাবি করে তারা শূদ্র নয়, বৈশ্য। নাদার-রা তাদের নাম 'শ্যানার' বলায় তীব্র আপত্তি জানায়। নমশূদ্ররা 'চণ্ডাল' নাম অস্বীকার করে, পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা তাদের নাম 'পোদ' হিসাবে লেখার তীব্র প্রতিবাদ জানায়, রাজবংশীরা দাবি করে তারা ক্ষত্রিয়। উত্তরপ্রদেশে ত্যাগীরা বলে তারা ব্রাহ্মণ। বাংলার মাহিষ্যরা ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে, মালোরা বলে তাদের নাম মল্লক্ষত্রিয়। তৈরি হতে থাকে অজস্র পুরাণধর্মী কাহিনী। কর্নাটকে বেদেরা বলে তারা বাল্মীকির বংশধর, মেষপালকরা নাম লেখায় তারা কালিদাসের বংশধর।

ড° শ্রীনিবাস লক্ষ করেছেন নিচু জাতিগুলির আত্মোন্নয়নের সংঘর্ষের পটভূমি হিসাবে কাজ করেছে আমাদের দেশের আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। ভারতব্যাপী রাজপথ নির্মাণ, রেলওয়ে পত্তন, ডাক ও টেলিফোন ব্যবস্থার ফলে, কাগজ-পত্র, মুদ্রা-যন্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে জাতিগোষ্ঠীগুলি নিজেরা সভা সমাবেশ সংগঠন তৈরি করতে পারে, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ আধিকারিকদের কাছে আবেদন নিবেদন করার উপায়ও তৈরি হয়। এর আগে জাতিগত উন্নয়নের দুটিমাত্র সুযোগ ছিল ব্রাহ্মণকে দান করা, দাক্ষিণ্য দেখানো কিংবা রাজানুগ্রহ। ইংরেজরা আদমসুমারির মারফৎ এক অর্থে দেশীয় সমাজে তাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি করল।

কোন কোন অঞ্চলে পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী আত্মোন্নয়নের চেষ্টাকে শিক্ষা বিস্তার, চাকরি বাকরির দাবি জানানো প্রভৃতি সৃজনশীল কাজেও প্রয়োগ করল। পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর এই চেষ্টাকে তাই শুধু সংস্কৃত্যায়ন (Sanskritization) বলার সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে আধুনিকীকরণ (Modernisation)। এই দুই প্রবণতার টানাপোড়েনে ভারতীয় সমাজে কিরকম নতুন নতুন তরঙ্গ তৈরি করল একটু দেখাই।

জাতিনাম (রাজ্য)	পরিবর্তিত জাতি নামের প্রস্তাব	পরিবর্তিত জাতি নামের প্রস্তাব
সূত্রধর (দক্ষিণ ভারত)	বৈশ্য (১৯১১)	ব্রাহ্মণ (১৯৩১)
শ্যানার (তামিলনাড়ু)	ক্ষত্রিয় (১৯২১)	নাদার
ক্ষৌরকার (উত্তর প্রদেশ/বিহার)	ঠাকুর (১৯২১)	ব্রাহ্মণ (১৯৩১)
চাঁই মণ্ডল (পশ্চিমবঙ্গ)	চন্দ্র বৈশ্য	চন্দ্র ক্ষত্রিয়
মুচি (বিহার/উত্তর প্রদেশ)	বৈদ্য ঋষি (১৯২১)	ক্ষত্রিয় (১৯৩১)
চামার (ঐ)	বৈদ্য ঋষি (১৯২১)	ক্ষত্রিয় (১৯৩১)
বারিয়া (গুজরাট)	ক্ষত্রিয়	—
ভিল (ঐ)	ক্ষত্রিয়	—
ত্যাগী (উত্তরপ্রদেশ)	ব্রাহ্মণ	—

উক্ত তরঙ্গে দেশব্যাপী এমন অবস্থা তৈরি হয় যাতে প্রশাসন সিদ্ধান্ত নেয় ১৯৪১-এর

জনগণনায় আর জাতি পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকবে না। ব্রিটিশ শাসকরা এই যে তরঙ্গ সূচনা করল তার ফল কিন্তু সুদূরপ্রসারী হল। কংগ্রেস রাজনীতি নিচু জাতিদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করল। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ-বিরোধী রাজনীতির অভিমুখ খুলে গেল। উত্তর ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে 'হরিজন'-আন্দোলন, 'অন্ত্যোদয়'-কর্মসূচী বিকাশ লাভ করল।

উপবীত-গ্রহণের উদ্যোগ ভারতের নানা অঞ্চলের অবদমিত বা মধ্যস্তরের জাতি গোষ্ঠীর আত্মোন্নয়নের এক ধরনের প্রয়াস হয়ে দেখা দিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার কায়স্থরা উপবীত গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। উগ্রক্ষত্রিয় সমাজের একটি অংশ ('জানা'-থাক) উপবীত গ্রহণ করেছে। যোগী-সম্প্রদায়ের অনেকেই উপবীত ধারণ করেন—আত্মপরিচয় দেন শৈব-নাথ ব্রাহ্মণ। সদগোপরা বৈশ্য বর্ণভুক্ত বলে উপবীত ধারণ করতে থাকে এক সময়। একে সংস্কৃত্যায়ন বলেই গণ্য করা উচিত।

হাঁসুলীবাঁকে সংস্কৃত্যায়নের তিনটি স্পষ্ট প্রমাণ পাই। প্রথম, সদগোপদের কৃষিকর্ম ত্যাগ করে বাবু হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়, কাহারদের পক্ষ থেকে কুকুর বেড়ালের মৃতদেহ না ফেলার কথা বলা। এ-দুটি ঘটনা জাঙল বাঁশবাদির। তৃতীয় ঘটনাটি চন্দনপুর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। করালী তরুণ কাহারদের মধ্যে প্রচার করেছে সদ্‌গোপ মুনিবদের এঁটোকাঁটা খাওয়া একেবারেই চলবে না। দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনের নেতা ই. ভি. রামস্বামী একে আত্মমর্যাদা রক্ষার আন্দোলন (self-respect movement) বলে অভিহিত করেছিলেন। প্রথম দুটি ব্যাপার সংস্কৃত্যায়ন বলে অভিহিত করতে হয়, শেষ ব্যাপারটিতে এর সঙ্গে আধুনিকীকরণ (modernisation) যুক্ত হয়ে আছে।

কাহারদের অস্পৃশ্যতা সর্বব্যাপী। চন্দনপুরের ব্রাহ্মণদের 'ভগবান-ভগবতী'দের কাহাররা রীতিমত ভয় পায়। 'তাঁদের দরবারে পূজোর থান দূরের কথা—কাহারেরা নাটমন্দিরেও উঠতে পায় না, দূর থেকে দেখতে হয়, তাদের ভোগের সামগ্রীতে কাহারদের দৃষ্টি পড়লে ভোগ নষ্ট হয়ে যায়।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) ক্রমে ছোট-খাট কাজকর্ম করার জন্য কাহারদের ডাক পড়ল চন্দনপুরে। কারণ আধুনিকতা তাদের সমাজেও সামান্য চাঞ্চল্য আনল। 'চন্দনপুরের ঠাকুরেরা বাবু হয়ে' উঠেছেন। বেশবাস তাদের বদলেছে—গায়ে দিয়েছেন 'পিরান' পায়ে জুতো পরে মসমসিয়ে হাঁটতে শুরু করেছেন তারা। 'ইংরিজী শিখলেন' তারা। ফলে 'ছুত-পতিত খানিকটা কম করলেন'। ধর্মপ্রাণতা কমল—'কীর্তনের দল' ভেঙে গেল ; মনোরঞ্জনের চাহিদা বাড়ল—'যাত্রা' আর তারপর 'থিয়েটারে'র দল তৈরি হল। এ অবস্থায় প্রয়োজনের টানেই কাহার মজুরনিদের প্রয়োজন হল। তাই অস্পৃশ্যতা দূর করার অন্তত কমিয়ে আনার দরকার দেখা দিল।

পরিবর্তনের প্রথম অভিঘাতটি এসেছিল বাইরের দিক থেকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তরঙ্গ হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের ছুঁয়ে যায় নি। তার ধাক্কা আর টান এসেছিল চন্দনপুরে। চিরাচরিত পেশা ছেড়ে তারা ব্যবসায় নেমে পড়ল। চন্দনপুরের 'মুখুজ্জে বাবুরা কয়লার কারবারে ফেঁপে রাজা হয়ে উঠল' প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে—সুযোগ কাজে লাগিয়ে। আর সুযোগ কাজে লাগাতে না পেরে জাঙলের চৌধুরীরা 'নাজেহাল' হয়ে পড়ল। সদ্‌গোপরাও নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারল। 'যুদ্ধের বাজারে ধান চাল কলাই গুড় বেচে' তারাও বড় লোক হয়ে গেল। সদগোপদের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে upward mobility বলতে হবে। তাদের পোশাক বেশবাসও বদলালো—আগে 'খাটো কাপড়' পরত এখন তা পালটালো ; আগে

তারা 'লাঙলের মুঠো ধরত, কোদাল ধরত'—'খাঁটি চাষি ছিল তারা—'কাহার-কৃষাণ'দের পাশে চাষ করতে একটুও অপমান বোধ করত না। এখন 'সবাই ভদ্রলোক' হয়েছে। [২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

১৮৭১ সালের জনগণনায় সদ্‌গোপরা নিজেদের গোপদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তাদের দাবি মেনে লেখা হয় তারা হল 'highest among the cultivating Hindn caste of Bengal'. এর আগে তারা গোপ বলে পরিচিত হত। 'গোয়ালা ও সদ্‌গোপ ভিন্ন জাতি। ইঁহাদের কৃতিত্ব আলাদা। গোয়ালাদের বৃত্তি ছিল দুধ বেচা। এঁরা কোনোদিন চাষ-আবাদ করেন নি। আর সদ্‌গোপেরা ভূমি কর্ষণ করিতেন। এঁরা কোনোদিন দুধ বেচেন নি। (শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ : *বাঙালি জাতি পরিচয়* ; বিমলচন্দ্র রায় অজয় বসু সম্পাদিত ; সাহিত্যলোক ; কলকাতা ; ২০০৬ ; প্রথম সংস্করণ ১৩৬৩ ;১৪১ পৃ.) আভীর-রা জনগণনার সময় নিজেদের গোপ বলে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন—সদ্‌গোপরা তাই 'বিচলিত হন' আর 'স্বাতন্ত্র্য বজায়' রাখার জন্য 'সদ্' শব্দ যুক্ত করে সদ্‌গোপ নাম গ্রহণ করেন। মতটি কতটা গ্রহণযোগ্য জানি না। সদ্‌গোপ নামটি মধ্যযুগেও পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যজ্ঞে সসম্মানে আহূত হয়েছিলেন সদ্‌গোপ কুলপতি নরোত্তম পাল। এসব কাহিনী, কিংবদন্তি ও টুকরো ইতিহাসের স্মৃতি সদ্‌গোপরা বহন করেন।

সাহেবডাঙার জমি তৈরির সময় দেখা গেল কাহাররা নিজেদের জমি নিজেরাই চাষ করছে, সদ্‌গোপরা কৃষান মাহিন্দারদের সাহায্যে জমি তৈরি করছে; সাঁওতাল শ্রমিক নিয়োগও করছে তারা। সদ্‌গোপ মনিবরা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছে—কখনও কৃষান মাহিন্দারদের দিকে কল্কে বাড়িয়ে দিচ্ছে তারা। এরকম কল্কে সুচাঁদও পাচ্ছে। হেদো মণ্ডল 'বিনা বাক্য ব্যায়ে' কল্কে দিলেও সুচাঁদ জানে 'পানার মুনিব হলে মারতে আসত'। (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বোঝা যাচ্ছে কাহার বা মুনিষ মাহিন্দারদের সঙ্গে হুঁকো তামাক বিনিময়ের ব্যাপারে সদ্‌গোপদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। পানার মুনিব—নগেন্দ্র মণ্ডল, জাঙলে তার মুদির দোকানও আছে। সাধারণ কাহাররা তাকে বলে পাকু মণ্ডল। সে নিশ্চয় একটু বাবু গোছের। হেদো তেমন নয়। তার মধ্যে চাষ করার প্রবণতা দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। 'তার শরীরে প্রচুর ক্ষমতা, এখনও চাষে কর্মে তার গভীর অনুরাগ। সকল কাজ পূর্বের মত করতে তার ইচ্ছেও হয়, কিন্তু পারে না।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) যথারীতি সুচাঁদ যখন প্রশ্ন করে-'তোমরা আর কোদাল ধরবা না, লয়' তখন হেদো বিরক্ত হয়। সুচাঁদ তাকে মর্মস্থলে আঘাত করেছে। গত 'বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে' সমাজে অনেক বদল ঘটেছে। 'সদ্‌গোপ মহাশয়েরা এখন আধাবাবু'—হেদো মণ্ডলের মতো পুরোনোপন্থীরা এটা মানতে চায় না। তার এখনও ইচ্ছা হয় নিজের হাতে কৃষিকর্ম করার। 'নিজেদের জাতি জ্ঞাতির কাছে লজ্জা' পাবার ভয়ে করতে পারে না। মাঝে মাঝে 'বাড়ির দরজা বন্ধ করে' কৃষকের কর্ম সে করে, তবে সুচাঁদের কাছে তা স্বীকার করার ইচ্ছা নেই।

হেদো মণ্ডল ভাবে শ্রমের মর্যাদা না দেবার এই বিচিত্র বাবুয়ানিটির উৎস ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক। তার ভাবনা 'ইংরিজি বাবুগিরির ঢেউ'-এর ফল এসব। সবটা ঠিক ভাবে কি হেদো মণ্ডল? সম্ভবত না। ভারতীয় বর্ণব্যবস্থায় উচ্চস্তরে যারা থাকে তারা নিম্নবর্ণের তুলনায় নিজেদের পার্থক্য তৈরি করে শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। মহাকাব্যিক ঐতিহ্যে রাজাদের কৃষিকর্মে অংশ নেওয়ার কথা থাকলেও ক্রমেই শ্রমসাধ্য কাজ কর্মগুলি নিচু অবস্থানে থাকা জাতি বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট হতে থাকে। তবে ইংরেজ শাসন এই বিষয়টিকে

সামান্য সাহায্যই করেছে। তারা 'ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গল বিধানের জন্য জাতি ভেদ প্রথাকে খর্ব করার চেষ্টা' করে নি। (পশ্য : ড. অমিতাভ মুখোপাধ্যায় : *জাতিভেদ প্রথা ও উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ* ; কলকাতা ; ১৯৮১ ; ৬২ পৃ.) ইংরেজি শিক্ষার ফলে চাকরি-বাকরির সুবিধা বৃদ্ধি পায়। যারা চাকরি-বাকরি করত তারা শ্রমসাধ্য পেশাকে একটু করুণা বা ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়। এই দেখার চোখটি পুরোনো বর্ণব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গি আর ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বাস্তব—দুটিকেই ধরে রেখেছিল।

হেদো মণ্ডল সুচাঁদের কথায় বিরক্ত হয়ে আত্মপক্ষে তেমন যুক্তি না পেয়ে কাহারদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে সমালোচনা করল। তার কথা কাহাররাও তো আগেকার রীতি নীতি বাদ দিয়েছে। 'মরা কুকুর বিড়েল ফেলা', 'মরা গরু কাঁধে করে' ফেলা—এসব কাজ এক সময় কাহাররা করত। এখন বনওয়ারীর নেতৃত্বে তারা স্থির করেছে ওসব কাজ তারা আর করবে না। 'গরু ফেলতে হলে কাঁধে করে ফেলাব না, গাড়ি চাই'—এই তাদের কথা। বাড়ির নর্দমা তারা পরিষ্কার করত একদা—এখন তাতে রাজি নয় তারা। 'জল নিকাশি নালা ছাড়াবে' তারা কিন্তু 'এঁটো কাঁটা ময়লা মাটির পচা নর্দমাতে হাত' দেবেনা তারা। অথচ একাজ এক প্রজন্ম আগেই ('বাপ পিতামোর আমল') করত তারা। এখন এ-কাজ করবে না কেন? সুচাঁদ এ প্রশ্ন করেছিল। বনওয়ারী আপত্তি জানিয়ে উত্তর দেয়—'মুদ্দোফরাস মেথরের কাজ করব কেনে?' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বোঝা যায়, বনওয়ারীর নেতৃত্বে কাহাররা নিজেদের সংহত করছে—ক্রমে উপরের দিকে সামাজিক সচলতার প্রবণতাকে আয়ত্ত করার ইচ্ছা তার। একে বলেছি upward social mobility। হেদো মণ্ডলের যুক্তি ভাষ্য তাই বেশ মোক্ষম বোধ হয়—'তোরাও বাবু হচ্ছিস, আমরাও বাবু হচ্ছি। না হলে আমাদের মর্যাদা থাকে কি ক'রে?' [ঐ]

কে. ইয়াং আর আর ডব্লু. ম্যাক সামাজিক সচলতা সম্পর্কে পেশা আর গোষ্ঠীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁদের ভাষায়— 'The term social mobility refers to a change in the status of an individual a group or a category. By social mobility, then, we mean movement within the social structure'. সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য থেকেই আত্মোন্নতির চেষ্টা—ব্যক্তি অপেক্ষা গোষ্ঠীর ভূমিকা প্রধান হয়ে দেখা দেয়। বনওয়ারী যেভাবে সবাই মিলে ধুয়া তোলে তার মধ্যে Social structure -টিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা নয়—নিজেদের অবস্থার সামান্য বদলানো— 'a change in the status'. সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক সচলতাকে আনুভূমিক (horizontal) এবং উল্লম্ব (vertical) বলে দুটি ভাগ করেছেন। আনুভূমিক সামাজিক সচলতা প্রায়শই ব্যক্তির। অ্যালেক্স ইংকেলেস তাঁর *What is Society* গ্রন্থে লিখেছেন 'A man moving from one job to another, but at the same level of prestige or income is engaged in horizontal mobility.' একই স্তর বা সম্মানের, একই আয়ের চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরিতে যাওয়ার ব্যাপার ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যক্তিগত বলেই ধরতে হয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় vertical বা উল্লম্ব সামাজিক সচলতাই প্রাসঙ্গিক। এর দুটি দিক বা অভিমুখ— upward আর downward ।

বনওয়ারীর নেতৃত্বে যে পরিবর্তন তা শেষ অবধি upward mobility বলে মনে হলেও উল্লম্ব-উত্থান হিসাবে খুব মৌলিক পরিবর্তন দেখি না। 'ঘোড়া গোত্ত' কাহার তারা। তাদের ভাবনায় আত্মমর্যাদা নেই—হীন নীচ অবস্থাকে তারা অমান্য করে না। 'বহুভাগ্যের মনুষ্যজন্ম পেয়েও পূর্বজন্মের হীন কর্মের জন্য' তাদের 'নীচ কুলে জন্ম হয়েছে'। 'মানুষ

হলেও ঘোড়ার মত উচ্চকুলের মানুষদের বহন করতে হয়'। বনওয়ারীর মাতব্বরিতে একদা যে কাজ করতে তারা বাধ্য থাকত তা এড়ান গেছে। 'মনিব বাড়ির মরা গরু মোষ কুকুর বিড়াল' এখন আর তারা ফেলে না—'রেহাই পেয়েছে'। (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) তা হলেও 'চরণের তলে' থাকতেই হবে। 'এসব পূর্বজন্মের ফল।' আবার এ-জন্মে 'মন্দ কাজ' করলে পরজন্মে 'কাহার থেকেও নীচকুলে' জন্মাতে হবে। বনওয়ারীর এই ভাবনা। ভারতীয় কর্মফলবাদের অন্তর্গত—জাতব্যবস্থার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।

করালী শুরু থেকেই অবাধ্য অনিকেত চরিত্র। কত্তাবাবার পুজোয় তার বলি অগ্রাহ্য হলে সে যেন জেদের বসেই 'পট পট করে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দু-হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে' বলে 'কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন চায় তাই কর।' (১ম পর্ব পাঁচ পরিচ্ছেদ) রীতিমত বিদ্রোহের কথা। তার স্পষ্ট কথা : 'আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে যথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।' পুজোর ব্যাপারটি ছিল খুঁতো পাঁঠা বলি দেবার অজ্ঞানকৃত অপরাধ স্খালনের উদ্দেশ্যে। গোটা কাহারসমাজকে 'স্তম্ভিত' করে করালী সেই পুজোর উদ্দেশ্যটিকে বদলে দিল! করালীর এই অনিকেত পরিস্থিতি তার বাল্যাবস্থা থেকেই। মা তার চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। মায়ের লজ্জা তাকে ছুঁয়ে গেছে। এরপর একদিন ঘোষ বাড়িতে কাজ করার জন্য নিযুক্ত হয় করালী। মাইতো ঘোষের নামে রেলে এসেছিল পার্সেল। আম পাঠিয়েছে মাইতো ঘোষের কোনো বন্ধু। আনার সময় স্টেশন মাস্টারের মেয়েকে একটি আম কেটে খাইয়েছিল সে। তার মুনিব অন্য মানুষের মতো নয় এই ছিল করালীর বিশ্বাস। বেরিয়ে আসতে জমাদার দুটো আম না নিয়ে ছাড়ে নি। উপরন্তু 'এক চাকা আম করালীকে' না খাইয়ে ছাড়ে নি। মাল নিয়ে ফেরার পর মাইতো ঘোষ তাকে ধরে ফেলেন—মুখ শুঁকে প্রমাণ হয় সে আম খেয়েছে। তারপর বনওয়ারী চেপে ধরে তাকে—মাইতো ঘোষ প্রবল প্রহার করে। মাইনে যা পাওনা ছিল তাও দিলেন না। স্টেশন মাস্টার এ-ঘটনা শুনে লজ্জা পেয়ে তাকে 'ইস্টিশানের গুদামে কুলির কাজ' দিলেন। তারপর লাইন ইন্সপেক্টরকে বলে 'কুলী গ্যাঙে' ঢুকিয়ে দিলেন। (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) করালী এভাবে কাহার সমাজের বৃত্তি আর বৃত্তের বাইরে এসে পড়ল। এখানে তার ব্যক্তিগত social mobility-র সূচনা হল। প্রথম দিকে এছিল horizontal আর vertical—একই সঙ্গে। কাহারদের ক্ষেত্রসীমার বাইরে চলে যাওয়াটা এক অর্থে আনুভূমিক সচলতা বলতে পারি। তবে নগদ পয়সায় যারা খাটে না তাদের তুলনায় এই সচলতা উল্লম্ব আর উন্নতিশীল।

করালীর মধ্যে আত্মমর্যাদার বোধ একটু বেশি করেই দেখিয়েছেন লেখক। আখের রস জ্বাল দেবার কাজ করার সময় নামল হঠাৎ বৃষ্টি। সেই সময় 'শাল'-এ বনওয়ারী-প্রহ্লাদ-রতনরা অসহায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হেদো মণ্ডল। হঠাৎ দৈব আশীর্বাদের মতো এসে পড়ল করালী। নিয়ে এসেছে 'তেরপল'। রেল কোম্পানির কাজ করার অবসরে এইসব আশ্চর্য বস্তুর সঙ্গে তার পরিচয় ঘটেছে। 'তেরপল' এনে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারীরা বৃষ্টির হাত থেকে গুড় রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারল। খুশি হেদো মণ্ডলও। বলে উঠলেন : 'বেটা খুব বাহাদুর।' এমন তারা কাহারদের বলেই থাকেন। কেউ কিছু বলে না। স্নেহের ডাক বলেই জানে। করালী কিন্তু তীব্র আপত্তি জানাল। তার কথা—'উ কি ? বেটা-বেটা বলছেন কেনে? ভদ্দলোকের উ কি কথা!' (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) কেন যে এত আপত্তি তা বুঝতে পারে না কাহাররা—বনওয়ারীকে জিজ্ঞেস করলেন হেদো মণ্ডল। কি অন্যায়টা বলেছেন—তাকে বলতে হবে। বনওয়ারী কিছু বলার আগে করালী বলল—'মুরুব্বির

কাছে' এসব 'অন্যায় লাগবে না'— এসব 'ওদের গা-সওয়া হয়ে' গেছে। বস্তুত, নানা রকম অন্যায় গালাগাল তারা কাহারদের দিয়েই থাকে। করালী এই বৃত্তির পরিমণ্ডল এড়িয়ে গেছে, সে এসব মানবে কেন? আত্মমর্যাদার এই নতুন বোধ, 'ভদ্দরলোক। মাথা কিনেছে।' বলে চলে যাওয়া করালীর নায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় মুসলমান সমাজের কথা বেশি নেই। কখনো কখনো চন্দনপুরে কাজে যাওয়া কাহার মেয়েরা মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়—রাজমিস্ত্রির কাজ করা 'শেখ ভাই সাহেব'-রা কাহার মেয়েদের' 'অঙ' ধরিয়ে কলমা পড়িয়ে বিবি করিয়ে নিয়ে' যায়। করালীর মা-ই গিয়েছে তেমন কোনো মুসলমানের সঙ্গে। (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) আর আছে 'শেখেদের দলের কথা। এরা শক্তিশালী। কোপাই নদীর নিম্ন ধারায় বাস করে। তারা চাষি। নদীতে বাঁধ দিতে গেলে তারা দাঙ্গা করে ছাড়বে। (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) কাবুলীওয়ালা তথা আগাসাহেব-এর সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছিল করালী। পাগলের ওপর হামলা করার উদ্যোগ করছিল লোকটা। পাগল তার কাছে ধারে একটা র‍্যাপার নিয়েছিল। টাকা ফেরৎ দেবার অনিচ্ছাও ছিল না, কিন্তু গতবারে যথা সময়ে দেওয়া হয় নাই'—তাই ছুটে পালাচ্ছিল। আগাসাহেব তাকে তাড়া করেছিল—'রুপিয়া ফেলো!' দিয়েছিল দুচার ঘা। করালী কাহারপাড়ার সকলকে সচকিত করে আগাসাহেব-কে শাসাতে থাকে—'উ সমস্ত চলে গা না আর। হাঁ। *ঠেঙিয়ে দোরস্ত ক'রে দেগা।*' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কাবুলীওয়ালাদের কাহাররা যমের মত ভয় পায়। তারা 'এদেশে ব্যবসা করেছে একদিন লাঠির জোরে।' কাউকে গ্রামে দেখলে 'গোটা গ্রাম' ত্রস্ত হয়েছে'। সুচাঁদের ধারণা ছিল করালীকে বুঝি মেরেই ফেলবে ঐ কাবুলীওয়ালা। তাকে বিস্মিত করে করালীর এই ভূমিকা চরম বিস্ময়ের বই কি।

করালীর সঙ্গে কাবুলীওয়ালার কথাবার্তা থেকে চন্দনপুরের দাঙ্গার সংবাদ শোনা যায়। চন্দনপুরে মেয়েদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করার জন্য এই কাবুলীওয়ালাকেও করালীরা সবাই মিলে মেরেছে ('মারকে ছাতু বানায়া দেগা')। জনাদশেক মিলে চন্দনপুরে তাদের সেই হামলার কথা স্মরণ করিয়ে কাবুলীওয়ালাকে শান্ত করেছে করালী। বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের নিম্নস্তরের কাহার—করালীর হাতে হিন্দুসমাজের সম্মান রক্ষার দায় বর্তাচ্ছে। যারা সমাজে ছিল অসম্মানিত—যাদের দৃষ্টিতে দেবতার ভোগ যেত নষ্ট হয়ে, তাদের দেহের শক্তি আর ঐক্যবদ্ধ সাহস আজ নতুন পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজের সসম্মান স্থিতির অন্যতম ভিত্তি। এভাবেই সমর্থ পঞ্চম-রা ভারতীয় সমাজে নতুন গুরুতর ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। হবে—তার সামনে ইতিহাসের খোলা পাতা।

ঝড়ে করালীর চাল উড়ে গেল। পাগল এসে বনওয়ারীর কথা তুলল তার কানে। বলল—'টাকা দিয়ে কেউ যদি বলে—জাতটি দাও, দেবে তুমি?' সেকথা শুনে করালী ভয়ঙ্কর ক্ষুব্ধ হল। তার কথা—জাত অত সহজে যায় না। অন্যের ছোঁয়াতে তো যায়ই না। তার প্রশ্ন—'জাত মারে কে? জাত! জাত যায় পরের এঁটো খেলে, কুড়োলে। ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। জাত ওদের গিয়েছে, আমার যায় নাই।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) করালীর ইচ্ছা এবার চালা টেনে বাঁধবে লোহার তার দিয়ে। আর জাত সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আধুনিক প্রত্যয়। বনওয়ারীরা এভাবে ভাবতে পারে না। তার ইচ্ছা জাত আসলে মানুষের একটি প্রয়োজনীয় সংগঠন মাত্র। উচ্চবর্ণের সেবার নামে তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষার নামে এঁটো কাটা কুড়োনোর নাম জাতিগত বৃত্তির রীতি মানা হতে পারে না। অথচ কাহাররা আসলে তো তাই করে। সদ্‌গোপ মনিবরা

তাদের নিমন্ত্রণও করে না। এই পরান্ন ভোজন—করুণার দান গ্রহণ মোটেই জাতিরক্ষার পূর্বশর্ত নয়।

ঘোষবাড়ির 'বৈশাখী-সংক্রান্তি'র অনুষ্ঠানের কথা জানা যায় কাহিনীর একাংশে। 'ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সদ্‌গোপ মহাশয়রা ভোজন করেন।' 'কাহাররা প্রসাদ পায়।' অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট ভোজন করে—এঁটো কাটা পরিষ্কার করে—'পাতায় পড়ে থাকা খাবার গামছায় বেঁধে' বাড়ি আনে। পরের দিনও আনন্দ করে খায়। (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই নিয়ম মানতে চায় নি করালী। চন্দনপুর স্টেশনে ঘোষবাড়ির ছোট ছেলের সঙ্গে বাজার করার ফাঁকে দেখা হয় সিধুর সঙ্গে। সিধু 'ছোটকাকে বলেছিল অন্নপ্রাশনে তারা যাবে কিনা। 'পেসাদ' পাবে কিনা ঘোষবাড়ি ছোট ছেলে ছোটকা বলেছিল—নিশ্চয় পাবে তারা, সবাই আসুক—করালী, পাখিও আসুক, কাহারপাড়ার সবাই তো আসবেই। করালী ছিল কাছে। সাফ জানিয়েছিল—'করালী এঁটো কাটার পেসাদ খায় না।' (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এসময় 'কাহারপাড়ার ছেলে ছোকরারাও' ছিল কাছে—তারও যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়েছে। এইরকম অসম্ভব কথা কাহারপাড়ার কেউ কখনো বলেনি। আত্মমর্যাদার বোধ এভাবেই প্রসারিত হয়েছে তার মারফৎ। তরুণ প্রজন্ম আজ তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছে। করালী ফরমান দিয়েছে—'ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। যে কাহার পরের এঁটো খাবে সে পতিত। তার জাত নাই।' (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) একথা শোনার পর বড়কর্তা অসম্ভব ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তার মনে হয়েছে এবার না হয় পৈতে নিক কাহাররা। কিন্তু যত ক্ষুব্ধই হোন ঘোষকর্তা করালীর কথা মিথ্যা নয়। সে তার প্রবল আপত্তি আর শক্তি নিয়ে যে ধাক্কা দিয়েছে তা সত্য। বাস্তব। সময়ের সত্য। বাংলা সাহিত্যে এমন প্রবল সামর্থ্য নিয়ে নিচু জাতের কোনো নায়ক উঠে আসে নি। জাত নীতির বিরুদ্ধে কর্ম আর ধর্মকে একাকার করার চিরাচরিত শাসন-প্রণালী, ভাবাদর্শ নিয়ে এমন আপত্তি বেশি দেখা যায় নি। কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম তারাশঙ্কর প্রায় অতীত যুগের স্মৃতি শাস্ত্রকারের ভূমিকা নিয়েছেন। 'মানুষের বানানো সমাজ আদর্শেরই কল্পনা-পরিকল্পনার অঙ্গ' যে সমাজ, আমার মনে হয়েছিল 'মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ভট্টভবদেব বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়' সেই সমাজ সম্পর্কে একই ধরনের সংগঠনশীল অভিব্যক্তিটি আদর্শায়িত করেছেন। (পশ্য : অচিন্ত্য বিশ্বাস : "আর এক আরম্ভের ভূমিকা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* ; উক্ত ; ২০৬ পৃ.) তারাশঙ্কর নিজেও এভাবে ভাবতেন। তাঁর মনে হয়েছে সমাজের স্বাভাবিক নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হাতেই ন্যস্ত ছিল চিরকাল—এখনও আছে। এযুগের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তাঁর মতে—রবীন্দ্রনাথ। মোহিতলাল মজুমদারকে একদা গুরু হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তাঁর মনে হয়েছিল মোহিতলাল বৈদ্য সন্তান হলেও তাঁর কাছে কেন দীক্ষা নেবেন, সেটির উত্তর। প্রথম, সাহিত্য প্রাণ মোহিতলাল ছিলেন সন্ন্যাসী। 'সন্ন্যাসীর জাতি নেই, বর্ণ নেই, ইহলোক পরলোক কিছুই নেই—আছে শুধু তপ এবং সাধনা।'—তাই এই 'সারস্বত তন্ত্র মন্ত্রে দীক্ষা। ['পশ্য : "আমার সাহিত্য জীবন"; *স্মৃতিকথা গ্রন্থভুক্ত*। ৪০৬-০৭ পৃ.]

অন্য আর একটি কারণে তারাশঙ্কর মোহিতলালের কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল—'বিকৃত বর্ণাশ্রম ধর্মের গণ্ডীকে লঙ্ঘন করে যাওয়ার মতো সাহস ও প্রবৃত্তি দুইই' তাঁর মধ্যে কাজ করছিল তখন। ("আমার সাহিত্য জীবন"; উক্ত ; ৪০৬ পৃ.)। সুতরাং সংগঠনী শক্তির পাশাপাশি ভাঙনের শক্তিও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় একই ভাবে কাজ করে গেছে। করালীর মারফৎ সমাজমনকে ভিতর থেকে ভেঙে ফেলার এমন অপূর্ববস্তুনির্মাণের প্রজ্ঞা তাই বুঝি তার স্রষ্টার আয়ত্ত হয়েছে।

১৫

হাঁসুলীবাঁকের কাহার জীবনে নতুন সাংস্কৃতিক উপকরণ

হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজের জীবনকে মনে হতে পারে বদ্ধ—বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে এই জীবন একেবারেই অন্য-নিরপেক্ষ নয়। পরিবর্তন জীবনেরই লক্ষণ। হাঁসুলীবাঁকেও ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে এসেছে বদলের ছাপ ছবি। লেভি স্ট্রাউস এরকম পরিস্থিতির কথা মনে রেখেই লিখেছিলেন—আদিম সমাজ মন ('Savage mind')-এর পরিচয় পাওয়া অসম্ভব—নিরঙ্কুশ নেই কিছু। সবই বদলে গেছে। সর্বত্র 'ফাটা ঘণ্টাধ্বনি' শোনা যাচ্ছে। হাঁসুলীবাঁকের কাহার সমাজেও এসেছে নতুন নতুন বিষয়। এসবই নগরায়ণ বা যন্ত্রায়ণের ফলাফল। কাহার সমাজের সাংস্কৃতিক উপকরণ (cultural goods) -গুলি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি প্রমাণিত হবে। দরিদ্র প্রান্তিক মানুষ তারা, তবু এসব তাদের জীবনেও থিতিয়ে পড়েছে।

রতন তার মুনিব হেদো মণ্ডলের অত্যাচারের কথা বলছিল। কিল মারেন হেদো মণ্ডল। রতন জানে তখন 'কিল খাবার আগে থেকেই দমটি বন্ধ' করে রাখতে হয়। ব্যাপারটা অনেকটা ঘোষবাড়ির ছেলেদের 'বল'-এর মতো। পিতলের পিচকারি দিয়ে বাতাসে বলটিকে ফোলানো হয়—'ইটের মত শক্ত হয়ে ওঠে বলটি'। তখন কিল মারলে বলটার কিছু হয় না। অনেকটা তেমনি হয় দমবন্ধ থাকা অবস্থায়। এক তীব্র অমানবিক অত্যাচারের ছবি। (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) তবে বলটির উপমা এনে সামান্য মজাই করে নিল রতন আর বনওয়ারী। আর সেই তামাসার মধ্যে এসে গেল শহর থেকে আসা কলোনিভুক্ত মানুষের নতুন খেলার সরঞ্জাম।

প্রহ্লাদ লক্ষ করল বৃষ্টির জলে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। 'গ্রাম-গড়ানি জলের ধারা' ভেসে যাচ্ছে। 'কালির মত জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।' এই রংটির কারণ 'সার ডোবা' ভেসে গেছে। সার-ধোয়া জল। ঐ রকম রং তার। জলের সঙ্গে মেশে না কিছুতেই। পা দিলে বোঝা যায় গরম—'ফুটন্ত জলের মত'। (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) সামান্য একটি প্রজন্ম আগে কাহাররা কৃষিকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর মধ্যেই সার-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে তাদের। তবে সার দেবার ক্ষমতা তাদের নেই। পাশেই আউশের ভুঁই। যদি সম্ভব হয় এই জল ধোয়া সারের কিছুটা কেটে ঢুকিয়ে দিতেও তো পারে প্রহ্লাদ। তাহলে এই সার জমিকে অত্যন্ত উর্বর করে দেবে। সে জানে। ও হল 'জমির সালসা'। (ঐ) এই রসায়নিক সারের সঙ্গে তাদের সদ্য পরিচয় ঘটেছে তখন। এর আগেও প্রহ্লাদ কথায় কথায় সারের কথা বলেছে। তার মুনিব খোল আর 'সালপেট আলুমিনি' সার দিয়েছেন আলুর খেতে এই ছিল খবর। [২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

বনওয়ারী ঘোষ কর্তাদের বাড়ি থেকে বাতিল কিছু বস্তু নিয়ে আসে। বিচিত্র সেসব জিনিস। (১) 'খাটের এক টুকরো ছত্রির ভাঙা ডাণ্ডা' ; (২) 'হাত-পা ভাঙা কাচের পুতুল'; (৩) 'খানিকটা সুতো' ; (৪) 'এক ফালি প্যাকিং পেপার'। সেসব দিয়ে কি করবে তাও মনে মনে ভেবে নিয়েছে বনওয়ারী। ভাঙা ডাণ্ডাটি 'চমৎকার টামনার বাঁট হবে'। কাঁচের পুতুলটি 'ঘরের তাকে দিব্যি সাজানো থাকবে।' সুতোও কাজে লাগবে ঠিক, কিন্তু প্যাকিং

কাগজটি কি কাজে লাগবে তা অনির্দিষ্ট। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এইভাবে কাহারদের সমাজে এসে পড়ে নানা রকম সাংস্কৃতিক উপকরণ।

বাবাঠাকুরের গাছতলাটি বাঁধানো হচ্ছে। বনওয়ারী বহু কষ্টে 'বিলাতী মাটি ' অর্থাৎ সিমেন্ট যোগাড় করেছে। বাঁধানোর সময় করালী একটু 'মাতঙ্গপনা' দেখিয়ে গেছে। কাহার পাড়ার সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে সঙ্গে এনেছে এক সাহেবকে। বলে তাকে 'ম্যান'। 'লোকটা গলায় ঝুলানো একটা বাক্স নিয়ে কিলিক্ কিলিক্ করে ছবি তোলে— 'ফটোক' অর্থাৎ ফোটো।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) ক্যামেরা-র সঙ্গে কাহারদের এই প্রথম পরিচয়। সাহেবদের সঙ্গে পরিচয়ও তাদের নতুন। বৃটিশ সাম্রাজ্য ক্রমেই কাহারপাড়ার দিকে থাবা বসাচ্ছে। কাহাররা এই অঞ্চলে এসেছিল নীল কুঠির মাধ্যমে। নীল কুঠিয়াল 'শ্রীযুক্ত মেস্তর জেনকিন্স সাহেবের' মাধ্যমে তাদের সেই আসা (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) আর এই ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে আসা সাহেব এক রকম নয়। প্রথম দিকে সাহেব তাদের জীবিকা দিয়েছিল—এবার তাদের জীবন জীবিকা সবই অনিশ্চিত হয়ে গেল 'ম্যান'-দের মারফৎ।

সাহেবদের সঙ্গে ভাষার দূরত্ব কাহারদের দুর্মোচ্য। তবে তাদের আদব কায়দা বেশ নকল করতে পারে তাদের মধ্যে একজন—পাখি। এর নাম 'ভিকনেস' ; 'অর্থাৎ ব্যঙ্গ ভরে মানুষকে নকল করা'। পাখি একসময় হাসিয়ে আনন্দ দেয় গোপালীবালাকে—রেল কোম্পানির সাহেবের মেমের নকল করে। 'সরু গলা ক'রে ইংরেজি বাক্য' 'অবিকল' বলে চলেছে নকল করে—'গুড-মুনিং-বুড-টিংটং—'অনুস্বার লাগিয়ে অনর্গল ব্যঞ্জনবর্ণগুলি উচ্চারণ ক'রে' যায়। (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) অদ্বৈত মল্লবর্মণের একটি কম-পঠিত উপন্যাস *শাদা হাওয়া-য়* এরকম একটি পরিবেশ আছে। এক উন্মাদ অর্থহীন ইংরেজি বলে যায় ব্ল্যাকআউটে রহস্যময় ভীতিপ্রদ কলকাতায়। সেই পাগলটি 'বৃটিশ সৈনিক পুরুষদের বীরদর্পী হাঁটার অনুকরণ' করে ; আর 'এক নাগাড়ে কতকগুলো অসংলগ্ন অর্থহীন কি সব উচ্চারণ করতে থাকে—এমন ভাষায়—যে ভাষার নিদর্শন দুনিয়ার কোনো যুগের কোনো মানুষের জানা ছিল না—এ সকল কথা দুনিয়ার কোনো ভাষাতে আজো সৃষ্টি হয় নি। ভাবখানা দেখাচ্ছে যেন ইংরেজি বলছে।' (অদ্বৈত মল্লবর্মণ : *শাদা হাওয়া* ; সম্পাদক—অচিন্ত্য বিশ্বাস ; বৃন্দবাক ; কলকাতা ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৯ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৯৬ ; ৭৮ পৃ.) *শাদা হাওয়া-র* কথা-বস্তুতে আছে ব্রিটিশদের সঙ্গে স্বাধীনতার দাবিতে গড়ে ওঠা তীব্র ভারতীয় জাতীয়তার সংগ্রাম আর পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ভাবাদর্শ টিকিয়ে রাখা—ভাষা সংস্কৃতির গভীর প্রভাবের ইঙ্গিত। পাখির কথায় এমনি একটু চকিত ইশারা পাচ্ছি। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে 'ম্যান'রা এসে কালারুদ্রতলাতে যুদ্ধের আপিস গড়েছে। তার আগে ভাঁজোর অনুষ্ঠানে এসে হাজির হয়েছে করালীর কোঠাবাড়িতে। চন্দনপুরের বাবুদের বাড়ির একটি ছেলে বিলেতফেরৎ। তার হাবভাব একেবারে সাহেবদের মতো। বাঁশবনের বাঁশ যখন শেষ করা হচ্ছে তখন সাহেবরা এসে যুদ্ধের আপিস খুললে ঘোষ কর্তা গিয়ে তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেছেন। সব মিলিয়ে পাশ্চাত্যের অভিঘাত কাহারদের উপর ভালোই পড়ল। শেষ পর্যন্ত 'ভিকনেস' বা ব্যঙ্গ ভরে নকল করার ব্যাপার থাকল না।

হাঁসুলীবাঁকে এসেছে নতুন যুগের অভিঘাত। তার সঙ্গে কাহাররা সম্ভবমতো অ-বৈর সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। বিশেষত রেলপথ, রেলপুল আর ট্রেন তাদের জীবনকে অনেকটাই পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মজলিশ ছিল তাদের—ছিল কাজ। কাজের ছিল নির্দিষ্ট সময়। কাজের উদ্দেশ্যে তৈরি হওয়ার সময় ছিল 'সাতটার ট্রেন'—পুল পেরিয়ে যাবার সময় যে

শব্দ উঠত তাতেই ঠিক হত তারা এবার কাজে যাবার জন্য তৈরি হবে। সুচাঁদের কথা শোনার আর সময় নেই—বনওয়ারী বলে : 'উ বেলায় শুনব'। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) গ্রামের পূর্ব দিক দিয়ে চলে গেছে রেলপথ। চন্দনপুর স্টেশন পার হয়ে কোপাই নদীর উপর একটি সেতু। হাঁসুলীবাঁকের মানুষ 'নীলের-বাঁধ পুকুরের পাড়' থেকেই দেখতে পায় সেই সেতু। 'ওই ব্রিজে যে গাড়িগুলো বের হয়, তাই ধরে চলে কাহারপাড়ার জীবনের ঘড়ি।' এই জীবনের ঘড়ি চলা নিয়ন্ত্রণ করে হাঁসুলীবাঁকের দিনানুদৈনিকের কাজ-কর্ম। তারা জানে (১) 'কলের ছটায় একটা গাড়ি'-যায় ; (২) 'সাতটায় গাড়ির সিগনাল পড়লেই পুরুষেরা কাজে বের হয়' ; (৩) 'সাতটার গাড়ি' এসে পড়লে মেয়েরা 'বের হয়, খাটতে যায়, ঘুঁটে বেচতে যায়, দুধ বেচতে যায়'। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) সময়ের এই হিসেব তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে গেছে। রেলপথ অপু-দুর্গর কাছে দূরের রোমাঞ্চ হয়ে দেখা দিয়েছিল *পথের পাঁচালী* উপন্যাসে। দুই কিশোর কিশোরীর চোখে সেই সুদূরের ইশারা *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র কাহারদের কাছে সময়চিহ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজ শেষ করে তারা 'সাড়ে তিনটের ট্রেন কোপাইয়ের পুলে উঠলে তবে'। (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) সাতটায় কাজে যাবার উদ্যোগ নিলে মোটামুটি সাড়ে সাতটার সময় তারা কাজ শুরু করে বলেই মনে হয়। কাজ শেষ হয় সাড়ে তিনটেয়—টানা আট ঘণ্টার কাজ।

সুচাঁদ কানে খাটো। বিষয়টি প্রতীকধর্মী। সে শোনে কম বলে বেশি। তার মনকেও পুল পেরিয়ে যাওয়া গাড়ির শব্দ স্পর্শ করে যায়। সেই 'গুরু গম্ভীর ঝমঝম শব্দের' 'ক্ষীণ ধ্বনি তার গানে প্রতিধ্বনি তোলে'। এই প্রতিধ্বনি সুচাঁদের কাছে 'ভারি মিষ্টি বলে মনে হয়'। রাত্রে যখন গাড়ি পুল পেরিয়ে যায় তখন তার মনে আরও আনন্দ তরঙ্গ তৈরি করে—'ঘরে চোখ বুজে শুয়ে....মনে হয় কেত্তনের দলের খোল বাজছে'। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) মোট কথা, ট্রেন কাহারদের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তারের কারণে সময়ের নতুন এক পরিমাপক হয়েছে ট্রেনের যাওয়া-আসা।

বনওয়ারী একদিন মাইতো ঘোষকে চন্দনপুরে ট্রেন ধরাবার জন্য মালপত্র সহ পৌঁছে দিচ্ছিল। বনওয়ারী দ্রুতপদে ('সতর গমনে') না চললে ট্রেন চলে যেত। মাইতো ঘোষ বলেছিলেন—'বাপরে বাপ' তাকে ছুটতে হয়েছিল প্রায়। বনওয়ারী বলেছিল, ওভাবে না এলে ট্রেন ধরা যেত না। 'উনি তো দাঁড়ান না। টায়েম হলেই ছেড়ে দ্যান।' (২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই সময়ানুবর্তিতা, ব্রিটিশ শাসনের অন্যতম উপাদান ; সভ্যতার অগ্রগতির চালিকাশক্তি। কাহাররা তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে নি। বনওয়ারী-র সাহেবডাঙার-জমি তৈরি করার জন্য কাহাররা যে শ্রম দান করে, তাকেও ট্রেন সময় বন্ধনে বেঁধেছে। 'রাত্রি ন'টার গাড়ি ঝমঝমিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে পুল পার হ'লেই জমি কাটার কাজ ক'রে কাহারেরা বাড়ি ফেরে।' [৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

দিনের সময়চিহ্ন হিসাবে ট্রেন কাজ করে, শুধু তাই নয়। কখনো কখনো কাহাররা সপ্তাহের আবর্তনও টের পায় ট্রেন যাওয়া-না-যাওয়াকে ঘিরে। রবিবার সন্ধ্যায় ট্রেন যায় না জানে তারা, মনে রাখে কেউ কেউ। চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে শুনে সুচাঁদ বলেছিল 'থানাদার হাঁক দিচ্ছে?' 'ট্যান পুল পেরিয়ে গেল কখন'? বুঝতে তো পারে নি সুচাঁদ! 'বাদ্যির মত শব্দ' পায়নি তো। পাখি মনে করিয়ে দেয়—'আজ অবিবার মনে আছে? আজ সেই ভোর বেলাতে গাড়ি।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) বিষয়টিতে খ্রিস্টিয়ান জীবননীতিও সামান্য আছে। ঈশ্বর ছদিন বিশ্বসৃষ্টি করেছেন—সপ্তম দিন নিয়েছেন ছুটি। রবিবার। গোটা

খ্রিস্টধর্ম-শাসিত বিশ্বে সপ্তাহ সম্পর্কিত এই নীতি ব্রিটিশ ভারতে একই ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। খ্রিস্টাব্দ-চিহ্নিত কালচেতনা আর সাপ্তাহিক কর্মকাণ্ডে তার প্রমাণ ও প্রভাব সূচিত হয়েছে। হাঁসুলী বাঁকের বদ্ধসমাজ তাকে অস্বীকার করতে পারে নি।

রেলপথ পত্তনের সময় প্রকৃতির সঙ্গে যন্ত্র সভ্যতাকে এক প্রস্থ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তার পরোক্ষ চিত্র হালকাভাবে হাঁসুলীবাঁকে ভেসে আসে। করালী দেখেছিল 'রেল লাইনে আটাশ মাইলে' এরকমই একটি বড় সাপ কেমন-শিস দিচ্ছিল। 'আটাশ মাইল' অরণ্য ভূমি। টলিতে করে যাচ্ছে সাহেব। করালী টলি ঠেলছিল। সাহেবের হাতে বন্দুক ছিল, ছিল টর্চ। সন্ধ্যাবেলা। শিস শুনে টলি থামাল সাহেব। টর্চ মারতে মারতে সাপ দেখতে পায়। আর সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দুক তুলে গুড়ুম।' (১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এই আধুনিক যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা প্রকৃতিকে লুণ্ঠন করে। সম্পর্ক তীব্র অবিশ্বাসের, ধ্বংসাত্মক, হিংস্র। করালী এই মূল্যবোধ নিয়ে গ্রামের চন্দ্রবোড়া সাপটিকে হত্যা করেছে। কিন্তু গোটা সমাজ তার পাপকে নিজের কৃতকর্ম বলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছে। রেলপথ, যন্ত্রায়ণ আধুনিকতার প্রকৃতি-বিযুক্তি হাঁসুলী-বাঁকের মানুষরা ভালো ভাবে নিতে পারে নি। পারে নি, চায়ও নি। কিন্তু তার অভিঘাত এতটাই প্রবল যে তাকে এড়াতেই পারে নি। এই অনিচ্ছুক-বাধ্যতার পরিণতিতে কাহিনী বিষণ্ণ গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

রেল লাইন চন্দনপুরে বড় নয়—'ছোট নাইন', তবে তার চৌহদ্দি 'সীমানা-সহরদ্দ মস্ত'। ভালো মন্দ সবই আসে তার টানে। এখানে খাটতে গিয়ে মেয়েরা চিরকালের জন্য গেছে হারিয়ে। পাচী খুকি বেলে চিত্ত নিম্মলা বা সিধু। নৈতিক স্খলন ঘটেছে তাদের। খুকি রেলে চলে গেছে মুসলমান রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে। চিত্ত পালিয়ে গেছে হিন্দুস্থানি লাইন মিস্ত্রির সঙ্গে। নির্মলা গেছে এক মিস্ত্রির সঙ্গে—পাঁচ বছরের বালক করালীকে ফেলে। (২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) পরে অবশ্য করালীর মায়ের নামটি বদলে গেছে যেন। পেবাতী বা প্রভাতী ছিল করালীর মায়ের নাম—এরকম জানিয়েছেন তারাশঙ্কর। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) সিধু বনওয়ারীর খুড়তুত বোন, আর জগদাত্তিও বাঁশবাদির মেয়ে। তাদের পেশা বদলে গেছে। এখন তারা রেল স্টেশনের বাবুদের ('মাস্টারদের') বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে। ইস্টিশানে পোড়া-কয়লা কুড়ায়, কয়লা-চুণের ডিপোতে কামিনের কাজ করে। 'আবার রাত্রিকালে অন্য রূপ ধরে'। (ঐ) এজন্যই মাতব্বর বনওয়ারী তাদের গ্রামে ঢোকা নিষেধ করেছে।

রেললাইনের ধাক্কায় জীবনপ্রবাহ চঞ্চল হয়েছে হাঁসুলীবাঁকের। তারা মনে রাখে তাদের কথা, যারা চলে গেছে—আর কখনো ফেরার সম্ভাবনা নেই যাদের। রেলগাড়ির শব্দ তরঙ্গে তৈরি হয় ছড়া। এখন ছেলেরা মেয়েরা বলে—গাড়িটা বলছে, 'কাঁচা তেঁতুল—পাকা তেঁতুল'। একসময় হাঁসুলীবাঁকের লোকরা বলত—'সিদু-জগা পেবাতী, গেল কুল গেল জাতি—সিদু-জগা-পেবাতী।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) রেলপথ হাঁসুলীবাঁকের নীতি, বিধি আর চলমান অস্তিত্বকে ধ্বংস করেছে।

পাখিকে বিয়ে করে করালী কাহারদের জীবনে যে তরঙ্গ বিক্ষেপ আনল তার ভিত্তি রেল লাইনের চাকরি। আগে ছিল 'চুনো ঘুঁটির অম্বল' আর 'কাঁচা কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত'। এর বাইরে কাহাররা বিয়ের নিমন্ত্রণে কিছু খাওয়াবার কথা ভাবতে পারত না। রেলের নগদ টাকা খরচ করেছে করালী—তিরিশ টাকা ('দেড় কুড়ি'); খাওয়াবে খাসির মাংস ছোলার ডাল। পাখিকে যে-সব অলঙ্কার দিয়েছে তাও বিস্ময়কর। আটগাছা চুড়ি, 'দড়ি-হার', 'কোমরে গোট'—'রূপোর গহনা' এসব। দিয়েছে 'গিলটির গয়না'। সুতাহার, পার্শি মাকড়ি,

বাজু, অনন্তবালা। তার নিজের সাজও বদলে গেছে। 'কাহার পাড়ায় ও যেন মোহন সাজে এক নতুন নটবর এসেছে!' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এত সব নতুন উপকরণ—নতুন সাংস্কৃতিক উপকরণ (cultural goods) রেলপথেরই অভিঘাত বলতে হবে।

সাহেবডাঙার জমি তৈরির সময় করালী বনওয়ারীকে দিয়েছে গাঁইতি। 'রেল কোম্পানীর' 'আনকোরা নতুন' গাঁইতি। বেশ কটা গাঁইতি। পাখি নিয়ে এসেছে। নতুন জমি তৈরি করছে সদ্গোপরা, তাদের সহায়ক অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত সাঁওতাল শ্রমিক দল। বনওয়ারী তাদের সঙ্গে পারছিল না। এই নতুন যন্ত্র (tools) তাদের সাহায্যে আসবে। বনওয়ারী পরম আহ্লাদে গাঁইতিগুলো নেড়ে দেখে। 'খাসা জিনিস। সাহেব কোম্পানীর যন্ত্র।' (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী জানে সাহেবরা অসম্ভব সম্ভব করে। 'সাদারঙ, কটা চোখ'—ওরা সবই পারে। তাদের কীর্তিই রেললাইন—'কল চলে গড় গড়িয়ে লাইনের উপর।' শুধু কি তাই—'আকাশ ফেঁড়ে ভর ভরিয়ে চলে উড়োজাহাজ।' এই প্রকৃতি বিজয়ের অবিশ্বাস্য ব্যাপারগুলি তারা দূর থেকেই দেখে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এই গাঁইতিগুলি তাকে অনেকটাই সাহায্য করল। শ্রম শক্তিকে বাড়িয়ে দিল অনেকখানি। আখ মাড়াইয়ের পর গুড় তৈরির 'শালে' বৃষ্টির বিপদ থেকে এমনি আকস্মিক ভাবেই বাঁচিয়েছিল করালী। রেল কোম্পানির 'তেরপল' এনে দিয়েছিল। 'রেল ইস্টিশানের তেরপল! চাল-ধানের বস্তার উপর বর্ষার সময় চাপিয়ে দেয়, একটি ফোঁটা জল পড়ে না—সেই তেরপল।' (২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) প্রকৃতির বিপর্যয়কর শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার এই সমস্ত আধুনিকতার উপকরণ কাহারজীবনকে বদ্ধ অন্যনিরপেক্ষ থাকতে দেয় নি।

করালী কোঠাবাড়ি তৈরি করার সময় গ্রামসমাজ তার বিরোধিতা করেছে। সেই বাড়ি তৈরির সময় করালী অস্বীকার করেছে কাহারদের মনোজগতে স্থির থাকা বেশ কিছু সংস্কার। হেনেছে প্রবল তরঙ্গ আর চাঞ্চল্য নিয়ে এসেছে। যেমন :

১. যা কেউ কখনো করেনি, তা কাহাররা করার সাহস দেখাতে পারে না। সুচাঁদ-বসন তাই করালীকে নিরস্ত করতে চেয়েছে। এহল চিরাচরিত সংস্কার। বলা বাহুল্য, করালী এই রীতি-সংস্কার মানে নি।
২. রতন-প্রহ্লাদরা যখন ব্যাপারটি জেনেছে, তারা তুলেছে রীতি নিয়মের কথা। কারণ বনওয়ারী নেই—মাতব্বরের অনুমতি নিয়ে নতুন ঘর করতে হয়। 'ঘর করতে নেয়ম হ'ল মাতব্বর এসে দড়ি ধরে।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) ধরা কে 'সরা' নয় 'খুরি' দেখছে করালী। তাদের বলা নিয়ম সে যথারীতি মানে নি।
৩. চৌধুরীদের জমিদারির তখন পড়তি অবস্থা। কিন্তু করালীতো তাদের 'চাকরান প্রজা'। 'বরাবরের নিয়ম, ঘর ভেঙে ঘর করতে হ'লে চৌধুরীদের হুকুম নিতে হয়। মুখে বললেই হুকুম হয়ে যায়—এক টাকা নজর দিতে হয়।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) সেই নিয়ম করালী মেনেছে। শ্বাশুড়ী বসন্তের হাত দিয়ে 'একটাকা নজর' সে পাঠিয়ে দিয়েছে। আটপৌরে পাড়ার নবীন মাহিন্দার মারফৎ করালীকে তবুও ডেকে পাঠিয়েছে চৌধুরীরা। কারণ 'এক টাকা নজর' কোঠাঘর করার কথা, শর্ত কোথাও নেই। করালী তাকেও হাঁকিয়ে দিয়েছে। সেটেলমেণ্ট হয়ে গেছে—'পরচা আছে' ; পরচায় আছে—'বাস্তুভিটা তার। সেখানে যেমন ইচ্ছা ঘর করতে পারে'। সুতরাং এক টাকা নজর যে দিয়েছে সেই অনেক ; খাজনার স্থলে সে বেগার খাটতেও যাবে না—একজনের মজুরি বাবদ পারিশ্রমিকের টাকা সে দিয়ে

দেবে সময় হলেই। পালকি-বহন করবে—এই শর্ত ছিল আগে, এখন 'বেগার'-দেবার কথা এসেছে। পালকি চৌধুরীদের নেই আর, 'বেগার'-এর শর্তই ভালো। সুতরাং করালীর মুখে শোনা গেল 'রীতিমত আইনের কথা।' [ঐ]

কাহাররা এই বিদ্রোহ মানতে রাজি নয়। সংস্কার-মাতব্বরের নেতৃত্ব মেনে নেওয়া আর জমিদারি ব্যবস্থার অধিকার নিঃশর্তে স্বীকার করা—কোনোটিই করালী মানে নি। তাই তার বিপক্ষে বনওয়ারীর সমর্থ চাপ নেমে এল। এর আগে 'দেওয়াল-বারুই'-দের কাজ বন্ধ রাখতে বলেছিল বনওয়ারী। করালী তার প্রতিবাদ করতেই 'বাজ ডেকে উঠল' বনওয়ারীর কণ্ঠে। 'জনাকয়েক চেপে ধরল করালীকে।' বাকি সবাই 'তার কোঠাঘরের বনিয়াদ তছনছ ক'রে দিল।' এই কাজে সোৎসাহে কোদাল নিয়ে টলতে টলতে 'কঙ্কালসার' নয়ান এসে হাজির হল।

করালী অবশ্য এই সাময়িক পরাজয় মেনে নেয় নি। তার জেদ সে বজায় রাখল। মানল না শ্বাশুড়ীর কথা, সুচাঁদের 'হিতবাক্য', 'কাহার পাড়ার বারণ' আর 'মাতব্বরের শাসন'। দুর্বার সে—চন্দনপুর থানায় অভিযোগ করল। ডাক পড়ল বনওয়ারীর। এমনভাবে অপমান বনওয়ারীকে কখনই হতে হয় নি। এর আগে সাপ মেরে ত্রস্ত গ্রামবাসীকে সাহস যুগিয়ে করালী থানা থেকে পুরস্কার পেয়েছিল, বনওয়ারীও তাকে থানায় পরিচয় করিয়ে এসে মোটামুটি সম্মান বজায় রেখেছে। আজ তার মান ধুলোয় মিশিয়ে গেল। রতন-প্রহ্লাদ আর নবীন মাহিন্দার গেল সঙ্গে। মাইতো ঘোষের বুদ্ধিতে সবাই বলল চৌধুরীর হুকুমেই 'বনেদ' কেটেছে তারা। দারোগাবাবু বললেন—তা চলবে না। জমির মালিক চৌধুরীরা 'খাজনার মালিক, খাজনা পাবে'। 'পাড়ার নিয়ম'ও চলবেনা। ওখানে করালী 'কোঠাই করুক আর গম্বুজ করুক, ওকে করতে দিতে হবে।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী আশঙ্কা প্রকাশ করে ('খ্যানত' যদি কিছু হয়)—করালী সে আশঙ্কা ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়—'হয়, আমার হবে।' এর বিরুদ্ধে আর কিছু বলার থাকে না। উপরন্তু জমাদারবাবু ক্ষতিপূরণ বাবদ 'একটি খাসি' চেয়েছিল বনওয়ারীর কাছে। এতো মৃত্যুর অধিক বেদনা, তার—করালী তখন উপস্থিত ছিল না। সে তখন গ্রামে ফিরে গিয়ে তৈরি করতে লেগেছে নতুন কোঠাবাড়ি!

কোঠাবাড়ির ব্যাপারটায় করালীর বিজয় আসলে কাহার সমাজে নতুন কিছু বিষয় প্রমাণ করল। প্রথমত, চিরাচরিত রীতি নিয়ম আর তারা মানতে চায় না এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। কাহার সমাজের পুরোনো 'বনেদ' গেল ভেঙে। মাথলা নটবর সহ যারা 'প্রকাশ্যেই করালীর দলে' যোগ দিয়েছে, তারা খুশি হল। এই প্রতিক্রিয়াটি বনওয়ারীর পরাজয়ের ভূমিকা হয়ে দেখা গেল। দ্বিতীয়ত, কাহারদের আত্মশাসন ব্যবস্থা—মাতব্বরি, জাতিগত মোড়লি-র রীতি সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হল। তৃতীয়ত, সামন্ত প্রভুদের স্বেচ্ছাচার, 'নজর' ও অন্য রকম অর্থদণ্ড করার রীতি করালী বাতিল করেছে। সমাজ নয় করালীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল এইভাবে। ব্রিটিশ শাসনের সমদর্শী ভাব এখানে স্পষ্ট হল। কাহাররা ব্রিটিশ আইনের নিয়ম কানুন মানতে বাধ্য হল। পাড়ার নিয়ম বলে কোনো সমান্তরাল ক্ষমতার বৃত্ত গেল ভেঙে।

খাসি জরিমানা ব্যাপারটি ছিল নিছক ঘুষ। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নিম্নস্তরে দুর্নীতির এইরকম ঘটনার ইঙ্গিত আগেও দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। সাপের শিস শুনে ত্রাসের সঞ্চার হওয়াই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক—থানা থেকে যারাই বাঁশবাদিতে আসে তারাই কিছু না কিছু উপহার পেয়ে থাকে—উৎকোচ হিসাবে। আজ কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ

অন্যরকম হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছে। করালী 'স্বদেশী বাবুদের' সঙ্গে পরিচিত। ঘুষ নেবার খবর শুনে বলেছিল 'ক্ষতিপূরণ' তো সে দাবি করে নি—তাই এই খাসি দেবার ব্যাপারটি অন্যায়। তার প্রস্তাব—'মাতব্বর' রাজি থাকলে 'স্বদেশী বাবুদের কাছে' নিয়ে যেতে পারে সে। 'খাসি পেট থেকে বার করব দারোগার।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই দুঃসাহস কাহারপাড়ায় আর কারো নেই। নতুন সময়ের যাবতীয় উপকরণ দিয়ে করালীকে তৈরি করেছেন তারাশঙ্কর।

কোঠাবাড়ি তৈরি করছে করালী—অনেক টাকার ব্যাপার। অত টাকা সে পাবে কোথায়? বসন প্রশ্ন করেছিল। ইস্টিশানে একজনের কাছে টাকা ধার করবে করালী। লোকটি মাড়োয়ারি—'গোটা ছোট লাইন বরাবর লাইনের বাবু থেকে আরম্ভ করে কুলীদের' ধার দেয়। মাসের শেষে কিছু 'আসলে উসুল' করতে হবে। 'দিতে পার ভাল, না পার তম্বি নাই।' 'তিনমাসের মাসে' 'আসলে উসুলে কিছু চাই-ই'। করালী স্থির করেছে, তার কাছেই একশো টাকা ধার করবে। 'একটাকা 'ল' আনা' সুদ-আর আসলে-উসুলে যদি 'সপ্তাহে আড়াই টাকা' করে শোধ করা যায় তবে প্রায় দশমাসে একশো টাকা শোধ হয়ে যাবে। 'সূক্ষ্ম হিসেব সে পরে' বুঝিয়ে দেবে। (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) হাঁসুলীবাঁকে এই হিসাব—কারবার সম্পূর্ণ অজানা। হতবাক হয়ে যায় বসন। চিরাচরিত হিসাব—লেনদেন তাদের। সবটা স্পষ্ট নয়—বেশির ভাগটাই সদগোপদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত। নতুন যারা করালীর সঙ্গে মিশেছে তাদেরও সে এরকম নতুন ঋণচক্রে এনেছে। মাথলা চাল তৈরি করার জন্য তার কাছে 'তিরিশ টাকা ধার' নিতে চলেছে। কাহারদের পক্ষে এই রকম নগদ লেনদেন অবিশ্বাস্য-রকম নতুন।

১৯৩৫ নাগাদ ব্রিটিশদের ভারতশাসন বিধিতে স্বায়ত্তশাসনের অবকাশ ছিল। সেই ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রিক নির্বাচিত (বা মনোনীত) প্রতিনিধিদের মারফৎ ইউনিয়ান বোর্ড জাতীয় বিভিন্ন প্রস্তাব ছিল। শুধুমাত্র করদাতাদের ছিল নির্বাচনের অধিকার। এই সুযোগে জাঙল গ্রামের ঘোষকর্তা ইউনিয়ান বোর্ড-এর সদস্য হয়েছেন। ইউনিয়ান বোর্ডের মারফৎ গণবণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিবেশে যুদ্ধের প্রয়োজনে দুরকম গণবণ্টন ব্যবস্থার পত্তন হয়। সাধারণ মানুষ রেশন দোকানের মাধ্যমে কেরসিন, চিনি, কাপড়, 'কুইনিয়ান বড়ি' পায়। অন্যপক্ষে রেলকাম্পানি যুদ্ধের ব্যবস্থায় ঢুকে পড়ার পর যারা কাজ করছে তারা এইরকম উপকরণ কম পয়সায় পায়। ঘোষবাড়ির বড়কর্তা ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য, তার 'হুকুম চিঠি'না পেলে কাহাররা কিছুই পায় না। (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) 'যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে' যারা তারা তেল, চিনি, আটা, ঘি, কাপড় পায় 'জলের দামে'। অন্যরা যখন চাল পায় ষোল টাকা দরে করালীরা পায় পাঁচ টাকায়। একই বাজার অর্থনীতিতে ভোগ্য সামগ্রীর নানা রকম দাম—কাহারপাড়াতে সংকট, বাড়িয়েছে, বনওয়ারীর প্রতিপত্তি কমেছে—করালীর আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে!

বড়কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সাহস করালী পেয়েছে কোথা থেকে? সম্ভবত স্বদেশীবাবুরাই তার ক্ষমতার উৎস। ইউনিয়ান বোর্ডের 'সেক্রেটারি'-র কাছে কাহারদের জন্য এনেছে রেশন কার্ড। বনওয়ারী ক্ষুব্ধ—কার্ড ছিঁড়ে ফেলল। অন্যদেরও বলল—'ফেলে দাও কার্ড'। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) কিন্তু এবার বনওয়ারীর কথা কেউ শুনল না। প্রহ্লাদ বলল—'কাড দিয়েছে নিউনাইন বোড আমরা বেগার দি। আমাদের কাড কেন ফেলে দোব।' এ প্রশ্নের উত্তর বনওয়ারীর কাছে নেই। সে কেবল জিজ্ঞাসা করেছে ঘোষরা

কেরসিন দিত না একথা তারা ওপর মহলে বলবে কিনা। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বনওয়ারী সামন্ত্রতন্ত্রের শক্তিকে রক্ষা করার—তার ভিতরকার যাবতীয় ফাঁক ফোকর মেরামতির কাজই করেছে। নতুন ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে সে ব্যর্থ।

খবরের কাগজ টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সংবাদ-বিনিময় মাধ্যমের শক্তি চন্দনপুরকে আধুনিক করেছে। করালীর মরফৎ সেই শক্তি কতকাংশে কাহারদের মধ্যে চালান হয়েছে। কাহারদের বিস্ময়ের ঘোর কটেনি, কিন্তু সম্পূর্ণ অস্বীকার করতেও পারেনি নতুন নতুন উপকরণের প্রবল অভিঘাত। মাথলার ছেলে মারা গেল সাপের কামড়ে। করালী জানে সময়মত ওর চিকিৎসা হলে মাথলার ছেলে মারা যেত না। বনওয়ারীর ধারণা, ছেলেটার মৃত্যু ঘটেছে করালীরই পাপে! 'শয়তানির কারণে'। করালীর স্পষ্ট কথা—'মিলিটারী হাসপাতালে' 'সাপের বিষের ইনজেকশন আছে'—সেখানে নিয়ে গেলে মাথলার ছেলেটা মারা যেত না ; এর পর অমন হলে 'সঙ্গে সঙ্গে' হাসপাতালে নিতে হবে। এহল একই ভূগোলে দুই কালচিহ্নিত মূল্যবোধ আর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি। কেরসিন তেল কাহাররা পাচ্ছে না—ঘোষকর্তারা যে দুর্নীতির উৎস 'চোরার একশেষ'—বড়ঘোষ, এই সংবাদও স্পষ্ট করে বলতে পারে করালী। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) তার মাধ্যমে তাই কাহারদের চিরকালের জীবন পরিধিটি ছত্রখান হল। যেখানে নতুন কোনো যোগায়োগ ব্যবস্থাই ছিল না, কাহাররা ছিল চালক বা বাহক—চিরদিনের 'পদাতিক', সেখানে রেল হানল প্রথম আঘাত, উড়ে চলল উড়োজাহাজ সেই আকাশে, আর সাহেবদের মোটরগাড়িও এসে ধুলো ওড়াতে থাকল। প্রহ্লাদের দিগম্বর ছেলে ছুটে এসে খবর দিল—'ওগো, মাতব্বর গো, এই মেলা সায়ের গো! মটর-গাড়ি গো!' (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) শুধু কি তাই—'কালারুদ্দুর পাট আগনে' তাঁবু ফেলেছে তারা—'আপিস' হবে। করালী এসেছে সঙ্গে। সাহেবদের কাছে 'করালী বারবার সেলাম' করছে। যে কালারুদ্র ছিল জাঙলের দেবতা—বনওয়ারী থেকে আরম্ভ করে গণ্ডার কাহার সবাই যার মূল ভক্ত হয়ে কৃচ্ছ্র সাধন করেছে যুগে যুগে—যে কালারুদ্রের চড়ক বিশ্ব-সংসারের কালপ্রবাহটি চক্রে করে আদি কাল থেকে ঘোরাচ্ছে—সেই যুগ যুগান্তের শক্তি আজ সাহেবদের মোটর গাড়ির আড্ডা, বাঁশ চালান দেবার ঠিকাদারদের কাজকর্মের ক্ষেত্র হয়ে উঠল। 'বাবার থানকে কেটে কুটে সমান ক'রে মটরগাড়ির আস্তানা' তৈরি হয়েছে। (শেষ পর্ব) পাগলের কাছে এই সংবাদ শুনে বনওয়ারীর বাঁচার ইচ্ছা নির্বাসিত হয়ে গেল।

১৬

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : লোকসংস্কৃতির উপাদান

লোকসংস্কৃতিকে গবেষকরা বলেছেন জীবন্ত জীবাশ্ম—'Living fossil'. যা মারা গেছে আবার বেঁচেও আছে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় সর্বত্র এই অপরূপ বিষয়টিকে বর্ণালী বিচ্ছুরিত হতে দেখি। মনে হয় একটি অঞ্চলের একটি বদ্ধ সমাজের শেষবারের মতো এক উচ্চারণ শোনা গেল ; এই শেষবারের মতো। আর শোনা যাবে না। কাহার সমাজকে ঘিরে এমনি এক হারিয়ে-যাওয়া সময়ের স্পন্দন লক্ষ করি। আর সেই সঙ্গে কাল-চিহ্নিত ভাবনার সূত্রও ধরা পড়ে এই স্পন্দিত চাঞ্চল্যে।

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী একটি প্রবন্ধে লিখেছেন লোকসংস্কৃতির বিষয়কে দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি' (২) 'বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি'। (পশ্য: "হাসুলী বাঁকের উপকথা ও লোকজ উপাদান"; অলোক রায় সম্পাদিত : *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা পাঠ ও পর্যালোচনা* ; উক্ত; ১৫৮ পৃ.) সম্ভবত তিনি ভাষিক ও নির্ভাষিক লোক-সংস্কৃতির প্রাথমিক বিভাজনটি স্মরণ করেছেন। ভাষাবাহিত লোকসংস্কৃতি আর ভাষা-নির্ভর নয় এমন বিষয়চুম্বিত লোকসংস্কৃতি—এইভাবে ভাবলে লোকসংস্কৃতির প্রকাশের দিকটি গুরুত্ব পায়; অন্যভাবে ভাবলে বিন্যাসের দিকটি প্রাধান্য পায়। যাইহোক ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তীর বিন্যাসটির সঙ্গে ড. মযহারুল ইসলামের বিভাজন প্রণালীর বেশ কতকটা মিল দেখা যায়। একটু দেখাই :

ড. মযহারুল ইসলাম : 'মেজাজ এবং চারিত্র্য অনুসারে ফোকলোরকে পণ্ডিতগণ দুভাবে ভাগ করেছেন— 'Material Folklore অর্থাৎ বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর এবং Formalised Folklore বা Non Material Falklore অর্থাৎ সাহিত্য ও শিল্পকেন্দ্রিক ফোকলোর।' [*ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন* ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা ; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩ ; প্রথম সংস্করণ ১৯৭৪; ১৭পৃ.]

তবে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী—কথিত : Formalised Folklore বা অ-বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি এবং....... Material Falklore বা বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি—এই ভাগের চেয়ে মযহারুল ইসলামের বিন্যাস বলা বাহুল্য, তাৎপর্যপূর্ণ।

ড. মযহারুল ইসলামের বই অনেকদিন আগে প্রকাশিত। তাঁর বিন্যাস একটু অদলবদল করে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সন্ধান মিলিয়ে সারণীভুক্ত করে দেখাই।
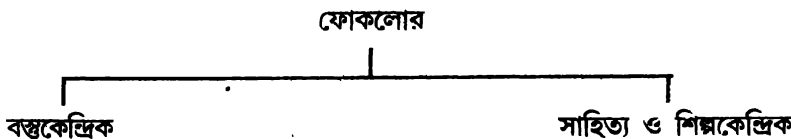
বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি : ১. লোক কাহিনী : ১.১. পুরাকথা (Myth)
১.২. কিংবদন্তি (Legend)
১.৩. পরীকথা (Fairy tales)
১.৪. রূপকথা (Marchen)
১.৫. নীতিকথা (Fables)
১.৬. প্রাণীকথা (Animal tales)
১.৭. ভৌতিক লোককথা (Ghost tales)
১.৮. বোকাদের গল্প (Numskull tales)
১.৯. হাস্যকৌতুক (Humorous tales)
১.১০. সাংসারিক গল্প (Household tales)
১.১১. শিকলি কাহিনী (Chain tales)
১.১২. ব্রতকথা (Ascetical tales)
১.১৩. সত্যঘটনাশ্রয়ী ক্ষুদ্রকথা (Anecdotes)

২. গীতিকা :

৩. লোক সঙ্গীত : ৩.১.১. বাউল
৩.১. ধর্ম সঙ্গীত : ৩.১.২. মুর্শেদি
৩.১.৩. মাইজ ভাণ্ডারি
৩.১.৪. মনসার ভাসান
৩.২ আঞ্চলিক সঙ্গীত : ৩.২.১. ভাটিয়ালি
৩.২.২. ঘেটু
৩.২.৩. জারি
৩.২.৪. সারি
৩.২.৫. ভাওয়াইয়া
৩.২.৬. গম্ভীরা
৩.২.৭. ঝুমুর
৩.৩. সাময়িক/আনুষ্ঠানিক : ৩.৩.১. সাইটোল বিষহরি
৩.৩.২. বারমাসী
৩.৩.৩. নবান্নেরগান

৪. ছড়া

৫. প্রবাদ

৬. ধাঁধা

৭. লোকনাট্য : ৭.১. আলকাপ
৭.২. সঙ
৭.৩. অষ্টক
৭.৪. পঞ্চরস
৭.৫. যাত্রা
৭.৬. রামলীলা
৭.৭. কৃষ্ণলীলা (কালীয় দমন)

৮. লোকনিরুক্তি (Folk-Etymology):
৯. মন্ত্র
১০. শপথ, ভর্ৎসনা, গালাগাল ইত্যাদি

বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি :
১. লোক বিশ্বাস
২. লোকাচার
৩. লোকখাদ্য
৪. লোক প্রযুক্তি
৫. লোক ঔষধ
৬. লোক পরিচ্ছদ
৭. বিশেষ লৌকিক পানীয়
৮. লোকগান
৯. লোকনৃত্য
১০. লোকক্রীড়া

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসটি সাধারণভাবেই উপকথা বা tale-ধর্মী। এখানে লোককাহিনীর অজস্র উপাদান দেখতে পাই। সুচাঁদের বলা কথা প্রায়ই পুরাকথা-ধর্মী। সৃজনের কাহিনী, উদ্ভব ও ধ্বংস পুনঃসৃজন বা মন্বন্তরের কাহিনী—মিশে আছে গোটা আখ্যানে।

কেমন করে নীলকররা হারিয়ে গেল, উঠে এল কাহারদের নতুন যুগের অধিকারী ভূমিবান চোধুরীরা তার গল্প কিংবদন্তি জাতীয় (১.২)। ধর্মপথে থাকলে অর্ধেক রাত্রে ভাত মেলে—এটি নীতিকথা জাতীয় (১.৫)। অমাই-খোনা কাহারদের গল্প ভৌতিক লোককথা-জাতীয় রচনা (১.৭)। সত্য-ঘটনাশ্রয়ী ছোট ছোট কথার পরিচয় আছে রতনের বাবা 'কলকাটা'র কাহিনীতে (১.১৩)। 'কলে তার চারটে আঙুল কেটে গিয়েছিল।' (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) আর আছে রূপকথার একাধিক সূত্র (১.৪)। এই অংশগুলি কাহিনীর বর্ণনার সঙ্গে আশ্চর্য ভাবে মিশে আছে। ঔপন্যাসিকের মূল শিল্পরহস্যই এখানে—এগুলিকে পৃথক করা যায় না কাহিনী-সংলাপের চালচিত্র থেকে। রূপকথার ঢং কিভাবে কাহিনীবর্ণনার ঢংটি নিয়ন্ত্রণ করেছে, একটু দেখাই। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি :

১. জাঙলের ঘোষবাড়িতে সদ্য পিতৃহীন ছোকরা মানুষ—চন্দনপুরের 'বড়বাবুদের নতুন শখের থিয়েটারে মেয়ে সেজে বক্তৃতা' করে বেড়াত। বাড়িতে বিধবা মা, তরুণী স্ত্রী। তাদের প্রতি দায়-দায়িত্ব বোধ করত না কিছু। 'ছেলেকে বারবার রোজগারে মন' দিতে বলে ব্যর্থ হয়ে মা তার এক কাণ্ড করে বসলেন। রাত্রে ছেলে ফিরল—ভাত চাইল। মা তার 'এক খানা ভাঙা থালায় এক মুঠো সত্যি সত্যি ছাই এনে নামিয়ে দিয়ে' বলেছিলেন 'খাও'! ছেলে কিছুক্ষণ মায়ের দিকে চেয়ে থেকে 'উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)। এইরকম রূপকথা বাংলায় বেশ পরিচিত। বেশ কয়েক বছর পর 'ঘোষ একদিন ফিরল রোজগার ক'রে। সেই ঘোষেদের ঘরে লক্ষ্মী এলেন।' (ঐ) রূপকথার রাজপুত্র যেমন ভাবে এসে পড়ে এও যেন তেমনি।

২. সুচাঁদ পিসির কাছে শোনা রূপকথার স্মৃতি বনওয়ারীকে তাড়িত করে। 'এক আজব কন্যেকে যে বিয়ে করত সেই মরত। কন্যের নাক দিয়ে আত্রিরে সুতোর মতো সরু হয়ে বের হত এক সাপ'—সে ক্রমে ক্রমে বড় হত। চেহারা দাঁড়াত 'অজগরে'র মতো। 'তারপর সে ডংসাত আজকন্যের বরকে।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) রেভারেণ্ড লালবেহারী দে-র *Folktales of Bengal*-এর বর্ণনা উদ্ধার করছি : 'In the dead of night he perceived somthing like a thread coming out of the left nostril of the queen. The thread was so thin that it was almost invisible....when the whole of it had come out, it began to grow thick, and in a few minutes it assumed the form of a huge serpent' ("The Story of Swet-Basanta" ; *Folktales of Bengal* ; বুক সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া; কলকাতা ; ১৯৭০ ; প্রথম সংস্করণ ১৮৮৩ ; ৯৫ পৃ.) প্রচলিত রূপকথাকে এমন ভাবে প্রয়োগ করলেও সুবাসীকে নাগিনী-কন্যা ভেবে ভয় পাওয়ার যে মনস্তত্ত্ব তারাশঙ্কর বনওয়ারীর মাধ্যমে উপস্থিত করেছেন তা তাঁর নিজস্ব নির্মাণ। 'সুবাসীর নাকের কাছে হাতের তালু রেখে নিশ্বাস অনুভব করে!' বনওয়ারী পরীক্ষা করে 'সুতোর মত কিছু বের হচ্ছে কিনা'। (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) এই ভয় কেবলমাত্র প্রেতজগতের নয়—নাগলোকেরও। বনওয়ারীর অস্তিত্বকে সর্বাঙ্গীণ চঞ্চল করে এই ভয়ের মনস্তত্ত্ব (Fear Psychosis)। কত্তার বাহন চন্দ্রবোড়ার হত্যা থেকে তার শুরু। ব্যক্তি বনওয়ারী আর কাহার সমাজ—সকলেই এই ভয়ের মনস্তত্ত্বে আচ্ছন্ন।

সঙ্গীতের প্রয়োগ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছি, এখানে নতুন করে উল্লেখ করছি না। ছড়া-প্রবাদ বিষয়েও তেমনি হয়েছে। পূর্বেই এনিয়ে আলোচনা করেছি। বিচিত্র যে-সব নাম দেয় হাঁসুলীবাঁকের মানুষরা—তাতে লোকনিরুক্তি আছে। শপথ-ভর্ৎসনা-গালাগাল কেমন করে হাঁসুলীবাঁকের মানুষদের ভাষাকে বর্ণিল করে তোলে সে-বিষয়ে পুনরুক্তি করছি না।

প্রবাদ সম্পর্কে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন 'লেখকের সরাসরি প্রবাদবাক্যের ব্যবহার' হাঁসুলীবাঁকে কম (এরকম ১২টি প্রবাদ বাক্য দেখিয়েছেন তিনি) আর 'নিজের জবানিতে' কতকগুলি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন (এরকম ৭টি প্রবাদ বাক্যের উদাহরণ এনেছেন তিনি)! (পশ্য: উক্ত প্রবন্ধ ; ১৫৮-১৫৯ পৃ.) উপন্যাসে কখনই এরকম ঘটে না। কিছুটা চরিত্রের কিছুটা লেখকের জবানি—এমনভাবে পৃথকীকরণ ঘটালে উপন্যাস শিল্পের দাবি বা চাহিদা মেটে না। বর্ণনা কখন লেখকের ভাষ্যকে স্পর্শ করে, কখন লেখকের ভাষ্য কথকের বাচ্য বা কথনরীতিকে স্পর্শ করে তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম রহস্যময়। বাখতিন চরিত্র-কথক আর লেখকের বিনিময়-প্রসঙ্গ—দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ও বিচিত্র বিমিশ্রণ নিয়ে তাঁর দ্বি-বাচনিক কল্পনার তত্ত্বটি দাঁড় করিয়েছেন। সেই তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় থাকলে কিছুতেই এরকম কথা লেখা যায় না। এবার দেখাই 'লেখক নিজের জবানি'তে যে প্রবাদগুলি উত্থাপন করেছেন বলে ড. চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তার মধ্যে কতগুলিতে কেমন করে কথক-চরিত্রের ভাবনার বিমিশ্রণ ঘটেছে।

১. 'ছাই ফেলতি ভাঙা কুলো।' (ড. চক্রবর্তী লিখেছেন 'ফেলতে') এই প্রবাদ বাক্যটিতো পাখির কথার থেকে তুলে ধরেছেন! (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) একে লেখকের জবানিতে বলা প্রবাদ বলা যায় না।

২. 'যার লেগে মরি, তার ঘা সইতে নারি'—এটিও পাখির বলা। রীতিমত উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করেছেন তারাশঙ্কর! [১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]
৩. 'নদীর ধারে বাস, ভাবনা বার মাস'—প্রবাদটি পূর্ববঙ্গের দারোগাবাবুর বলা। এখানেও উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত। [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]
৪. 'বেগুনে কেন খাড়া? না বংশাবলীর ধারা।'—এ প্রবাদটি মোটেই লেখকের জবানিতে বলা নয়। এহল 'কাহারদের পুরুষে চলে' আসা কথা। বলেছে সুচাঁদ। [১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

কি রকম অমনোযোগে লেখাটি তৈরি হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে। বিশেষত ড. চক্রবর্তীর দেয়া উদাহরণ প্রথম পর্বের সীমানা পার করে নি।

হাঁসুলীবাঁকের কাহাররা যে-কথা নিজেদের মধ্যে প্রচলন করেছে তার তিনটি মাত্রা :
১. কথক সুচাঁদের মনোজগৎ; স্মৃতি ধরে রাখার আন্তরিক সামর্থ্য যার নিজস্ব।
২. সংগঠন বনওয়ারীর ক্রিয়াশীলতা ; কথা যেখানে কৃত্য (ritual বা rite) -তে পরিণত হয়েছে। কথা ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে দৃষ্টান্ত তৈরি করে—নতুন নতুন কথার জন্ম দেয়। কথার ধারাবাহিকতা তৈরি হতে থাকে।
৩. মনোরঞ্জক পাগল আর নসুবালার নন্দিত উপস্থাপনা— performance-এর দ্বারা কথা হয় গান বা নাচ। তৈরি হয় অনন্ত জীবনপ্রবাহ।

উক্ত তিনটি মাত্রা সমাপতিত হয় বলেই হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় লোকসংস্কৃতি জীবন্ত একটি বাস্তবের স্পর্শ নিয়ে আসে।

উপকথার সঙ্গে নীতিকথার মিশ্রণ লক্ষ করা যায় হাঁসুলীবাঁকের কাহার মনস্তত্ত্বে। তারা যেন যা ঘটেছে তাই স্মরণ রাখে না—যা হওয়া উচিত তাকেও ধরে রাখতে চায়। কাহারদের প্রথম প্রভু নীলকররা হারিয়ে গেল—এল চৌধুরীরা। এই যুগান্তর পরিস্থিতি কাহারদের সৃষ্টি-বিবরণে ধরা পড়েছে। এ-এক মন্বন্তর—'মনন্তরা'। চৌধুরীরা পেলেন যখের ধন। তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটালেন কত্তাবাবা। বললেন : 'আমার পুজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথিকে জল দিস, ভিখিরীকে ভিখ দিস, গরীবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) দেবতা একথা বলেন নি—যাদের দেবতা, তারাই এরকম একটি কাম্য অবস্থার কথা ভেবেছে। অর্থাৎ তারা উপকথার মধ্যে জুড়ে দিয়েছেন তাদের স্বপ্ন-লীন আকাঙ্ক্ষা। পূজা ধর্ম সম্বন্ধীয় কৃত্য, অতিথি-বাৎসল্য, দয়া দাক্ষিণ্য দেখানো নীতি আর সদাচারের অঙ্গ। সমস্তই একসঙ্গে উপস্থিত হয়েছে এখানে। কাহাররা পুজো করতে পারে, কিন্তু তাদের পক্ষে অতিথি-বাৎসল্য বা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন অসম্ভব। উচ্চবর্গ এসব পালন করুন এই তাদের ইচ্ছা। উপকথার সঙ্গে জীবন্ত লোক-সংস্কৃতির যোগ এখানে।

কাহারদের উপর সংগঠিত ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট নয়। প্রত্যক্ষ প্রভাব বেশি নেই। হিন্দু সমাজের প্রভাব তাদের উপর অবশ্যই যথেষ্ট। মুসলমানদের কথা, তাদের ধর্ম দর্শনের কথাও সামান্য আছে হাঁসুলীবাঁকে। লৌকিক স্তরে হিন্দু-মুসলমানদের বিমিশ্রণ কেমন করে ঘটছে তার পরিচয় বনওয়ারীর ভাবনায় ধরা পড়েছে। বৈষ্ণব ফকিরদের ভাবনা—'এ দুনিয়া আজব কারখানা'। বনওয়ারীকে অত্যন্ত বিহ্বল করে দেয়। বনওয়ারী ভাবতে থাকে 'আল্লা-তালার আজব কারখানা।.... ..বাউল আসে, বৈষ্ণব আসে, সন্ন্যেসী আসে, সবাই ওই এক কথাই শুনিয়ে যায়।' (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) সেই ভাব-পরিকল্পনা অনেকটাই

সহজিয়া। সহজ অর্থাৎ যা নিয়ে আমরা জন্ম নিই। 'দেহের খাঁচায় অদেখা অচেনা পরান পাখি' আসে—'হাড়ের কলা নিয়ে খাঁচা তৈরি', 'পরিপাটি চামড়ার ঘেরাটোপ' দিয়ে ঢেকে দেওয়া ; কোথা থেকে তার মধ্যে এসে ঢোকে পরানপাখি। 'সে পাখি নাচে, বুলি বলে, কত রঙ্গ করে!' জীবন ব্যাপারের এই অপরূপ ব্যাখ্যান বাংলার লোকায়ত ভাবনার স্তরে অত্যন্ত জনপ্রিয়। লালন ফকিরের গানে এই রহস্যের ইশারা ছড়িয়ে আছে বাঙালির মনে। 'খাচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়'। কাহাররাও অবাক হয়—কখন একদিন মৃত্যু আসে—'একদিন ফুরুৎ করে উড়ে পালায়'—সেই পাখি। সামান্য প্রভাবিত হলেও কাহাররা তাদের guardian deity অভিভাবক দেবতার কাছেই ফিরে আসে। 'বাবাঠাকুরের বেলতলায় এবং 'কালারুদ্দে'র দরবারে লুটিয়ে পড়ে তারা বলে—'অপরাধ মাজ্জনা কর বাবা! কোলের কাছে অন্ধকার, তুমি অইচ' পক্ষ দিয়ে ঢেকে, বক্ষ দিয়ে আগুলে' অথচ তোমাকে অন্য রহস্যের ব্যাখ্যানে খুঁজে ফিরছি। আসলে, এই দেবতা—শিলারূপী fetish. তাকে ঘিরেই কাহারদের যাবতীয় জীবন আচরণ, কথা ও কৃত্যের বিস্তার। এর বাইরের তাদের কোনো আকাঙক্ষা নেই। কাহারদের লোকধর্মের এই দুই স্তর অবিষ্কৃত হয় :

লোকধর্ম ⟨ জীবন রহস্যের পরিচয়—বাউল-ফকির ধর্মের প্রস্তাব
জীবন যাপনের সবক্ষেত্রে লোকদেবতা-কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান

উপরের স্তরটি কাহারদের খুব প্রভাবিত করে না।

নয়ানের মৃত্যুর পর পাগল কাহার একটি গান গেয়েছে ; সে-গানে জীবন-মৃত্যুর দার্শনিক পরিকল্পনাটি বেশ স্পষ্ট হয়। অন্ধকারের ভাবনা অবান্তর—অন্ধকারেই প্রাণপাখি অন্য এক দেশে চলে যায়। মহান এক পুরুষ সেখানে হাত বাড়িয়ে ডেকে নেয়।

'দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাইরে' [৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

পাগল কাহার হাঁসুলীবাঁকের সংস্কার সংস্কৃতিতে বাইরের উপাদান বহন করে আনে। এই বিশ্ব-ভাবনা (cosmic imagination) তাদের ভাববিশ্বে উচ্চস্তরীয় দার্শনিক আদর্শ দ্বারা কিঞ্চিত অভিযোজিত হয়েছে বলে মনে করি।

হাঁসুলীবাঁকে কাহারদের উপকথায় পুরাণ-কথা কখনো প্রায় অবিকৃতভাবে উপস্থিত। অনুরূপ কয়েকটি পুরাণ-কথার পরিচয় আনছি।

১. **বাণ গোঁসাই-*এর কথা***। হাঁসুলীবাঁকে উপকথাটি এইরকম—বাণ গোঁসাই ছোট জাতের রাজা; 'ভোলামহেশ্বর কালারুদ্দের ভক্ত'। তার একমাত্র কন্যা রুষাবতী, ঊষা। তার সঙ্গে নারায়ণের নাতির প্রেম সম্পর্ক গড়ে উঠল। বাণ গোসাঁই তাকে হাতে নাতে ধরে বন্দি করলেন। নারায়ণ জানতে পারলেন। চক্রদিয়ে বাণের হাত পা কেটে ফেললেন। 'তবু গোসাঁই হারে না, মরে না'—শেষ পর্যন্ত এলেন স্বয়ং শিব, কালারুদ্র। তিনি নারায়ণের নাতির সঙ্গে রুষাবতীর বিয়ে দিলেন। হরি-হরের মিলন হল। কাটা হাত পা জোড়া লাগানোর কথা ভাবতেই কালারুদ্রকে বললেন বাণ—কাটা হাত পা না থাকুক ক্ষতি নেই। রাজা হবার বাসনাও তার নেই। শুধু ইচ্ছা তার 'জাত-জ্জাত পেজা সজ্জন ছাড়া' অন্য কেউ যেন তার পুজো না করে—শিবের গাজনে ছোট জাতরাই যেন ভক্ত হবার অধিকার পায়। [২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ]

'বিষ্ণুপুরাণ'-এ কাহিনীটি সামান্য ভিন্ন ভাবে আছে। ঊষার প্রেমাস্পদ সেখানে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। [পশ্য : সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত—*পৌরাণিক*

অভিধান ; এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা ; চতুর্থ সংস্করণ ; ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ ; প্রথম সংস্করণ ; ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ; ৬৯-৭০ পৃ.]

২. **ইন্দ্র রাজার হাতির কথা**। ইন্দ্র জলদাতা। হাতিতে চড়ে 'মেঘের সাত সমুদ্র' ঘুরে বেড়ান ইন্দ্র। মেঘের সাত সমুদ্র থেকে জল টেনে বৃষ্টি দেয় ঐ হাতিই। মাঝে মাঝে ইন্দ্র বজ্রদণ্ড দিয়ে হাতিকে আঘাত করেন। 'ঝলকে ওঠে আগুনের লকলকানি'। পড়ে বাজ। আবার কখনো হাতিটি একাই বেরিয়ে পড়ে—তখন হয় জলস্তম্ভ। 'প্রলয় কাণ্ড বেধে যায়।'[৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

পুরাণ-কথায় ইন্দ্রের বাহন ঐরাবত। 'ইরাবৎ অর্থাৎ জল থেকে উদ্ভূত—এই থেকে এর নাম ঐরাবত'। (*পৌরাণিক অভিধান* ; উক্ত ; ৭৭ পৃ. পুরাণে শক্তি মদমত্ত ঐরাবতের সঙ্গে গঙ্গার দ্বন্দ্বের কথা সামান্য আছে। হাঁসুলীবাঁকে ঐরাবতের সঙ্গে ঝড় বাদল, প্রলয়ঙ্কর জলস্তম্ভের সম্পর্ক কাহারদের নিজস্ব পুরাণ-নির্মাণ।

৩. **মনসা-কথা**। মনসার কোপে লখিন্দরকে সাপের কামড়ে বাসরঘরে মরতে হয়েছে। লোহার বাসরঘরে। দেব কোপ কোনভাবেই এড়ানো যায় না। বনওয়ারী এই রকম ভেবেছে। আলো জ্বালার উপায় নেই। সুতরাং এরকম ভাবনা ছাড়া উপায়ই বা কি। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) মনসা-কথা বাংলার নিজস্ব পুরাণকথা। এর আগেও আকাশে কত্তাবাবাকে প্রত্যক্ষ করে নয়ান প্রার্থনা করেছিল কর্তার সাপটি যেন করালীর বাসরঘরে ঢোকে! (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) মনসাকথা কাহারদের বেশ ভালোই জানা আছে। হাঁসুলীবাঁকটিকেও কখনো তারা ভেবেছে 'মনসার গলার অজগরের বেড়' [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

৪. **দেবতা-দৈত্যের দ্বন্দ্ব কথা**। আমাদের পুরাণের এই অতিপরিচিত উপাদান নানাভাবে কাহার পুরাণ ভাবনায় এসেছে। এ-সম্পর্কে তাদের ভাবনা বিচিত্র। কখনো প্রকৃতির বুকে কোন বিস্ময়কর ব্যাখ্যাতীত বস্তু তাদের ব্যাখ্যায় পুরাণ-কথার সঙ্গে মিলে আসে। সায়েবডাঙার জমি তৈরির সময় পাথরের মাঝখানে গোল সাদা দাগ পাওয়ার সময় সুচাঁদ বনওয়ারীকে বলে মাটি খুঁড়ে কাজ নেই—'পাথরের মধ্যে কোথা কোন্ দেবতা আছে, অসুরের কাঁড়ি আছে'! অসুরের কাঁড়ি 'অর্থাৎ অসুরের হাড় জমে পাথর' হয়ে গেছে এমন পাথর। দেব-দৈত্যের লড়াইয়ের সময় এগুলির সৃষ্টি হয়। কাহারদের এই ছিল অতি জনপ্রিয় বিশ্বাস। (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) এখন সে-বিশ্বাস নেই। তবে বিশ্বাসটির পিছনে দেবতা-দৈত্যের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত পুরাণ-কথা বিজাড়িত আছে। বনওয়ারী যখন করালী সম্বন্ধে ভাবে সে হল কাহার কুলে প্রহ্লাদ—তখন মনে হয় কাহারদের ভাষ্য তা নয়। কাহাররা নিজেদের দৈত্য ভাববে এটা স্বাভাবিক নয়। এ বোধহয় হাঁসুলীবাঁকের স্রষ্টার অনবধনতাজনিত প্রয়োগ। দেব-দৈত্যের দ্বন্দ্ব অবশ্য এখানেও ধৃত হয়েছে। করালীকে দানব ভাবার মধ্যে অবশ্য তেমন ভুল নেই। বনওয়ারী সুবাসী তাকে দানবই ভাবছে। 'আদ্যিকালের কথায়' মানুষ হয়ে দানবদের জন্মকথা আছে। তারা 'পাড়া-গেরাম-দেশ' ছারখার করে দিত। দেবতা এসে ধ্বংস করত তাকে। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কাহাররা তেমন দেবতার ভূমিকায় নামবে এমন ভরসা নেই বনওয়ারীর। বনওয়ারী বড় জোর অপেক্ষা করতে পারে—দেবতার আবির্ভাবের জন্য। এখানে পুরাণ-কথা বহুমাত্রিক জীবন-ভাবনায় সঞ্জীবিত হয়েছে।

৫. **রামায়ণকথা**। পাগল এসে পড়লে কাহার সমাজ তার কাছে রামায়ণকথা শুনতে চায়। সে-কথা পাঁচালীর ঢঙে বলে যায় পাগল। 'মহাপাপী রাক্ষস' রাবণের মৃত্যুতে শেষ হয় কথা। কাহাররা নীরব হয়ে শোনে। তাদের মনোজগৎ রাম-রাবণের যুদ্ধের কালেই বিচরণ করে। 'যত কালই হোক, হাঁসুলীবাঁক তো ছিল সেকালে। সেই রাম রাবণের যুদ্ধের কালে!' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) হনুমান তাদের কাছে রামের বাহন পবননন্দন। তাদের গোলমালে চালা নষ্ট হলে দায় নেয় তারা—হনুমান রুষ্ট হলে বৃষ্টি হবে না। অনাবৃষ্টি হলে কষ্ট যে অসহনীয় হবে তাদের। (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) পুরাণকথার এইরকম জীবন্ত প্রভাব তাদের সমাজে।

কাহারদের উপকথায় আছে প্রেতলোকের বিচিত্র কাহিনী। তার কয়েকটির কথা আগে সামান্য আলোচনা করেছি। খোনা কাহারের পিতা অমাইয়ের পরিবারের আসপাশে থাকা—বিধবা বউকে উপকার করা, অনুরোধ শোনার কথা লিখেছি। আছে তাদের কুমকলসীর কাহিনী। প্রথম পক্ষের বৌ মারা গেলে বিয়ের 'কুমকলসী' অর্থাৎ জলধরা ঘট কাঁধে নিয়ে সেই বৌ চলে যায়—অর্থাৎ তার প্রেত। স্বামীর মৃত্যু না হলে সেই ঘট সে ফেলতে পারে না। স্বামীর মৃত্যু আসন্ন বোঝার পর সেই কলসী নাকি সে ফেলে দেয়। শোনা যায় কুমকলসী পড়ার শব্দ। কেউ না শুনুক স্বামীর কানে ঠিক যায়। বনওয়ারী গোপালীবালার মৃত্যুর পর এই রকম শব্দের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার তো জানা আছে উপকথার নির্দেশ—'শব্দ ওঠে। কোথায় কিছু পড়ে না, অথচ একটা শব্দ শোনা যায়।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী তাই ভয় পায়। তার কানে হয়তো আসে প্রতিবেশীর বাসন পড়ার শব্দ, কেঁপে ওঠে বনওয়ারীর অন্তরাত্মা।

পরীদের কথা—কাহারদের মধ্যে প্রচলিত। খুব বড় করে সে কথা নেই। উড়োজাহাজ-পেড়ে শাড়ি কিনতেই হবে বনওয়ারীকে। সুবাসীর আবদার। পাখি যে অমন একটি শাড়ি কিনেছে। বনওয়ারী সাধ্যাতীত দাম দিয়ে যে রঙিন কাপড় এনেছে তাতে মন ওঠে না তার। বনওয়ারী স্বীকার করে তাই হবে। উড়োজাহাজ-পাড়ের শাড়িই এনে দেবে। সুবাসী হঠাৎ হেসে ওঠে। বনওয়ারীকে বলে—'কাপড়খানা প'রে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব।' কোথায় যাবে তার দ্বিতীয় পক্ষ? গলা জড়িয়ে ধরে হেসে ওঠে সুবাসী। 'একা যাব না, তোমাকে সমেত নিয়ে যাব পরীর মতন পিঠে ক'রে।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বাংলায় অবশ্য পরীকথা পাশ্চাত্য ধরনের নয়। এখানে পরীরা অশুভ শক্তি। যাকে নজর দেয় তাকে নিঃশেষ করে ছাড়ে। রক্তশূন্য করে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটিয়ে ছাড়ে। বিভূতিভূষণের *আরণ্যক* উপন্যাসে এরকম পরীকথা আছে।

কাহারদের উপর নানা সময়ে নানা ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এসেছে। সেসব তাদের উপকথার স্মৃতিকে ভয়ার্ত রাখে। বর্গির হাঙ্গামা তাদের উপকথায় আছে। 'ঘোড়া ছুটিয়ে' এসেছে তারা, মানুষের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার করেছে তারা। 'মানুষের নাক কেটে কান কেটে হাত কেটে মুণ্ডু কেটে' চলে গেছে তারা। সন্ত্রস্ত মানুষ 'ভয়ে পোড়া মালসা মাথায় দিয়ে জলে গলা ডুবিয়ে' কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছে। [৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

সাঁওতাল হাঙ্গামার সময়ও 'সিঁদুরে মুখ' রাঙিয়ে, 'কালো যমের মত' সাঁওতালরা এসেছে কাহারদের অঞ্চলে। সুচাঁদ সে-কথা ভয়ে বিহ্বল হয়ে বলে। তথ্যের বিবরণ হিসাবে নয় নিছক স্মৃতির ভয়াবহতার ইঙ্গিত এখানে স্পষ্ট হয়। [৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

ইতিহাসের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাহাররা নিজেদের বীরযুগের কথাও স্মরণ করে। তাকে

অনেকটাই যেন anecdote হিসাবে ধরা চলে। (সূত্র : ১.১৩) তবে এসব কথা শত শতাংশ ঐতিহাসিক নয়। সত্য মিথ্যা কল্পনা ও বাস্তব সেখানে একাকার। মৌখিক পরম্পরায় যা স্বাভাবিক।

১. সুচাঁদের কত্তাবাবা আটপৌরেদের একজনকে তার ঘর থেকে বের হতে দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ('মাথায় অক্ত উঠে গেল') শিল নোড়া দিয়ে ছেঁচে মেরেছিল তার স্ত্রী সুচাঁদ কাহারনীর 'পেথম কত্তামাকে'। সাহেবদের আমল তখন। সেই স্ত্রীকে টেনে কোপাইয়ের গর্ভে ফেলে দেবার পর আসে পুলিশ। সাহেবরা পুলিশ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু 'পড়ে পাথরে মাথা' ফেটেছে একথা তারা বিশ্বাস করে নি—'চাবুক দিয়ে সপাসপ মেরে পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছিল।' (৪র্থ পর্ব; এক পরিচ্ছেদ) এরকম বহু ঘটনা সুচাঁদের জানা। যেমন—ক্রমে সেগুলিও বলে নিচ্ছি।
২. 'রতনের পূর্বপুরুষ চড় মেরে' খুন করেছিল তার বোনকে। কোপাইয়ের দহতে ফেলে দিয়েছিল। দহে ছিল বড় বড় কুমীর। [৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]
৩. গুপীর পূর্বপুরুষ বিষ খাইয়ে হত্যা করে তার স্ত্রীকে। [ঐ]
৪. পরমের পূর্বপুরুষ স্ত্রীর হাত পা বেঁধে মুখে কাপড় দিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে মেরে ফেলে। পরে বাঁধন খুলে 'মুখের কাপড়' খুলে হৈ-চৈ করেছিল। 'কেউ সন্দেহ করতে পারে' নি। [ঐ]
৫. একমাত্র ছেলে মারা যাবার দুঃখে 'নয়ানের প্রথম ঠাকুরমা' দহে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। [ঐ]
৬. অম্লশূলের বেদনা সহ্য করতে পারে নি পানুর কাকা। 'গলায় দড়ি দিয়েছিল।' (ঐ) কালোশশীও ঐ কালিদহে ডুবে ছিল। তাকে নিয়ে হাঁসুলীবাঁকে নতুন উপকথা তৈরি হবে। প্রয়োজনে সেকথা মনেও পড়বে তাদের। করালীর কাছে পরাজিত বিধ্বস্ত বনওয়ারী সুচাঁদের বলা উপকথা স্মরণ করেছে। করালীর মাথা পাথর দিয়ে ছেঁচার ভাবনা আসছিল তার। 'হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনে পাথর দিয়ে মাথা ছেঁচার অনেক উপকথার মধ্যে তার কত্তাবাবার হাতে কত্তামায়ের (সুচাঁদ আর তার কত্তাবাবা একই মানুষ; প্রথম পক্ষের স্ত্রী তার—'পেথম কত্তামা') মৃত্যুর কথা মনে পড়ে বনওয়ারীর। পাথর একটা কুড়িয়ে নেয় বনওয়ারী। করালীকে সে মারবে। (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) ব্যর্থ আক্রোশ—আস্ফালন মাত্র। বনওয়ারী এখন কাহারদের চালিকাশক্তি নয়। সময় পরিবেশ এখন আর তাকে সাহায্য করছে না। উপকথার যুগও শেষ হয়েছে।

সুচাঁদ উপকথার কথক, সংরক্ষকও। তার সঙ্গে চলমান সময় সংকটে উপকথার শিক্ষা থেকে ব্যাখ্যা যোজন আর পরিত্রাণের উপায়ও তার কাছে। মনে হয় নারী পুরোহিতদের আদি যুগের সঙ্গে তার যোগ আছে। বনওয়ারীকে সে স্তন্যদান করেছিল। এই সূত্রে বনওয়ারীর উপর তার অধিকারও প্রশ্নাতীত। সুচাঁদ কাহারদের উপকথা বলে সামান্য আত্যন্তিকতা যুক্ত করে—আবেগ সঞ্চার করে। কতকাল আগেকার ব্রতকথার নিঃসন্তান বুড়ির মতো তার অবস্থা। 'ব্রত করত, ধর্মকর্ম করত, গাঁয়ের দুঃখে দুঃখ করেই তার ছিল সুখ।' (১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এই সামগ্রিক সমাজ-মনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারত বলেই সুখ পেত। অন্যের দুঃখকে নিজের বলে গণ্য করা বড় মনের লক্ষণ। যখন কারো দুঃখই খুঁজে পেতনা সেই বুড়ি তখন 'মহাবনে হাতী'-র মৃত্যু কল্পনা করে 'তার গলা

ধরে কেঁদে' আসার কথা ভাবত। লেখকের মন্তব্য : 'হাঁসুলীবাঁকে সুচাঁদ বুড়ী বোধহয় সেকালের সেই বুড়ী'। (ঐ) সে আসলে অতীত থেকে বর্তমানের মানসিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি করে শ্রুতি-সাহিত্যে—Orally transmitted স্মৃতি-চিহ্নিত সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায়। গোটা কাহার সমাজকে সে স্পর্শ করে তার গভীর সহানুভূতি দিয়ে।

যখন সুচাঁদ গাজনের গল্প বলে তখন কৃত্য (rite), অনুষ্ঠান (function) আর উপকথা (folk-narrative) সমাপতিত হয়। এর পিছনে যে প্রাকৃতিক বর্ষচক্রের আবর্তন তা চিরকাল ছিল ; চিরকালই সূর্যের অয়নান্ত হয়ে আসছে—সেই প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা আর তার সঙ্গে প্রমাণের মিশ্রণ আগে ছিল না। উপকথা ছিল না। তাই সুচাঁদ বলে : 'গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না। হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না!' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পাখি বলে 'ছিষ্টি ছিল না তখন'। মেলাতে পারে না। পাখির আধুনিক মন—সে সাপ আবার বাবা হয় বলে সন্দেহ প্রকাশ করে। চন্দনপুরের শম্ভু বাউরি-রা কোঠাবাড়ি বানিয়েছে—তাদের কিছু হয়নি, করালীর হবে কেন, জিজ্ঞাসা করে। আর তাই তার মতো যুক্তি খোঁজা তরুণীকে বোঝাবার জন্য, অনাদি অনন্তকাল ধরে ভ্রাম্যমাণ ঘূর্ণমান চড়ক, গাজন বোঝাবার জন্য, দু-হাত নেড়ে ভঙ্গি করে—'কি-ছু—ইনা—' বলে টানে কণ্ঠস্বর। এই প্লুতস্বরের সাহায্যে কিছু না থাকার শূন্যতাকে বোঝায়। শব্দ এসে আদিম শূন্যকে ধীরে ধীরে রূপ দেয়। তখন তৈরি হয় গাজনের শব্দচিত্র—উপকথা। গল্প বলার মধ্যেই তা জীবন্ত থাকে। লোকসংস্কৃতি বেঁচে থাকার এই পূর্ব শর্ত।

সুচাঁদ লোকসংস্কৃতির আবেগকে অন্তরে ধারণ করে। তার গল্প-বলা অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আশ্লিষ্ট। বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। তাই 'গল্প না বলে চুপচাপ বসে থাকতে হলে সুচাঁদের মনে হয়, সে যেন কত কাঙাল দুখী হয়ে গিয়েছে, লোকে তাকে হেনস্থা করছে।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই ভাবনা, আবেগের এই উৎসার সুচাঁদকে বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় তার মধ্য দিয়ে যে তত্ত্বভার, তা কতটা স্বাভাবিক। আধুনিক Oral tradition সংক্রান্ত তত্ত্ব তাঁর স্রষ্টা তারাশঙ্করও সম্ভবত জানতেন না। মৌখিক পরম্পরা যারা বহন করে—'singer of tales' তাদের কথা লিখেছেন হার্ভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালবার্ট লর্ড আর মিলম্যান পেরী। তাঁরা দেখিয়েছেন সমরূপ বাক্য বা বাক্যাংশ কেমন করে মৌখিক পরম্পরার বিস্তৃত কথাকে স্মরণযোগ্য রাখে। তারাশঙ্কর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে এই Orally transmission-এর এক কৃতী চরিত্র এনেছেন। সুচাঁদ যখন ঝড়ে পা ভেঙে পড়ে যায়, মনে হয় এই আদিকালের কথা বলা বৃদ্ধার গতি স্তব্ধ হল, পরে তাকে চন্দনপুরে চিকিৎসিত করে মোটামুটি সুস্থ করে করালী। চন্দনপুরের বাড়ি বাড়ি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষা করে আর আপন মনে বলে যায় তার উপকথা—মাথা মুণ্ডুহীন। কারণ যে জলসা তাকে ঘিরে রাখে তা তো অস্থির। কর্তাবাবার অভিজনদের জনপদ বাঁশবাদি তো নয় এহল শহর ইস্টিশন চন্দনপুর।

সুচাঁদের বলা কথায় উপকথার মূল আদল আর তাৎপর্য স্পষ্ট হয়। তার কথা—'বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে! তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত।' (শেষ পর্ব) এতো সম্ভব

নয়। কর্তাবাবা নেই, হাঁসুলীবাঁকের মানুষরাই উৎসন্ন হয়েছে। সুতরাং উপকথার ভবিষ্যৎ জানে সুচাঁদ—'আমার সাথে সাথেই ও উপকথার শেষ।' এতদূর পর্যন্ত সুচাঁদ নিশ্চয় নিজের কথাই বলছে। এরপর যখন সে বলে—'তবে পার তো নিকে রেখো।'—তখন তারাশঙ্করের লেখকসত্তা যেন কতকটা প্রকাশ পেয়ে যায়। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' হয়ে ওঠে সুচাঁদের বলা ছেঁড়া ছেঁড়া উপকথার লিখিত রূপ—মৌখিক পরম্পরার মুদ্রিত উপহার। সুচাঁদ একথা বলতে পারে বলে বিশ্বাস হয়না। তবু আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতি গবেষকরা যা করতে পারতেন—তারাশঙ্কর তাই করলেন। হাঁসুলীবাঁক হয়ে উঠল অনেকটাই 'Thesis Novel'। হৃদয়ের কথা লিখে রাখলেন তিনি। সুচাঁদের উপকথার শেষে একটি কলমের সচল অক্ষর মালার শুরু হতে পারল।

নির্ভাষিক বা extra linguistic লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাষাতীত সংযোগ পদ্ধতি নাও থাকতে পারে না। ফলে বস্তুনির্ভর লোকসংস্কৃতি বলে কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গেই ভাষা বা ভঙ্গির সম্পর্ক থাকে। তবে, ভাষা এখানে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে কিনা দেখা দরকার। ভাষা যদি উপেক্ষণীয় হয় তবে তাকে বস্তু-নির্ভর বা ভাষা-নিরপেক্ষ লোকসংস্কৃতি বলা যেতেও পারে। আমাদের পূর্বোল্লিখিত এই রকম বিষয়গুলি হাঁসুলীবাঁকে কিভাবে আসছে দেখাই :

১. **লোকবিশ্বাস** : **ক.** সুচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে 'দু আঙুলে টিপে টেনে' বের করে একটা কিছু—'নসুকে বলে—দেখ তো ভাই, ডেঙুর, না, নিকি?' নসু চমকে ওঠে—'ডেঙুর' 'আই একেবারে বলদের মতন!' তারপর ডেঙ্গুরটি 'নিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের উপর রেখে ডান হাতের নখ দিয়ে টিপে মারে—পট ক'রে শব্দ হয়। সঙ্গে সঙ্গে নসুও মুখে শব্দ ক'রে—হুঁ!' বলাবাহুল্য, এই 'হুঁ' শব্দটি বস্তু নয়—শব্দ। ভাষাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে লোকজীবনের চলে না। নসুর এই 'হুঁ' বলার তাৎপর্য 'ওই শব্দটি না করলে উকুনের স্বর্গ হয় না।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কারো মনে হতেও পারে উকুনকে স্বর্গে পাঠাবার এত তাড়া কিসের? আসলে, স্বর্গে না গেলে যে ঐ বলদের মতো উকুনটির পুনর্জন্ম হবে। এই হল কাহারদের লোকবিশ্বাস।

খ. সুচাঁদকে তার নুড়ির মতো চুল কেটে ফেলতে বলে পাখি। বিশ্বাস হয়না বুড়ির—'তার চুল শোনের নুড়ি'! অবিশ্বাস্য। আয়না দেখুক—পাখি বলে। কিন্তু তখন রাত। সুচাঁদ বলে 'আতে আয়না? না।' দেখে কাজ নেই। কারণ—'এই বুড়ো বয়সে কলঙ্ক হবে।' [৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

গ. ঝড় আসে বাঁশবাদিতে। গোপালীবালা সাহস করে 'ঝড় ঠাকুরকে কাঠের পিঁড়ি পেতে বসতে দেয়, ঘটিতে ভরে জল দেয় পা ধুতে ; বলে ঠাকুর, শান্ত হয়ে ব'স।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ)। এখানেও আচরণের সঙ্গে মিশে আসে ভাষাভঙ্গি।

ঘ. ভাঁজোর দিন তার বেদি তৈরি করে সাজিয়ে তার পাশে 'আকণ্ঠ মদ খেয়ে কাহাররা 'মেয়ে পুরুষ মিলে গান' করে, নাচে। এই দিন 'রাত্রে ঘুমোতে নাই, নাচতে হয়, গাইতে হয়—জাগরণ হল বিধি।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এদিন চূড়ান্ত যৌন স্বাধীনতা ভোগ করে কাহার মেয়ে-পুরুষের দল। 'অঙে'র গান—'অঙে'র খেলা যার যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, কানে শুনলে দেখতে যাবে না। ওইদিনের সব কিছু মন থেকে মুছে ফেলবে।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এ হল নিষেধ। এই বিধি নিষেধ কাহারদের লোকবিশ্বাস।

২. **লোকাচার** : **ক.** কাহারদের লোকচার সব থেকে বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে জমি চাষ করার আগে পরে। বনওয়ারী জমিকে মা জ্ঞান করেছে। বলেছে—মনে মনে : 'তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মার্জনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) এরপর সে হাততালি দিল খানিক। বলল—'কীট-পতঙ্গ, সাপ-খোপ, সাবধান, তোমরা স'রে যাও।' (ঐ) জমি চাষ করার আগে অনুমতি গ্রহণ, কীটপতঙ্গ সাপখোপের সঙ্গে সম্পর্ক রচনা—এসবই লোকাচারের অঙ্গ।

খ. চাষ করার আগে জমি তৈরি। তখন তার কপালে লাগল আঘাত। 'হাতের তালুতে আগুনের মত 'তাই' লাগল । তার স্থির বিশ্বাস 'অক্ত' নিয়েছেন মা-বসুমতী।' হেদো মণ্ডল আহ্লাদিত। প্রশ্ন তার—'নিয়েছে না কি?' নেবে যে, তা জানাই ছিল। তাই পরামর্শ তার—'লাগিয়ে লে, মাটি লাগিয়ে নে।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) 'বনওয়ারী একমুঠো মাটি তুলে চেপে ধরলে কপালের ক্ষতস্থানে।' তারপর 'রক্তমাখা মাটি মুঠো করে জমির এক কোণে পুঁতে দিলে।' তার এই কাজ লোকাচারের অঙ্গ।

গ. ভাঁজোর দিন 'পাঁচ-আকুড়ি অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুর'-এর সরা মাথায় নিতে হয়। উপন্যাসে এ-নিয়ে বিস্তৃত কিছু বলা নেই। অবনীন্দ্রনাথের *বাংলার ব্রত* গ্রন্থে 'বর্ধমান অঞ্চলের মেয়েদের মধ্যে' প্রচলিত 'শস্‌পাতার ব্রত বা ভাঁজো'-তে 'মটর, মুগ, অড়হর, কলাই, ছোলা—একটা পাত্রে ভিজিয়ে' রাখার পর 'ইঁদুর মাটির সঙ্গে মেখে নতুন সরাতে রাখার রীতির কথা আছে। (*বাংলার ব্রত* ; বিশ্বভারতী; ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ; ৬০-৬১ পৃ.) সঙ্গে আছে মেয়েদের সমবেত নাচের সঙ্গে গানের কথা। অবনীন্দ্রনাথের সংগ্রহ করা গান :

> ভাঁজো লো কলকলানী, মাটির লো সরা,
> ভাঁজোর গলায় দেব আমরা পঞ্চফুলের মালা।
> এক কলসি গঙ্গা জল, এক কলসি ঘি,
> বছরান্তে একবার ভাঁজো, নাচবো না তো কি? [ঐ; ৬১ পৃ.]

এর সঙ্গে তারাশঙ্কর-ভাষিত ভাঁজোর 'মন্তরের মত' গান—

> ভাজো লো সুন্দরী, মাটি লো সরা
> ভাঁজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
> আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দিবি,
> ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলবি,
> পঞ্চ আঁকুড়ি আমার ধর লো ধরা। [৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

পরিবর্তনটি হয়তো সামাজিক-ভৌগোলিক কারণেই ঘটেছে। তারাশ[illegible] উপন্যাস রচনার তিন বৎসর পূর্বে অবনীন্দ্রনাথের বই বেরিয়েছিল। একথা [illegible] খলে মনে হয় ছড়াটিতে হয়তো তারাশঙ্কর অবনীন্দ্রনাথের ভাষ্যের দ্বার' স[illegible]ন্য হলেও অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন। অবশ্য তারাশঙ্কর এরকম ছড়া তাঁর [illegible] অভিজ্ঞতা থেকেও পেয়ে থাকতে পারেন।

ঘ. ভাঁজো অনুষ্ঠানের দিন একটি ব্যাপার হয় 'গানে গানে গাল[illegible] [illegible]দা হত আটপৌরে আর কাহারপাড়ায়—এবার হল করালীর দলের স[illegible] [illegible] পাড়ার।

করালীর দলে নসুবালা, আর কাহারপাড়ার দলে পাগল। গালাগাল চলল কিছু। এ অনুষ্ঠানটি মৃত্তিকাকে উত্তেজিত করার কৃত্য। লোকাচারটি পৃথিবীর নানা অঞ্চলে আছে। 'সোঙ্গা'দের মধ্যে এরকম অনুষ্ঠান হয় পুরোনো ঘর ভেঙে নতুন ঘর করার সময়। জুলুদের বিয়ের সময় বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষ পরস্পরকে নিন্দাবাদ করে। ম্যাক্স গ্লুকমান বিষয়টি নিয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন—তাঁর "Rituals of Rebellion in South-East Africa" নামক বক্তৃতায়। ১৯৫২-তে ফ্রেজার-স্মারক বক্তৃতা ছিল এটি।

৩. **লোকখাদ্য** : **ক.** নবান্নের সময় 'নতুন ধান কেটে লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার পুজো করে কালারুদ্দু বাবাঠাকুরের ভোগ দিয়ে নতুন অন্নের' সাহায্যে নবান্ন রান্না হয় ('দব্যপস্তুত')। নবান্নের প্রধান খাদ্য নতুন ধানের পিঠে। পাগলের গান শুনলে মনে হয় এদিন নিরামিষ ('আজ কাজ কি মাছের ঝোলে') হিসাব করে তারা কে কে নতুন ছেলে কোলে নবান্ন করছে। নবান্নের সবাই সবাইকে ভাল মন্দ খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে। [৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

খ. বিয়ের অনুষ্ঠানে কাহাররা সাধারণত 'জ্ঞাতি ভোজন' দেয়। 'চুনো ঘুঁটির অম্বল আর কাঁচা কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত'। এই চিরকালের নিয়ম। কাহারপাড়ার সমর্থ জোয়ান করালী আর পাখির বিয়ের সময় করালী রীতি ভঙ্গ করল। সে খেতে দেবে 'খাসী'-র মাংস, ছোলার ডাল। এ নিশ্চয় লোকখাদ্য হিসাবে কাহারদের স্বপ্নের, আশাতীত ব্যাপার। [২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

৪. **লোক পানীয়** : **ক.** মদ। ভাত পচিয়ে কাহাররা নিজেরাই তৈরি করে। বিশেষত ভাঁজোর আগের দিন মদ প্রস্তুতির সামান্য পদ্ধতির ইঙ্গিত আছে উপন্যাসে। 'হাঁড়ি হাঁড়ি মদ 'রসিয়ে' উঠেছে ভাদুরে গরমে—ঢাকনি খুলতেই বাতাসে গন্ধ বেরিয়েছে।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী নিজেই ছেঁকে নিয়েছে মদ। 'ম্যাতা' বা 'পচুই-ছাঁকা পচা ভাত'—সেসব কুকুরের প্রিয় খাদ্য। শুধু কুকুর নয়—গরু, বলদ, ভেড়া হাঁস মুরগি—সবাই পাবে। সবাই মিলে মাতাল হবার অনুষ্ঠান—'লে ঢকাঢক, লে ঢকাঢক।' মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে খাবে না। তাদের আলাদা করে দিতে হবে।

খ. গ্রামে ঢোকার মুখে সাহাবাবুদের মদের ভাটি। সেখান থেকে মদের গোলা নিয়ে আসে। পালকি বহন করার পুরস্কার হিসাবে মদিরালয়ে সমবেতভাবে মদ্যপান করে তারা। এখানে অবশ্য জাতপাতের ভেদ মানার বিধি আছে। 'মুড়ি-বেগুনি ফুলুরির সঙ্গে' মদ খায় তারা। পরম কাহারদের ছেড়ে গিয়ে বসেছে ডোমদের মধ্যে, মদ খাচ্ছে। এতে 'পরমের ডোমে জাত দেওয়া হল'—বলল সবাই। পানীয় গ্রহণেরও রীতি আছে তাদের। (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) জাতি-সম্মত রীতি। অমান্য করলে চলবেনা।

গ. 'পাড়ার জন্য মদ নেওয়ার নিয়ম বরাবর আছে!' মেয়েদের জন্য মদ নিতে হয়। সে মদ পেয়ে কিছু পরেই 'পাড়া আনন্দে মাতোয়ারা' হল। [৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

ঘ. মদ চন্দনপুরের কাহাররাও খায়। বনওয়ারী সিধুর কাছে গেলে সিধু তাকে এগিয়ে দেয় 'পাকি মদের বোতল'—খানিকটা আছে, পান করতে বলে। বনওয়ারী

'বোতলটি নিয়ে গলায় ঢেলে' দেয়। (২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) একটু পরে অনুভব করে সে—'বোতলটিতে নেহাত কম 'দব্য' ছিল না, জিনিসটাও ছিল খাঁটি, বেশ খানিকক্ষণ তার প্রভাবে 'অল্প অল্প নেশায় বেশ স্ফূর্তি ছিল মনে। [২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

ঙ. করালী তার বিয়েতে (আসলে দ্বিতীয় বিবাহ—প্রথম বউকে সে তাড়িয়ে দিয়েছিল) যা করল তাতে চমক ভাঙল গোটা কাহার পাড়ায়। 'প্রচুর মদ, বড় বড় হাঁড়ি থেকে বাটি ভ'রে তুলে ঢেলে দিচ্ছে একজন, সকলে আকণ্ঠ পান করছে।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) এ ছিল তার বৈভব আর সামর্থ্যের প্রদর্শনী। এসময় আব্গারি ('আফগারি') দপ্তরে অনুমতি লাগে। হাঁড়ি ফেরৎ পাঠাতে হয় উৎসব শেষে। [২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

চ. বনওয়ারী মাত্র এক ভাঁড় মদ কিনে আনছিল সাহাদের মদিরালয় থেকে। তখন তার পরিস্থিতি মোটেই ভালো নয়। ধান নষ্ট হয়ে গেছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে। জিনিস পত্রের দাম বেড়েছে ভয়ঙ্কর রকম। মনও অস্থির। ঐ এক ভাঁড় মদ নিয়ে কেমন করে যাবে বাড়ি? 'কাহার পাড়ার মাতব্বর সে, কোন্ মুখে এক ভাঁড় নিয়ে ঢুকবে সেখানে? কাউকে না দিয়ে ঘরের কোণে একা বসে মদ' খাওয়া তার সাজে না। (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) লোকপানীয় ব্যক্তিগত নয়—চন্দনপুরের মতো 'তরিবৎ' শেখা সিধুর দেওয়া উপহারের মতো তো নয়ই।

ছ. ধূমপানের ব্যাপারেও কাহারদের নিজস্ব কিছু নিয়ম-কানুন আছে। সাঁওতালরা কাজ করে জমিতে, তারা অস্থায়ী শ্রমিক—যাযাবর-স্বভাব। তাদের নেশার বস্তু 'চুটা'। তামাক দিয়ে নিজেদের হাতে প্রস্তুত। বনওয়ারীর কাহার মজুররা পান করে বিড়ি। 'দু পয়সার বিড়ি'—নিজে খায়, অন্যদের বিলোয়। কখনো নিজে খানিকটা খেয়ে পরিবার অর্থাৎ গোপালীবালাকে দেয়। গোপালীবালা 'এঁটো বিড়ি' খায়। সুচাঁদকে দেয় 'গোটা বিড়ি'—'একটা বিড়ি না খেলে সুচাঁদের নেশা' হয় না। হেদো মণ্ডল ছিলেন তার জমির আলে। তদারকি করছিলেন। পান করছিলেন হুঁকো। সুচাঁদ তাকে বলল—'কল্কেটা একবার দাও কেনে গো।' মণ্ডল 'বিনা বাক্যব্যয়ে' কল্কেটা নামিয়ে দিতে সুচাঁদ 'উবু হয়ে' ধূমপান করতে থাকে—'মণ্ডলের সামনেই'। 'অবশ্য লজ্জা ক'রে পিছন ফিরে বসে নারীত্বের ভূষণ বজায় রেখে'। (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) গোটা ব্যাপারটিতে এক ধরনের সাংস্কৃতিক স্তরায়ণ (Cultural stratification) আছে। কাহার পুরুষ আর নারীর অবস্থান এক স্তরের নয়, সদগোপ আর কাহারদের অবস্থানও এক স্তরের থাকে না। সুচাঁদ তাই বলে সদগোপ মনিবরা সবাই এরকম বিনা বাক্যব্যয়ে কল্কে দেয় না। 'পানার মুনিব হলে মারতে আসত'। [ঐ]

তামাক পায় কাহাররাও। মানুষ এলে তামাক নিয়ে আপ্যায়ন করে তারা। বনওয়ারীর তামাক খাওয়ার ব্যবস্থা করে কালোশশী। একটু আগেই ('খনিক আগে') বেরিয়ে গেছে পরম। 'হুঁকোর মাথায় কল্কিতে আগুনও নেবে নাই'। [১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৪. **লোক প্রযুক্তি** : কাহারদের শিকারের ক্ষেত্রে লোক-প্রযুক্তির ব্যবহার আছে। তারাশঙ্কর এসবের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

ক. বুনো শুয়োর ধরার জন্য কাহাররা তৈরি করে ফাঁদ। 'হাত খানেক লম্বা বাখারির ফালির মাঝখানে আধহাত লম্বা সরু দড়ি বেঁধে' তৈরি হয় ফাঁদ। প্রান্তে বাঁধে ধারালো বঁড়শি। টোপ—'কলা এবং পচুই মদ'—মদ নয় ম্যাতা। শুয়োর ম্যাতার গন্ধে আকৃষ্ট হয়। বঁড়শি গাঁথে জিভে বা চোয়ালে। পা দিয়ে টেনে বঁড়শি ছাড়াতে গিয়ে আর এক বিপত্তি ঘটে। 'চেরা খুরের মধ্যে বঁড়শির দড়ি ঢুকে' যায়—'বেটা শুয়ার নিতান্তই শুয়োরের মত ঠ্যাঙ তুলে তিন পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে।' [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

খ. কুমির মারার জন্য 'বড় বড় বাঁশের ডগায় বাঁধা শক্ত দড়ির ফাঁস' ব্যবহার করে কাহারবা। গর্তে থাকা কুমিরকে 'সুকৌশলে ফাঁস পরিয়ে বেঁধে টেনে এনে' মারে। [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

গ. অসম্ভব মাছি আর মশা হয় বন্যার পর। মানুষ-গরুর জীবন দুর্বিষহ হয়। 'তালপাতা চিরে ঝাঁটার মত করে বেঁধে' আছড়ে মশা মাছি মারে কাহাররা। [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

ঘ. আখের রস তৈরির জন্য আখ মাড়াই কল আর তাতে সাবধানে আখ দেবার কাজ করে কাহাররাই। সাবধান না হলে বিপত্তি। গোরু থামাতে থামাতে আঙুল চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। রতনের বাবার চারটে আঙুলই ওভাবে গেছে। বনওয়ারী গুড় তৈরির ভিয়েনে বসে। চুলোতে 'আখের খোসা দিয়ে জ্বাল' দিতে হয়, 'ছাকনায় ভরে গাদ অর্থাৎ ময়লা তুলে একটা টিনে জমা করতে হয়। গুড় তৈরিতে বনওয়ারী আসপাশের সাতখানা গ্রামে (জাঙল-বাঁশবাদি-গোয়ালপাড়া-রাণীপাড়া-ঘোষগ্রাম-নন্দীপুর-কর্মমাঠ) অপ্রতিদ্বন্দ্বী। (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) লোক প্রযুক্তিতে বনওয়ারীর দক্ষতা যথেষ্ট।

ঙ. নবান্নের দিন বিকেলে কাহার 'ছেলেরা বার হয় তীর ধনুক নিয়ে—বাঁখারির ধনুক নতুন শরকাঠির তীরে তৈরি করে হৈ-হৈ করে বেড়ায় মাঠময়'—'কাক, শালিক, চড়াই, টিয়া'-দের বধ করার চেষ্টা করে। [৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

চ. তাস খেলার রূপবন্ধ বেশ বিচিত্র ভাবে উপহার দিয়েছেন তারাশঙ্কর। বোঝা যায়, দুরকম তাস খেলা হাঁসুলীবাঁকে পরিচিত। অঙের খেলা। সাধারণ ভাবে যাকে বলে 'টোয়েন্টি নাইন'। সে খেলায় 'টেক্কার চেয়ে গোলাম বড়, নহলা বড়।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কাহারপাড়ার মাতব্বরি অবশ্য এইরকম কমবয়সীদের 'অঙের খেলা' নয়। এখানে মাতব্বর বনওয়ারী সায়েব; কত্তাবাবা টেক্কা; গোলাম করালীর কাজকর্ম এখানে কোনো প্রাধান্য পাবে না। বলাবাহুল্য এ খেলা 'ব্রিজ'। এই উপমা থেকে বোঝা যাচ্ছে, কাহারদের লোকজীবনে তাসের খেলা বেশ প্রচলিত।

৫. **লোক ঔষধ** : তুক তাক মন্ত্র সংস্কারের সঙ্গে মিশে থাকে এসব। মাথলার ছেলেকে সাপ কামড়েছে। জানার পর পথে হঠাৎ বনওয়ারী দাঁড়ায়। 'একটা ওষুধ নজরে পড়েছে তার। ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে বলে সে শিকড় তুলতে বসল।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) ছেলেটাকে এগিয়ে যেতে বলার কারণ খুব সম্ভব ওষুধটির কথা গোপন রাখা। তুকও আছে এই ওষুধের—কাছাটা ঠিক আছে কিনা দেখে নেয় বনওয়ারী। 'ঠিকই আছে। খুলে গেলে শিকড়ের ওষুধে কাজ হত

না। এসব হল ওস্তাদি তুক।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) সাপের কামড়ের ওষুধ বনওয়ারী ছাড়াও জানত পাগল। বনওয়ারী মাতব্বর—'জানতে হয়' এসব। এজন্যই নয়ানকে তার হাঁপানী শ্বাসকষ্ট দূর করতে আরশুলা সেদ্ধ করে খেতে বলেছে বনওয়ারী। সব সময় অবশ্য এসব ওষুধ পুরোপুরি লোক ঔষধ নয়। বনওয়ারী মাথলার ছেলের জন্য খবর দিতে আসা ছেলেটিকে ওষুধ আনার জন্য সদ্‌গোপ মনিবদের কাছে মিহিজামের ওষুধ 'খানিক আদেক' থাকলে আনতে বলেছিল। এ থেকে বোঝা যায় তার সর্পবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত বিশ্বাস এখন বনওয়ারীর আর প্রশ্নহীন নেই।

৬. **লোক পরিচ্ছদ** : নানা রকম বিশেষ অনুষ্ঠানে কাহাররা বিশেষ রকম পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। এসব লোক পরিচ্ছদ তাদের।

ক. বিয়ের সময় কাহারকন্যাকে সাজানোর জন্য অলঙ্কার দেওয়া হত। করালী পাখির জন্য সেই পোশাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারে এনেছে নতুন তরঙ্গ।—'শাঁখা-শাড়ি সিঁদুর-নোয়া ছাড়াও' পাখি পাবে 'রূপদস্তার' গহনা নয় আসল 'রূপোর গহনা'। 'হাতে চার গাছা করে আট গাছা চুড়ি, গলায় দড়ি হার, কোমরে গোট।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) শুধু তাই নয় 'গিলটির গয়না—সুতাহার, পার্শী মাকড়ি, হাতে বাজু অনন্ত বালা।'

খ. করালীও পরেছে এমন পোশাক—যাতে গ্রামের মানুষের মুখে চোখে বিস্ময় জেগেছে। 'গোলাপী রঙের বুকে-ফুল-কাটা গেঞ্জি', ' নতুন একখানা মিহি ধুতি হলুদ রঙে' রাঙানো, আর 'নতুন একখানা বাহারের 'তইলা' অর্থাৎ তোয়ালে।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) কাহারপাড়ায় ও যেন 'মোহন সাজে নতুন নটবর'।

গ. পালকি বহনের সময় আট বেহারার কাহাররা প্রত্যেকে পায় একটা করে গামছা। সেটি মাথায় বেঁধে চলে তারা। [৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

ঘ. রায়বেঁশে নাচে আটপৌরে কাহাররা। তাদের পরতে হয় মেয়েদের সাজ। 'ফেরৎ গোষ্ঠ' অর্থাৎ কন্যের বাড়ি থেকে বরের বাড়ি এসে—সিধা সহ পালকি ফেরৎ দেবার পর মদ্যশালার আগে 'পরমেরা ঘাঘরা, বডিজ, পায়ের নূপুর, কানের মাকড়ি খুলে' ফেলে। (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) একে বলে 'transvestism'—মেয়ের সাজ পোশাক পরেছে ছেলেরা। কোথাও কোথাও মেয়েরাও ছেলে সাজে। এর পিছনে আদিম জীবন ভঙ্গি—witch craft প্রভৃতির লক্ষণ বিজড়িত আছে। transvestism-এর অস্থায়ী রূপটির পাশে আছে নসুরামের মেয়েলিভাব—সে হল স্থায়ী transvestism-এর উদাহরণ।

ঙ. কাহার পাড়ার পাগল গাজনের পর পর এসে হাজির হয় গ্রামে। আসার সময় নন্দীর বেশে উপস্থিত হয় সে। মহাদেব নয়, 'সঙেল নন্দীর বেশ'—'মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল'। (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ের পর পাগল সেজেছে 'মহাদেব'। 'দুপাশে দুটো ছেলেকে সাজিয়েছে দুর্গা আর গঙ্গা।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীকে নিয়ে ঠাট্টা। 'একজন বয়সালো মেয়ে আর একজন যোবতী। বড়কী আর ছুটকী।' গোপালীবালা আর সুবাসী। জীবনের চলমান ঘটনার প্রতিচ্ছবি এসব লোক-পরিচ্ছদ আর আনুষঙ্গিক রূপগ্রহণে ধরা পড়ে।

চ. সুবাসীর সঙ্গে সাঙা করতে যাবার পথে বনওয়ারীর সঙ্গী কাহাররা প্রহ্লাদ রতন গুপী পানু—'সকল কাহার মাথায় বেঁধেছিল ক্ষারে কাচা গামছা, গায়ে দিয়েছিল বহুকালের সযত্ন-রক্ষিত ফতুয়া, হাতে নিয়েছিল লাঠি'। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) ছিল তাদের হাতে একটা করে মশাল। 'গোঁফে চাড়া দিয়ে' জ্বলন্ত মশাল নিয়ে এছিল বিজয় যাত্রার মতো। বনওয়ারী গায়ে দিয়েছিল একটা 'নতুন চাদর'।

ছ. গোপালীর শেষযাত্রার সময় নিয়ম মতো নতুন কাপড় দিতে পারেনি বনওয়ারী। বাজারে কাপড় পাচ্ছিল না কেউ। রেশন থেকে পাওয়া যেতে পারত—বনওয়ারীর তখনও রেশন কার্ড নেই। ঘোষকর্তারা রেশন দেবার 'হুকুম চিঠি'-র অধিকারী। তারাও সাহায্য করেনি। বসন এসে বলেছিল করালীকে বললে কাজ হতে পারে। অভিমানী বনওয়ারী তার প্রস্তাবে সায় দেয় নি। গোপালীবালার জন্য আনা হল জাঙলের তাঁতীদের বোনা গামছা। 'গামছা পরেই যাক গোপালী। তাই যাক। কি করবে বনওয়ারী! এ দুঃখ তার মরলেও যাবে না।' [৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

উপন্যাসে করালী পাখিকে উড়োজাহাজ পেড়ে রঙিন শাড়ি দিয়েছে উপহার। তা দেখে সুবাসী আবদার করেছে বনওয়ারীর কাছে ঐরকম কাপড় তার চাই। করালী কোট-প্যাণ্ট জুতো পরে ঘুরে বেড়িয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লোক-পরিচ্ছদের প্রাসঙ্গিক নয়।

৭. **লোকযান** : কাহারদের লোকযান পালকি। এ-বিষয়ে সামান্য কথা কাহারদের জাতি পরিচয় বলার সময় লিখেছি। পালকি বাংলার গ্রামপথে চমৎকার এক বাহন। এটি বাংলায় সম্ভবত পর্তুগীজদের মারফৎ এসেছিল। পরে নীলকুঠিয়াল, জমিদারবর্গ এটিকে বাবুয়ানির প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। এর নানা রূপ, নানা নাম। 'ডুলি, মহাপা, তঞ্জাম, আর চৌদল বা চৌদোল, প্রভৃতি নানা ধরনের পালকির সংবাদ দিয়েছেন ড. মোমেন চৌধুরী। (পশ্য : "পালকি'; অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত 'অভিযাত্রী ফেরী'। প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা; নভেম্বর ২০০২; ২৩ পৃ.) 'মতির ঝালর দেওয়া কিংখাবে মোড়া পাল্কী, পাল্কীর ডাঁটে থাকত রূপোর মকরমুখ, কি বাঘের মুখ, কি সিংহের মুখ।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এ ছিল কাহারদের সত্যযুগের ব্যাপার। 'এখন ভাঙা পাল্কীর আমল। কাহারদেরও আর চাকরান নাই, দেশেও আর সে সব পাল্কী নাই।' (ঐ) পালকি বহন, প্রতিযোগিতা (বর ও কনের পালকির ক্ষেত্রে কে আগে যাবে তা নিয়ে), পথ-নির্দেশক গান—আনন্দের ছন্দিত গান, পারিতোষিক, সিধা পাঠান—প্রভৃতি বিষয়ে এক চমৎকার স্মৃতি *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় নানা ভাবে উপস্থিত করেছেন তারাশঙ্কর। কোনো কোনো ভদ্রজনের মৃত্যুর পর পালকি-তে করে শবযাত্রী হয় কাহাররা— একে তারা বলে 'জ্ঞান গঙ্গা'। কাটোয়ার কাছে উদ্ধারণপুরের ঘাটে নিয়ে যায় তারা।

৮. **লোকনৃত্য** : কাহারদের লোকনৃত্য কতকগুলি। হাঁসুলীবাঁকে সেসবের বিস্তৃত পরিচয় পাই। যেমন :

ক. ঘেঁটু-গানের সঙ্গে নাচ। বনওয়ারীর বাঁধা 'তাই ঘুনাঘুন—বাজলো নাগরী' গানটির সঙ্গে নাচের ইঙ্গিত আছে। (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ)। উপন্যাসের শেষে নসু এই গান গেয়ে 'পায়ে নূপুর বেঁধে নাচতে লেগে' যায়। [শেষ পর্ব]

খ. ভাঁজোর সময়কার নাচ। এ-নাচে যে যাকে খুশি সঙ্গী করতে পারে। 'চিরকালের নিয়ম—বয়সওয়ালা মেয়েরা নাচতে আরম্ভ করে।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ)। এবার সুচাঁদ নেই। সে ভিড়েছে করালীর ভাঁজোর দলে। পাগল গিয়ে গোপালীবালাকে নাচতে বলল। বনওয়ারী দুঃখিনী পুত্রহারা বাসিনী বউ-এর হাত ধরে বলল—'এস তুমি আমি আগে নাচব।' অবশ্য পাগলের প্রস্তাবে সায় দেয়নি বাসিনী-বউ।

গ. নবান্নের নাচ চলে সন্ধ্যায়। কাহাররা মদ পান করে সমবেত ভাবে গান গায়, আনন্দে 'নৃত্য আরম্ভ' করে। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বিশেষত যাদের সন্তান হয়েছে, তারা এসে নাচে। ফসলের উৎসব এভাবে জনসম্পদ বৃদ্ধিকেও জড়িয়ে নেয় নিজেদের ভাব পরিমণ্ডলে।

ঘ. কাহারদের উপকথা শেষ হবার পর উপকথার বিষয় নিয়ে পাগল গান করতে থাকে; সঙ্গে নসু নাচতে শুরু করল। 'কাঁচা পাকা চুলের বেণীতে লাল ফিতে জড়িয়ে খোঁপা বেঁধে নূপুর পায়ে নাচে।' (শেষ পর্ব) এই নাচ নিশ্চয় সামাজিক উৎসবের নয়—এ-হল উৎসন্ন কাহার সমাজের বেদনার চূড়ান্ত পরিবেশে হাহাকারের মতো।

৯. **লোকক্রীড়া** : হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের লোকসমাজে খেলাধূলোর ভূমিকা যথেষ্ট। নবান্নের দিন ভালো খাওয়া দাওয়া হজম করতে তাদের প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা। সামাজিক প্রয়োজনেই এই খেলাধুলো—স্বাস্থ্য রক্ষার উপায়। খেলা নানা ধেরণের যেমন :

ক. 'ড্যাংগুলি' অর্থাৎ 'ডাণ্ডা-গুলি পাল্লা'। এ-খেলা কাহারদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। খেলার স্থান সায়েবডাঙার মাঠ। উপকরণ 'দেড় হাত লম্বা ড্যাং এবং বিঘৎ প্রমাণ মোটা গুলি'। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) ডাণ্ডা দিয়ে গুলি পাঠায় তারা 'লম্বা পার'। মাপার রীতিও বিচিত্র। 'বারি দুরি চেরি তাল চম্পা ডেক লঙ্কা'—মাপতে মাপতে 'সাত মাপে গজ। 'গজা' অর্থাৎ এক দানের হার। যারা খাটে তারা 'বোঁ-বোঁ শব্দে ছুটন্ত গুলি দুই হাতে খপ করে লুফে নেয়—'মুখ ঠেকিয়ে বলে—খেয়ে নিয়েছি'। এরকম হলে 'খেলনাদারের হাত' চলে যায়। নবান্নের দিনের অপরাহ্ণে 'সে এক মাতন'। বয়স্করাও 'মধ্যে মধ্যে লোভ সামলাতে পারে না'—'তারাও দু-এক দান খেলে নেয়'। [ঐ]

খ. শিকার করার উৎসবে মাতে কাহাররা। নবান্নের বিকেলে। এতে যোগ দেয় ছেলেরা। 'বাঁখারির ধনুক, নতুন শরকাঠির তীর' এই নিয়ে তাদের কাণ্ড লোকক্রীড়া হিসাবেই গণ্য। ধানখেতে নামা পাখির ঝাঁককে কাক, শালিক, চড়াই, টিয়া তাড়িয়ে বেড়ায় তারা। [৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

গ. লাঠি খেলা কাহারদের বিশেষ ধরনের লোকক্রীড়া। লাঠিখেলা পৌরুষ প্রদর্শন। আটপৌরেরা লাঠি খেলতে খেলতে মন্দ পরামর্শ দিতে পারে—এই ভয়ে বনওয়ারী করালীকে 'ওর সাথে লাঠি খেলা ভাল নয় বাছা' বলে পরামর্শ দেয়। (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) ও মানে পরম। আটপৌরেদের মাতব্বর। কাহার পাড়ার মান রাখতে গিয়ে এই লাঠিখেলায় নেমেছিল করালী। বনওয়ারী বুঝিয়ে দেবার পর পাখি এর রহস্যটি বোঝে—করালীকে বোঝায়।

> মিত্র গোপালপুর গ্রামে রায়বংশের অবকাশে লাঠিখেলা দেখিয়েছে পরম। লাঠিতে ওরা ওস্তাদ। 'পাঁচ পাঁচটা সাকরেদ লাঠি দিয়ে' ঘিরে ফেলে—'পরম পাঁচটাকেই হটিয়ে লাফ মেরে বেরিয়ে' এসেছে। (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এরপর দুপক্ষের কর্তারা বনওয়ারীকে পরমের সঙ্গে লাঠি ধরতে বলেছে। বনওয়ারী রাজি হয় নি। 'পাড়ার রেষারেষি চিরকাল।' পরম দাঙ্গাবাজ—ওকে বিশ্বাস করে না বনওয়ারী। লাঠিখেলায় বনওয়ারীও কম ওস্তাদ নয়। তার সঙ্গে খেলতে চেয়েছিল পরম। বনওয়ারী অবশ্য একা একা খেলা দেখিয়েছে—রতন-প্রহ্লাদদের সঙ্গেও খেলা দেখিয়েছে। [৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় লোকসংস্কৃতির উপাদান বহুমাত্রিক প্রসাধনে উপস্থিত। এতখানি নিবিড় লোকসাংস্কৃতিক উপাদান তারাশঙ্করের অন্য উপন্যাসে প্রায় দেখা যায় না। বিশেষত উপন্যাসের চরিত্র নির্মাণ ও রসপরিণতিতে এই সমস্ত লোকসংস্কৃতির উপাদান বিচ্ছিন্ন নিরপেক্ষ থাকে নি—অনিবার্য অপরিহার্য অনবচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে। যা না থাকলে উপকরণগুলির কোনো সাহিত্যিক উপযোগিতা থাকত না।

১৭

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : প্রতীকের নির্মাণ শৈলী

তারাশঙ্করের রচনারীতি সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা ছিল তীব্র। বুদ্ধদেব মনে করেছেন তারাশঙ্করের বলার কথা অনেক কিন্তু বলার রীতিটি সাহিত্যের সঙ্গে খুব একটা মানানসই নয়। তাঁর উপন্যাস নাকি অনেকটাই খসড়াধর্মী ('Often given the impression of an author's notes rather than the finished product'), সে-উপন্যাস ঠিক উপন্যাস হয়ে ওঠে নি ('not novels, strictly speaking, but only material for novels')। তাঁর নাকি বলার বহু কথা ছিল ('Tarasankar has a lot to wite all about') কিন্তু তিনি জানেন না কিভাবে লিখতে হয় ('but does not seem to know how to write')। শেষ পর্যন্ত তিনি মোক্ষম অভিযোগ করেছেন—তারাশঙ্করের রচনায় যে বীরভূম তা শুধু সময় আর স্থানের মাত্রায় আছে ('his Birbhum exists only in time and place'), টমাস হার্ডির উপন্যাসে ওয়েসেক্স-এর মতো সাহিত্যের তৃতীয় মাত্রা—চিরন্তনত্ব, তারাশঙ্কর আয়ত্ত করতে পারেন নি। এই চিরন্তনত্ব—'eternity' নেই তারাশঙ্করে। কারণ তারাশঙ্করের সাহিত্য বিবেক। বুদ্ধদেবের মতে তারাশঙ্করের নৈতিকবোধ রক্ষণশীল ('it is morally conventional'), মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও উচ্চস্তরের নয়। সে সাহিত্য—'psychologically poor'. বুদ্ধদেব বসু খ্যাতিমান সাহিত্যিক-সমালোচক-অধ্যাপক। তারাশঙ্কর তাঁর চোখে ব্যর্থ সাহিত্যিক। তাঁর দৃষ্টি আছে বিবেচনা নেই—'he observes, but cannot judge'; দেখেছেন যথেষ্ট কিন্তু যে জীবন দৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক তাঁর রচনাকে সময় আর স্থানের সীমানা পার করতে পারে—'eternity'-র দিকে যাত্রা করে তা তাঁর নেই। বুদ্ধদেবের ভাষায় 'he visualizes well, but has no vision.' (*An Acre of Green Grass* : প্যাপিরাস প্রকাশিত; কলকাতা; ১৯৮২; 93-94 পৃ.) বাংলা ভাষার সৌভাগ্য, তারাশঙ্কর সমালোচকের ব্যাখ্যাকে মিথ্যা করে বাংলা সাহিত্যে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, গণদেবতা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কবি, রাইকমল, কালিন্দী, রাধা*-র মতো উপন্যাস লিখেছেন। ৬০ বছরের বেশি *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* বাঙালি পাঠকের কাছে আজও সমান জনপ্রিয় থেকে গেছে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় একটি বিষয় বার বার বর্তমান আলোচকের মনকে বিশেষভাবে ভাবিত করেছে। উপন্যাসটির আপাত-অসংলগ্ন গঠনের আড়ালে থেকে গেছে যে প্রতীক নির্মাণের বৈশিষ্ট্য তা থেকে বুদ্ধদেব বসু কথিত প্রায় প্রায় পরিকল্পনাহীন রচনা বলে এটিকে ধরা যায় কিনা সন্দেহ। তারাশঙ্করের দীর্ঘ উপন্যাসে পরিকল্পনার অভাব দেখে বুদ্ধদেব সমালোচনা করে লিখেছেন, এগুলি পড়লে মনে হয় নাটকের মহড়া দেখে এলাম। বুদ্ধদেবের ভাষা :

> 'It is a great pity that Tarasankar, ceasessly productive, has of late been inisting on writing nothing but long novels, increasingly giving one the curious feeling of having been admitted in to a theatre by daytime when a rehearsal is on'.

নিছক উপমা? Metaphor? মোটেই না। বুদ্ধদেব লিখেছেন—তারাশঙ্করের উপন্যাসে এই উপমা বড়ই সত্য। কারণ 'The stage is bare, the light is gray, the actors are in everyday clothes'– আর শেষপর্যন্ত অকরুণ বুদ্ধদেবের মন্তব্য—'The metaphor has been over worked, but is useful ; for in this case one rather fears that the play will never be ready' তাই যদি হবে, তারাশঙ্করের রচনায় প্রতীকের এমন মনোজ্ঞ ও সার্থক রূপায়ণ ঘটে কি করে? বিশেষত *কবি, রাধা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, কালিন্দী* আর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় বিষয়টি বারংবার প্রমাণিত হয়।

হাঁসুলীবাঁকের বর্ণনা থেকে কয়েকটি অনুরূপ ইঙ্গিতময় রচনাংশ উল্লেখ করি :

১. 'কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে'। [১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

২. 'চড়কের পাটা থাকে মানুষের মাথায়, সেই পাটায় গজাল পোঁতা থাকে, তার উপরে শুতে হয় গাজনের প্রধান ভক্তকে। মাতব্বরিও তাই। মানুষের মাথার উপরে কাঁটা ভরা পাটায় শোয়া।' [২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

৩. 'কাহারপাড়ার কন্যেরা বউয়েরা ক্ষেপলে অবশ্য বানভাসা কোপাই, কিন্তু সহজে তারা ক্ষেপে না। এমনিতে তারা নীল বাঁধের জল, শান্ত স্থির।' [২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ]

৪. 'পিসী হ'ল 'অরণ্য' অর্থাৎ অরণ্যের মত, অরণ্যে যেমন ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, অরণ্য যেমন মাতলে ঝড় ওঠে; কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসী তিলকে করে তাল, উইঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগন ফাটিয়ে চেঁচায়, হা-হা করে হাসে, ধেই-ধেই ক'রে নাচে।' [৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

৬. 'কালারুদ্দের থানে বটগাছের ডালে ঢেলা বেঁধো। অমিও তাই করব। আর মনের আগুনে পোড়ো, আমিও পুড়ি, পুড়ে পুড়ে খাঁটি হই, জ্বলুক! দিবানিশি কুলকাঠের 'আঙোরা'র মত ভালবাসার আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলুক। ঐ পুণ্যেই পাব আমরা দুজন দুজনকে।' [বনওয়ারীর ভাবনা কালোশশীর সঙ্গে একা জনান্তিকে বলা কথা। ৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ]

৭. গাঁয়ে টেক্কা দেবে ছোকরা! আরে টেক্কা দেওয়া কি সোজা কথা? অঙের খেলায় টেক্কার চেয়ে গোলাম বড়, নহলা বড়। কাহারপাড়ায় মাতব্বরি—অঙের খেলা নয়—এখানে টেক্কা বড়। তারপরে সাহেব। টেক্কা হলেন বাবাঠাকুর, সায়েব হ'ল মাতব্বর। এখানে গোলাম করালীর খেলা চলবে না! [বনওয়ারীর ভাবনা; ৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

৮. গোপালীবালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই। মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হল নীলের বাঁধের জল—না আছে সাড়া, না আছে ধারা, চুপচাপ ঠাণ্ডা 'শেতল'; বুক ডুবিয়ে বসে থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে তোমার চারি পাশে। নীলের বাঁধের মতই বনওয়ারী ওকে ভালবাসে; কিন্তু কোপাইয়ের মতন নাই ব'লে ওর ওপর নেশা কোন কালে জমে নাই। [৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

৯. 'করালী চন্নপুর যাওয়া আসার একটা নতুন আলপথ তৈরি করেছে। পথটা একেবারে মাঠের বুকচিরে সোজা চলে গিয়েছে।' [৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

১০. 'চালে দাঁড়িয়ে উঠল বনওয়ারী। সর্বনাশ। আদ্যিকালের শিমুল বৃক্ষ বাবাঠাকুরের 'আশ্চয়' সেখানে চেপেছে করালী। পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছে হো—! ডাকছে। কাকে ডাকছে!

—হো—ব্যানো কাকা—! হো— ! হো —!'

—'থর থর ক'রে কেঁপে' ওঠে বনওয়ারী। অত উঁচু কাঁটা ভরা গাছ— সেখানে উঠেছে! 'বাবাঠাকুর যদি ঠেলে দেন!' করালী নির্ভয়। বলছে 'ব্যানো কাকা! পেলয় ঝড়।' সবাই চাল থেকে নামুক। 'চন্ননপুরে খবর এসেছে তারে।' ঝড় আসছে। [৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

১১. 'পে-লা-য় ঝড়' আসার খবর কলকাতা থেকে চন্দনপুর ইস্টিশনে এসেছিল। 'তেরপলের লম্বা জামা আর মাথায় টুপি প'রে' করালী সেই খবর সবাইকে জানাতে বেরুল। 'সাকোলন' 'সাইকোলন'—ভয়ঙ্কর ঝড়। কেউ যেন বাইরে না বের হয়। [৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

১২. সাইক্লোনের প্রাবল্যে সুচাঁদ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলে ওঠে—'দহ বাবা, কত্তাবাবা!' অর্থাৎ দোহাই। করালী 'সুচাঁদকে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে' বলল—'বাবা ঠাকুরের ডিঙে উল্টাচ্ছে। বেলগাছ উপড়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে দেখ্‌গা।' এসময় বনওয়ারী ঝড়ের মধ্যে বাবাঠাকুরের থানে গিয়ে দেখল—'বেল গাছটা সত্যিই আবার উপরে পড়ে রয়েছে। গাঁথনিটা দু'ভাগ হয়ে ফেটে গিয়েছে।' [৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ]

১৩. সাইক্লোনের প্রবল আঘাতে 'সুচাঁদ পা পিছলে আচাড় খেয়ে পড়ে গিয়েছে।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) সুচাঁদ পিসীর পা ভেঙেছে। করালী তাকে হাসপাতালে দিয়েছে। [৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ]

১৪. বনওয়ারী বাবাঠাকুরের পাতা ঝরা বেল গাছটা দেখে। সমবেতভাবে সেটিকে ঠেলে তুলেছিল। গোড়া বাঁধিয়ে দিয়েছিল। 'তলাটা সে বাঁধিয়ে দিলে কি হবে প্রতিদিন গাছটি শুকিয়ে আসছে।' [৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ]

১৫. 'হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাদির বাঁশবন নির্মূল হয়ে গিয়েছে। শুধু বাঁশবন নয় বড়বড় বটগাছ অশ্বত্থগাছ পর্যন্ত নাই। ঘর থেকে বার হতেই—তীব্র আলো চোখে এসে লাগল।'—বনওয়ারী এত আলো কখনই দেখেনি। [শেষ পর্ব]

১৬. 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় শেষকালে শুধু গাছকাটার শব্দ।' [শেষ পর্ব]

—উপরের ষোলটি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ রচনাংশ পড়লে মনেই হবে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র রচনারীতি অন্যমনস্ক অনলঙ্কৃত পরিকল্পনাহীন খসড়া নয়। বরং অত্যন্ত গভীর পরিকল্পনার দ্যোতনা এই রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। রচনাংশগুলোর কিছু ব্যাখ্যা আমাদের মন্তব্যকে বুঝতে সাহায্য করবে।

(১) নদীকে নারীর সঙ্গে তুলনার কাহারদের নারীদের সম্পর্কে বার বার এসেছে। এক রকম জীবনরসপ্রবাহ নদী আর নারীকে কবিত্বপূর্ণ কল্পনায় প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই উপস্থিত থাকে। কাহার নারীরা অবন্ধনা। তাদের সম্পর্কে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন তারাশঙ্কর—'হাঁসুলীবাঁকের কাহার কন্যাদের প্রকৃতি আছে চরিত্র নাই।' প্রকৃতির মতোই তারা বাধাহীন। নদী যেমন। বিশেষত কোপাই। হড়পা বান তার—আকস্মিক অনিবার্য ভয়ঙ্কর। পশ্চাদভূমিতে বৃষ্টি হলে দ্রুত বহন করে আনে সে জল। তখন ছোট নদীর দুকূল প্লাবিত হয়। ঠিক যেমন কাহার বউড়ি ঝিউড়িরা দু-কূলের তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে পড়ে ঘরের বাইরে। তারা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক সত্তার দ্বারা পরিচালিত। চরিত্রের সঙ্গে সংস্কার সংস্কৃতি বিধি নিষেধ মান্য করার অনুশীলন প্রয়োজন। কাহার মেয়েরা সেই রকম পর্যায় পার করার আগেই তাদের জীবন যুদ্ধে নামতে হয়। তাই তাদের অনুশীলনের সুযোগ হয় না।

গোপালীবালা কিন্তু অন্যরকম সংস্কারের অনুশীলনে উজ্জ্বল। তাকে নীল বাঁধের মতো

বলার সার্থকতা এইখানে। পাগল তাকে সাঙা করতে চেয়েছিল। কাহার মেয়েরা সতীনের ঘর করে না—একথা জানিয়েছেন লেখক। এরকম সম্ভাবনা থাকলে তারা কি করে তার প্রমাণ পাখির শেষ সময়ের ব্যবহারে। সুবাসীকে সাঙা করছে করালী। পাখি তাকে অস্ত্রাঘাত করে স্থায়ী দাগ রেখে দিয়েছে করালীর কপালে। ফিরে এসে গলায় দড়ি দিয়েছে। গোপালী-বালা পাগলের বিবাহ প্রস্তাব অমান্য করেছে। ছমাস সতীন সুবাসীর সঙ্গে ঘর করে হঠাৎ মারা গেছে। তাকে বাঁধভাঙা কূলপ্লাবী কোপাইয়ের মতো লাগে না। স্বাভাবিক।

নদী আর বাঁধ—প্রকৃতি আর সংস্কৃতির দ্বৈত রূপটি কাহার সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে চমৎকার সাযুজ্য তৈরি করেছে। লেখকের রচনা-পরিকল্পনার বেশ সুন্দর পরিচয় এখানে।

(২) চড়কের পাটায় শুয়ে বনওয়ারী কাহার সমাজের বহু বিচিত্র স্মৃতি বিস্মৃতির আবর্তনেই জড়িয়ে ছিল। তার মধ্যে উৎসবের পবিত্রতা যাকে এমির্য দুর্খেইম Sacred বলেন তার পরিচয় আছে। যেখানে সে পবিত্র কৃচ্ছসাধনের মধ্য দিয়ে কাহার সমাজের উপর প্রতিপত্তির পরিচয় রাখতে পেরেছে। এর মাধ্যমে মাতব্বরির কর্মটিকে দৈব আধ্যাত্মিক শক্তির সঙ্গে একরকম সন্নিবেশিত করতে পেরেছে সে। সে নিজেই হতে পেরেছে কর্তাবাবার divine শক্তির প্রতিনিধি। সেই সঙ্গে তার মনস্তত্ত্বে আছে profane তথা তুচ্ছ বিষয়ে বিজড়িত থাকার প্রবণতা। একে সে অস্বীকার করেনি—অস্বীকার করতে চায়ও নি। অন্তর্বাহ্য তার দুটি প্রবণতার পরিচয় বহন করেছে—ভিতরে সাধারণ মনস্তত্ত্বের বিষয়াগ্রহ আর বাইরে উচ্চমার্গের আধ্যাত্মিক শক্তি (কাহারদের পক্ষে যতটা দার্শনিক হওয়া সম্ভব—অন্তত ততটা) —এই দুইয়ের মধ্য দিয়ে হাঁসুলীবাঁকের এই protagonist অত্যন্ত দ্বন্দ্ব বিধুর হয়েছে। অথচ বহু সমালোচকই বনওয়ারীকে দ্বন্দ্বরিক্ত Flat Character বলে নিজস্ব সমাধান দিয়েছেন। এটা ঠিক নয়। তার প্রমাণ হিসাবে সামান্য উদাহরণে আনা যাক।

> সুচাঁদ পা ছড়িয়ে মজলিশে কাঁদছে, তাকে কে খেতে দেবে? প্রহ্লাদরা বনওয়ারীর পরিবর্তে এখন সাময়িকভাবে মোড়লি করছে। কারা তাকে বোঝাতে পারে না। বনওয়ারী তখন উপবাসী। 'কালারুদ্দের শিবভক্ত হয়েছে'—'সন্ন্যাসের সময় সংসারের ধুলো-মাটি ঝগড়া ঝাটি এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে' নেই। (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) অথচ গোটা চড়কের অবসরে বনওয়ারী গ্রামের কথাই ভেবেছে—গ্রামের মানুষের কথা। চড়কের পাটা তাকে পবিত্র করুক না করুক—গ্রাম জীবনের আবেষ্টনী থেকে মুক্তি দেয় নি। বনওয়ারী তা চায়ও নি।

(৩) সুচাঁদকে উপন্যাসের কথক করেছেন তারাশঙ্কর। উপকথার Narrator—অনেকটাই পল্লীসমাজের bard বা লোককবির ভূমিকা তার। উপকথার দুটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান প্রকৃতিলগ্নতা আর আত্যন্তিকতা। সাহিত্যের মা বেশি কাঁদেন—রবীন্দ্রনাথের এই উপপাদ্য তারাশঙ্কর মেনেছেন। যা কিছু স্মরণীয় তা তো কাহার সমাজে প্রবল অভিঘাত এসেছে বলেই তা স্মরণীয়। তা না হলে তা তো ভিড়ের মধ্যে দিনানুদৈনিকে যেত হারিয়ে। সমাজ বদলে যায়—প্রলয় হড়পা বানে নীলকুঠির প্রতিপত্তি লুপ্ত হয়—চৌধুরীরা পায় যখের ধন। এর ফলে কাহারদের শুধু জীবন প্রবাহ বদলাল না, মালিকরা আর তাদের চাকরান ভোগী প্রজা বলে স্বীকারই করতে চাইলেন না। তারপর তারা বিভক্ত হয়ে গেল। আটপৌরে আর কোশকেঁধে কাহার—একদল লুণ্ঠনজীবী, অপরাধের সীমান্তে ঘোরে ফেরে, অন্যদল কর্ষণজীবী, নম্রতা তাদের জীবন নীতি—সামন্ত প্রভুদের কাজকে ভাবে ধর্ম। এই সব বদল আর মূল্যবোধের অভিনব তরঙ্গ-ভঙ্গ

হাঁসুলীবাঁকের সুচাঁদ-ভাষিত উপকথায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি হতে বাধ্য। আরণ্যক প্রাকৃতিকতার সঙ্গে একে মিশিয়ে দিয়ে তারাশঙ্কর উপন্যাসটির তাৎপর্য বেশ সঠিকভাবেই শনাক্ত ও ব্যাখ্যান করেছেন।

প্রলয় ঝড়ে সুচাঁদ কর্তাবাবার দোহাই দিতে দিতে পড়ে যায়, আকস্মিক ধাক্কায় পা খোঁড়া হয় তার। এই ঝড়টিকে প্রতীকই ভাবতে হবে। এটি যে আসছে তা টেলিগ্রাফের মাধ্যমে কলকাতা থেকে চন্দনপুর পর্যন্ত বয়ে এসেছে আশ্চর্য যান্ত্রিক অভিঘাতে। এই যন্ত্র-নির্ভর সংস্কৃতি— নগরায়ণের অনিবার্য ফল। কাহারপল্লীতে সে ঝড়ে চলাফেরা করার স্বাভাবিক ছন্দ ও সক্ষমতা হারালো সুচাঁদ। তার মুখ দিয়ে উপকথা এখন আর আগের মতো অনিবার্য কর্তব্য হয়ে কাহারপাড়াতে ধর্মীয় সুসমাচার উপস্থিত করবে না। একটি ধর্ম-সম্মত সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা নগরায়ণের ঝড়ে কেমন করে ব্যাহত হল হাঁসুলীবাঁক তো তারই উদাহরণ। সুচাঁদের খোঁড়া হয়ে যাওয়াও তেমনি একটি প্রতীকের নির্মাণ বললে ভুল হবে না।

(৪) করালীর সঙ্গে বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব—আধুনিক সময় পরিবেশের সঙ্গে কাহার সমাজের আত্মরক্ষার প্রবণতার দ্বন্দ্ব। করালী আত্মবিচ্ছিন্ন? নাকি মাইতো ঘোষ তাকে গ্রামত্যাগ করতে বাধ্য করেছে? কাহিনীর সূত্রে বোঝা যায় করালী সদ্‌গোপদের সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেছে অসম্ভব অত্যাচারের কারণে। তবে নতুন পরিবেশে করালী মানিয়ে নিয়েছে। অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সে চায় নি। তা যদি না হত, যদি চিরকালের জন্য সে চলেই যেত তাহলে তার প্রভাব এত ভয়াবহ আঘাত হানত না কাহার সমাজে। তাই একই গাছের ফল আর নিজেই নিজের বোঁটা ছিঁড়েছে—এই উপমা একান্ত বনওয়ারীর মনে আসা ব্যক্তিগত উপমা বলে মনে হয়। করালী নিজে কাহার সমাজকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেনি। সমগ্র উপন্যাসে তার প্রমাণ ছড়ানো আছে। শিশু বয়সে তাকে ত্যাগ করে গেছে তার মা। সে তার মায়ের কলঙ্কের আভাস যতদিন বোঝে নি বাঁশবাঁদির নানাখানে মাকে খুঁজে ফিরত। মা না থাক—গ্রাম পরিবেশ তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাতৃস্নেহে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল কাহারদের এক নারী— তার পিসী। নসুরামের মা। এরপর গ্রামে তার প্রেমপর্ব—গ্রামের মানুষকে সম্ভব মতো গুরুত্ব দেবার চেষ্টা, বনওয়ারীর পাশাপাশি নিজের ঘরে অন্য ভাঁজো পাতার চেষ্টা বিশেষ ভাবেই গ্রাম জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযোগের পরিচয় বহন করে। বনওয়ারী যখন কৃষিকর্মে সমস্যার মুখে পড়েছে তখন রেল কোম্পানির নতুন গাঁইতি সরবরাহ করেছে করালী; বৃষ্টি নেমে আখের গুড় তৈরির 'শাল'-এ কাজ পণ্ড হবার উপক্রম হলে বনওয়ারীকে এনে দিয়েছে 'তেরপল'। এসবই তার গ্রাম-সমাজের সঙ্গে সংযোগের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট করেছে। বনওয়ারী যখন চড়কের পাটায়—করালী জনতাকে নিয়ন্ত্রণ আর সদ্‌গোপ মহাশয়দের আপ্যায়ন করার চেষ্টায় বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। এই-সব ঘটনার পাশাপাশি কোঠাবাড়ি তৈরির ব্যাপারে গ্রামের রীতি নিয়ম সম্পূর্ণ অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছে করালী। অর্থাৎ সম্পর্কটি দ্বন্দ্ব-মিলনের। এই প্রতীকটি তাই বাঁশবাঁদির কাহারদের সঙ্গে করালীর সম্পর্ককে স্পষ্ট করে বুঝতে সাহায্য করছে না।

(৫) বনওয়ারী আত্মদমনের চেষ্টা করেছে, কালোশশীর সঙ্গে প্রেমকে অবারিতভাবে উন্মোচন করে নি। এই চেষ্টা *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় নতুন উপাদানের মতো। কাহার মনস্তত্ত্বে এই সংযম নেই। বনওয়ারীকে তাই জন্ম-জন্মান্তরব্যাপী পাপ পুণ্যের আবর্তন-বিষয়ক ভাববিশ্বের সঙ্গে নিজের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাকে সমাপতিত করতে হয়। কালোশশীকে এই জীবনে সে গ্রহণ করতে পারে না। মাতব্বর হিসাবে স্বেচ্ছাচার করা তার

পক্ষে অসম্ভব। তার মধ্য দিয়ে একটা নিদর্শন রাখতে চায় বনওয়ারী। ব্যক্তি হিসাবে নয় বনওয়ারীর এই ভূমিকা সামাজিক। বনওয়ারী পরমকে যখন নির্ণায়ক যুদ্ধের মতোই যুদ্ধে পরাস্ত করে, সেই সন্ধ্যায় গ্রাম যখন পরম-আনন্দে মতোয়ারা, আকাশভরা চাঁদনি— বনওয়ারী এসে দাঁড়ায় তার ভালোবাসার জন কালোশশীর সামনে। এই সন্ধ্যায় কোপাই নদীর গর্ভে তারা দুজন প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে । এই বাঁধভাঙা প্রেম বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। মৃত্যুর ভূমিকায় পরমের আবির্ভাব ঘটেছে অচিরেই। বনওয়ারীর আত্মদমন পরিকল্পনা, উচ্চতর জীবনাদর্শ অনুসরণের চেষ্টা শেষ অবধি একান্ত ব্যক্তিগত থেকে গেছে। অবদমনের আকাঙক্ষা কালোশশীকে স্পর্শ করে নি। আর পরবর্তী ঘটনাধারায় কালোশশীর মতো দেখতে সুবাসীকে বিয়ে করার মধ্যে বনওয়ারীও আত্মদমনের পণ রক্ষা করতে পারে নি।

(৬) তাস খেলার অনুষঙ্গে বনওয়ারী নিজেকে 'কত্তাবাবা'র ঠিক পরবর্তী ক্ষমতার অধিকারী ভেবেছে। রঙের খেলা অর্থাৎ টোয়েণ্টি নাইনে গোলামের ভূমিকা বড়ো। গোলাম করালী। এই ভাবনাটি একধরনের চিন্তন-বিশ্ব গড়ে তুলেছে। বাবাঠাকুর নিজেই টেক্কা—তার শক্তি অপ্রতিরোধ্য। করালী রঙের গোলাম বড়জোর। ভাবনাটি স্তরায়িত সমাজ বাস্তবের সঙ্গে মিশে আছে। আর আছে বয়সের স্তরবিন্যাস—তারতম্য সম্পর্কিত ভাবনাও। করালীর সঙ্গে যারা তারা গুরুজন। ব্রিজের মতো বয়স্কদের খেলায় বনওয়ারীর ক্ষমতা অপ্রতিরোধ্য। এই ভাবনার জটিল দ্বিস্তরতা হাঁসুলীবাঁকের পটভূমিটি বুঝতে সাহায্য করবে।

(৭) ধানক্ষেত মাড়িয়ে—'চাষের মুখে ঝাড়ু' মেরে করালী চলে গেছে উত্তরের পথে। চন্দনপুর রেল কোম্পানির আড্ডায়। নগদ টাকা উপার্জন করে তার শক্তি আর সক্ষমতা বেড়েছে। তাই তার পথ স্বতন্ত্র—'নতুন আলপথ'। উপন্যাসে এই পথটি অত্যন্ত প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষ দিকে গ্রামের চিরাচরিত পেশা ত্যাগ করে চলে গেছে নারদ, নোদা, বেঁকারা—সপরিবারে। অতন-পেল্লাদ-গুপীরাও বনওয়ারীর পরামর্শ (মানুষ সব বিক্রি করে খায়—ধর্ম বেচে কেউ খায় না) মানে নি। তারাও বাঁশবাদি ছেড়ে গেছে। তাই ধান খেতের উপর দিয়ে 'মাঠের বুক চিরে সোজা' চলে যাওয়া পথটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে নতুন দিগন্তের পথরেখাটি করালীর তৈরি।

(৮) বাবাঠাকুরের আদ্যিকালের শিমুল গাছের উপর উঠে চন্দনপুরের টেলিগ্রাফে আসা কলকাতার খবর শোনাল করালী। ভয়ঙ্কর ঝড় আসছে। এই প্রলয় ঝড় এক অর্থে প্রতীক। নগরজীবন এই ঝড়ের সংবাদ দেয়—সংগ্রহ করে করালী, ছড়িয়ে দেয়। বনওয়ারীরা মাইতো ঘোষের বাংলা বাড়ির চাল ছাইবার কাজ করছিল। করালীর ডাক এক ধরনের সাবধান বাণীর মতো মনে হয়। এই ঝড়কে এড়ানোর উপায় নেই।

দ্বিতীয় বার করালী রেনকোট পরে গ্রামে ঘুরে ফিরেছে। এবারও কলকাতা থেকে তারে খবর এসেছে—সাইক্লোন আসছে। সাইক্লোন বিষয়ে সবাইকে সাবধান করার ভঙ্গিটি নাগরিক সমাজ সম্পর্কে করালীর সক্ষমতার পরিচয় বহন করে। সে এবার কর্তার দেবাশ্রিত গাছে চাপে নি—বাবা ঠাকুরের ডিঙি যে উল্টেছে সে খবর দিয়েছে। কর্তাবাবার আশ্রয় বেলগাছটি এবার উল্টে গেছে। বাবাঠাকুর চিরকালের জন্য ত্যাগ করে গেছেন তাদের। এই আশঙ্কায় কাহার পল্লী এক সময় চন্দ্রবোড়ার শিসের ব্যাখ্যা করেছিল। এখন আর এক প্রস্থ সেই আশঙ্কা সত্য হল।

ঝড়টি প্রকৃতিক ঝড়ের সংবাদটি যান্ত্রিক। ফলে ঝড় আর তার পরিণতি—কাহার সমাজের পক্ষে দুই গুণ ভীষণ হয়ে দেখা দিল। অঙের খেলার প্রবল প্রাকৃতিকতা আর

সে-সম্পর্কে অপরাধবোধ বনওয়ারীকে বিদ্ধ করছিল। চন্দ্রবোড়াকে হত্যা, পানুর খুঁতো পাঁঠা বলি হয়ে যাওয়া ইত্যাদির মিশ্রণে সেই অপরাধবোধ—গ্রামজীবনকে পরিচালনা করতে চাওয়া আর না পারার ব্যর্থতা বনওয়ারীর মধ্যে চেপে ধরেছিল। অঙের খেলার কারণে এই অপরাধবোধ আরও বৃদ্ধি পেল। প্রাকৃতিক ঝড় তাই কাহার সমাজকে বাইরে থেকে ভেঙে দিল। অন্যপক্ষে যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পাওয়া ঝড়ের খবরটিকে যদি প্রতীক বলে ধরি তাহলে নাগরিক অভিঘাত হাঁসুলীবাঁককে বাইরে থেকে ভেঙে চূরে শেষ ধাক্কাটি দিয়ে গেল।

বনওয়ারী কাহারদের সঙ্গে নিয়ে সমবেতভাবে কাঁধ লাগিয়ে কর্তার বেল গাছটা ঠেলে তুলে দিল। দুইভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া তলাটা মেরামত করল বহু কষ্টে। কিন্তু এ-কাজটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। তলা বাঁধালেও গাছটি প্রতিদিনই নিষ্প্রভ হতে লাগল। বনওয়ারী ভাবল কর্তা আর নেই। কর্তাই যদি না থাকে—জীবনে কি লাভ তাদের! 'নিশ্চয় আর বাবাঠাকুর নাই; হাঁসুলীবাঁকের দেবতা, উপকথার বিধাতাপুরুষ চলে গিয়েছেন। তবে আর কি রইল তাদের?' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) এ তো কোন প্রশ্নমাত্র নয়—গভীর ট্রাজিডির পরিণতি। এই হাহাকার ভাষায় বর্ণনা করার দক্ষতা তারাশঙ্করের সাহিত্য প্রতিভাকেই প্রমাণ করছে।

(৯) বাঁশবাঁদির বাঁশবন কাহার জীবনের আলো অন্ধকারের ঘেরাটোপ। এটিকে অতিক্রম করলে যে জীবনে যাওয়া যায় তাতে রহস্য নেই। আদিম যে রহস্যের স্পর্শে হাঁসুলীবাঁক জীবন্ত মরমী (mystic) হয়ে ওঠে। নতুন সময় এসে সেই শত বর্ষের আড়ালটিকে দিল ভেঙে। প্রতীকের খেলা ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে এর ব্যাখ্যা চলে না। বনওয়ারী করালীর কাছে পরাজিত হবার পর দুমাস কেটেছে। তার মধ্যেই পরিবেশ এতটাই বদলেছে যে হাঁসুলীবাঁকের অন্ধকার নয়—আলো এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেল। বনওয়ারী বুঝল 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র শেষ পর্ব আসলে খাণ্ডবদাহন কিংবা অরণ্যধ্বংসের কাহিনী—'শেষ কালে শুধু গাছকাটার শব্দ'।

কালিদাস রায়কে উৎসর্গ করার সময় তারাশঙ্কর লিখেছেন হাঁসুলীবাঁকের 'প্রাণের ভোমরা-ভোমরী কালো রঙ ও গুঞ্জন'-এর কথা। উপন্যাসের শেষ পর্বেও আছে তেমনি ভাবনার চিহ্ন। 'হাঁসুলীবাঁকের বুকের মধ্যে উপকথার কৌটার ভিতর ভোমরা-ভোমরীর মত কালো কাহারদের মেয়ে-পুরুষেরা কোথায় গেল?' এ-প্রশ্ন উপন্যাসে বনওয়ারীর। পাগল উত্তর করেছে—'তারা আছে, সুখেই আছে।' আছে। তবে নেই তাদের উপকথা—দেবতা নেই। মানুষগুলি বদলে গেছে। হাঁসুলীবাঁকের জীবন বদল হবার এই প্রতীকসমূহ, উপন্যাসটিকে সার্থকতা দিয়েছে। এর আড়ালে আছে প্রতীকের সচেতন নির্মাণ শৈলী।

১৮

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র চরিত্র নির্মাণ পদ্ধতি

সাহিত্যজগতে প্রবেশ করার প্রথম পর্যায়ে তারাশঙ্কর অনুভব করেন সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও কল্পনার গভীর প্রভাব পড়ে। যখন লেখা চলতে থাকে তখন সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে থাকেন লেখক। একে তারাশঙ্কর বলেছেন 'তন্ময়তার যোগ'। এই যোগ না থাকলে সাহিত্য সার্থক হয়না—'গল্প লেখার এইটেই একটা বড় সমস্যা। সব হয় কিন্তু বেঁচে ওঠে না—জেগে ওঠে না।' (*তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা*; প্রথম খণ্ড; উল্লেখিত; ২০৪ পৃ.) সৃষ্ট মানুষগুলি বেঁচে না উঠলে, জেগে না উঠলে সাহিত্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাঁর ইঙ্গিত এই শক্তি বাইরে থেকে শেখা বা শেখানো যায় না—এ 'মন্ত্র' বা 'বিদ্যা' আপনা থেকে জেগে ওঠে। 'ওই শক্তিটুকু একদিন অকস্মাৎ জেগে ওঠে'। আর এই জাগরণ পর্বটি যে সময় পার হন লেখক 'তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে' তিনি ডুবে যান; তখনই শিল্প সার্থক হয়—লেখা হয়ে ওঠে জীবন্ত। তারাশঙ্কর এই নিবিড় অস্মিতা বোধকে তাঁর শিল্পচর্চার মৌলিক শক্তি বলতে চান—তাঁর মতে এই 'জোরেই' তিনি 'পাত্র-পাত্রীর মুখে' তাঁর নিজের ভাষা সন্নিবেশ করেন না—তারা তাদের মতো কথা বলে। হয়ে ওঠে।

অন্যত্রও এই রকম দাবি তারাশঙ্কর করেছেন। যখন তিনি রাজনীতিতে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন, ইউনিয়ান বোর্ডের সভাপতি হিসাবে আসপাশের গ্রামের উন্নয়নের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তখন জনৈক অব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারীর অনুমতি না নিয়েই পথ কাটার সাহস দেখিয়েছিলেন। জানতেন ব্রাহ্মণ মানুষ, গিয়ে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে চৌধুরী আপত্তি করবেন না। এ ছিল তাঁর দেশ, দেশের মানুষকে জানার অহঙ্কার। বয়স্ক মানুষটি তারাশঙ্করকে বললেন—'আপনি বাবা জাত বামুন। তা, নেন আগে জল খেয়ে নেন। তারপর চলুন, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পুকুরের পাড় কাটিয়ে দিয়ে দক্ষিণান্ত করে আসি।' (*তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা*; উক্ত; ৩১২ পৃ.) তাঁর মন্তব্য ছিল—'এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে। আমি ওদের জানি—ওদের আত্মীয় আমি। উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয়, ভালোবাসার জন।' (ঐ; ৩১১ পৃ.) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে 'তন্ময়তার যোগ' যখন মেশে তখনই সৃষ্টি হয় সার্থক সাহিত্য।

স্মৃতিকথায় বার বার ফিরে এসেছে হাঁসুলীবাঁকের মানুষজনের প্রসঙ্গ। কয়েকটি অংশ উদ্ধার করছি।

১. 'ওই সুচাঁদ এবং আমি গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি।' । তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা; উক্ত; ৩১০ পৃ. ।

২. বুড়ী মোনা-র কথা লিখেছেন তারাশঙ্কর। 'মোনার একটা কথা ভারি কৌতুককর। সে ব্যাঙকে ভয় করত যমের মতো। তার ধারণা ছিল ব্যাঙের বিষেই সে মরবে। ব্যাঙ দেখলে মোনা ভয়ে আতঙ্কে বু-বু তি-তি শব্দ করে লাফাতে আরম্ভ করত। অকস্মাৎ বড় ব্যাঙের সামনে পড়লে তার চোখের দিকে চেয়ে যেন আতঙ্কে জমে পাথর হয়ে যেত।' (ঐ) ৭২-৭৩ পৃ.) মোনা—মনোমোহিনী; বাউরী সম্প্রদায়ের মহিলা।

৩. 'চুল বেঁধে নাকছবি'-পরা নসুবালার সঙ্গে কথাবার্তা সবচেয়ে বিচিত্র। তারাশঙ্করকে দেখে তার কথা শেষ হত না। 'হেই মা গো। কখন এলা? বলি মনে পড়ল আসতে। ছেলেরা ভালো আছে? তোমার শরীর এমন কাহিল হল ক্যানে?' তারাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করতেন— 'তুই কেমন আছিস?' পুরাণ-নিষ্ণাত মন নসুবালার, কথায় তার ভাঁজ থাকত। 'ঠোঁটে পিচ কেটে' বলত নিজের কথা।—যম ভুলেছে, কানা হয়েছে, নইলে আর আমাকে থাকতে হয়?' একের পর এক যারা মারা গেছে তাদের কথা বলত—কাঁদতে থাকত। কান্না শেষ করে বলত গিয়েছিল কোনো এক গ্রামে, বিয়ের অনুষ্ঠানে 'নাচতে যেয়েছিলাম'। তারা তাকে 'রাঙা শাঁখা' পরতে বলেছিল—সে কথা ভেবে লজ্জার এক শেষ হল। চলে যাবার সময় বলল—'এই দেখ, এমন করে মথুরার সুখে বেজধামকে ভুলে থেক না।' মাসে একবার অন্তত আসতে অনুরোধ জানাল নসুবালা। [ঐ ৩১০ পৃ.]

বোঝা যায় হাঁসুলীবাঁকের চরিত্রসমূহ একটি বাস্তবের পটভূমি থেকে প্রাথমিক ভাবে সংগৃহীত হয়েছে। মোনার ব্যাঙের প্রতি তীব্র ভয়ের বিষয়টি সুচাঁদের উপর আরোপিত হয়েছে। একই ভাবে কুকুর সমাধির বিষয়টি তারাশঙ্কর তাঁদের গ্রামে দেখেছিলেন। গ্রামে ঢোকার পথেই কুকুরের সমাধির উপর লেখা ছিল :

"সমাধি মোদের ভুকুর
আমাদের ভালো কুকুর।" [ঐ ২৮৯ পৃ.]

কালুয়াকে করালী এরকম আবেগের বশেই সমাধি দিয়েছিল। সমস্ত হাঁসুলীবাঁকই হয়ে উঠেছে তারাশঙ্করের চোখে-দেখা জীবনের সাহিত্যিক রূপায়ণ।

সি. জি. ইউং সাহিত্যে প্রযুক্ত চরিত্রের গভীরে মনস্তত্ত্বের টানাপোড়েন দেখিয়েছেন। অত্যন্ত মৌলিক সেই আলোচনা। সাহিত্যের চরিত্র তাঁর তাত্ত্বিক কাঠামোতে 'individuation' নামে অভিহিত হয়। চরিত্র হতে পারে তিন রকম—

১. Persona : নায়ক চরিত্র;

২. Anima : নায়িকা চরিত্র ; আর

৩. Shadow : খল নায়কের চরিত্র। (*Psychological Reflection* ; হারপার প্রকাশিত; নিউইয়র্ক; ১৯৬১; 217 পৃ.) তাঁর বিশ্লেষণে 'anima' সবসময়ই নারী চরিত্র এমন নাও হতে পারে। কখনো কখনো পুরুষ চরিত্রেও 'anima-র লক্ষণ থাকা সম্ভব। কারণ তাঁর মতে 'anima is the contra sexual part of a man's psyche, the image of the opposite sex that he carries in both his personal and his collective unconscious'. এই সূত্র তাই নসুবালাকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষত যখন জার্মান বচনের কথা স্মরণ করেন ইয়ুং, মনে হয় নসুরাম বা নসুবালাকে বোঝার একটি চাবি তিনি যোগাচ্ছেন। 'Every man has his own Eve within him'. উপন্যাসের একেবারে শেষে নসুবালা বনওয়ারীকে বলছে : 'আমার মন বললে—তবে তু কি করতে আছিস! ভগবান যে কোনো পুরুষ করে গ'ড়েও মেয়ের মন দিয়েছে, মেয়ের মতন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কেনে দিয়েছে? আর এক দণ্ডের জন্য ভাবলাম না। চলে এলাম, শিয়রে এসে বললাম।' (শেষ পর্ব) এতো জার্মান-বচনের প্রতিধ্বনি। 'তন্ময়তার যোগ' না আকস্মিক ভাবে জেগে ওঠা রহস্যময় সৃজনী শক্তি—কীসের সাহায্যে এই অপরূপ চরিত্রটি গড়ে উঠল, বলা যাবে না। তবে একথা বলতেই হবে এমন চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় নেই।

উপন্যাসের চরিত্র সম্পর্কে অনেকেই আলোচনা করেছেন। ই. এম. ফর্স্টার দেখেছেন বাস্তবের মানুষের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্রের মৌলিক পার্থক্য হল লেখকের বিশ্লেষণ বা দৃষ্টিকোণের সঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র মিলে মিশে থাকে। এই বিশ্লেষণ আর দেখার চোখটি বাস্তবের মানুষের আছে কিনা বোঝা যায় না। এখানেই থাকে 'the fundamental difference between people in daily life and people in books' (*Aspects of the Novel* ; পেঙ্গুইন; লণ্ডন; প্রথম প্রকাশ এডওয়ার্ড আর্নল্ড, ১৯২৭; আমরা দেখছি পেঙ্গুইন-এর ১৯৯০ সংস্করণ; 56 পৃ.) কখনও তিনি সর্বদর্শী কথক ('Sometimes the author is omniscient'—ঐ; ৪৩ পৃ.), কথকই বলেন লেখক চরিত্র সম্পর্কে নিজে থাকেন আড়ালে। ('explains everything, he stands back'.—ঐ)। অর্থাৎ চরিত্র হল মানুষের কথা—আর তার ব্যাখ্যান। কখনও লেখক ব্যাখ্যান সুস্পষ্টভাবে করেন না—পাঠকের জন্য রাখেন ইঙ্গিত। বিশেষত যখন তা দিনপঞ্জীর ঢংয়ে ('cause the story to be told through the diary of one of the characters'—ঐ) হাঁসুলীবাঁকে আত্মজীবনীর ঢং ব্যবহৃত হয়নি। এখানে সর্বদর্শী লেখকের বর্ণনা আর ভাষ্য হাজির আছে। চেনা মানুষের সীমা ছাড়িয়ে উপন্যাসের রচনা বৈশিষ্ট্য চরিত্রের বহুমাত্রিকতায় মুখর বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছে।

নসুবালা সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য এর অনন্যতা বিষয়ে। পরে অবশ্য নসুবালাকে তারাশঙ্কর আর একটি উপন্যাসে এনেছেন। *শুকসারী-কথা*-য় নসুবালা হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'র মতোই নারীবেশী পুরুষ—নারীস্বভাব, স্থায়ী transvestism-এর পরিচয় নিয়ে হাজির। হাঁসুলীবাঁক লেখার (১৯৪৭) দুই দশক পরে *শুকসারী কথা* (১৯৬৭) লিখিত। *শুকসারী-কথা* আত্ম অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। এতে তারাশঙ্কর তাঁর জন্মগ্রাম লাভপুরের একটি ইতিবৃত্ত রচনা করার চেষ্টা করেছেন। এখানে নসুবালা হাঁসুলীবাঁকের কর্তাবাবা-কেন্দ্রিক শৈব সংস্কার ভেঙে মাতৃপূজার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। লাভপুরের দেবী অট্টহাস, একান্নপীঠের অন্যতম জনপ্রিয় দেবী মন্দির। লোকবিশ্বাস—দেবী সতীর শরীর বিষ্ণুর চক্রে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যে-সব একান্ন পীঠের দেবী ক্ষেত্রগুলি তৈরি করেছে—অট্টহাস তার অন্যতম। অট্টহাস দেবীর অধর-ওষ্ঠের উপর গড়ে উঠেছে। নসুবালা এই দেবী মন্দিরের কাছে বাস করে 'কুঁড়েঘর বানিয়ে'; তার কাছে দেবী 'আদারবুড়ী ফুল্লরা'। (পশ্য : 'শুকসারী-কথা'; পূর্বকথা'; *তারাশঙ্কর রচনাবলী*; ২০ খণ্ড; ৬ পৃ.; মিত্র ও ঘোষ; কলকাতা; দ্বিতীয় মুদ্রণ, মাঘ, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ; প্রথম সংস্করণ—১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) আদারবুড়ী অর্থাৎ বনবাসী বৃদ্ধা। *শুকসারী-কথা-য় পরিবর্তনশীল* জীবন প্রবাহ বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপিত। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় সব কথা বলা হয়নি সম্ভবত। সেজন্যই নতুন করে লিখেছেন এই উপন্যাস। উভয় উপন্যাসের বেশ কয়েকটি চরিত্রে অনেকটা মিল আছে। *শুকসারী-কথা*-র সঙ্গে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র তুলনা সামান্য হলেও করে নিতে হচ্ছে। কাহিনীর দিক থেকে নয়, চরিত্রভাষ্যে এই তুলনা আমাদের সাহায্য করতে পারে।

পূর্বকথার সঙ্গে এ-উপন্যাসের ২৪টি পরিচ্ছেদ। প্রায় সর্বত্রই নসুবালা উপস্থিত। হাঁসুলী-বাঁকের কাহাররা চিরকালের জন্য উৎখাত হবার পর নসুবালা কেমন করে এসে পড়ল চন্দনপুরের একপাশে চণ্ডীতলায় সেকথা আছে পূর্বকথায়। সামান্য কিছু কথা বলে নিয়েছেন তারাশঙ্কর। সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই হাঁসুলীবাঁকেও আছে। যেমন :

১. *ছোটবেলায় তার মা তাকে মেয়ে সাজিয়েছিল। 'সেই থেকেই তার মেয়েলিপনা এবং মেয়ে-জীবন আরম্ভ।'* [*পূর্ব কথা : শুকসারী-কথা*]

২. মেয়ে সাজা নসুবালার ডাক পড়ত গ্রামের নাচ গানে। বছরে তিনবার অন্তত : ক. চৈত্রে—ঘেঁটু পরবে; খ. শ্রাবণে—মনসার ভাসানে, আর গ. ভাদ্রে ভাঁজো পরবে।
৩. নসুবালার গলা ভালো ছিল। গান গাইত। তার গান আর নাচে বার বার ঘুরে আসত 'তাই ঘুনাঘুন বাজে লো নাগরী—/চরণে নূপুর হায় থামিতে যে চায় না।'
৪. করালী 'বাপমরা ছেলে, মা তাকে ছেলেবেলায় ফেলে পালিয়েছিল'। এ সময় নসুর মা তাকে স্নেহ করত। সেই থেকে করালীর 'নসুদিদি' সে।
৫. কাহাররা উৎসন্ন হবার পর সে, পাগল আর সুচাঁদ এসেছিল চন্নপুর। সুচাঁদ চন্দনপুরে বটতলায় বসে বলে যেত—'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'। নসু আর পাগল গান গাইত নাচত। 'হাঁসুলীবাঁকের কথা বলব কারে হায়'।

অবশ্য সব কথাই হাঁসুলীবাঁকে যেমন ছিল তেমনি রাখেননি তারাশঙ্কর। নসুবালার গান আর জীবনযাপন পদ্ধতি, ভাষা আর গান অনেকটাই বদলে গেছে। পূর্বকথায় সেই নতুন নসুবালাকে এনে হাজির করেছেন তারাশঙ্কর। নতুন কিছু উপাদান পরিবর্তনশীল কালপ্রবাহের কারণে আক্ষিপ্ত হয়েছে, কিছু এসেছে নতুন জনপ্রবাহে। উৎসন্ন কাহারদের আবেষ্টনী আর তার নেই ফলে খুঁজে নিতে হয়েছে নতুন বাতাবরণ। চন্দনপুর ছাড়াও নবীনপুর, বন্‌চাতরা, যোগপুর, আকুটি, রামভাঙা, গোপতলী—এইসব নানা গ্রামে নসুবালা ভিক্ষা করে বেড়ায়, নাচ গান করে তার ভাদুমণিকে নিয়ে। ফলে এই নতুন ভূগোলে এনে ফেলেছেন তিনি হাঁসুলীবাঁকের বিচিত্র অনন্য মানুষটিকে। নতুন উপাদান আসা অনিবার্য। সামান্য কিছু এসেছে তার পূর্বজীবনের সূত্রেও।

(১) 'তাই ঘুনাঘুন' গানটি নাকি মুকুন্দ ময়রার বেঁধে দেওয়া গান। 'বছর বছর এক এক রকম' গান বেঁধে দিত মুকুন্দ। এ সংবাদ হাঁসুলীবাঁকে সামান্য অন্য রকম। গানটি বনওয়ারীর বাঁধা—হাঁসুলীবাঁকে তাই আছে। (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) হাঁসুলীবাঁকেও গান-বাঁধিয়ে মুকুন্দ ময়রার বর্ণনা আছে। নতুন নতুন ঘটনার কথা তার জানা থাকত—ফলে নতুন নতুন তথ্যে নতুন নতুন গান সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। হাঁসুলীবাঁকে আছে বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য সংবাদ। *শুকসারী-কথা*-য় আছে 'ধূমকেতু' ওঠার কথা। আর মড়কের খবর। এ নিশ্চয় হ্যালির ধূমকেতু—আর পঞ্চাশের মন্বন্তর।

(২) ভাঁজো নিয়ে সে ভিক্ষা করতে যায় বর্ধমানে। বর্ধমানের মহারানি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে নাম দিয়েছিলেন 'ভাদুর মা' নামটি নসুবালার গোটা অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে যায়। ভাদু মণি তার সঙ্গে অপরিত্যজ্য সম্পর্কে জড়িয়ে গেল সেই থেকে। ভাদু সম্পর্কে নসুর সম্পর্ক অদ্ভুত এক পুরাণ-কথার রহস্য রোমাঞ্চ নিয়ে উপস্থিত হয়।

রাঢ় বাংলার ভাদুর গল্প বেশ পরিচিত। তারাশঙ্কর সেই কাহিনী এনে হাজির করেছেন। রাজকন্যা মাঝ রাত্রে চলেছেন—রাজা তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছেন। রাজবাড়ির কৃষ্ণমন্দিরে রাজকন্যা ভাদুমণির নাচের শব্দ পেয়ে ধরে নিলেন রাজা—পুরোহিতের সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত ভাদুমণি। তাই হত্যার নির্দেশ। দ্বার-উন্মোচন করার পর কন্যাকে আর জীবন্ত দেখা গেল না। বিগ্রহ ছাড়া কেউ ছিল না। কৃষ্ণই কন্যার প্রেমাস্পদ—একথা জানবার পর আফশোষের একশেষ হল। ভাদুর মূর্তি গড়া হল বিগ্রহের পাশে। দেশব্যাপী ভাদু পুজো শুরু হল সেই থেকে। [১ পরিচ্ছেদ/*শুকসারী-কথা*]

ভাঁজো রানির কথা ভাদুতে পরিণত হল। নসুবালা ভাদুর মা-তে পরিণত হল। তাকে নিয়েই ভিক্ষে করে গান গেয়ে নাচ করে দিনপাত করত নসু।

(৩) অট্টহাস বা ফুল্লরা নসুবালার 'আদারবুড়ী'তে পরিণত হয়েছে। সে তার নিজস্ব নির্মাণ। আদার অর্থাৎ জঙ্গলের বুড়ি। সৃষ্টির কর্ত্রী—'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মা'—ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী—নসু তাকে 'মহাবুড়ী' বলেই জানে। থাকে এর কাছাকাছি কুড়ে ঘর তৈরি করে। [*পূর্বকথা/ শুকসারী-কথা*]

(৪) পাগল আর সুচাঁদ মারা যাবার পর ফটিক দাসের সঙ্গে বিচিত্র এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নসুর। ফটিক দাস বিচিত্র স্বভাবের মানুষ বৈষ্ণব। দরিদ্র বলেই সম্ভবত তার বৈষ্ণবীরা কেউ টেকেনি। দুজন তাকে ছেড়ে গেছে। মাটির পুতুল গড়ে হাটে-গঞ্জে বিক্রি করে গ্রাসাচ্ছাদন হয় তার। তার বৈষ্ণবতার একমাত্র প্রমাণ—কৃষ্ণের বিগ্রহ। রাখাল-কৃষ্ণ পাঁচনি আর বাঁশি নিয়ে দণ্ডায়মান, কোনো শক্তি সঙ্গে নেই। নিত্যসেবা পুজো সেই রাখাল কৃষ্ণকেই—কোন মন্ত্র নেই—'তবে ফুল দিয়ে সাজায়, নিজে যা খায় সে তাকে ভোগ দিয়ে নিজে খায়, চা, ভাত সবই আগে তার সামনে নামিয়ে দেন।' [১ পরিচ্ছেদ; *শুকসারী-কথা*]

নসুর কাছে ভাদুমণি নীচু জাতির রাজার কন্যা। তার প্রিয় কৃষ্ণ কখনই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সদগোপের কৃষ্ণ নয়। উচুজাতের পুরুষরা 'তাদের ঘরের কন্যেদের সঙ্গে গোপনে রাত্রিকালে' দেখাশোনা করলেও দিনে 'চিনতে পারে না, বাড়ীর দোরে গিয়ে দাঁড়ালে'—তাড়িয়ে দেয়। সুতরাং তার 'ভাদুমণি' এরকম 'তিলক' না-কাটা, 'ফোঁটা' না-দেওয়া, 'গান' না-গাওয়া, ভিক্ষা না-করা ফটিক দাসের রাখালবেশী কৃষ্ণের ঘরনি তাতে সন্দেহ নেই।

দেবতার সম্পর্কে নসু আর ফটিক দাসের আত্মীয়তা। তারা বেয়াই-বেয়ান। এভাবে গড়ে উঠেছে তাদের আশ্চর্য সম্পর্কের রোমাঞ্চ। তারাশঙ্কর লিখেছেন—'দুটি সৃষ্টি ছাড়া মানুষের এই সৃষ্টিছাড়া খেলা।...পুতুল নিয়ে খেলে দিন কেটে যায়। হয়তো বিধাতার সৃষ্টির অপব্যয়, হয়তো পৃথিবীর—দেশের—এই অঞ্চলের জমা খরচের হিসেব-নিকেশের খাতায়—ওরা অমার্জনীয় বাজে খরচ।' [১ পরিচ্ছেদ; *শুকসারী-কথা*]

পুরাণকথা এমনি করে প্যাশান (Passion) হয়ে তাদের জীবনের অপূর্ব এক অবসর তৈরি করে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র বৃত্ত ভেঙে নসু এইভাবে *শুকসারী-কথা*-র বৃত্তে ঢুকে পড়ে। হাঁসুলীবাঁকের কর্তা মূলত শৈবভাবনার অনুষঙ্গ বহন করেন, তাকে হারিয়ে নসু আশ্রয় পায় শাক্ত পরিমণ্ডলে। তার সঙ্গে ফটিক দাসের সম্পর্ক গড়ে ওঠে বৈষ্ণবতার আবহে।

হাঁসুলীবাঁকের নারী-স্বভাব নসুবালার চেয়ে *শুকসারী-কথা*-র নসুবালা অনেক যত্ন দিয়ে লেখা। তারাশঙ্কর যেন কুড়ি বছরের ব্যবধানে বুঝেছেন নসুবালাকে আর একটি উপন্যাসে গুরুত্ব দিয়ে লিখলে বাংলার পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় নসুবালা সম্পর্কে স্রষ্টার অভিজ্ঞতার ঝুলি সম্পূর্ণ উপুড় করা হয় নি—এরকম অভাববোধ ছিল বলেই মনে হয়।

হাঁসুলীবাঁকে নসুবালার পরিচয় কাহার-সংস্কৃতির মধ্যে। *শুকসারী কথা*-য় এই সংস্কৃতির বাইরে নসুবালার টিঁকে থাকার লড়াই, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা লক্ষ করি। সে হয়ে উঠেছে চন্দনপুরের বাইরের বৃত্তটির সর্বত্র ঘুরে-ফেরা একান্ত নিজস্ব জীবন যাপনে অভ্যস্ত এক বিচিত্র মানুষ। হাঁসুলীবাঁকের নসুবালার এই পরিণতি অভাবিতপূর্ব ছিল। পাঠক এই নতুন নসুবালাকে দেখে তার স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য।

হাঁসুলীবাঁকের নসুরাম 'করালীর পিসতুতো ভাই'। দুজনের সম্পর্ক বিচিত্র। মেয়েদের মতো সাজ পোশাক ব্যবহার নসুবালার। 'করালী বিয়ে করে বউ তাড়িয়ে দিয়েছে'—নসুও

'বউ তাড়িয়ে দিয়েছে'। করালী আবার বিয়ে করবে—নসু বিয়ে করবে না। সে এখন 'করালীর ঘরে' 'গৃহিণী' হয়ে বাস করে। (১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) মনে হতে পারে নসুর সঙ্গে করালীর সম্পর্ক সমকামিতার। তবে, তারাশঙ্কর বিষয়টিকে ইঙ্গিতে রেখেছেন। একটু পরেই নসু সম্পর্কে লেখা হয়েছে, করালীর নতুন বউ-এর সঙ্গে আত্মীয়ের মতো থাকবে সে—'ননদ হয়ে থাকবে—এই তার বাসনা।' (ঐ) করালীকে বিচিত্র স্বভাবের hetero sexual বলে মনে হলেও হতে পারে। করালীর বিয়ের পর পাখির সঙ্গে নসুবালার সম্পর্ক স্বাভাবিক ভাবেই অঙ্কিত। কোনো ঈর্ষাকাতরতার পরিচয় নেই। সুবাসীর সঙ্গে সাঙা করার পর পাখি করালীর সঙ্গে যে ক্রুদ্ধ ব্যবহার করে তার তুলনায় করালীর গৃহে ঘরনি হয়ে থাকা নসুবালার সঙ্গে সম্পর্ক নিতান্তই সহজ।

পাগল কাহার উপন্যাসে এসে পড়ার মুহূর্তে একটি অদ্ভুত বিবরণ পাই। 'সঙেল নন্দী'র বেশে গানের কলির রেশ টানতে টানতে ঢোকে পাগল। নসুবালা গান ধরেছিল 'লষ্ট চাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—/কলঙ্কিনী রাইমানিনী—নাম রটেছে দ্যাশে।' সেই সুরের সঙ্গে 'সুর মিলিয়ে' 'অতিসুন্দর পুরুষালি গলায়' বেড়ার ধার থেকে গেয়ে উঠেছিল পাগল :

> শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে—
> ঝাঁপ দিব সই কালীদহে;
> কালীনাগের প্রেমের পাকে মজব আমি অবশ্যাযে।

সকলে চমকে উঠল। সুচাঁদ বলল 'হেসে গড়িয়ে' পড়ে—'রবশ্যাযে এল!' 'নসু লাফ দিয়ে' বলে উঠল—'উ মুখপোড়া কোথা থেকে এল লো? মড়া মরে নাই তাহ'লে?' 'পাখি খিল খিল করে হেসে উঠল।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই রঙ্গ-রসিকতার মধ্যে পাগল-নসুর সম্পর্ক ইঙ্গিতময় হয়ে ওঠে। স্ত্রী মারা গেছে পাগলের। একটি মাত্র কন্যা—ভিন গ্রামে বিয়ে দিয়েছে। গ্রামে নিয়মিত থাকে না। তবে তাকে দেখে সুচাঁদ-পাখি আনন্দে উদ্বেল হয়েছে, নসুবালা বিচিত্র ব্রীড়ার পরিচয় দিয়েছে। এ থেকে মনে হয় সম্পর্কটিতে সাধারণ মস্করার চেয়ে কিছু বেশি ছিল। 'সুচাঁদের পা টিপে এবং ইঙ্গিত' করে উচ্চকণ্ঠে যখন পাগল বলে—'তা এই বারেতে আমার বেবস্থা একটা কর।' তখন নসুর চমক্ লাগে! গালাগাল দিয়ে ওঠে সে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—'কথাটা কৌতুকের। পাগল নসুবালাকে ওই স্ত্রী-বেশের জন্য ক্ষ্যাপায়, বলে—বিয়ে করব। নসু একেবারে ক্ষেপে যায়। ছুটে পালায়।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)।

নসুর বৈশিষ্ট্য তার বলার ভঙ্গি—ভাষা। সে-ভাষায় নারীদের মনোগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। আছে নারীদের কলহ করার ভঙ্গি। "কৈশোর স্মৃতি"-তে তারাশঙ্কর লিখেছেন 'সেকালে পাড়াগাঁয়ে কোন্দল-কলহ একটি যাকে বলে 'আর্ট', তাই ছিল। এমনভাবে গুছিয়ে গুছিয়ে কবিতার মতো ছন্দোবদ্ধ ভাবে সর্বনাশ কামনা করা সহজ নয়।' (*তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা*—১ম খণ্ড; উল্লেখিত; ২২৭ পৃ.) আরও জানিয়েছেন 'এর আবার ব্রাত্য সংস্করণ আছে।...এর নিদর্শন "হাঁসুলীবাঁকের উপকথা"য় নিখুঁতভাবে দেওয়া আছে।' (ঐ) হাঁসুলীবাঁকে কোন্দলের ব্রাত্য সংস্করণ পাই প্রধানত বাসিনী বউ-এর মুখে। নয়ানের মা'র খর জিহ্বা ভয়ঙ্কর। আর আছে সুচাঁদ আর নসুর কথায়। নয়ানের মা আর সুচাঁদ নারী—এ তাদের স্বাভাবিক ভাষা। নসুবালা ভাষাটি আয়ত্ত করেছে। কয়েকটি প্রকাশভঙ্গি তার অননুকরণীয়।

(১) বনওয়ারী একসময় নসুবালার কথায় বিব্রত বোধ করে, ভাবে—'ওঃ, পুরুষের মেয়েলী চঙ হ'লে সে পুরুষ ঝগড়ায় মেয়ের বাড়া হয়ে ওঠে।' (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) তখন ঝগড়ার উপলক্ষ ছিল নয়ান; পাখির নাকে কামড় বসিয়েছিল সে। পাখি নয়ানের 'বিয়োলো বউ' কিন্তু 'হেঁপো রুগী' নয়ানকে ছেড়ে মাস ছয় সে মায়ের কাছে থাকত। এরপর করালীকে সাঙা করেছে সে। নয়ান কোন অজুহাতে পাখির নাক কামড়ে প্রতিশোধ নিয়েছিল। নসু বনওয়ারীকে দেখে বলে গেল : 'সব পুত থাকতে লাতির মাথায় হাত!' হাত গেল, আঙুল গেল, পিঠ গেল, কাঁধ গেল, গিয়ে লাকে কামড়?' [ঐ]

(২) পানু মজলিশে মুরুব্বিদের ঢঙ-এ কথা বলছিল। নসুর তা ভালো লাগে নি, কারণ পানু তাদের সমবয়সী। বয়সাধিক গাম্ভীর্য নিয়ে কথা বলছিল। 'পুরুষদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে' বসে থাকা নসুর সহ্য হয়নি। বলেছে 'পানুর মুখের সামনে হাত নেড়ে শরীর দুলিয়ে'—'আ ম'রে যাই, গুড় দিয়ে তোমার গাল চেটে খাই।' 'কিরে আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো' আমার! উনি বলেছেন—আমরা ছেলে ছোকরা। বলি তোর মতি গতি তো ভাল। বলি—হা রেক মুখপোড়া চিমড়ে শকুনি, কি করেছি আমরা। বল শুনি? মাতব্বরের দোসর আমার। বাঘের পেছুতে ফেউ—সানাইয়ের পো।' [২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ]

(৩) করালীর বাড়ি উড়েছে তাতে পানু খুশি। ভাবনা এই—'পিতিফল' হয়ে গেল! নসু যাচ্ছিল মিত্র গোপালপুর। হঠাৎ বলে উঠল—'তা আবার পাবি না? তোর ব'লে কত পুণ্যাত্মা, কত তোর সাধন ভজন, তু আবার পমাণ পাবি না? বলে, সেই পুণ্যি ছটায় আঁধার আলো হয়। নখে তোর তিন কাল, চোখের দৃষ্টিতে বক মরে, ঝুলিতে তোর সিঁধ কাঠি, তু আবার পমাণ পাবি না?' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এই ছড়ার মতো বহুস্তরীয় কথার তুলনা মেলা ভার।

(৪) নয়ানের মা করালীর কোঠা বাড়ি সম্পর্কে পাড়ার সকলের আশঙ্কা আপত্তির মধ্যে অভিশাপ দিয়েই চলেছিল। অভিশাপ করালীর মৃত্যু কামনা করে ('তোমার বাহনের বিষ নিঃশ্বাসে 'ফুস ধা' করে দিয়ো'—'তোমার' অর্থাৎ 'বাবা ঠাকুরের') নসুবালা ছাড়ার পাত্র নয়। তার কথা—সে আবার তীব্র গালাগাল দিতে দিতে; সঙ্গে ফিরে অভিশাপ—'হাঁপাতে হাঁপাতে 'ফুস ধা' হয়ে যাবে লো! অর্থাৎ নয়ান। যে মুখে পরের মন্দ চায় লোকে, সে মুখে লোকের পোকা পড়বে লো।' সেই সঙ্গে—'দুহাতের বুড়ো আঙুল নাড়ছে আর ঢেউয়ের মত দুলছে।' [৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ]

নসুবালা কাহার সমাজের চিরাচরিত বদ্ধতাকে সামান্য অস্বীকার করেছে। অনেকটা নিজের মতই। *শুকসারী-কথা*-র নসুর মতো নিত্য ভ্রাম্যমাণ নয় হাঁসুলীবাঁকের নসু। তবে সেও আসপাশের গ্রামে ঘুরে ফেরে। 'এ অঞ্চলে বিয়ে-বাড়িতে নসুবালার বাধা নিমন্ত্রণ।' আসলে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হয়। 'পরনে মেয়ের সাজ, নাকে নথ, মাথায় খোঁপা, গায়ে গয়না, কাঁধে ঝুড়ি। গিয়ে ঝুড়িটি রেখে প্রণাম করে বলে—এয়োদের মঙ্গল হোক।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) নিজেই বেছে নেয় কাজ। এঁটোকাটা ফেলা, 'পাটকাম' করা আর গান শোনানো। আর পারিশ্রমিকও বলতে থাকে—'যাবার সময় একখানি শাড়ি লোব, খাবার লোব, গুণগান করে নাচতে নাচতে বাড়ি যাব।' [ঐ]

মিত্রগোপালপুর থেকে ফেরার সময় একটা নাকছাবি পরে আসছে দেখে পাগল একটু মজা করে নিল। তার শাড়ি 'অঙে-অঙে' 'অক্ত সনজে' হয়েছে। পাগল বলল 'তা হলে গাঁয়ে ফিরে আমার সাঙাটাও হয়ে যাক ব্যানো-ভাই। কনে তো তৈরি।' নসুবালা প্রবল

আপত্তি তোলে—'ভদ্দলোকের ঘর মান না!' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এখানে বোঝা যায় পাগলের প্রস্তাবে যে সমকামিতার ইঙ্গিত ছিল তাকে সে অভদ্রজনোচিত বলে গণ্য করছে। মেয়েলি স্বভাব তার, কিন্তু তা নিয়ে বিদ্রূপ অন্তত কায়স্থ বাড়ির চত্বরে করা উচিত নয়—তা সে জানে। এখানে তার মনে দুটি স্তরের সমান্তরলতা লক্ষ করি। একটি স্তরে সে যে পুরুষ সে কথা ভোলে না, আর এক স্তরে সে নারীস্বভাব—তাকে সে মনে রাখতে চায়। নসুবালা চরিত্রটির অনন্যতা এইখানে। বিয়েবাড়ি থেকে কত কিছু সংগ্রহ করেছে সে। বরকে বলেছে—'দাদাবাবু, কাহার বলে আমি ননদ পেটারি পাব না কি?' (ঐ) এই বলার পিছনে আছে তার নারীসত্তার প্রকাশ। নসু চরিত্রটি বুঝে নেবার জন্য এই দ্বৈত সত্তার ক্রম পরিণতি আর শেষ পর্যন্ত নারীসত্তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার অদ্বৈতটিকে বুঝে নিতে হয়।

নসুর ভিতর পাড়ার মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কে এক ধরনের নিজস্ব ব্যাখ্যান ছিল। তবে তার স্নেহশীলতা সর্বদাই করালীকে ঘিরে। পাড়ায় করালীর উন্নতিতে তার আনন্দ, অহঙ্কার আর করালীর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সবার উপর ছিল তীব্র সমালোচনা। করালীর প্রতি স্নেহের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার সংঘবদ্ধ জীবনে (community life-এ) যেখানে যা করার, তা সে করতে ভোলেনি। নয়ানের বিরুদ্ধে এত যে ক্ষোভ সব একপাশে সরিয়ে সে যখন তার মৃত্যুর আগে পরে আক্ষেপের কথা বলেছে তখন মনে হয় সে হল বাঁশবাদি কাহারপাড়ার মঙ্গলদায়িনী শক্তির প্রকাশ। 'তার আক্ষেপের কথাগুলির মধ্যে অকৃত্রিম আক্ষেপ—কত কথা সে বলছে! নয়ানের বাল্য কৈশোর যৌবনের কথা; তারই সমবয়সী ছিল, একসঙ্গে খেলেছে; এক সঙ্গে বড় হযেছে, তারই স্মৃতির কথা; তার মধ্যে নয়ানের দোষের কথা নাই, সব গুণের কথা।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এভাবেই স্মৃতিধৃত হয় মানুষের বীরত্বের কথা, পরাজয়ের কথা—চলে যাবার কথা। তার কিছু থেকে যাবে—উপকথার অন্তর্গত হয়ে যায়। নসু হয়ে ওঠে সুচাঁদের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। তার নারীভাবকে পুরোপুরি নপুংসক পৌরোহিত্য (eunach priest-ship)-এর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় কিনা তার প্রমাণ এই উপন্যাসে নেই। তবে অপ্রমাণের উপাদানও নেই। পৌরুষের প্রকাশ তার মধ্যে নেই—নারী ভাবুক সে। নিজেকে নারীই ভাবে। আর নারীর হাত থেকে তার মধ্যে গ্রামসমাজে কৃত্যের দিকটিও তার হাতে চলে আসে যেন। নয়ানের মৃত্যুকালের আক্ষেপ নারীস্বভাবের প্রমাণ বোধ হয়। গোপালীবালার মৃত্যুর পর সামান্য মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করি।

সুবাসীকে দেখে গোপালীর প্রশংসা (গোপালী কাকী 'মাটির মানুষ', 'সোনার পিতিমে', তার 'মুখে ঝরত অমিতি', 'কথা শুনে প্রাণ জুড়াত' ইত্যাদি) ছেড়ে কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। 'হঠাৎ নসুবালা' 'দেওয়ালে ঠেস দিয়ে' দাঁড়ানো সুবাসীকে বলল : 'আঃ সুবাসী, তোর বাছা করণ দেখে শরীরটা রি-রি করছে আমার। বলি—দে, সিঁদুর ঢেলে দে—সতীনের মাথায় সিঁদুর দে, বল্—সোয়ামীর দাবী ছেড়ে দাও, তোমাকে আমি সিঁদুর দিলাম, আমার সিঁদুর তুমি বজায় একো।' (৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) কৃত্য (ritual)—শুধু কথা (narrative) নয়, আচরণ—চর্যা। গোপালীবালা ছমাসও সতীনের ঘর করেনি। মায়া ছিল। সংসারের প্রতি মায়া। এরকম ক্ষেত্রে সে যাতে ফিরে না আসে—অশরীরী আত্মা হিসাবে, তাই এই দৃষ্টিকোণ।

আগেই লিখেছি—করালীর জন্য অহংকার তার ছিল। সেই অহংকার তাকে অস্থিতিশীল রেখেছে। সমাজের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকতে পারেনি। করালী যখন নতুন ভাঁজো পেতেছে তখন সেতো মোটেই গ্রামজীবনের কৃষি-সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত

বনওয়ারীর ভাঁজো নয়, তবু তাকে দেখি করালীর দিকেই ঝুঁকে পড়তে। 'গানে গানে গালাগালি' এক অর্থে ভাঁজোর প্রাণ। বর্ধমান-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ভাদুও অনুরূপ। এক পাড়ার ভাদু অন্য পাড়ার ভাদুকে যথেষ্ট গালাগাল করে—নিন্দামন্দ করে। লোকজীবনে আত্মস্বার্থ রক্ষার জাদু এসব। পাগল এবার বনওয়ারীর দলে—নসু করালীর দলে। 'এই ভাঁজোর দিনে নসু পাগলের কথায় ক্ষ্যাপে না, ভয় করে না। সমানে মাতনে মাতে।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) কেন এমন দ্বন্দ্ব—এ-নিয়ে আগে আলোচনা করেছি। বিষয়টি উর্বরতা সংক্রান্ত ক্রিয়া (fertility cult)। করালীর ভাঁজো অবশ্য নিছক অহংকার-প্রকাশক। গ্রামের লোকদের দেখানো, তার ক্ষমতা বেড়েছে। সাহেবদের এনে দেখানো সেই অনুষ্ঠান। সেতো কৃষিলক্ষ্মীর কারণে জাদু-নিয়ন্ত্রণের কৃত্য করছে না; তার দেবতায় বিশ্বাস নেই। তবু নসু তার সঙ্গেই থেকে গেল। নপুংসক-প্রতিম নসু। কৃষি সংস্কৃতির জাদু-নিয়ন্ত্রণ যেমনই থাকুক, করালীর উদ্দেশ্য আনন্দ করা। নসুরও কোনো উত্তরাধিকার থাকা সম্ভব নয়।

করালী যুদ্ধের কোম্পানিতে পদস্থ হবার পর নসুকে দুর্গা পুজোর পোশাক দিল। নসুবালা পরম আহ্লাদে গ্রামের সবার সামনে 'নতুন শাড়ি পরে ঘুরে ঘুরে' বেড়াল—বলল, 'আমাদের কি মাঠের পয়সা? আমাদের পয়সা কলির কারখানার। ঝম্-ঝম্-ঝম্—লগদ লগদ। আমাদের কাপড় সম-সম কালে নয়, আগে-ভাগে।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) চন্দনপুরের নগদ পয়সা—মাঠের পয়সার চেয়ে ক্ষমতা তার বেশি। আর তাই নসুবালার মতো নারী স্বভাবের আকর্ষণ তার প্রতি। তবে শেষ পর্যন্ত এই অহঙ্কার তার টেঁকে নি। গ্রাম-জীবনের চরম উৎক্রান্তির দিনে তার মন ফিরেছে 'ব্রজধামে'। মথুরার সম্পন্নতার আকর্ষণ ছিন্ন করে ফিরেছে সে।

নসুর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এইভাবে একটি পরিণতি পেয়েছে। তার আগে নসু একবার তার ব্যক্তিত্বের পরিচয়টি স্পষ্ট করেছে। বনওয়ারীর দ্বিতীয় বিবাহে তার মত ছিল না মোটেই। সুবাসীর সঙ্গে সাঙা আসলে বনওয়ারীর নেতৃত্বে আটপৌরে পাড়ার সঙ্গে কোশকেঁধে কাহারদের ক্রিয়াকর্মের সূচনা। এখানে অঙের সম্পর্ক মলিন হয়েছে—ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক, কালোশশীর সঙ্গে বনওয়ারীর সম্পর্ক। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখানে কালোশশীরই মতো চালচলন সামান্য মাজা রঙের সুবাসীর সঙ্গে সাঙাতে পরিণতি পেল যখন তখন পরম পলাতক, রমণের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতাই নেই। এখানে অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ থাকতে পারে—নেই যা তা হল অঙের খেলার মায়াবী মনস্তত্ত্বের দোলাচলতা। হয়তো নসু তাই আনন্দ করতে চাইল না। অন্য কারণটি স্পষ্ট। করালী-পাখিকে পাড়া ছাড়া করেছে বনওয়ারী। গোটা গ্রাম যখন বিজয়ীর খুশিতে উদ্বেল তখন বনওয়ারীর প্রতি নিস্পৃহ থাকার ক্ষমতা নসুবালার আছে। তাই বলছিলাম ব্যক্তিত্বের উন্মেষ ঘটেছে তার এই পর্বে। নসুর অজুহাত, শরীর খারাপ। 'আসল কথা সবাই বুঝেছে'। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) নসু বলেছে—'কাহার কুলে জন্মেছি, কাহার পাড়ায় বাস করি, বনওয়ারী কাহার পাড়ার মাতব্বর, দণ্ডমুণ্ডের মালিক, তার হুকুম যেন মানতে হবে বাইরে; কিন্তু মন তো কারুর দাসী বাঁদী নয়, সে কাহারও নয়, আটপৌরেও নয়, সেই শুধু মানুষ'—(ঐ) নসুর মধ্য থেকে এই 'শুধু মানুষ'টিকে তারাশঙ্কর বের করে এনেছেন।

উপন্যাসের চরিত্র flat না হয়ে round হলে উচ্চস্তরের হয়। সর্বত্রই এই সূত্র সিদ্ধ নয়। ফর্স্টার লিখছেন : 'we must admit that flat people are not in themselves as big achievements as round ones, and that they are best when they are

comic'. (*Aspects of the Novel*: উক্ত; 77 পৃ.) নসু হয়তো হাস্যকর তবে তাকে ধীরে ধীরে গভীর মমত্ববোধ থেকে তার স্রষ্টা এনে দাঁড় করিয়েছেন বড় একটি সার্থকতা (big achievement)-র প্রান্তে। এতদিনের নির্ভরতা, সম্পর্ক, ভালোবাসা, স্নেহ, অহঙ্কার যাকে ঘিরে—সেই করালী যখন বনওয়ারীকে 'কুটোর মত তুচ্ছ' মানুষে পরিণত করল তখন নসু করালীকে পরিত্যাগ করল। এসে দাঁড়াল বনওয়ারীর পাশে। তার যুক্তি : 'তার এই দিনগুলি জন্যেই কি বাবাঠাকুর দয়া ক'রে নসুকে নারীর স্বভাব দিয়ে গড়েছিলেন? গড়ে বলেছিলেন—আমি যখন চলে যাব হাঁসুলীবাঁক ছেড়ে, বনওয়ারী যখন কুটোর মতন তুচ্ছ লোক হবে, তখন তার ভার নেবার জন্যেই তোকে গড়লাম?' (শেষ পর্ব) নসুর এই পরিণতি কতকাংশে দৈব অনুগ্রহের মতো। এই Spiritual অভিব্যক্তিটি নসুর মনের গড়নে বিমিশ্র হয়ে আছে। এতে কোনো বিকার বা অন্যরকম যৌন-মনস্তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এ হল নসুবালার উত্তরণ।

নয়ানের মায়ের ভয়ঙ্কর অনাথার মতো মৃত্যু দেখে নসুবালা যখন বলে—'আমারও হয়তো শেষে এই দশাই হবে। আমারও তো কেউ নাই। আমাকেও এমনি করে মরতে হবে।' নসু নয়ানের মাকে জল দিল শেষকালে। তার স্নেহশীলতা পরিণতি পেল।

বনওয়ারীকে সেবা করার সময়ও একই রকম ভাবনা তার। 'আমার মন বললে—তবে তু কি করতে আছিস! ভগবান যে তোকে পুরুষ গড়েও মেয়ের মন দিয়েছে, মেয়ের মতন কাজকর্ম করবার ক্ষমতা দিয়েছে, কেনে দিয়েছে?' আর না ভেবে বনওয়ারীর সেবায় নেমে গেছে নসু। এই স্নেহশীলতা তার চরিত্রটিকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছে।

উত্তর-আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার ধারায় নসুরাম তথা নসুবালা চরিত্রটি ব্যাখ্যা করার একটি অন্যরকম পরিসর পাওয়া যেতে পারে। সমকামিতা-বিষয়ক আলোচনা যার পোশাকি নাম 'gay and lesbian studies'—তার দ্বারা বিষয়টিতে সামান্য নতুন আলো ফেলা সম্ভব। মার্কিন দার্শনিক জুডিথ বাটলার-এর অন্তত তিনটি রচনায় একই তাত্ত্বিক বিবেচনার অবকাশ আছে। বই তিনটি যথাক্রমে :

১. Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity (১৯৯০);
২. Bodies that Matter (১৯৯৩) আর
৩. Excitable Speech : A Politics of the Speech Act (১৯৯৭)।

প্রথমেই লিখি, বইগুলি আমরা দেখছি না। আমরা এই তাত্ত্বিক আলোচনাগুলি থেকে গড়ে ওঠা 'Queer Theory' সম্পর্কে সামান্য তত্ত্ব তল্লাশ করছি। Queer অর্থাৎ সমকামী—অস্বাভাবিক, বিস্ময়কর। তত্ত্ব কাঠামোটির দ্বারা সমকামিত্ব সমাজের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ থেকে ক্রমশ অর্থান্তরের সম্ভাবনার দিকে অগ্রসর : 'the epithet Queer!' the gamble is that flaunting this name can change its meaning and make it a badge of honour rather than an insult.' (পশ্য : জোনাথন কুল্লার : *Literary Theory : A very short Introduction* ; অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ; ১৯৯৭; 101 পৃ.) কুইয়ার-তত্ত্ব অনুসারে মানুষের লিঙ্গ নির্ধারিত হয় শুধুমাত্র দৈহিক কাঠামো অবলম্বনে, সমাজ-সংসারের প্রচলিত সংস্কারে—এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। সমকামী আরেথা ফ্রাংলিন যখন ঘোষণা করেন : 'you make me feel like a natural woman' তখন নতুন এক প্রসঙ্গ উঠে আসে। লিঙ্গ শুধুমাত্র সামাজিক-সাংস্কৃতিক আরোপ না থেকে হতে থাকে ব্যক্তির ইচ্ছা ও প্রাণতার অঙ্গ—কুইয়ার তত্ত্বে বলা হবে : 'your gender is created by your acts,

in the way that a promise is created by the act of promising' (ঐ; 102 পৃ.) বাটলার একটি পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেছেন—'girling'—যে-সামাজিক প্রক্রিয়ায় একটি মেয়ে হয়ে ওঠে, 'the making of a girl, through an 'assignment' of compulsory repetition of gender norms' (ঐ ; 102-103 পৃ.) নসুবালাকে তার পরিবার ছোট থেকে মেয়ে সাজিয়ে এই 'girling'-এর প্রক্রিয়ার দিকেই গিয়েছে—এভাবে ভাবাই যায়।

এস. জ্যাকসন ও জে. জোনস সম্পাদিত *Contemporary Feminist Theories* গ্রন্থে এস. জ্যাকসন একটি প্রবন্ধে ("Theorizing Gender and Sexuality") বাটলারের সামান্য সমালোচনা করেছেন। তার মতে যখন কোনো পুরুষ নারীভাবে ভাবিত হয় তখন তার মধ্যে নকল নবিশীর প্রক্রিয়া চলতে থাকে।—'when a man performs in drag, dressing and acting like a woman', তখন তার প্রবণতা নারীত্বের একটি আদর্শ ('original' model যা কিনা কোনা 'real' woman-এর) নকল করতে করতে এগিয়ে যায়। এভাবে তার প্রবণতা প্রমাণ করতে থাকে— লিঙ্গ মোটেই মৌলিক কোন মানবিক সত্তা বা পরিচিতি নয়—'gender is a construction there is the original' (আমরা দেখছি : রিণিতা মজুমদার-এর *A short Introduction to Feminist Theory*'; অনুষ্টুপ; কলকাতা; ২০০১-এর 83 পৃ.)। রিণিতা মজুমদার অবশ্য বইটিতে তাঁর নিজস্ব মতামত ও বিশ্লেষণ বেশি রাখেন নি। বইটি সংকলনধর্মী। যাইহোক, প্রসঙ্গটি এস. জ্যাকসনের মারফৎ কেমন উপস্থাপিত হল একটু দেখাচ্ছি। এইরকম লিঙ্গান্তরিত পরিস্থিতিকে জ্যাকসন অনুকরণাত্মক বলে বিবেচনা করার পক্ষপাতী—de-naturalizing gender', এ-হল 'the imitative structure of gender itself' (ঐ) তাই যদি হবে তাহলে নারীত্ব বলে মূলে original কিছু তো নিশ্চয় থাকবে! সেটি কি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান বাটলার-জ্যাকসন বা রিণিতা-রা? স্পষ্ট উত্তর মিলছে না। এ উত্তরটি না পেলে নসুবালার কথা : 'তার এই দিনগুলির জন্যেই কি বাবাঠাকুর দয়া করে নসুকে নারীর স্বভাব দিয়ে গড়েছিলেন? গড়ে বলেছিলেন—'আমি যখন চলে যাব হাঁসুলী বাঁক ছেড়ে, বনওয়ারী যখন কুটোর মতন তুচ্ছ লোক হবে, তখন তার ভার নেবার জন্যেই তোকে গড়লাম?' (শেষ পর্ব)—এর ব্যাখ্যা হয় না। চিরন্তন মানবী-সত্তার উত্তর পাশ্চাত্য নারীবাদে নেই, আছে আমাদের তন্ত্রে—'ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী' জননীকে প্রেমিকা হিসাবে গ্রহণ করার দুঃসাধ্য সাধন প্রণালীতে। এ-নিয়ে একটু পরে এ-বইতে আলোচনা করেছি।

নসুবালা বুঝবার জন্য দু-তিনটি মানদণ্ড আমাদের। ১. আদিম সমাজের নারী বেশ ধারণের (transvestism) ব্যাপক প্রচলনের রীতিতে নসুবালাকে বোঝা সম্ভব। ২. সমাজ বিবর্তনের সূত্রে নারী পৌরোহিত্য ধীরে ধীরে বাঁকা পথে পুরুষ পৌরোহিত্যে রূপান্তরিত হবার মধ্য পর্যায়ে খুব কম সময়ের জন্য নপুংসক পৌরোহিত্য (eunach priest-ship) ছিল; নসুবালাকে এই পর্যায়ের স্মৃতি হিসাবেও দেখা যেতে পারে। ৩. আধুনিকোত্তর (post modern) নারীবাদী ভাবাদর্শে কুইয়ার-তত্ত্বে, নারী লিঙ্গ নির্মাণ তথা girling-এর সূত্রেও নসুবালাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

চতুর্থ একটি বিশ্লেষণের কথা লিখব। আমাদের দেশের ভাবনায় বৈষ্ণব সংস্কৃতির সখীভাবের সাধনায় বিষয়টির আভাস ছিল। শ্রীচৈতন্য স্ত্রী-ভাবে ভাবিত সাধক। তার অন্তরে কৃষ্ণ বহিরঙ্গে তিনি রাধার ভাব অঙ্গীকার করেছেন। কেন এই রূপ গ্রহণের প্রয়োজন পড়ল?

পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রচনা *চৈতন্য চরিতামৃত* অনুসারে প্রশ্নটির সমাধান করা যাক। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চায় আছে।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয় বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাৎ
একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ঞ্চ ঐক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

কৃষ্ণদাসের ভাবানুবাদ খানিকটা এই রকম :

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥

একআত্মা হওয়া সত্ত্বেও ত্রিগুণাতীত ঈশ্বর নিজেকে 'দেহ ভেদ' করেছিলেন—রাধা আর কৃষ্ণ প্রকৃতি আর পুরুষ—এই দুই সত্তায়। শ্রীচৈতন্যে এই দুইকে ঐক্যবদ্ধ করে ('তদ্বয়ঞ্চ ঐক্যমাপ্তং') অবতীর্ণ হলেন গোরা। অন্তরে কৃষ্ণ তিনি—বহিরঙ্গে রাধা—'রাধা ভাব দ্যুতি সুবলিত' তিনি—'কৃষ্ণস্বরূপ'। কি করে এই অসম্ভব সম্ভব হল? বৈষ্ণব দর্শনের ঝটিতি উত্তর, এ-হল 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনা :

রাধা পূর্ণ-শক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র-পরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতারি। রাধা-ভাব-কান্তি দুই অঙ্গীকার করি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপে কৈল অবতার।

যোগমায়ার প্রভাবে রাধা-কৃষ্ণ ভুলেছিলেন স্বরূপ, তাই লীলারস আস্বাদন সম্ভব হয়েছে। বস্তুত তারা তো অভেদ স্বরূপ। পার্থক্য যা তাইতো মায়া। মৃগমদ—কস্তুরী আর তার গন্ধ পৃথক? আবার পৃথকও কি নয়? ঘ্রাণেন্দ্রিয় যে সুঘ্রাণে তন্ময় তা তো কস্তুরীরই? জ্বলন্ত প্রদীপ আর তার আলো কি এক? আবার কি এক নয়? দর্শনেন্দ্রিয় যে আলোকিত পরিবেশের পরিচয় লাভ করে—প্রদীপ শিখা তো সেখানে হাজির নেই? অথচ আলো তো আছে! আসলে নারীসত্তা আর পুরুষসত্তা—মানুষের দেহে যেমন আছে, বিশ্বব্যাপারেও তো বর্তমান আছে। এই সত্তার জায়মান বিচ্ছেদ ও মিলনই তো জগৎ ব্যাপার! নসুর মধ্যে এই অচিন্ত্য ভেদাভেদই সম্ভবত তারাশঙ্কর দেখাতে চেয়েছেন। এর সঙ্গে আমাদের দেশের মঞ্জরী-ভাবের সাধনাও যথেষ্ট আলো ফেলেছে। নায়কের নাম যেখানে বনওয়ারী—সেখানে এই ভাবনা নিশ্চয় অবান্তর নয়।

উপন্যাসের শেষে যখন নসু দেখেছে করালী নতুন হাঁসুলীবাঁক গড়ার কথা ভেবে এসেছে তখন আবার সে গেয়ে উঠেছে—'তাই ঘুনাঘুন'। এর আগে নসুবালা পাগলের নৃত্যগীতের বিষয় ছিল 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'। সুচাঁদের উত্তরাধিকার। এক সময় ভেবেছিলাম এতে কখনই নতুন কিছু জন্ম নেবার সম্ভাবনা নেই।—'পাগল ও নসুরাম তথা নসুবালার যৌগপত্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশিষ্ট শিল্প কৌশল বলে মনে করি। তিনি পুরুষে পুরুষে বিবাহ দিয়ে বলতে চান, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা এবার সত্যি সত্যি উত্তরাধিকারহীন হল।' (অচিন্ত্য বিশ্বাস : "প্রতিহত মনুষ্যত্ব, প্রবহমানকাল ও হাঁসুলীবাঁকের কালো মানুষেরা"; রবিন পাল, নিমাই দাস, অনিল রায় সম্পাদিত : *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-গ্রন্থভুক্ত; চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা; ১৯৯৬; ১৮১ পৃ.) এখন মনে হচ্ছে করালীর ফিরে আসা—'অনেক

কথা। একঘর কথা।'—নসুবালার কাছে সত্যিকার নতুন সম্ভাবনার কথা হয়ে দেখা দিল। পাগলও তৈরি করল নতুন গান :

যে গড়ে ভাই সেই ভাঙেরে, যে ভাঙে ভাই সেই গড়ে;—
ভাঙা গড়ার কারখানাতে, তোরা দেখে আয়রে উঁকি মেরে।

সৃষ্টি আর স্থিতির প্রান্তে প্রলয়ের অভিঘাত। ভারতীয় গ্রামজীবন তার মধ্যে শত সহস্র বছর টিকে আছে। নসু আর পাগল তার আনন্দধ্বনি—মঙ্গল ভাষ্যের পরম বিস্ময়। হারায় না খুব সহজে। নতুন রূপে ফিরে ফিরে আসে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় প্রধান চরিত্রগুলি প্রায় সবাই উত্তরাধিকারহীন—সন্তান নেই কারো। অথচ উপন্যাসটি বংশপরম্পরার নানান সম্পর্কের বনিয়াদ গড়ে এগিয়েছে। আটপৌরে নেতা পরম অপরাধী—চিরকালের জন্য পলাতক; নতুন নেতা হিসাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ রমণও অপরাধপ্রবণ—কাটোয়ায় পলাতক। ঘরভাঙাদের শেষ পুরুষ নয়ান মৃত, শেষ নারী বাসিনী বউয়ের মৃত্যু বীভৎস। বনওয়ারীর সন্তান নেই। গণ্ডার কাহার পুরোনো মাতব্বর—তারও বংশ নেই। মনে হয় একটি পরম্পরার ভয়ঙ্কর নিঃশেষিত হবার কাহিনীই রচনা করতে চান তারাশঙ্কর। নসুবালা এই পরিকল্পনার অঙ্গ। তাকে নতুন উপন্যাসে কুড়ি বছরের ব্যবধানে আর একবার আনলেন তারাশঙ্কর। *শুকসারী-কথা*-র পটভূমিতে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুষঙ্গ আছে। রাধা-পক্ষ আর কৃষ্ণ-পক্ষে সারী আর শুক—সামান্য দ্বন্দ্ব জুড়ে দেয়। তাই 'শুকসারী-কথা'। ভাদু আর রাখাল কৃষ্ণ—এই দুইয়ের পক্ষে নসু আর ফটিক দাস—সারাজীবনই তারা পুতুল খেলে গেল। হাঁসুলীবাঁকে যে কৃষি সংস্কৃতির ঘন বুনট —*শুকসারী-কথা*-য় তা নেই, থাকা সম্ভব নয়। সমস্ত কিছুই সে দেখে তার আধ্যাত্মিক মায়াঞ্জনে মিশিয়ে। চণ্ডীতলায় যায়—দেখে পুরোহিতের অন্যায় আচরণ, প্রণামীর টাকা নিয়ে নেওয়া। পরক্ষণেই ব্যাখ্যা তার—অন্যকে লুকিয়ে টাকা সরালেও মাকে তো লুকোয় নি। দেবী তো 'ড্যাবডেবে চোখ মেলে চেয়ে সব' দেখেছেন। সুতরাং তাকে চোর বলা যাবে না। এই মেনে নেওয়া—একটা ব্যাখ্যা-বিন্দু খুঁজে নেওয়া নসুবালাকে নতুন প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে। প্রেক্ষাপটটি নতুন কিন্তু নসুর আনন্দ রোমাঞ্চ প্রায় একই রকম।

নসু ছিল হাঁসুলীবাঁকের পরম্পরার চলমান কথক পাগলের সঙ্গী। এখন ফটিক দাস তার অনুগত নয়। বেয়াই ফটিক দাস পুতুল বিক্রি করে আর রাত্রে ফিরে বলে তার অভিজ্ঞতা। সেটেলমেন্ট অফিসে জমিদার আর সাধারণ প্রজার উপস্থিতি দেখে সে। সবই সমান হয়ে যাচ্ছে। নতুন সময়—গণতন্ত্রের পরিবেশ। স্বাধীনতার ফল—এতো হবারই কথা। ফটিক দাস সাম্যের পক্ষে। নসু দেখে পুরোহিত চক্রবর্তীর সেজ মেয়ে সীমাকে। সাইকেলে চড়ে ফেরে। নতুন দিনের মেয়ে। স্কুলে যায়। হঠাৎ সেই মেয়ে এক কাণ্ড করে বসে। ভোরবেলায় গায়ে হলুদ দেওয়া অবস্থায় বিয়ের কনে এসে পৌঁছল থানায়। সে চায় না বিয়ে করতে। রমেন আচার্য—কাছাকাছি গ্রামের অর্থবান রাজনৈতিক কর্মী, প্রথম বউ মারা গেছে। তার সঙ্গে বিয়ে দিলে পিতা অমর চক্রবর্তীর গ্রাসাচ্ছাদনের নেশা করার এরকম সুরাহা হয়। কিন্তু সীমা নারাজ। সে কি ছোটবেলায় একসঙ্গে আবৃত্তি করা শুভেন্দুকে ভালোবাসে? না তাও নয়। সীমা চায় লেখাপড়া করে চাকরি করতে। নতুন সময়ের মেয়ে। নসু তাকে দেখে। তার ভাদু গান এই নতুন বিষয়কে আশ্রয় করে। সীমাই তার নতুন দিনের ভাদু।

নতুন কালের নতুন ভাদুর নতুন মহিমে।
এক মুখে যে নারি কহিতে।
[৩ পরিচ্ছেদ: *শুকসারী-কথা*]

উপকথার ভাদুমণির সঙ্গে কৃষ্ণের মিলন ঘটেনি। শুভেন্দুর ইচ্ছা থাকলেও সীমা তাকে গ্রহণ করতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত কুলীন ব্রাহ্মণ শুভেন্দু তার এক সহপাঠী কায়স্থ কন্যাকে বিয়ে করেছে। সীমা অঞ্চলের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশে পড়তে চলে গেছে। নসুবালা পর্যবেক্ষণ করেছে কেবল। শেষে জানা গেল ফটিক দাসের 'বেয়ান নসুবালা মারা গেল'—'পালা শেষ হল তার'। [২৪ পরিচ্ছেদ; *শুকসারী-কথা*]

আধ্যাত্মিকতা, নারী ভাব, পুরাণধর্মী কল্পনার জীবন, মুগ্ধতাবোধ—এই সব উপাদান নিয়ে চন্দনপুরের গুপ্ত ব্রজধাম ছেড়ে চিরকালের মতো চলে গেল নসুবালা, তার পালা শেষ করে। উত্তরাধিকারহীন।

পাগল হাঁসুলীবাঁকে কাহার সমাজে অন্তর্ভুক্ত চরিত্র। তার বাবা কাটোয়া থেকে আসা রাজমিস্ত্রি—রাখালরাজা দাস বোষ্টম। পাগলের মা অং খেলেছিল তার সঙ্গে। জাঙলের চৌধুরীরা কালারুদ্রের থানটিতে পাকা ইমারতের কাজ করতে এসেছিল রাখালদাস। 'পাগলের গায়ে আছে সেই বোষ্টমের অক্ত।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কাহার সমাজে মাতৃ-সূত্রে অন্তর্ভুক্তি (inclusion) চালু ছিল। তাই পাগল কাহার হয়েছে। বৈষ্ণব সংস্কার ছাড়াও ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে ছিল বেশ খানিকটা ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা। 'চন্দনপুরের বামুন-বউ লাল ঠাকরুণের সঙ্গে' দিদি পাতিয়েছিল। চন্দনপুরের বহু সংবাদ সে বয়ে আনত একসময়। পাগল একটু বহির্বৃত্তীয় চরিত্রই বটে। নানা বিদ্যা জানে—ঘর-ছাওয়া, মাটির দেওয়াল দেওয়া, ঘরলেপা—ঝুড়ি বোনা নানা কাজেই সে 'পাকা হাত'-এর প্রমাণ রাখে। আর আছে গান। সে-গান তার নিজের বাঁধা—'গানও অতি চমৎকার'। [৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

পাগল গ্রামের সমস্যা-সঙ্কটে নেই, আনন্দে মনোরঞ্জনে তার দুর্লভ উপস্থিতি। চাষের সময় তার দেখা মেলে না—নবান্নের সময় গান গাইবার সময় দেখা মেলে। উৎপাদনের কাণ্ডে নেই, উৎসাহের উদ্দীপনায় তুলনা নেই তার। একমাত্র মেয়েকে ভিন গাঁয়ে বিয়ে দিয়েছে। সেই মেয়ের ঘরের পাঁচ বছরের নাতনি। তাকে নিয়ে কাটে কাল। ছড়া বেঁধেছে—'এ বুড়ো বয়সে তুমি আমার নতুন নেশা হে।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) ছড়া-গান-পাঁচালী—এইসবেই পাগল নিজেকে নির্মুক্ত করে। তৃতীয় পর্বে কাহারদের গাজন-উৎসবের পর হঠাৎ গান গাইতে গাইতে তার উপস্থিতি। 'সঙেল নন্দী'র বেশে। তবে সেই গান নসুবালার গানের পূরণ হিসাবে গাওয়া। নসুবালা তার গলা শুনে চমকে *ওঠে*—সুবাসী পাখি হেসে ওঠে। কাহারপাড়া আনন্দে মেতে ওঠে। পাগলের এই উপস্থিতি আর অন্যদের প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় তার নিত্য আসা যাওয়া-আছে।

পালকি বহনের মতো কঠিন কর্ম পাগলের উপস্থিতিতে রমণীয় বোধ হয় কোশ-কেঁধেদের। পাগলের গান 'বরেরো পাল্কী/পড়িল পিছনে/আগে চলে লক্ষ্মী/পিছে এল নারায়ণ'—বর বধূকেও হাসিয়ে ছাড়ে। (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) ঘর ছাইবার সময় পাগল গেয়ে ওঠে '*লাল মুখো সাহেব এল কটা কটা চোখ—/দ্যাশ-বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক*'—বনওয়ারী অনুভব করে : 'পাগল মাতিয়েছে ভাল। যেমন গলা তেমনি গাইয়ে। সবচেয়ে সুখ ওকে নিয়ে পাল্কী বহনে। এমন ছড়ার বোল ধরবে!' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) পালকি বয়ে চলার আনন্দে পাগলের উদ্দাম সঙ্গীত প্রবাহে কাহাররা পথের বাধা

ভুলে না যায়, বনওয়ারী তাই ছড়া বদলে নেয়। 'সে যেরকম আলাভোলা লোক, হয়তো গানের ঝোঁকে পথের কথা না বলে বর কনের কথাই বলে যাবে।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এখানেও বোঝা যায় পাগল কাহার সমাজে এক ভিন্ন গোত্রের মানুষ। তার লক্ষ্য সব কিছুকে রমণীয় করে তোলা।

বাস্তববুদ্ধি পাগলের যথেষ্ট। সেটি প্রকাশ পায়না এই যা। চতুর্থ পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে গোটা গ্রাম যখন আনন্দে মাতোয়ারা, মিত্র গোপালপুর যাত্রার শেষে সবাই পেয়েছে আশাতিরিক্ত মদ্য ও পারিতোষিক, সেদিন পরমের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের বিজয়ী বনওয়ারী কালোশশীকে নিয়ে গেছে কোপাইয়ের জলে—তখন 'কোপাইয়ের ধারে সে গিয়েছিল চাঁদের আলো দেখে মনের খেয়ালে। কালোবউ তখন গান গাইছিল। অপার কৌতুকে বনওয়ারীর প্রেমলীলা দেখবার জন্য একটা গাছে উঠে বসেছিল।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) তারপর যখন সে দেখল পরম কালোশশীকে তাড়া করল, কালোশশী ছুটতে ছুটতে বাবাঠাকুরের আশ্রিত গাছের শিকড় ধরে পালানোর চেষ্টা করল আর শেষে রহস্যময় কারণে মৃত্যু ঘটল—কালিদহে ডুবে গেল কালোশশীর শরীর—তখন সম্বিৎ ফিরল তার। বনওয়ারীকে চেপে ধরল পাগল—'দহে নামতে তারও সাহস' নেই—সে তাকে নিয়ে গিয়ে সবাইকে বলল বনওয়ারী 'জাঙলের ধারে বসে হাপাচ্ছিল'। জানে সে, 'কালোবউয়ের দেহ কাল ভেসে উঠবে।' পুলিস এসে টানাটানি করবে, যদি জানা যায় কোপাইয়ের ধারে ছিল তারা—দুজনকেই মারবে টান। 'চাঁদের আলোয় সবাই ভোলে, দারোগাবাবু ভোলে না।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) সুতরাং সে এই মিথ্যার বিবরণ তৈরি করে। জাঙাল থেকে কোপাইয়ের জঙ্গল বেশ দূর। এখানে 'আলাভোলা' বাস্তব-বুদ্ধিহীন বলে পরিচিত পাগলের অন্য একটি রূপ স্পষ্ট হয়েছে।

সাধারণত মনোরঞ্জক হিসাবেই উপন্যাসে পাগলকে আনা হয়েছে। উপন্যাসের কথক জানাচ্ছেন : 'সুচাঁদ বলে হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, পাগল বাঁধে হাঁসুলীবাঁকের ছড়া পাঁচালী।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) উপকথা যদি অতীত থেকে আসা, অতীত হতে থাকা বিষয়ের রোমন্থন—পাগলের ছড়া-পাঁচালী চলমান ঘটনার ধারাবাহিকতাকে স্মরণীয় করে। উপকথা অতীতের উপকরণকে প্রকাশ করে। পাগলের ছড়া-পাঁচালী সময়ের চলিষ্ণু প্রবাহকে চিরন্তন করতে থাকে। এ-হল উপকথারই অন্য রমণীয় আনন্দজনক অভিমুখ। সুবাসীকে বিয়ে করার পর পাগল গান করে—

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই বলিহারি
বাঁধিল নতুন ঘর দক্ষিণ দুয়ারী।
সুবাসী বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরি রে মরি!

[৪র্থ পর্ব; দুই পরিচ্ছেদ]

এ-গান হয়ে ওঠে বর্তমানের ঘটনা প্রবাহের একটি স্মরণীয় চিত্র। ভবিষ্যতের উপকথায় এ-গানই তৈরি করবে নতুন পর্ব। অশ্বগোত্র কাহারদের সঙ্গে দূতগোত্র কাহারদের মিলন পর্বের কথা।

পাগল কখনও লোক-দার্শনিকের ভূমিকা নেয়। বনওয়ারীর উপর যে-সব লোক-দর্শন প্রভাব ফেলে, গোটা কাহার সমাজকেই বিমর্ষ করে যে জীবন ব্যাপারের রহস্য—পাগল তার একটি নিজস্ব কথামুখ হয়ে ওঠে। বৈষ্ণব-ফকির-বাউলদের লোক-দার্শনিকতা জানায় 'এ দুনিয়া আজব কারখানা'। ভাবে কাহারবা, অবাক হয়। সত্যি তো, কেমন করে

'হাড়ের কলা' দেওয়া খাঁচায়—'চামড়ার ঘেরাটোপ' তৈরি হয়, কেমন করে সুরুৎ করে ঢোকে 'অচিন পাখি', কেমন করে সেই পাখি একদিন ফুড়ুৎ করে পালায়! এই লোক দার্শনিকতা রহস্যে রোমাঞ্চে বিহ্বল করে তাদের। (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) পরক্ষণেই অবশ্য তারা ফিরে আসে তাদের কত্তাবাবার আশ্রয়ে। অত রহস্য রোমাঞ্চে দরকার কি, তাদের তো অভিভাবক স্বরূপ এই দেবতাই আছেন! পাগল এক মৃত্যুত্তীর্ণবোধ সঞ্চার করেছে তার গানে। মৃত্যু আর অন্ধকার সেদিন যার পর নাই বিদ্ধ করেছে তাদের। সামান্য কেরসিনও সংগ্রহ করতে পারল না কাহারবা। বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত। কালোবাজার—রেশন ব্যবস্থায় ধাক্কা। মারা গেল নয়ান। কাহারদের একটি মাতব্বর বংশের শেষ প্রদীপ, ঘরভাঙাদের শেষ পুরুষ—রুগ্ণ নয়ান। তার মৃত্যুর পর অন্ধকারেই গাইল পাগল : 'অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে!/অন্ধকারেই পরাণ পাখি সেই দ্যাশেতে যায়।' তার কল্পনায় সেই দেশ—অন্ধকার নয়, যদিও চন্দ্র নেই সূর্য নেই লম্ফ নেই পিদীমও নেই। না থাকুক—একজন আছে; 'এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়' সেই জন—'দুই চোখে তার দুইটি পিদীম আঁধারে রোশনাই' হয়। সেই একজনের চোখের আলোই তো শেষ বেলার সব দুর্ভাবনা দূর করতে পারে। পাগলের উপলব্ধি এইভাবে জীবনকে আশ্বস্থ করে। কাহাররা বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়।

গাজনের আনন্দে মাতে পাগল। সবাইকে কৌতুকস্নিগ্ধ ভালোবাসায় বাঁধে। সাজে মহাদেব। দুপাশে দুটি ছোট ছেলে, 'দুর্গা আর গঙ্গা' সাজিয়েছে তাদের। আর আড়াল কথাটি লোক-সাংবাদিকতার; সেবছরই বিয়ে হয়েছে বনওয়ারী-সুবাসীর। বনওয়ারীকে মহাদেব আর দুর্গা-গঙ্গার দ্বন্দ্বে বিধুর সংসারের চিত্রটি চেনা ঘটনার রূপায়ণ ছাড়া কি। 'বনওয়ারীকে ঠাট্টা করেছে।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) স্নিগ্ধ কৌতুক। 'বনওয়ারীরও বেশ ভালই লাগছে।' (ঐ) লোকজীবনের শ্রমে না থাকুক বিশ্রামে পাগলের ভূমিকা অনিবার্য।

বনওয়ারী মুশকিলে পড়েছিল সুবাসীকে বিয়ে করতে যাবার সময়। গোপালী কেঁদে ফেলেছিল। বনওয়ারী এসে বন্ধু পাগলকে বলতে পাগল পথ বাতলেছিল গোপালী রাজি থাকলে সে সাঙা করবে তাকে! গোপালী রাজি হয়নি। পাগল কিন্তু প্রস্তাবটি নিতান্ত মন্দ উদ্দেশ্যে দেয় নি। মাতব্বর-বংশ কোনো সন্তান নেই—বনওয়ারী সুবাসীকে বিয়ে করুক। 'লতুন করণ আট পৌরেদের সাথে সেটাও হবে—তোরও ছেলেপুলে ঘর সংসার হবে, সাধ মিটবে, গোপালী-বউকেও সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে না।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) গোপালী রাজি হয় নি। বরং এক্ষেত্রে দেখা গেল লোকচরিত্রজ্ঞান নিমতেলে পানুরই বুঝি বেশি—তার পরামর্শ ছিল কিছু টাকা দিক বনওয়ারী। সে যাহোক। পাগলের ক্ষীণ আকর্ষণ কি ছিল গোপালীর প্রতি? ভাঁজোর দিন তাকে নিয়ে 'অঙের' নাচ নাচার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল পাগল। 'গোপালীবালার নেশা ধরেছে, তবুও লাজুক মানুষ বলছে—না না।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) পাগলের ব্যবহারে সেদিন সবাই খুব মজা পেয়েছিল। 'বলিহারি ভাই' বলেছিল পাগলকে।

পাগলকে নীল বাঁধের সঙ্গে তুলনা করেছেন তারাশঙ্কর। শান্ত অচঞ্চল কোমলস্বভাব। কাহার সমাজের নানা রূপের আকাশের প্রতিচ্ছবি। করালী যখন তাকে বলে 'জাত যায় পরের এঁটো খেলে, কুড়োলে। ছোঁয়া খেলে যায় না।' (৩য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ)—তখন অবাক হয় পাগল। বোঝে এটা একটা 'কথার মত কথা'। সমাজ বদলাচ্ছে। আত্মমর্যাদা বোধে ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে করালীর মধ্য দিয়ে একদল তরুণ কাহার। ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে

তাদের ধারণা একটু স্বতন্ত্র। পাগল এই কথাটা নিয়ে নাড়াচাড়া তোলা পড়া করেছে। তার ভাববিশ্বে এমন কথা সম্পূর্ণ নতুন।

নিমতেলে পানু তারাশঙ্করের অপূর্ণ চরিত্র ভাবনার ফল। তার বয়স বেশি নয়। কিন্তু বয়সাধিক তার ব্যবহার, সূক্ষ্ম বুদ্ধি আর বিচিত্র কার্যকলাপ। তার নামটি নিয়ে সামান্য কথা লিখেছি। একে folk-naming বলতে হয়। পাড়ায় একাধিক প্রাণকেষ্ট থাকায়, বাড়ির নিম গাছটির সঙ্গে জড়িয়ে লোক সমাজ তার নাম রেখেছে নিমতেলে পানু। উপন্যাসের শুরুতে যে সমস্যা জড়িয়ে উঠেছে—সবাই ভাবছে কত্তাবাবার বাহনটি যে মারা গেল তাতে করালীই দায়ী। কিন্তু বাহনটি শিস দিচ্ছিল। গ্রামকে জানাচ্ছিল কত্তাবাবা চলে যাচ্ছেন—রুষ্ট হয়েছেন তিনি। এই রোষের অন্যতম কারণটি পানুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পানুই জানায় এবার কর্তার পুজোয় যে পাঁঠাটি বলি দেওয়া হয় সেটি নাকি খুঁতো ছিল। ছোট বাচ্চা ছিল যখন—তখন কুকুরে কামড়েছিল। পরে সেটি বড় হল। চৌধুরীদের বাড়িতে ঢুকে 'শখ করে লাগানো' ফুল গাছ খেল সেই পাঁঠা। 'পাঁচ টাকা'র কলমের ফুল গাছ। পাঁঠাটা জরিমানা দিতে হয়। সেই পাঁঠাটি যে খুঁতো সেকথা বলেওছিল পানা। কিন্তু চৌধুরীরা সেই পাঁঠাটি ব্রহ্মদত্যিতলায় উৎসর্গ করেছে! পানু নাকি প্রতিবাদ করেছিল। মজলিশে একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ভয়ে কাতর হল। 'কুকুরে ধরা, এঁটো পাঁঠার' পুজো সহ্য করলেন না—দেবতা চলে যাবেন, ইঙ্গিতে সেকথাই বললেন যেন। সুচাঁদ নির্দিষ্টভাবেই বলল : 'পানা, অপরাধ কিন্তু তোমারও বটে বাবার থানে।' কারণ 'পাঁঠাটি তো পানুর ঘরের'—বনওয়ারীর স্থির সিদ্ধান্ত। (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বক্র জটিল চরিত্রের পানু, তার অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা—অপরাধের ব্যাখ্যা—তার বিরুদ্ধেই জড়িয়ে গেল। গ্রাম্য দলাদলি আর বিচিত্র নেতিবাচক উপাদানের অন্যতম প্রকাশ নিমতেলে পানু।

পুজো-পার্বণের হিসেবি 'কাঠির মত' সরু চেহারার পানুর ('ওরা বলে, সরিঙ্গী') নখদর্পণে। এতে তার হিসেবি বুদ্ধিটি ধরা পড়ে। মজলিশের ওপর তার প্রভাবের ভিত্তি এই হিসেবি বুদ্ধিতে। যতই সমালোচনা উঠুক, শেষ পর্যন্ত কূট বুদ্ধিতে সে মজলিশকে নিজের দিকে টেনে আনার ক্ষমতা রাখে। সেই সঙ্গে আছে ষড়যন্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। পুজোর সন্ধ্যায় সে-ই দেখতে পায় বনওয়ারী-কালোশরীর মিলন দৃশ্য। অন্ধকারে চোখ গিয়েছিল ঠিক। সন্ধ্যা প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছিল কালোশশী। পানু চলেছিল আটপৌরে পাড়ায় তার মনের মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে। এই ঘটনার কথা জানিয়ে আটপৌরেদের ঘেঁটুগান বাঁধা—তারই বিচিত্র কীর্তি। সেই গান—'বিচার নাহিক বাবা পুরিল পাপের ভারা/সাজের পিদীম বলো ফুঁ দিয়ে নিভালে কারা/ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে/সাধুজনের একি লীলা সন্‌জে বেলাতে।' এ গান শুনে 'বনওয়ারীর হাত পা যেন অসাড় হয়ে গেল।' [২য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

বনওয়ারী বুঝল সব। পানুকে কৌশলে চাপ দেবার চেষ্টা করল সে। বোঝা যায় কৌশলে মাতব্বর বনওয়ারীও কম যায় না। পাকু মোড়ল পানুর মুনিব। সেও কম জটিল মানুষ নয়। তার কাছে গিয়ে বনওয়ারী জেনে নিল 'ছিমান প্রাণ কেষ্টোর একটি জট পাকানো কীর্তি।' (২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) কেমন করে সে নয়ানের বাঁশ বাগানের পুরোটাই পাকু মোড়লকে বিক্রি করেছে! মজলিশে একথা যখন বনওয়ারী বলে তার সামান্য আগেই আটপৌরে পাড়ার ঘেঁটুগানের বিষয়টি বলেছিল সে। আত্মপক্ষ সমর্থনে বনওয়ারীর বিরুদ্ধে নিজেকে তৈরি করেছিল? হতে পারে। বনওয়ারীর অনুপস্থিতিতে পানু তখন 'বনওয়ারীর ভূমিকায় মাতব্বরি' করছিল। গোপন অস্ত্রটি শানিয়ে ছোঁড়ার আগেই আসর ছেড়ে চলে যায়

পানু। ক্ষোভ বনওয়ারী করালীর অন্যায়ের কোনো শাস্তি দেয় নি। তার কথা 'জাতজ্ঞাত কেউ আপনার লয় আমার। লরমকে ধরম দেখায়!' (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীর সম্পর্কেও তার সমালোচনা—'সাধু নোক, আটপৌড়ে পাড়ায় বটতলাতে সন্‌জেবেলা সাধন ভজন করেন। মনে করলাম থাক্, বলব না, মানী লোক—' এইভাবে পাড়ার মজলিশকে নিজের দিকে আনার চেষ্টা আর বনওয়ারীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা স্পষ্ট হয় তার আচরণে। কৌশলী নিমতেলে পানু—ভীরু কিন্তু কূটবুদ্ধিতে অদ্বিতীয়। বনওয়ারীর মধ্যে শাসক সত্তাটি জেগে ওঠে এসময়। হাত মুচড়ে আসরে ফেলে প্রশ্ন তার—'লয়ানের বাঁশঝাড় নিজের ব'লে পাকু মোড়লকে বেচে দিয়েছিস কেনে?' পানু এ-প্রশ্নের জবাবে কৌশলের চূড়ান্ত করল। 'কুটিল মনের উপস্থিত বুদ্ধি' তার—পাকু মোড়লের অত্যাচার, মিথ্যাচার, ধার বাকির গল্প বলে গেল। আর সবাই তো একই অভিজ্ঞতায় মানুষ তারা। পানুর কথা ছুঁয়ে গেল সমস্ত শোষিত বঞ্চিত কাহারদের মন। 'মুহূর্তে ঘুরে গেল মজলিসের মনোভাবের মোড়।' (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) এদিক থেকে দেখলে পানুর বুদ্ধিমত্তা আর কাপুরুষতার মিশ্রিত রূপটি বেশ বৈচিত্র্যের মনে হয়।

পানু মোটেই উন্নত চরিত্রের মানুষ নয়। লগন্দ বা নগেন্দ্র মণ্ডলের আলু তোলার সময় মোটা আলু খান চারেক মাটিতে পুঁতে চিহ্ন দিয়ে রাখে সে। স্ত্রী জলখাবার দিতে এলে বলবে—সে 'পেট আঁচলে পুরে' নিয়ে যাবে। এই কৌশল আসলে চুরি। নগেন্দ্র মণ্ডলের চোখকে অবশ্য ফাঁকি দেওয়া কঠিন। (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) যাইহোক, পানুর এই দুষ্কর্ম উপন্যাসের শেষে একটি চরম সমস্যা তৈরি করেছে। পাকু মণ্ডলের রুপো বাঁধানো হুঁকো চুরি করার দায়ে জেল হয়েছে তার। তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল করালী। পানু অবশ্য সেদিন মোটেই দুঃখ পায় নি। বলেছে—'যাক, কিছুদিন এখন নিশ্চিন্দি।' (শেষ পর্ব) কৌশলী কাপুরুষ মিথ্যাবাদী পানু, চোর। কাহার সমাজের একটি মলিন উদাহরণ মাত্র। তবে সাহিত্যের চরিত্র হিসাবে তার এই নেতিবাচক উপাদান বেশ মনোগ্রাহী হয়েছে।

'নিমতেলে পানু ভেতরে তেতো, বাইরে মিষ্টি।' হাঁসুলীবাঁকের কথকের ব্যাখ্যান। হাসি তার 'কাঁসার বাসনের আওয়াজের মত তার খন খনে আওয়াজের হাসি'। (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) তার নেই কোনো আদর্শ। যখন যেমন তখন তেমন। বনওয়ারীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার প্রস্তাব সুবাসীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েই হোক আটপৌরে আর কাহারদের মধ্যে রীতিকরণের সূচনা। জানে সে আটপৌরেরা এ প্রস্তাবটি অস্বীকার করতে পারবে না ('আপনার গরজে ধান ভানে মরদে')—আর তার প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত বনওয়ারীর খুশির কারণই হবে। 'পানা চতুর, সে ঠিক লক্ষ্য করেছে যে, মেয়েটির মধ্যে কালোশশীর ঢঙ রয়েছে।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এই প্রস্তাবে পানুর কৌশল থাকুক, করালীকে তাড়িয়ে দেবার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বনওয়ারীকে সামান্য খুশি করার বাসনাই থাকুক—আসলে তার প্রস্তাবে ছিল কাহারদের সামাজিক মনেরও প্রকাশ। এক্ষেত্রে 'আটপৌরে ঘরের মেয়ে সর্বপ্রথম' মাতব্বর বনওয়ারীরই 'ঘরে আসা উচিত'—এই ভাবনাটি আদিম সমাজ গঠনের ইঙ্গিত বহন করে। নিমতেলের ব্যক্তিগত কৌশল যতই আধুনিক মনে হোক তার মধ্যে চিরকালের ঐতিহ্যও কিছু আছে। নিমতেলেকে তাই হাঁসুলীবাঁকের একটি বিচিত্র প্রকাশ বলেই মনে হয়।

পানুর বাস্তববুদ্ধি তার উপস্থিত বুদ্ধির মতোই সীমাহীন। যখন সে শোনে বনওয়ারী বিয়ে করতে যাবার সময় গোপালীবালা কেঁদে উঠেছে, তখন বলেছে তার হাতে দশটা

টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে বলুক বনওয়ারী। সবার সামনে না, বলেছিল 'বনওয়ারীকে আড়ালে নিয়ে'।—'এক কাজ কর কাকা। দশ টাকা কাকীর হাতে দাও। বল ঘর কর, সংসার কর, পাড়ায় ধার দাও, মহাজনী কর।' শুধু কি তাই, তার সিদ্ধান্তের সপক্ষে বলেছিল—'টাকাতে পুত্তু শোক ভোলে, তা এতো—'। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পানুর এই বাস্তববুদ্ধিও বেশ কার্যকর হয়েছিল। কুড়ি টাকা দিয়ে বনওয়ারী গোপালীকে তখনকার মতো নিবৃত্ত করতে পেরেছিল।

কুচক্রী পানুর কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর নৈতিক-বিবেচনা (moral justice)-র পরিচয় রেখেছেন। পানু প্রহ্লাদদের কথার উত্তরে একসময় বলেছিল—'ছেলের দিব্যি করে বলতে পারি'—আটপৌরেদের ঘেঁটু গান সম্পর্কে সে কিছু জানে না। (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) এই মিথ্যা শপথের ফল যেন ফলল হাতে হাতে। তার ছেলে চন্দ্রবোড়ার বিষে মারা গেল। 'বুক চাপড়ে কেঁদে উঠল পানা'—। কাহাররা ভাবল 'পানার ঘরের কুকুরে-ধরা উচ্ছিষ্ট পাঁঠা জরিমানা স্বরূপ আদায় ক'রে চৌধুরীবাবুরা বাবার থানে বলি দিয়েছে, শাস্তি যাবে কোথা?' (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) যে পানু অন্যের অঙের খেলা নিয়ে বিচিত্র নীতি কথা বলত—তার স্ত্রীর পরিণতিও প্রায় একই ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। জেলে গেল পানু, আর তার স্ত্রী—'চন্দনপুরে আঙামুখো উড়োজাহাজের আস্তানায় খাটে। খাটুনি, না মাথা। ওজকার খুব; ফেশান কি!' (শেষ পর্ব) পানার হাহাকার আর তার স্ত্রীর অধঃপতন থেকে মনে হয় দ্বিতীয় বিধাতা তারাশঙ্কর উপন্যাসের পৃষ্ঠাতেই তার চরিত্রের এক ধরনের moral justice-এর ব্যবস্থা করেছেন।

কাহার সমাজের বাইরের বেশি কেউ এ-উপন্যাসে চরিত্র হয়ে ওঠেনি। মাইতো ঘোষ অর্থাৎ মেজো ঘোষের তীব্র অত্যাচারী রূপটি দেখা যায় করালীকে শাসন করার সময়। তার প্রতাপ বোঝা যায় চন্দ্রবোড়া সাপ দেখতে আসার সময়—জনতার দু-ভাগে বিভক্ত হবার মধ্যে। বড় ঘোষকর্তার সঙ্গেও পরিচয় খুব বেশি দূর গড়ায় নি। কালারুদ্রতলায় সাহেবদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলার সময় কাহারদের শ্রদ্ধা তিনি আকর্ষণ করেছেন ঠিকই। ভয় বেড়েছে বনওয়ারীর, বিশেষত যখন স্বদেশী বাবুদের মারফৎ করালী বড় ঘোষের বিপক্ষে অভিযোগ করেছে তখন। করালী বৈশাখ সংক্রান্তি আর ঘোষ বাড়ির অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে যাবে না বলায় রাগ চড়েছে মাথায়। তাঁর তীব্র প্রতিক্রিয়া 'কাহারের আর কাহার নাই, বামুন! তা পৈতে নিক কাহারেরা।...জুতো না-খেয়ে সব মাথায় উঠেছে।' (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)। মাইতো ঘোষ গ্রামসমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। বন্দুকের গুলি মেরে হনুমান তাড়াতে চেয়েছিলেন—পারেন নি। এসব থেকে বোঝা যায় বনওয়ারী-করালীর টানা-পোড়েনে ভদ্রসমাজের বিশেষ কোনো ভূমিকাই উপন্যাসে নেই।

রতনের মনিব হেদোমণ্ডল আর নিমতেলে পানুর মনিব নগেন্দ্র বা লগন্দ মণ্ডল সামান্য বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র। দুজনকেই কাহাররা বিচিত্র নামে ডাকে। হেদো মণ্ডল মোটাসোটা লোক বলে এরকম নাম; নগেন্দ্র বা লগন্দের নাম পাকু মণ্ডল। মানুষ দুটির স্বভাব বিচিত্র। হেদো মণ্ডল অত্যাচারী। রতনের উপর হাতের মুঠো করে প্রচণ্ড ঘুষি মারে প্রায়ই। ক্ষোভ জাগলে রেহাই নেই। পাকু মণ্ডল সূক্ষ্ম বুদ্ধির মানুষ। কূটবুদ্ধির পানু চুরি করে মোটা মোটা আলু মাটিতে রেখে চিহ্ন দিয়ে রাখলে ঠিক বুঝতে পারে সেই আলু বের করে নেয়—সূক্ষ্ম কথায় পানুকে কঠিন ভাবেই শাসন করে। তার

কথা—এই আলুগুলো ভুল করে ফেলে গেছে, এগুলোর ভাগ সে পাবে না। হেদো মণ্ডল সদগোপদের লাঙলের মুঠি ধরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা, নিজের জমিতে নিজে চাষ না করার বাবুগিরি সমর্থন করে না। মেনে নেয়—তবে ভালো লাগে না। বাড়িতে দরজা বন্ধ করে কোদাল চালায় কখনো কখনো। কাহারদের কলকে দিতে তেমন আপত্তি করে না—হুঁকো না, শুধু কলকে। পাকু তাও দেবে না। পাকুর আছে একটি মুদির দোকান। জাঙলেই। তার ধূর্ত বুদ্ধি আর লোভ একটু অন্যরকম। হেদো রতনদের দুঃখে কেঁদে ভাসায়। পানুর কাছ থেকে নয়ানের বাঁশঝাড় ফাল দলিলভুক্ত করবার সময় সে স্পষ্ট বলে—দখল করার ব্যাপারে তাকে ভাবতে হবে না। শেষে পানু তার রূপো-বাঁধানো হুকো চুরি করে বলে ভয়ঙ্কর এই সামন্তপ্রভু তাকে থানায় ধরিয়ে দেয়। এই দুটি চরিত্রে সদগোপ সমাজের দুটি দিক স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন তারাশঙ্কর। বস্তুত এই দুটি একরঙা চরিত্র আর বড় ও মেজো ঘোষ সদগোপ সমাজের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করেছে। ১. তারা অত্যাচারী; ২. সম্পত্তি সচেতন; ৩. নিজেদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন; ৪. অনৈতিক উপায়ে ক্ষমতা রক্ষা ও অর্থ উপার্জনে দ্বিধাহীন।

রমন আটপৌরেদের সাময়িক মোড়ল। মোড়ল হবার কিছুমাত্র যোগ্যতা তার নেই। পরম চলে যাবার পর বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাতে মূল্য বৃদ্ধির ধাক্কায় তাদের সঙ্কট তীব্র হবার পর বাধ্য হয়ে বনওয়ারীর সাহায্য দরকার পড়েছে তাদের। বনওয়ারী ছাড়া আটপৌরেরা সাধারণ কাজকর্ম পাবে না। 'চাষী হিসেবে' তাদের সুনাম নেই। বনওয়ারী জামিন হলে 'আটপৌরেরা জাঙলে সদগোপ মহাশয়দের বাড়িতে কৃষাণি পাবে'—হয়তো। এই রকম কিছু বিবেচনা ছিল তাদের। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)। রমণ এই প্রস্তাব দিয়েছিল আর এক লোভে—যদি কোনভাবে পরমের বন্দোবস্ত পাওয়া সায়েবডাঙার জমিটা তারা পায়। নিমতেলে পানু প্রস্তাব দিল যাতে সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ে দেওয়া যায়। প্রথম দিকে সামান্য হতচকিত হয় রমণ—'জালের বন্ধনে তাকেই প্রথম পড়তে হবে'—এ সে ভাবে নি। তবে পরে পানু তাকে প্রবোধ দিয়েছে এই বলে—'শালীর কন্যে আর পালতে দেওয়া গাইয়ের বাছুর—ও দুই সমান।' এতে দুই সমাজের 'করণও হবে' আবার 'কুল ভাঙার পাপ অর্শাবে না।' বোঝা যায় রমণ কিছু লোভী, কোশকেঁধেদের তুলনায় নিজেদের সামান্য অভিজাত ভাবা, কৌশলী মানুষ।

সুবাসীর সঙ্গে বিয়ে দেবার কিছুদিন পর তার স্ত্রী মারা গেল। রমণ এসে উঠল বনওয়ারীর কাছে। কাজের মধ্যে শুধু গরুগুলি নিয়ে মাঠে যায়—আর কুটো ভেঙে উপকার করে না। খায় প্রচুর। তাকে হিসাব করতে বললে রমণ বলে ও কাজ সে পারবে না। 'আটপৌরে পাড়ার লোক' সে। 'বস্তায় ভরে ধান চুরি করে' এনে দিয়েছে 'সামালদারের ঘরে'—তারা 'ঠাউকো দাম দিয়েছে'। (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) তারা ধান চালের হিসাব করতে পারে না। উঞ্ছবৃত্তি কখনই ছাড়তে পারেনি রমণ। বনওয়ারীর চরম অবস্থায় তার 'একটা ভাল গাই পাইকারদের বিক্রি করে দিয়ে মাঠের পথ ধরে পালিয়েছে।' (শেষ পর্ব) পালিয়েছে গঙ্গার তীরে, কাটোয়ায়। পুণ্যলোভাতুর। বলে—'শেষ দশা'। গঙ্গার ধারে এসেছে সেজন্য। 'হাড় ক'খানা গঙ্গায় পড়লে' হয়তো পরজন্মে 'উঁচু কুলে' জন্ম হলেও হতে পারে। রমণেরও ছিল নিচু জাতির সংস্কার। তবে কাহার সমাজে সে পরমেরই মতো বিচ্ছিন্ন চরিত্র।

প্রহ্লাদ-রতন আর গুপী—কাহারদের সমাজবদ্ধতার পরিচায়ক। বৈচিত্র্য কম। রতনের পুত্র মাথলা। সে করালীর দলে ভিড়েছে। এজন্যই কিছুটা বেদনা বোধ করত রতন। মাথলার ছেলেকে সাপে কামড়াল—মৃত্যু হল তার। রতনের ধারণা হল সে মাথলাকে নিরস্ত করতে পারে নি বলেই এরকম ঘটেছে। পাশাপাশি চাষ করতে করতে রতন জিজ্ঞাসা করে—'কি হবে বল দিনি বনওয়ারী? খাব কি?' (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ)। বনওয়ারী কিছুই উত্তর দিতে পারে না। পাড়ার ছেলে ছোকরারা পালিয়ে যাচ্ছে। এনিয়ে সামান্য বিতর্কও হল। বিশেষত রাত্রে খবর দেয়নি কারণ বনওয়ারী রাগ করে—করতে পারে। আড়ালে ছিল সুবাসীর সঙ্গে রাত্রিবাসের ইঙ্গিত। বনওয়ারী ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়। রতন প্রতিবাদ করে। 'মুখ বুজে প্রহার' সহ্য করতে পারে না আর—একদিকে সামন্তপ্রভু হেদো মণ্ডলের অত্যাচার। আর বনওয়ারীর গালমন্দও অসহ্য লাগে তার। এখানে রতনের সামান্য প্রতিবাদ বেশ গুরুত্ব বহন করে।

বনওয়ারীর অবর্তমানে প্রহ্লাদ কাহারদের নেতৃত্ব দেয়। তবে বনওয়ারীর অবর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চায় না সে। নয়ানের স্ত্রীর সঙ্গে 'ছাড়বিড়' না করে, করালীর সঙ্গে বিয়ে দেবার ব্যাপারে অবশ্য সামান্য আপত্তি জানিয়েছে প্রহ্লাদ। 'করালীকে শাসন না করে দণ্ড না ক'রে' এক হিসাবে তাকে প্রশ্রয় ('আসকারা') দেওয়া হল; এর ফল ভালো হবে না। (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী শিবভক্ত হবার পর প্রহ্লাদ মজলিস সামলানোর সময় সুচাঁদ ক্রমে সমস্যার কথা জানায়। সে কার কাছে থাকবে—কে তাকে খেতে দেবে! বনওয়ারীর সঙ্গে একপ্রস্থ কথা চালাচালি হল এসময়। কারণ হেদো মণ্ডলের সামনে বিনা কারণে কাহার সমাজের আত্মমর্যাদার প্রয়াসকে সমালোচনা করায়—কাজকর্ম ফেলে কথা বলায় বনওয়ারী আর তাকে কাজ দেয় নি। বনওয়ারী বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়েছে। 'মরা কুকুর বিড়াল ফেলা, নর্দমা পরিষ্কার' আর করবেনা কাহাররা—এটা সুচাঁদের ভালো লাগে নি। বনওয়ারীর মতোই, এ-কাজে প্রহ্লাদের সমর্থন আছে। তার কথা—'জাঙলের সদগোপ'রা 'পিরান গায়ে দিতে' শিখেছে—'বামুনদের মড়া কাঁধে করে গঙ্গাতীরে' নিয়ে যেত, এখন যায় না। কাহাররা আগেকার মতো নোংরা কাজ করবে কেন? (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) উপন্যাসের শেষে কাহার সমাজ উৎসন্ন হয়েছে। তখন এই আত্মমর্যাদার কোনো মূল্যই থাকে নি।

গুপীর সামান্য কথাবার্তায় বোঝা যায় কাহারদের পরম্পরা সম্পর্কে তার ধারণা বেশ স্পষ্ট। নয়ানের স্ত্রী পাখির সঙ্গে করালীর অবৈধ বিবাহ আর বনওয়ারীর প্রশ্রয় প্রদান তারও ভালো লাগে নি। তার মনে পড়েছে নয়ানের বাপের 'পেতাপ'-এর কথা; 'ঘরভাঙা'দের বংশের হতাশাজনক পরিণতি তাকে ব্যথিত করেছে। সে ভেবেছে 'মানুষের দশ দশা, কখনও হাতী কখনও মশা'। (ঐ)। মিত্র গোপালপুর থেকে ফেরার সময় পরমের ডোমদের সঙ্গে বসে মদ্যপানের ব্যাপারটি বনওয়ারীর ভালো লাগে নি। গুপী অবশ্য ব্যাপারটিকে তত গুরুত্ব দিতে চায় নি। তার কথা—'যাক বাপু, যার যেথা মন সেথাই বিন্দাবন; বেশ বসেছে'। (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পথে পরম আটপৌরেরা যে উচু বংশ-গোত্রের, সে কথা বলেছে। তাই গুপীর অভিমান-মেশানো এই উক্তি। বনওয়ারী সামান্য ইঙ্গিতেই বুঝে নিতে পারে গুপীর মন।

পরম উপন্যাসের অন্যতম shadow-চরিত্র; বনওয়ারীকে যদি Persona বলা যায় তাহলে পরম shadow; আবার বনওয়ারীর তুলনায় করালীকে shadow ভাবা যেতে

পারে। এক্ষেত্রে করালী আর একবার হাঁসুলীবাঁকে ফিরে এসে কাহার সমাজকে সংগঠিত করার চেষ্টা করায় তাকে শেষ পর্যন্ত persona হিসাবেই ধরতে হয়। মাঝখানে anima জাতীয় চরিত্র কালোশশী আর তার alter ego সুবাসীর আশ্চর্য ভূমিকা। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চ কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা এখানে। একটি ছকের দ্বারা বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।
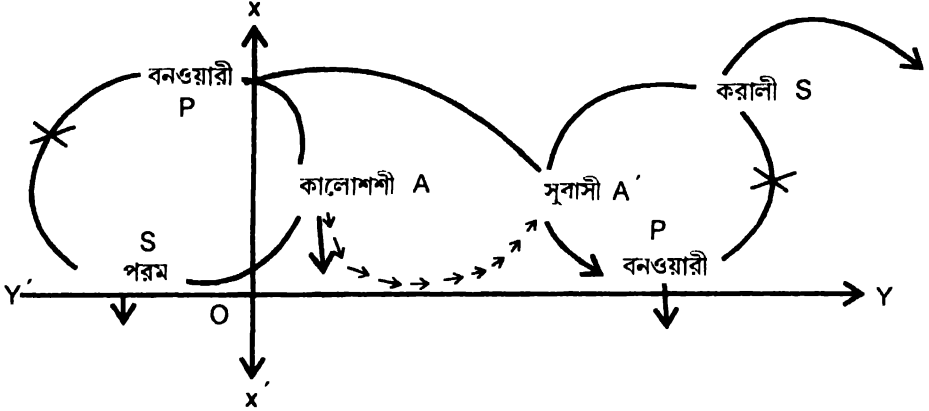
X-অক্ষ কালবাচক Y-অক্ষ স্থান O-বিন্দু বর্তমানের চিহ্ন। পরম-বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব বেশিরভাগটিই চন্দনপুরের প্রভাবমুক্ত তাই Y-অক্ষের দিকে চিহ্নিত করা হল। পরম পলাতক, করালী নতুন উদ্যমে অগ্রসর। অধোগামী তীর চিহ্ন আর বক্ররেখ তীর চিহ্ন তার পরিচায়ক। কালোশশী মৃত, বনওয়ারীও। তাই অধোগামী তীর চিহ্ন ঢাঁড়া (×) চিহ্ন দুটি বনওয়ারী-পরমের আর বনওয়ারী-করালীর নির্ণায়ক যুদ্ধের পরিচয় বহন করেছে। পরম বনওয়ারী আর করালী বনওয়ারীর সঙ্গে কালোশশী আর সুবাসী। দুজনেই Anima হিসাবে গণ্য। দুজনের প্রেমজীবন স্ব-সমাজের সম্পূর্ণ উৎযাপনের দিকচিহ্ন তৈরি করেছে।

পরম আটপৌরেদের প্রধান। দুরন্ত তার সাহস। হাঁসের মতো চোখ, লাঠি-সড়কি চালানোতে ওস্তাদ। উপন্যাসের সূচনায় কর্তার কাছে অপরাধ-ক্ষালনের পুজোর খবর দিতে যাবার সময় বনওয়ারী জানতে পেরেছে পরম গেছে চন্দনপুরে। চন্দনপুরের মুখোপাধ্যায়-রা জমির বন্দোবস্ত করছে। পরম বনওয়ারীর চেয়ে বড়, বনওয়ারী বলে 'পরমদাদা'। সে গেছে 'বড়বাবুদের কাছারিতে'। (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) অবশ্য চাইলেই জমি সামান্য পেতে পারে—কিন্তু চাষে মন নেই তাদের। চাষ তারা জানেও না। সক্রিয়তা আর লোভ পরমের বনওয়ারীর তুলনায় বেশি। বনওয়ারী কালোশশীর কাছে জমি বন্দোবস্তের সংবাদ পাবার পর নিজে সক্রিয় হয়েছে।

পরম কত্তাবাবার পুজোতে অংশ নেয় নি। তার কারণ 'বনওয়ারীর সঙ্গে তার সৌহার্দ্য নেই।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মূল কারণ কালোশশীর সঙ্গে বনওয়ারীর রঙের সম্পর্ক। তবে বনওয়ারী যেমন কত্তাবাবার আশ্রয়ে থেকে গোটা সমাজকে নেতৃত্ব দেয়—পরম তেমন করে না। কত্তার ধর্ম-সম্মত সংস্কারের জগৎ থেকে তার বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারটি ব্যক্তিগত ঈর্ষা হতে পারে। আটপৌরেরা কত্তার পুজোয় ভালো মতোই অংশ নিয়েছে। 'এ-ক্ষেত্রে আটপৌরেরা, পরমের কথা মানে নাই। কিন্তু পরম যোগ

দেয় নাই। তবে নিজের পাড়ার লোকেরা যখন তার কথা না শুনেও যোগ দিলে, তখন নেহাত পাড়ার মাতব্বরি করতে উপস্থিত হয়েছিল মাত্র।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ)। পরম এমনকি কালোশশীকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। কত্তাবাবাকে বলি হিসাবে একটি হাঁসও পাঠিয়েছে—'গোপনে'। পরমের মাতব্বরি যে প্রশ্নহীন আনুগত্যের অধিকারে শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে নেই, এসব থেকে তা স্পষ্ট হয়।

পরম কৌশলী, ষড়যন্ত্রী। করালীকে তাদের পাড়ায় লাঠি খেলতে ডাকে। 'পরামশ্য' চলছে—'করালীকে হাত করবে।' তাহলে 'ওকে পেলে অ্যাল-লাইনে ডাকাতি' করার সুবিধা হবে। করালীও একটু একটু এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। বনওয়ারী 'বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে' পরমের আখড়ায় 'খট খট শব্দ' শুনতে পায়। (২য় পরিচ্ছেদ, আট পরিচ্ছেদ) এক হিসাবে পরম কাহারদের পুরোনো জীবন-বিন্যাসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। সে ছিল আহবণজীবী—পরে হয়েছে লুণ্ঠনজীবী। নীলকররা হাতে তুলে দিয়েছিল লাঠি। চাষিদের ভয় দেখিয়ে নীলের দাদন নিতে বাধ্য করত। নীলকররা চলে যাবার পর তারা লুণ্ঠনকেই জীবিকা হিসাবে রক্ষা করতে চেয়েছে। এই চেষ্টাকে পৌরুষ-ব্যঞ্জক ভেবেছে তারা—কৃষিকর্মে প্রবেশ করতে চায়নি। বনওয়ারীর সঙ্গে পরমও জমি বন্দোবস্ত নিয়েছিল—চন্দনপুরের বাবুদের কাছ থেকে সাহেবডাঙার অনুর্বর জমি। বনওয়ারী নানাভাবে জমি তৈরি করে। 'পাশে পরমের জমিটা' পড়েই থাকে। 'যে ডাঙা, সেই ডাঙা। কোন একটা চুরি বা ডাকাতি করে পয়সা হাতে না পেলে পরমের জমি কাটানো হবে না।' (৩য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী এই পরমের কৌশলের থাবা থেকে সস্নেহে করালীকে বের করে আনতে পেরেছে। করালী ভেবেছিল কোশকেঁধেদের সম্মান তার উপর নির্ভর করছে।

বনওয়ারীর প্রতি তীব্র বিরাগ পরমের। বোঝা গেল মিত্র গোপালপুরের 'বিয়ের বায়না'-র সময়। রায়বেঁশের দল যাক আটপৌরেদের। বনওয়ারী এই খবর দিতে গেল। পরম সে সময় সামান্য মাতাল ছিল। বলল : 'তোর সঙ্গে আমার—বুল্লি কিনা, আমার একটা কাজ আছে।' কি কাজ স্পষ্ট বলে নি। তার আগেই বনওয়ারী যখন বলেছে 'আমি রে পরম।' পরমের উত্তর ছিল 'তুমি ক্যা রে? আমিও তো আমি রে।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) দুজনের মধ্যে এই ঈর্ষা কালোশশীকে ঘিরে—তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়। ফেরৎ গোষ্ঠ অর্থাৎ মিত্রদের বাড়ি থেকে চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ি পালকি ফেরৎ দিয়ে আসার পথে পরম বনওয়ারীকে হাত ধরে বলে 'তোর সাথে একটা কথা আছে।' বনওয়ারী দ্বন্দ্ব এড়াতে চেয়েছিল। অন্তত প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব। মিত্রদের বিয়ের আসরেও পরম লাঠিখেলা দেখিয়েছিল। 'সুখ' পেতে বনওয়ারীর সঙ্গে লড়তে চেয়েছিল। সেই লাঠি খেলা দেখে বাবুরাও আনন্দ পাবেন—এই ছিল কথা। বনওয়ারী রাজি হয়নি। 'খুনে' স্বভাব পরমকে বিশ্বাস নেই। মদের আসর থেকে ফেরার পথে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলে বনওয়ারীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইল পরম। জিজ্ঞাসা করল—করালীকে সে বলেছে কিনা—'আমি ডাকাত, আমি দাগী?' নেহাৎ কথার কথা। এই কথা সবাই জানে। পরমও ডাকাতিতে খুশিই হয়। পরের কথা পরমের—'শালো সাধু নোক, আমাদের পাড়ার বটতলাটে তোমার কীসের ভজন?' ৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ বনওয়ারীর এনিয়ে ঝগড়া করার ইচ্ছা ছিল না। পরম এই কথা বলে তো নিজের পারিবারিক কুৎসাই বাইরে আনছে! পরম কিন্তু তাকে লড়তে বাধ্য করে। শেষে পরাজিত হয়। 'পরম প্রায় অসাড় হয়ে পড়ল।' বনওয়ারী তাকে 'মারলে আরও কয়েকটা নিষ্ঠুর কিল।' [৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

প্রতিহিংসা পরমের চরিত্রের নিহিত অন্ধকারের উপাদান। বনওয়ারী যখন তাকে হাত ধরে টেনে তুলতে গেছে পরম আহত-বিধ্বস্ত অবস্থাতেও সে সাহায্য চায় নি। পরে বনওয়ারী এসে হাজির হয়েছে কালোশশীর কাছে। গেছে কোপাইয়ের চরে। পরম সেখানে হাজির হয়েছে। তাকে দেখে কালোশশী পালিয়েছে। কালারুদ্রের আশ্রিত শিমুল গাছের শিকড় ধরে উঠতে গেছে। সাদা গোখরের ছোবলে অচেতন হয়ে কালীদহে ডুবেছে। পরম কালোশশীর মৃত্যুদৃশ্যে খুশি—হেসে উঠল। বনওয়ারী তাকে ডাক দেয় আস্ফালন সহ। কিন্তু ওপার থেকে বিচিত্র হাসি হাসল পরম। 'তার আক্রোশ মিটে গিয়েছে।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) প্রতিহিংসা, জিঘাংসা আর লুণ্ঠনপরায়ণতা—এক কালে কাহার সমাজে এগুলোই ছিল বীরত্বের, প্রশংসার। কাহারদের সেই প্রাচীন সময়ের ছবি পরমের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে।

করালী হাঁসুলীবাঁকে নতুন নায়ক—protagonist। তার মধ্যে তারুণ্য, প্রতিবাদ, নতুনকে অঙ্গীকার করার প্রবণতা লক্ষ করি। হাঁসুলীবাঁকের সমাজে সে নতুন তরঙ্গ। যুক্তিবোধ তাকে আধুনিক করেছে। সবাই যখন চন্দ্রবোড়া সাপটিকে নিছকই সাপ ভাবতে পারে নি, মনে করেছে কত্তাবাবার বাহন, তখন করালী সোজা চোখে দেখতে চেয়েছে ব্যাপারটিকে। এর দ্বারা করালীর পরম ইহমুখী মনোভাব আর যুক্তিবোধ প্রকাশ পেয়েছে। তার সঙ্গে আছে তার দুর্জয় সাহস—নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা। 'কাহার পাড়ায় তরুণদের নিয়ে তার একটি দল আছে'—বাইরে বনওয়ারীর নেতৃত্ব মেনে নিলেও 'অন্তরে অন্তরে করালীই তাদের দলপতি।' [১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

করালীর যুক্তিবোধের উৎস অভিজ্ঞতা। সে গ্রামের উপকথার দ্বারা শাসিত নয়। তাই সাপকে অন্য কিছু ভাবে না। কাজ করে বাইরে। চন্দনপুরে রেল কোম্পানির গ্যাংম্যান সে। 'রেল লাইনে আটাশ মাইলে' একরমই হয়েছিল। সেখানেও এমনি জঙ্গল—সেখানেও এমনি শিস উঠত। সাহেবকে ট্রলিতে নিয়ে আসছিল। হঠাৎ শিস শুনে সাহেব হাতে বন্দুক নিয়ে ট্রলি থামিয়ে টর্চ ফেলে ঠিকমত ঠাহর করে সাপকে মেরেছে। সুতরাং কাহাররা চন্দ্রবোড়াটিকে যাই ভাবুক (প্রহ্লাদ ভেবেছে জাত সাপ—'বেরাম্ভন না হোক বদ্যি কায়স্থ টায়স্থ'; পানু ভেবেছে এটির বয়স অনেক 'পবীন সাপ') করালী স্থির করেছে সবাই দেখুক, কাকে এতদিন ভয় পেয়েছে তারা। [১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন; করালীর মধ্যে যুক্তিবোধ আর দ্রোহবুদ্ধি। অপরাধ ক্ষালনের পুজো চলার সময় হাঁস বলি দিতে এসেছিল। কুচক্রী পানু আপত্তি করেছে তার বলি নেওয়া হবে না। বনওয়ারীও অনুমতি দিতে দ্বিধান্বিত। করালী তখন যা করল, কাহারপাড়ায় কেউ কখনো তা ভাবেনি। 'কোন কথা না বলে পটপট করে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দুহাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন চায় তাই কর। আমার হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) তীব্র অবিশ্বাস। এই দুঃসাহসের দুটি অভিমুখ—১. সে কাহার সমাজকে মানে না আর ২. কাহারদের অভিভাবক-দেবতার প্রতিও শ্রদ্ধা ভক্তি তার অবশিষ্ট নেই।

শুধু কাহার-সমাজই নয় তার শ্রদ্ধা অবশিষ্ট নেই সদগোপের প্রতিও। রতনের মনিব হেদো মণ্ডল তাকে যখন 'বেটা' বলে সম্বোধন করে তখন সে প্রতিবাদ করে। কাহারদের গালাগাল দিয়ে কথা বলা ভদ্রলোক বলে গর্ব-করা সদগোপদের স্বভাব। কাহারদের অন্য কেউ এসব নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবে না। করালী মানবে কেন। সদগোপ প্রভুদের কাছে সে বন্ধক দেয়নি নিজেকে। রেল স্টেশন থেকে ত্রিপল এনে দিয়েছে—আখ জ্বাল দেবার শালে

বৃষ্টি পড়ছিল তাই। বনওয়ারীর জন্যই একান্ত করেছে। হেদো মণ্ডলের জন্য কোন উপকার সে করবে কেন। তাই 'বেটা' শুনে তীব্র প্রতিবাদ করল সে! 'বেটা শালা হারামজাদা গুখেকোর বেটা লেগেই আছে—ভদ্দর লোকের মুখে লেগেই আছে। ভদ্দলোক। মাথা কিনেছে।' [২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

আগাসাহেব অর্থাৎ কাবুলিওয়ালা। পাগল কাহারকে তাড়া করে ধরেছিল। আমাকে দেখে পাগল পালিয়ে যাচ্ছিল ভয়ে। একটা র‍্যাপার কিনেছিল ধার করে। টাকা শোধ না দেবার. ইচ্ছাও ছিল না। করালী আগা সাহেবকে নিরস্ত করেছে। যে কাবুলিওয়ালারা গ্রাম অঞ্চলে লাঠির জোরে দৈহিক শক্তিতে ত্রস্ত রাখত, তার সামনে দাঁড়িয়ে করালী বলে— 'ঠেঙিয়ে দোরস্ত করে দেগা। মেরে ফেলে দেগা দহমে।'—তখন বুঝি তার সাহস সীমাহীন। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) পাগল তাকে সাবধান করে—সে বলে ওদের সঙ্গে চন্দনপুরে শক্তি পরীক্ষা হয়ে গেছে তাদের। তারা একসঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গে দাঙ্গা করেছে। 'লাঠি ফাঠি ফেলে' পালিয়েছে ওরা। করালীর আত্মশক্তি এভাবে বলিষ্ঠতার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু সমাজের ভার বহন করত যে কাহাররা—তাদের প্রতিনিধি করালী এখন হিন্দু সমাজের সম্মানও রক্ষা করার দায় নিচ্ছে। বিষয়টি সমাজতত্ত্বের বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়।

করালীর চালচলন কথাবার্তায় হাঁসুলীবাঁকের কাহারপাড়ায় তাকে 'ভিনদেশী মানুষ' বলেই মনে হয়। চন্দনপুরের মুখুজ্জেদের একটি ছেলে যেমন 'বিলাত থেকে সায়েব হয়ে' এসেছে—চন্দনপুরের অন্য মানুষদের তুলনায় সে যেমন অন্য রকম মানুষ, করালীও তেমনি। সে 'কাহারপাড়ার বিলাত-ফেরৎ'। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) তার শক্তির উৎস বাইরের জগতের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেবার সাহস। শিক্ষা তার নেই—কিন্তু আয়ত্ত করার ক্ষমতা অভাবিতপূর্ব। চৌধুরীদের চাকরান ভোগ করলেও কোঠাবাড়ি গড়ার ক্ষেত্রে চৌধুরীদের পাঠানো নবীন মাহিন্দারকে সে হাঁকিয়ে দিয়েছে। 'রীতিমত হাতখানা মুচড়ে ধরে' বলেছে—তার নামে জমি সেটেলমেণ্ট হয়েছে—পরচা আছে। 'বাস্তু ভিটা' তার। 'সেখানে যে যেমন ইচ্ছা ঘর করতে পারে'। এই আইনের কথা—'দখলের জোর'—করালীকে নতুন সময়ের উপযুক্ত করেছে। [৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

প্রথম চেষ্টা করালীর ব্যর্থ হয়েছে। তার কোঠাবাড়ির বনেত ভেঙে দিয়েছে বনওয়ারীর লোকজন। কিন্তু তারপর বনওয়ারীকে থানা ডেকে পাঠিয়েছে। দারোগা বলেছেন—চৌধুরীরা খাজনার মালিক, পাবে। 'ঘর করতে বাধা দিতে কেউ পারবেনা'। আর পাড়া-নিয়মের কথাও চলবে না। (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) আইনের জোর, যুক্তির শক্তি করালীকে তীব্র বিদ্রোহীতে পরিণত করেছে। মাথলার ছেলেকে সাপে কামড়েছে। কাহাররা কিছুই করতে পারে নি। বনওয়ারী সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যেসব তুক তাক জড়ি বুটি শিকড় বাকড়ের সাহায্য নেয়—তাই করেছে। বিশ্বাসের শক্তি আর মিহিজামের হোমিওপ্যাথিক ওষুধের আশা—ছেলেটাকে বাঁচাতে পারে নি। করালীর স্পষ্ট কথা : 'যদি কেউ কোলে ক'রে হাসপাতালে নিয়ে' যেত—ছেলেটা বাঁচত। বনওয়ারীকে তার নির্দেশ : 'এবার যদি এমন হয় তো সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো মিলিটারী হাসপাতালে। সাপের বিষের ইনজেকশন আছে।' (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) আধুনিক ভাবনা চিন্তার প্রতি তার নিবিড় আগ্রহ ও নির্ভরতা।

করালী অধিকার-প্রত্যাশী। সেই অধিকার সে যুক্তির জোরেই পেতে চায়। সদগোপ ঘোষ কর্তারা রেশনের জিনিসপত্র দেয় না—করালী জানিয়েছে উপর মহলে। ফলে ঘোষকর্তা ক্ষুব্ধ

হলেও শেষ অবধি করালী কাহার সমাজের সকলের জন্য রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করতে পেরেছে। বনওয়ারী কেরসিন তেল চাইতে গিয়ে শুকনো সহানুভূতি ছাড়া কিছুই পায় নি! এইভাবে করালী গ্রামের বদ্ধ সমাজের বাইরে থেকে তীব্র আত্মসচেতনতা আর লড়াই করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। চন্দনপুর ইউনিয়ান বোর্ডের কাছে নালিশ, দরখাস্ত করার মধ্য দিয়ে সে স্বদেশী বাবুদের ভাবনায় উৎসাহিত হয়েছে। (৫ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এর আগে কোঠাবাড়ির ব্যাপারে বনওয়ারী চরম অপমানিত হয়েছে দারোগার কাছে। বেরিয়ে আসার সময় জমাদার খাসির জরিমানা আদায় করেছে তার কাছে। শুনে করালী বলেছে সে তো জরিমানা পেতে চায় নি। আরও বলেছে—বনওয়ারী চাইলে খাসির দাম জমাদারদের কাছ থেকে আদায় করে নেবে স্বদেশীবাবুদের বলে। এই সংযোগ—রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ—করালীর প্রতিপত্তির অন্যতম উৎস। তারাশঙ্কর এইদিকে চরিত্রটিকে বেশি এগিয়ে দেয় নি। সেরকম কোনো আদল তৈরি হলে হাঁসুলীবাঁকের ভারকেন্দ্র বদলে যেত।

করালী একটু বিলাসী। টাকা উপার্জন করে যেমন খরচও করতে চায়। এই প্রবণতা বাজার-অর্থনীতির, ভোগ্যপণ্য ব্যবহার করার মধ্য দিয়েই বাজার-অর্থনীতির বিকাশ ও ব্যাপ্তি। পাখিকে বিয়ে করার সময় তার আনা সামগ্রীগুলি (আয়না, চিরুনি, ধুতি, গেঞ্জি, তোয়ালে), খাদ্যবস্তু—সব কিছুতেই অভিনবত্ব। 'কাহারপাড়ার উপকথায় বরের সাজ-সজ্জায়—করালী কলিযুগ এনেছে', তার উপস্থিতি বয়স্কদের কাছে ভালো লাগছে না মোটেই। তবু তার যৌবন-সৌন্দর্যে সবাই মোহিত হচ্ছে। 'কাহারপাড়ায় ও যেন মোহন সাজে এক নতুন নটবর' হয়ে উপস্থিত। [২য় পর্ব, তিন]

বনওয়ারী যখন শিবভক্ত হয়েছে করালী তদারকি করে ফিরেছে সর্বত্র। 'বাঁশে পাতায়' চারটি ফটক, তেরপল টানিয়ে মনোহর করেছে মজলিসের থানটিকে, রঙিন কাগজের শেকলের মালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। 'হাঁক ডাক করে করে বেড়াচ্ছে' সে। (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ)। ধীরে ধীরে বনওয়ারীর সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে। কিন্তু করালী গ্রামের মানুষদের সামনে তার নিজের শক্তির নানাবিধ পরিচয় রাখতে ছাড়ে নি। কখনো তার 'পরণে কোট পেন্টুলুন' দেখে চমকেছে বনওয়ারী। (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কুলি-সর্দার হবার পর 'জুতো পরে পায়ে টুপি মাথায় দিয়ে হুকুম চালায়' সে (৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ। এই বেশভূষাও নতুন সময়কে অধিকার করার প্রত্যয়।

করালী আত্মমর্যাদা পেয়েছে নতুন পরিবেশ থেকেই। তার সঙ্গে সাহেবদের সহজ পরিচিতির সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। আলাদা ভাঁজো সাজিয়ে সে গ্রামের সমাজ-পরিত্যক্ত মেয়েদের ডেকে আনে নাচার জন্য। সাহেব মেমদেরও ডাকে। তারা এসে মদ খায় নাচ করে চলে যায়। সাহেবরা করালীদের অস্পৃশ্য ভাবে না নিশ্চয়। তাই করালীর মধ্যে অস্পৃশ্যতা, উচ্চবর্ণের লোকদের দুর্ব্যবহারের বিপক্ষে আপত্তি চূড়ান্ত হয়েছে। যে ভঙ্গিতে সে হেদোমগুলের দুর্বাক্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আপত্তি জানিয়েছে তাতে আত্মমর্যাদার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। 'সদ্ জাতের-ভদ্দলোকের গা চেটে' পড়ে থাকা কাহারদের সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করছে। ঘোষণা করেছে, তার সঙ্গে 'যে যাবে কারখানায় খাটতে', তাকে কাজ পাইয়ে দেবে সে। 'দিন পাঁচসিকে মজুরি'। 'উপরন্তু কোম্পানি দেবে সস্তা চাল, সস্তা ডাল, সস্তা কাপড়।' (৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) সমাজ ভেঙে ফেলেছে সে—তাকে প্রথম প্রথম আড়কাঠির মতো মনে হলেও হতে পারে, শেষ-পর্বে কিন্তু সে কাহারদের নতুন জীবনপ্রবাহে টেনে আনা দরদী বন্ধুই হয়ে পড়ে।

ঘোষ কর্তারা নিমন্ত্রণ করে কাহারদের—মুখে মুখে বলে দেয়। কখনো বৈশাখ সংক্রান্তির উৎসবে, কখনো অন্নপ্রাশনে। কাহাররা বিনা নিমন্ত্রণেও যায়। উৎসব বাড়িতে গিয়ে তারা এঁটো পরিষ্কার করে—উঁচু জাতের পাতের খাবার খায়, কুড়িয়ে নিয়ে যায়—গ্রামে গিয়ে আনন্দ করে পরের দিনও খায়। করালী এই ব্যবস্থার বিপক্ষে। পাগলের সঙ্গে কথা বলার সময় তার সুস্পষ্ট কথা—'জাত যায় পরের এঁটো খেলে, কুড়োলে। ছোঁয়া খেলে জাত যায় না।' (৩য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এই নতুন চেতনা তার উপন্যাসে কাহার-সমাজের জীবনাদর্শ নতুন খাতে বইয়ে দেবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়। তার কথা—'যে কাহার পরের এঁটো খাবে সে পতিত।' [৫ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ]

করালীর সঙ্গে তীব্র সংঘাত বনওয়ারীর। শেষ সংঘাত হল ঝাকড়া গাছের নীচে—কালিদহের কাছে। বনওয়ারী এর আগে দুবার তার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করেছে। বাঁশবনে সাপ মারার সময় করালীর শক্তি যে বেশি তা সে বুঝেছে। ভেবেছে পায়ের তলে বাঁশপাতা ছিল বলেই টাল সামলাতে পারে নি! দ্বিতীয় বার গোপালীবালাকে দাহ করে ফেরার সময়—সুবাসীর সঙ্গে যুদ্ধের গল্প করতে দেখে ক্ষুব্ধ বনওয়ারী তার ঝাঁকড়া চুল ধরে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু করালী চন্দনপুরের 'কারখানায় কাজ করে, মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করা ভুলে গিয়ে সোজা মাথায় সেলাম করা অভ্যাস করেছে'। কিন্তু তার মাথা শোয়াতে পারল না বনওয়ারী। 'পাথরের মত শক্ত, যন্ত্রণা সহ্য ক'রেও করালী ঘাড় শক্ত মাথা সোজা' করে রাখল। 'কিছুতেই নোয়াবে না সে তার মাথা।' (৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) করালীর মারফৎ এই নতুন দৃপ্ত ভঙ্গিটি আয়ত্ত করে নতুন সময় পরিবেশে কাহারেরা হাঁটতে শিখেছে। সেদিন বলে গেছে করালী—'তুমি মাতব্বর তোমাকে আমার এই শেষ খাতির।' (ঐ) পাঠক আগে থেকেই বোঝেন—এক ভয়াবহ ট্র্যাজিক পরিস্থিতির দিকে এই দ্বন্দ্বের পরিণতি এগিয়ে চলেছে।

কাহার সমাজের দ্বন্দ্ব নারী ও নেতৃত্বকে ঘিরে। পরম বনওয়ারীর দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে আছে কালোশশী। নেতৃত্ব সেখানে খুব প্রবল নয়। আটপৌরে কাহারদের নেতা পরম পরাজিত হবার পর গোটা কাহারকুলের নেতৃত্ব পেয়েছে বনওয়ারী। নয়ানের স্ত্রী পাখির সঙ্গে করালীর বিয়ে নানা কারণে অবৈধ। রীতিমতো 'ছাড়বিড়' না করে পাখিকে দ্বিতীয়বার করালীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘরভাঙাদের শেষ পুরুষ নয়ান। তার স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা মাতব্বর-পুরুষ ঘরভাঙাদের চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার ভূমিকা। বনওয়ারীর সঙ্গে করালীর নির্ণায়ক লড়াইয়ের সময় পাখি এক সময় ভয় পেয়েছে। মনে হয়েছে বনওয়ারীই জিতেছে শেষ অবধি—আর ভেবেছে—'তাকে আজ এই মুহূর্তে সে কখনই রেহাই দেবে না। ধর্ম সমাজ কিছু মানবে না।' (৫ম পর্ব, তিনটি আট পরিচ্ছেদ) নারী-ই হাঁসুলীবাঁকের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূল কারণ।

করালী-বনওয়ারীর দ্বন্দ্বের মূলে সুবাসী—যে-কিনা কালোশশীর মতোই দেখতে। একটু মাজা রং—ভাবভঙ্গি একই রকম। পরম-বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব এভাবে নতুন নেতৃত্ব করালীর সময় পর্যন্ত বিবর্তিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হচ্ছে। প্রথমদিকে বনওয়ারীকে করালী 'ব্যানো কাকা' বলে ডাকত। পাখির সঙ্গে বিয়ের পর বনওয়ারীকে সে বলে মামা। সেই সূত্রে সুবাসী করালীর মামী। পুরাণ-প্রতিমায় যেমন হবার কথা তা যেন একটু বদলে গেল এখানে। Archetypal image-এর সাহিত্যিক রূপায়ণ রূপকধর্মী থাকে না, সংকেতধর্মী হয়। মামী-ভাগনের প্রেম বাংলার গোচারক সমাজের কাহিনী—

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। বনওয়ারী কৃষ্ণতুল্য নাম, করালীচরণ তা নয়। শক্তির পীঠস্থানে করালীচরণের আর্থিক শক্তির বৈভব। চন্দনপুরের শক্তি মহাপীঠ—অট্টহাস, এনিয়ে হাঁসুলীবাঁকে খুব বেশি কথা নেই—শুকসারী-কথা-য় আছে। করালীর শক্তি চন্দনপুরের কারখানা—আধুনিক শক্তিপীঠ। সুবাসীর মাথায় মৃদু গন্ধের ফুল ছাতিম দেখেছিল বনওয়ারী। ছাতিম গাছ আছে কোপাইয়ের কূলে—জাঙলে নাই। তাহলে সুবাসী পেল কিভাবে? পাখিরও এনিয়ে সন্দেহ হয়। পাখিকেও ছাতিমফুল উপহার দিয়েছিল করালী। পাখির সঙ্গে বাসিভাঁজোর দিন সুবাসীর দেখা হয়েছিল। সে 'পাখির মাথায় ছাতিম ফুল দেখে' হেসে উঠেছিল। সন্দেহের জবাব দিল করালী। 'গ্যাঙের সর্দার' করালী খোলসা করে বলে 'আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব'। (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) শুধু কি তাই—তার ঘোষণা। 'পোষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে' করে যেমন, তার যেহেতু 'বারো মাস পৌষ মাস' তাই সে এসব করতেই পারে।

কিছুদিন আগে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলাম, করালীর এই আকাঙ্ক্ষা, আস্ফালন আধুনিক নায়কের মতো নয়। লিখেছিলাম—'নারী সম্পর্কের চেতনায় করালীর দৃষ্টি পুরোনো যুগের ধ্যান ধারণাই সামান্য পরিবর্তিত রূপ। এক্ষেত্রে তার ধারণায় বিন্দুমাত্র আধুনিক মন রক্ষিত হয় নি।' ("প্রতিহত মনুষ্যত্ব, প্রবহমানকাল হাঁসুলীবাঁকের কালো মানুষেরা" : অচিন্ত্য বিশ্বাস: *প্রসঙ্গ হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* গ্রন্থভুক্ত; উক্ত: ১৭৪ পৃ.) এর ফলে, তখন মনে হয়েছিল 'করালীর আধুনিকতা, নতুন আর্থসামাজিক কাঠামোর উপযুক্ত হয়ে আসা—তার অধিকারবোধ, আত্মমর্যাদার ধারণা, আইন সম্পর্কে ধারণা, আইন-সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান সবই অস্বীকৃত হয়ে যায়।' (ঐ) নৃতত্ত্বের সাহিত্যিক ভাষ্য হিসাবে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র ব্যাখ্যানসূত্র তখন স্পষ্ট হয়নি। এখন আমার মনে হয় উপন্যাসটির অন্তর্গত একটি সত্য এখানে লুকিয়ে আছে।

হেনরি লুই মর্গান তাঁর *Ancient Society* গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বেশিরভাগ মানব সমাজ বিকাশের সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবের মারফৎ অগ্রসর হয়েছে। আদিম মাতৃপ্রধান সমাজ (Matrilineal Society) আধুনিক পিতৃপ্রধান (Patriarchal) সমাজ গড়ে ওঠার কতকগুলি নির্দেশক আছে। প্রথম স্তরে নারীরা স্বেচ্ছাবিহার করতে পারত, কখনো বহুপতি গ্রহণ (Polyandry) করত। কখনো দেবর স্থানীয় বা দেবরের সঙ্গে বিধবা-বিবাহ চালু ছিল। এ হল মাতৃপ্রধান সমাজের ক্রমিক অবক্ষয়ের চিহ্ন। পরবর্তী সময় নিশ্ছিদ্র পুরুষ-প্রাধান্য স্পন্দনের আভাস পাওয়া গেল অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা-র কাহিনী আর 'সেই রাজার রাজ্যে'র পরিকল্পনার মধ্যে (সে রাজ্যে প্রতিরাত্রে রানির সঙ্গে এক তরুণের বিয়ে হয়—পরদিন তার মৃতদেহ মেলে!)—কাহিনীটির সঙ্গে কাহারদের সামান্য পরিচয় সূত্র সুবাসীর ঘুমন্ত অবস্থায় বনওয়ারীর ব্যবহারে দেখিয়েছেন লেখক। এই পর্যায়ে গড়ে উঠেছে মাতুল-ভাগিনেয় দ্বন্দ্বের কাহিনী; পিসতুত মামাতো ভাইবোনের বিবাহ (Cross-cousin marriage)-এর প্রথা। করালীর পিসতুত ভাই নসুরাম, বনওয়ারী করালীর মামা-স্থানীয়। বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহ্যে মহামদ আর লাউসেনের দ্বন্দ্ব আর পুরাণপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণ-কংসের দ্বন্দ্ব এবং অর্জুন-সুভদ্রার বিবাহ (সম্পর্ক তারা পিসতুত-মামাতো ভাইবোন) এই মধ্যস্তরীয় সত্যের ইঙ্গিত বহন করে। এর মধ্যে আর একটি ব্যাপার বলে নিতে হয়—বহুপতিত্ব যেমন মাতৃপ্রধান সমাজের শেষ লগ্নের ইঙ্গিত তেমনি বহুপত্নীত্ব (Polygamy) হচ্ছে পিতৃপ্রধান সমাজ বিকাশের প্রথম দিকের ইঙ্গিত বলে ধরেছেন নৃতাত্ত্বিকরা। দ্রৌপদীর

পঞ্চস্বামীত্ব আর ভীম-অর্জুনেব একাধিক বিবাহ অনুরূপ বিবর্তনের চিত্র রচনা করেছে। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় নারীরা স্বেচ্ছাবিহারী—প্রসিদ্ধ তাদের প্রেম, অপ্রতিবোধ্য তাদের 'অঙে'-র জন্য বাঁধভাঙা কোপাইয়ের মতো বাধা বন্ধন লজ্জাহীন অবারিত অভিসার। এই সমাজের মাতব্বর বনওয়ারীর দুই বিবাহ। করালীর তিন বিবাহ (প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে সে, পাখি দ্বিতীয়, সুবাসী তৃতীয় পত্নী)।—এসবই সামাজিক ব্যবস্থার বিবর্তন চিহ্ন।

করালী বনওয়ারীকে লাথি মেরে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল। 'সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছে। ক্ষতবিক্ষত-দেহে বিজয়ী বীর' করালী চলে গেল। (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) এই বিজয় আধুনিকতা আর প্রাগাধুনিকতা, ধনতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র, অর্থপ্রধান ব্যক্তির সচলতা আর কৃষি-নির্ভর সামাজিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বের অনিবার্য ফলাফল ভাবা যেতেই পারে। তবে এই বিজয় নৃতাত্ত্বিক সমাজ সাংস্কৃতিক বিবর্তনের চিহ্ন হিসাবেও গ্রহণ করা যায়।

অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, করালীর পক্ষে বাঁশবাঁদিতে ফিরে আসা সম্ভব কিনা। এ-প্রশ্ন প্রথম যারা তুলেছেন তারা মার্কসীয় শ্রেণী-দ্বন্দ্ব ও সমাজ বিবর্তনের তাত্ত্বিক ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। সাহিত্য অপেক্ষা রাজনীতি তাদের বিবেচনার মূল যুক্তি ছিল। বীরেন পাল ছদ্ম নামে সি. পি. আই. নেতা ভবানী সেন 'মার্কসবাদী' পত্রিকার অক্টোবর ১৯৪৮ সংখ্যায় ''বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা'' নামক নিবন্ধে লিখেছেন—'বইখানি প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যেরই শ্রেণীভুক্ত'। কারণ চরিত্রগুলো (জমিদার/বনওয়ারী/করালী) 'দুর্নীতির পসরাবাহী'—'প্রত্যেকেই ভাঙল'—'সমাজ গড়তে পারল না'। 'অগ্রগামী ধনতন্ত্রের নিকট দরিদ্র গ্রামবাসীর আত্মসমর্পণ'—এ উপন্যাসের সব সমস্যার শেষ সমাধান! আর *কালিন্দী থেকে হাঁসুলীবাঁকের উপকথা পর্যন্ত* তারাশঙ্কর-সাহিত্য নাকি 'সূক্ষ্মভাবে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে।' হিরণকুমার সান্যাল 'পরিচয়' ১৩৫৪, পৌষ সংখ্যায় যা লিখলেন তা আরও উপাদেয়। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* যে 'উচ্চস্তরের কথাসাহিত্যে উত্তীর্ণ হতে পারল না' সে ব্যাপারে হিরণকুমার নিশ্চিন্ত। শেষে প্রশ্ন—'এত মেহনতের ফল হল কী?' এবং উত্তব—'যে আদিম অন্ধকার থেকে কাহার পল্লীর উদ্ভব, সেই অন্ধকারেই হল তার বিলুপ্তি।' ভবানী সেন নিছক রাজনৈতিক কারণে আর হিরণকুমার সম্ভবত গোষ্ঠী পরতন্ত্রতার কারণে এই নেতিবাচক সমালোচনা করেছেন। দুজনেই উপন্যাসের পরিণতিতে করালীর বিজয় অভিযান কেন গ্রামে ফিরে এল এই প্রশ্ন তুলেছেন। তবু, তারাশঙ্কর একে উপেক্ষাই করতে পারতেন। তিনি তো প্রকাশ্যে সকলকে জানিয়েই ১৯৪৬ নাগাদ কমিউনিস্ট সংশ্রব ত্যাগ করেছেন। 'কালি ও কলম'-এর ১৩৭৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় লিখেছেন গোপাল হালদার : '১৯৪৬-এর দিকে আসতে আসতে তিনি (তারাশঙ্কর—অ. বি.) তা ('পরিচয়ে'র সঙ্গে 'একাত্মতা'—না থাকা) বেশি অনুভব করেন এবং 'কমিউনিজমে'র ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেন।' গোপাল হালদারকে তারাশঙ্কর পারঙ্গম-সমালোচক বলে জানতেন। একই ভাবে তাঁর নির্ভরতা ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক-অধ্যাপকের মতামতের উপর। তারাশঙ্কর অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছিলেন এই দুই সমালোচকের বিচিত্র ব্যবহারে।

হাঁসুলীবাঁক প্রকাশ পাবার পর তারাশঙ্করের ৫০ বৎসরের জন্মদিন উপলক্ষে টালা-পার্কের বাড়িতে একটি সাহিত্যসভা হয়। তখন তারাশঙ্কর 'কমিউজিম'-এর দলবদ্ধ সমর্থকদের সঙ্গে (বিশেষত ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্য সমিতির সঙ্গে) সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি। পেলেন একটি চিঠি— চেকস্লোভাকিয়ার কোনো প্রকাশক বইটির অনুবাদ-সংস্করণ করতে চান।

সি. পি. আই-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর ঐ প্রকাশকের উৎসাহ নির্বাপিত হয়! ঐ সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন :

> 'তাঁর সৃষ্টির সমনে আর সেই আলোর দীপালিতে ঝলমল করে উঠেছে তাঁর আধুনিকতম সৃষ্টি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'হাঁসুলীবাঁক'। এই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর শুধু 'বাঁশবাঁদি'র কাহারদেরই ফুটিয়ে তোলেননি—ব্রাত্য, মন্ত্রহীন ভারতবর্ষে যুগান্তরের দোলা যেন রূপকছলে এতে আত্মপ্রকাশ করেছে।...চলমান যুগের তিনি সার্থক কাহিনীকার এবং গণসাহিত্যের নির্ভীক অগ্রদূত।'

শ্রাবণ ১৩৫৪-এর এই বক্তৃতা। তখন হাঁসুলীবাঁকের প্রথম সংস্করণ সদ্য প্রকাশিত (আষাঢ় ১৩৫৪)। নারায়ণবাবু বইটি পড়ে কেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ ঐ আলোচনায়। সি. পি. আই-এর প্রভাবমুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তারাশঙ্করের ক্ষোভ-তিক্ত ভাষা 'গণসাহিত্যের ইজারাদারেরা' মত বদল করেন! ভবানী সেন লেখেন—'ছোটোলোকে'র মধ্যে মহত্ত্বের কোনো সন্ধান তারাশঙ্করের হাঁসুলীবাঁকে নেই—'ছোটোলোক'কে তিনি 'দেখিয়েছেন অসভ্য নীচ আকারে।' ['মার্কসবাদী'—১৯৪৮, অক্টোবর সংখ্যা]

গোপাল হালদার ১৩৭১-এর আষাঢ় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে তারাশঙ্কর-এর হাঁসুলীবাঁকের তির্যক সমালোচনা করেছেন। সেই সমালোচনার মূল লক্ষ্য করালীর পরিণতি যে মার্কসবাদসম্মত নয় তা দেখানো।—'সম্ভবত 'অভিযানে'র পরেই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য় এই অর্ধালোকিত উপকথার লোক দিয়ে তিনি আপনার দৃষ্টির দ্বিতীয় প্রস্থানে এসে পৌঁছন।' দ্বিতীয় প্রস্থান অর্থাৎ সমাজবাস্তবের সোজা পথ এড়িয়ে আবর্তনমূলক কালচেতনায় আশ্বাস স্থাপন। 'উপকথার মহলে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনাশ্রয়ী বাস্তবের অবকাশ বেশী, সত্য অপেক্ষা সত্যাভাসই উপকথার অবলম্বন। উপকথার অবয়বে তখনও তবু তারাশঙ্কর রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় আবর্তিত সমাজ সত্য।'—এই আবর্তিত সমাজসত্য বলতে গোপাল হালদার যা আড়ালে রেখেছিলেন, তাকে একালের সমালোচকরা কেউ কেউ তারাশঙ্করের ব্যর্থতা বলে শনাক্ত করতে চেয়েছেন।

এক তরুণ সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন : 'কালের অমোঘ বিধানে যে করালীর নেতৃত্বে শ্রমিকরা কারখানায় বাঁশি শুনে যন্ত্র দাসত্বের নৈমিত্তিক প্রভাতী অভিসারে পদক্ষেপ করতো উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রিত পাঠেও—তাকেই চতুর্থ সংস্করণে নিয়োজিত করলেন হাঁসুলীবাঁক পুনঃখননে! উপকথার কোপাই ইতিহাসের গঙ্গায় মেলে না, প্রাকৃতিক নিয়মে কাঁদরে পর্যবসিত হয়—এই সত্যকে গণ্য না করে ব্যক্তি করালীর কোপাই খনন তার অপমৃত্যুরই নামান্তর।' ("তারাশঙ্করের উপন্যাসে সমাজ-আর্থ শ্রেণীবিন্যাস" : অরূপ কুমার দাস; ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* উক্ত; ২৫৭ পৃ.) তাঁর তীক্ষ্ণ ভাষা—এই প্রত্যাবর্তনের রেখা—'পশ্চাদপসারক দিশাচিত্রণ' ছাড়া কিছু নয়। গোপাল হালদার একেই 'আবর্তিত সমাজসত্য' বলেছিলেন! যাহোক দীক্ষিত অরূপকুমার এই করালীকে 'বনওয়ারীর মুখোশ পরিয়ে অভীষ্ট খর্বতায় সংস্থাপিত করে দিয়েছেন' বলে তারাশঙ্করের চতুর্থ সংস্করণের পাঠটিকে যথেষ্ট আক্রমণ করেছেন।

আমাদের মনে হয় না তারাশঙ্করকে অত সহজে নস্যাৎ করা যায়। আনন্দমোহন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক সরোজ দত্ত লিখেছেন—'করালীর মধ্য দিয়ে প্রাচীন মূল্যবোধকে আঘাত করাটাও সম্পূর্ণ নয়, তাহলে আধুনিকতার প্রতিবন্ধক বনওয়ারীর মৃত্যুর

পরে সে বনওয়ারীর স্বর্গ কামনায় শালকাঠের চিতাশয্যা রচনা থেকে নিবৃত্ত থাকত।' এছাড়া মন্তব্য তাঁর 'করালীর অনুসারী হাঁসুলীবাঁকের সেই তরুণ কাহার ছেলেরা' চন্দনপুরের 'পাকা ঘুপচি কোয়াটার্স' থেকে 'তাকায় বালিভরা' 'হাঁসুলীবাঁকের দিকে'—এর পিছনে সম্পূর্ণ প্রাগাধুনিক গ্রামজীবনের বৃত্ত ও বৃত্তি ভাঙার ইতিহাস তো তৈরি হয় নি। উপরন্তু চন্দনপুরের ধনতন্ত্রকে তাঁর মনে হয়েছে 'বিঘ্ন ধনতন্ত্র (Sick Capitalism). করালী এর 'শীর্ণ প্রতিনিধি' ছাড়া কিছু নয়। করালী এই অবিকশিত ধনতন্ত্রের প্রতিনিধি বলেই 'শেষ পর্যন্ত' তার উপর তারাশঙ্কর ভরসা রাখতে পারেন নি—'সেটা তাঁর ইতিহাসসম্মত বিবেচনা বলেই গণ্য করা উচিত।' [''তারাশঙ্কর ও হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'' : সরোজ দত্ত; অলোক রায় সম্পাদিত : *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা/পাঠ ও পর্যালোচনা* ; উক্ত; ২৫ পৃ.]

উপরের তিনটি যুক্তি ছাড়াও করালীর ফিরে আসার ক্ষেত্রে আরও কিছু কারণ ভাবা যায়। যথা :

(১) রেলপথ ডবল হওয়া, রেল কোম্পানির যুদ্ধের কাজে যুক্ত হওয়া—কর্মী নিয়োগ, কালোবাজারি পরিবেশে বিশেষ ধরনের সস্তায় খাদ্য, জ্বালানি ও বস্ত্র পাবার সুযোগ পাওয়া আর সেসব অল্পবিস্তর কাহার তরুণদের দেবার ক্ষমতাই ছিল করালীর শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর এই শক্তি আর তেমন অপ্রতিরোধ্য না থাকারই কথা। করালী ফিরে আসার কারণ এখানে নিহিত বলেই মনে করি।

(২) রেলে কাজ করতে গেলেও করালী তার জন্ম-গ্রামের সঙ্গে নানাভাবেই একাত্ম বোধ করেছে। যখন কৃষিকর্মে যোগ নেই তখনও তার চেষ্টা ছিল গ্রামেই বাস করবে। কোঠা বাড়ি গড়া—চড়কের সময় মেলার তদারকি করা, ভাঁজো উৎসবে যোগ দেওয়া, বিশেষত সম্মান রক্ষার চেষ্টা (যারা সদ্‌জাতের এঁটো খায় তারা তার কাছে পতিত—এই ঘোষণা), গ্রামের মানুষের জন্য স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান দান, পরামর্শ—সবই তার গ্রামসমাজে ফিরে আসার ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) আর একটি যুক্তি আমরা উত্থাপন করতে চাই। এই গ্রামের সঙ্গে তার আবাল্যের সম্পর্ক। মা তার চিরকালের জন্য তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। তার মনে দুটি গভীর বেদনার স্মৃতি উপস্থিত। প্রথম স্মৃতি—মাইতো ঘোষের কাছে প্রবল অত্যাচারের স্মৃতি। এ ছিল পরম বেদনার। গ্রাম সে ত্যাগ করতে চায় নি। 'ওই চন্দনপুরের কারখানায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছেন এই মাইতো ঘোষ।' (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) মেজ ঘোষের খদ্দেরের পাঠানো খাস আমের ঝুড়ি আনার সময় স্টেশন মাস্টারের মেয়েকে নিজের মনে করে ('আমার মুনিব তেমন লয়'—এই ছিল তার বিশ্বাস) একটা আম দিয়েছিল, জমাদার জোর করে নিয়েছিল আরো দুটি আম। সেখান থেকে একফালি করালীকে জোর করেই খাইয়েছিল। গন্ধ শুঁকে ব্যাপারটি ধরে ফেলে মেজো ঘোষ প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিল তার উপর। সুতরাং চন্দনপুরের কারখানায় কাজ করার 'অহঙ্কার'-টি বাহ্যিক বোধ হলেও এর আড়ালে এই 'বেদনা'-র আন্তরিক হাহাকারটিও সত্য। করালী এই বেদনার কারণেই সামন্ত ব্যবস্থার মেনে নেওয়ার বাধ্যতা আর বশ্যতাকে চরম আপত্তি জানিয়েছে বলেই মনে হয়।

(৪) প্রথম দিকে হারানো অবচেতনের ধাক্কায় গ্রামেই বালক 'করালী খুঁজে বেড়াত তার মাকে।' সে তার মাকে খুঁজে ফিরত। 'মহিষডহরির বিলে', 'কোপাইয়ের তীরের বনে বনে', 'শিমূল গাছের তলায়', 'ওই বাবাঠাকুর তলায়'—সর্বত্র। 'মা-মা' বলে কাঁদত। শেষে অস্পষ্ট

হয়ে যেত মায়ের স্মৃতি। 'বাবাঠাকুরের থানে পূজো' দেওয়া বাতাসা পাটালি আর দুধ দিয়ে নিত সকলের অলক্ষ্যে। পর্যবেক্ষণ করত প্রকৃতি। সেখানে অনন্ত দ্বন্দ্ব সংঘাত—টিয়াপাখির ছানাদের আক্রমণ করছে সাপ, সেই লড়াইতে দুর্বলের পক্ষে থাকত সে। 'সাপটাকে বিব্রত করত।' (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) আবার মাকে খুঁজে ফিরত। তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন—'ক্রমে বয়স বাড়ল, মায়ের ইতিহাসের লজ্জা তাকে স্পর্শ করল, তখন মাকে খোঁজা ছাড়লে সে।' এই যে অবচেতন স্তরে মায়ের জন্য লজ্জা তার তাতে—'মা হারানোর বেদনা'-টি সঞ্চারিত হয়েছে। তারই প্রতিক্রিয়ায় করালীর আচরণের মধ্যে এই ব্যক্তিগত বেদনাবোধকে অতিক্রম করে অহঙ্কার প্রকাশের মধ্যে ক্ষতিপূরক মনোভাবটুকু থাকার সম্ভাবনা খুবই আছে। আর মাকে হারিয়ে যে পিসীর কাছে সামান্য স্নেহ সে পেয়েছিল ('করালীর তিনকুলে থাকার মধ্যে ছিল এক পিসী—ওই নসুর মা')—তার পাশে ছিল এই গ্রাম দেশের প্রতি মমতাও। জোর করে এই সম্পর্কের সূত্র ছিঁড়ে ফেলতে বাধ্য করেছেন মাইতো ঘোষ। ক্ষমতার প্রতিনিধি। তাকে সে চরম অপমান করেও আবার ফিরে এসেছে—এই টান, মায়ের কাছে না হোক ধাত্রী দেবতার কাছেই ফিরে আসার টান বলে গণ্য করি। তারাশঙ্করের কথা সাহিত্যে জন্মগ্রামে ফিরে আসার এই ছকটি বার বার ফিরে এসেছে।

বস্তুত দেশকে জননী ভাবার প্রবণতাটি বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্ট করে তাঁর সাহিত্যে এঁকেছিলেন। *আনন্দমঠ*-এ তার স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত। বন্দেমাতরম্ হয়ে গেল দেশের আদি-কল্প সন্ধান—রোমাঞ্চকর অভিসার। মধুসূদনের লেখায় এই চেতনা কখনো ব্যক্তিগত (চতুর্দশপদী কবিতায়) কখনো তাত্ত্বিক (*মেঘনাদবধ কাব্যে*)। রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে*-র নিখিলেশ তাকে পেতে চেয়েছে পরিবারে, ব্যক্তির সংকোচন ও প্রসারণের ঘেরাটোপে; গোরা-সুচরিতা দেশকালের সীমা অতিক্রম করে যে মহাভারতীয় চেতনায় উত্তীর্ণ হবার অপরূপকে *গোরা* উপন্যাসে দেখতে পাই তা কতকটা যেন কালাতীত। যদি এই দেশটিকে দেশের মূল শ্রমসাধ্য কাজ করা মানুষগুলির চোখে দেখতে হয় কেমন হবে সেই দেখা? এ প্রশ্নের উত্তর বাংলাসাহিত্যে খুব বেশি খোঁজা হয়নি। সতীনাথ ভাদুড়ী ঢোঁড়াই-এর মধ্য দিয়ে আগামী দিনের রামচরিত-মানসকে ধরতে চেয়েছেন—সেই প্রান্তিক মানুষের সন্ধানে মহাজীবনের স্পর্শ এসেছে সামান্য বঙ্কিম-দৃষ্টিতে। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন, রামায়ণের অনুষঙ্গ—রামরাজ্য গঠনের আকাঙ্ক্ষায় মেদুর সেই রচনা। করালীর মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর তেমনি একটি সম্ভাবনা দেখে থাকলে তাকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে হবে? ভারত চীনের মতো হয়নি—রুশিয়ার মতোও হয়নি, ভারতের বিকাশে এখনও পর্যন্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় নি। ভারত বাস করে তার গ্রামে। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাঁদি তেমনি একটি গ্রাম। এই অন্ত্যোদয়ের নেতৃত্ব সর্বহারা করালীরই প্রাপ্য। তার ফিরে আসাও নিতান্ত অবাস্তব নয়। সর্বহারা করালী মাতৃহারা, ভূম্যধিকারীর দ্বারা অত্যাচারিত—গ্রাম থেকে বিতাড়িত। আর সে তো বটেই, তার সহযাত্রীরাও হাঁসুলীবাঁককে কোনদিন ভোলে নি। সুতরাং তার বাঁশবাঁদিতে ফিরে আসা একটি স্বপ্নের আবর্তন। এছাড়া অন্য কিছু—খসড়ার মতোই মনে হয়। তারাশঙ্কর জীবিতকালে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র শেষ পাঠান্তরে তার পরিণতিটি বেশ ভেবেচিন্তেই লিখেছেন।

বনওয়ারীর কথা এর আগে অনেকবার বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছি। এখন ভূমিকাটি সম্পর্কে সামান্যকথা একত্র করছি। বনওয়ারী বাঁশবাদির অবিসম্বাদী নেতা। স্বভাব তার শান্ত—কথা সাধারণত অনুচ্চ। কিন্তু নেতৃত্ব দানের সময় বনওয়ারীর কণ্ঠস্বরে অন্য এক ব্যক্তিত্বের

আভাস লক্ষ করা যায়। কালুয়াকে 'সামাজ' দেবার বাসনা তার; করালীর এই সৃষ্টিছাড়া ইচ্ছাকে দমন করানোর জন্য বনওয়ারী যখন ডেকে ওঠে—'করালী', তখন তার মধ্যে এই 'আর এক বনওয়ারী' জেগে ওঠে। বনওয়ারী তখন আর ব্যক্তি থাকে না, হয়ে পড়ে প্রতিষ্ঠান। 'বনওয়ারীর এই কণ্ঠস্বর' শাসকের—'একে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না।' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) তারাশঙ্কর জানাচ্ছেন বনওয়ারীর উপস্থিতি কাহারপাড়ায় একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি করে। ঝগড়া বিবাদ থেমে যায় তার উপস্থিতিতে। [১ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ]

বনওয়ারী অত্যাচারী কর্তা নয়—তার মধ্যে আছে এক ধরনের নিরহঙ্কার ভাব। 'হাসি-খুশি নাচ-গান মিষ্টি কথা নিয়েই আছে।' ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা বা গরজ তারই যেন বেশি। যদি শান্ত বুদ্ধিতে তার কথা কেউ না শোনে—তাহলে তার ভিতর থেকে চিরকালের অত্যাচারী শাসক-সত্তা জেগে ওঠে। তাকে দেখে, সেই আওয়াজ শুনে করালী পালায়। বনওয়ারী মনে মনে গর্জায়—'যাবে কোথা? ফিরতে হবে না, ফিরতে হবে না? কার এলাকায় ফিরবে?' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) একটি বদ্ধ সমাজের চিরাচরিত ব্যবস্থায় বনওয়ারী মণ্ডল তথা স্থানীয় প্রশাসক। সেই অঞ্চলে তার কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করতে হবে ; অন্য উপায় নেই।

উপন্যাসে বনওয়ারীর আত্মমর্যাদাবোধ আর সংযম নানাভাবে উপস্থাপিত। কর্তার আসনের দিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাবার পথে কালোশশীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে সে। এখানে ব্যক্তিমনের ভালোলাগাকে স্বীকার করা আর পাড়ার রীতি নিয়মকে মেনে নেবার ক্ষেত্রে তীব্র দ্বন্দ্ব ঘটেছে। কালোশশীর প্রতি তার ব্যাকুল আত্মপ্রকাশ : 'অন্য কেউ হলে তার পক্ষে সম্ভব ছিল এমন কাজ।' অর্থাৎ 'সাঙার রেওয়াজ' মেনে নেওয়া সম্ভব হতেও পারত। কিন্তু 'সে বনওয়ারী—পাড়ার মাতব্বর।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) Instinct-কে অস্বীকার করার চেষ্টা—প্রবৃত্তিকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তার মধ্যে আছে; অথচ মানবিক প্রবৃত্তি—প্রেমকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে সে পারে নি। এখানে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র প্রধান চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব, বাঁক ও মোচড় চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে। 'কালোশশীকে সে যে ভালবাসে। সে ভালবাসা তার মনের মধ্যে কুলকাঠের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলছেই—জ্বলছেই।' (২য় পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) এই প্রেমের বোধ আছে, অবদমনের নিবিড় বেদনাবোধ আছে বলেই করালী-পাখির প্রেমকে সে ভুল বোঝেনি। ওদের বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বনওয়ারীর অন্তর্দ্বন্দ্ব কালোশশীর প্রতি প্রেম আর ভগবৎ-আশ্রয়ী অপরাধবোধ থেকে জন্ম নিয়েছে। কালোশশী তার গোপন প্রেম—তাকে প্রকাশ্যে এনেছে পরমদের পাড়ার ঘেঁটু গানের দল। গানটি অবশ্য পানা বেঁধেছে। তবু পরমরা উৎসাহিত হয়ে এই ঘেঁটু গানটি লহর ছুটিয়ে গেয়ে চলেছে : বনওয়ারী এ-গান শুনে বুঝেছে লক্ষ্য সে।

সাধুজনের এ কি লীলা সনঝে বেলাতে।

[২য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ]

আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে একাধিক প্রবণতা দেখতে পাই। মনের মধ্যে একাধিক স্তর তার স্পষ্ট হয়। যেমন :

১. তার মনে আছে এক প্রেমিক সত্তা। কালোশশীর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ তার চিরকালের। সেই প্রেমিকসত্তা সে স্পষ্ট প্রকাশ করতে চায় না।

২. তার মাতব্বরি-সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রতি তার আকর্ষণ কম নয়। এই অধিকার বোধ তার আয়ত্ত—আর আছে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের চেষ্টা এবং উপযোগী ব্যবহার আয়ত্ত করা।

২. করালী-পাখির প্রেমের সম্পর্কে তার দুর্বলতা; রীতিসম্মত ভাবে যা করা উচিত তা না করে তাদের সে সামান্য প্রশ্রয়ই দিয়েছে। অথচ করালীকে শাসন করা উচিত ছিল—কর্তার বাহন বলে সমাজ শনাক্ত করেছে যে সাপটিকে সেই সাপটিকে সে হত্যা করেছে।

৪. কর্তাবাবা সম্পর্কে তার অনন্ত শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধার পাশাপাশি অপরাধবোধও কাজ করে যায়। পানার খুঁতো পাঁঠাটি বলির দায় প্রত্যক্ষত তাদের নয়—তবু বনওয়ারী অপরাধ বোধ করে। অন্যদিকে কর্তার বাহন মেরেছে করালী, তাকে শাস্তি দেয় নি—প্রশ্রয় দিয়েছে। নিজেও কর্তার থানে প্রদীপ দেখানোর সময় কালোশশীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। অপবিত্র করেছে কর্তার আসন।

এই চারটি স্তরই চার ভাবে তার মনের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণ হয়েছে। তার মনে হয়েছে—বটতলায় কালোশশীর সঙ্গে 'দেখা হওয়ার' ব্যাপারটি 'তার অপরাধ'। করালীর ব্যাপারেও 'অপরাধ হয়েছে, একশো বার হয়েছে।' (২য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) সঙ্গে সঙ্গে তার মনে জেগেছে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা। কে খবরটা দিল—বটতলায় কে ছিল সেদিন, তোলাপড়া করতে করতে সে পানাকে মোটামুটি দোষী বলে স্থির করে। পরে বনওয়ারী তাকে আসরের মধ্যে সকলের সামনে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে (নয়ানের বাঁশ ঝাড় নিজের বলে বিক্রি করে দেওয়া) পানুকে চেপে ধরে। বনওয়ারী এখানে পার্থিব—মানবিক। অন্যদিকে বনওয়ারী যখন স্থির করে এবার চড়কের সময় কালারুদ্রের পাটায় সে মূল ভক্ত হয়ে বাণের উপর শুয়ে নিজের পুণ্যাত্মা স্বরূপের প্রকাশ তখনও ঘটাবে। তাঁর মনে হয়—'এইবার' 'বাবার প্রধান ভক্ত হয়ে চড়কের পাটায় চাপবেই।' পাপ খণ্ডিয়ে যাবে ব্রতের পুণ্যে; 'কর্তাঠাকুরের দয়ায় বাবা কালারুদ্দুর পেসাদে গাজনে পাটায় শোওয়া সহ্য হলে নিন্দুকের মুখ বন্ধ হবে।' (২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) এই ভাবনাও পার্থিব বা মানবিক। কারণ তার মনে এর দ্বারা মাতব্বরির ক্ষেত্রে তার সমালোচনার সমস্ত কুপ্রভাব নির্জিত হবে। আটপৌরেদের ঘেঁটুগানের উদ্দেশ্যের মূলোৎপাটন করা যাবে। অন্যপক্ষে তার মনে হয়েছে, তা যদি না হয়—কালারুদ্দের চড়ক পাটায় শুয়ে পাপের ভারে সে মারাই যায়, তাহলেও তার দুঃখ ('দুস্কু') থাকবে না। 'যাকে দশে করেছি, তার জীবনে কাজ কি?' (ঐ) বনওয়ারীর মন—আদিম আরণ্যক, 'savage mind', তার পরিচয় এই ভাবনা-শৃঙ্খলায় পাওয়া গেল।

· চড়কের পাটায় শুয়ে চেনা জগতের নিকট অতীতের স্মৃতি তার মনে পড়েছে। বনওয়ারী চেনা পৃথিবীতে দেবতার মতো হয়ে উঠেছে এই ঘটনার ফলে। দেবতার স্পর্শে সে হয়েছে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। 'গোটা কাহারপাড়ার আজ সে দেবতা হয়ে উঠেছে। সকলে তার পথে গোবরজল ছিটিয়ে পবিত্র করে দিচ্ছে।' (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) 'গজাল-পেটা' 'চড়ক পাটার উপর' প্রধান ভক্ত বনওয়ারী যখন শুয়ে পড়েছে তাকে ষোলজন ভক্তের কাঁধে চড়ে ঘুরে উঠেছে তখন এই পবিত্রতা প্রকট হয়েছে। (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) আকাঙ্ক্ষা তার এই জন্মে যে অস্পৃশ্যতার বোধ সহ্য করতে হয়েছে—পরজন্মেও যেন তেমন ভোগ করতে না হয়। 'শিবো হে, আসছে জন্মে উচ্চ কুলে জন্ম দিয়ো।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই ভাবনাটুকু একক—নিজস্ব। ব্যক্তিগত। বনওয়ারী অবশ্য সামাজিক

মানুষ। পরক্ষণেই তার প্রার্থনা—'বাবাঠাকুর তোমারই শিষ্য বাবা, তাঁরও পুজো দিয়েছি, তোমার চড়কের পাটায় লোহার কণ্টকে শুয়ে তোমার চরণে মিনতি করি বাবা, তুমি তাকে প্রসন্ন হতে বল, তোমার শিষ্যকে বল—তাঁর বাহন-'হত্যে'-র অর্থাৎ সেই অজগরটি পুড়িয়ে মারার অপরাধ যেন তিনি ক্ষমা করেন, যেন হাঁসুলীবাঁকের অমঙ্গল না হয়।' (ঐ) বনওয়ারীকে তারাশঙ্কর এই দুই প্রান্তিকতার চাপ ও টানের দোলাচলতার মধ্য দিয়ে অঙ্কন করেছেন।

বনওয়ারী উপন্যাসের প্রধান চরিত্র—Protagonist। কাহার সমাজের একটি বিশেষ পরিবর্তনের নায়ক সে। নীলকরদের ভূমিকেন্দ্রিক ব্যবসা যখন আমাদের দেশের চিরাচরিত জীবন পদ্ধতিতে তরঙ্গ এনেছিল তখনই তার সহযোগে এসেছিল এই জনগোষ্ঠী, কাহার সম্প্রদায়। তাদের দুটি অংশ—এক. যারা কোশকেঁধে; পালকি বহন ছিল যাদের কাজ। দুই. যারা আটপৌরে; অষ্টপ্রহর যারা লাঠি হাতে অপেক্ষা করত। নীলকণ্ঠ সাহেবদের হয়ে প্রজাদের অত্যাচার করে ভয় দেখিয়ে যারা নীল বুনতে বাধ্য করত। নীলকররা চলে যায় (উপকথায় কোপাইয়ের হড়পা বানের পর তাদের সলিল সমাধি হয়)—নতুন সম্পদ পেয়ে ভূম্যধিকারী হয় চৌধুরীরা। এই পর্যায়ে আটপৌরে-রা হয়ে ওঠে অপরাধ প্রবণ। থানায় তারা 'দাগী' বলে পরিচিত থাকে। বনওয়ারীর নেতৃত্বে কাহারবা এই সময় অস্থায়ী ভাবে পালকিবহনের পেশায় যুক্ত থাকলেও (নতুন প্রভুদের সর্বদা পালকি রাখার দরকার হত না) আসল পেশা দাঁড়াল কৃষি-কর্ম। এক প্রজন্মের মধ্যে 'দাগী' দুর্নাম ঘুচল তাদের—চৌধুরী-সদগোপ বাবুরা তাদের বিশ্বাস করে ভাগচাষি হিসাবে গ্রহণ করল। এই পর্যায়ে বনওয়ারীর ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। সক্রিয়তা অত্যন্ত গতিশীল।

বিশ্বযুদ্ধ এল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তাও দেখেছে বনওয়ারী। তবে তার চোখে-দেখা সমস্ত ধ্যান-ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমূল বদলে গেল। চন্দনপুর হয়ে উঠল নতুন সময়ের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্র। এর উৎসে বেলপথের ভূমিকা বনওয়ারী দেখেছে। রেলপথ, রেলপুল—তার উপর দিয়ে চলা রেলগাড়ি সবই তাদের জীবনের সঙ্গে মিশে গেল। বনওয়ারী বাঁশবাদির কাহারপাড়ায় এইসব তরঙ্গ থেকে সম্ভব মতো নিজেদের বন্ধ করে রাখল। তার লক্ষ্য গ্রাম-জীবনের প্রকৃতি-নির্ভর জীবন যাপন পদ্ধতিটি অবিকৃত থাক। এই ভাবাদর্শকে আঁকড়ে থেকেছে সে। তার ধারণা ধান্যলক্ষ্মী গিয়ে উঠবেন মনিবদের গোলায়—তার 'প্যাঁজের ধুলো'তেই কাহারদের চলে যাবে। এই ধানখেতের ফসলে যার পেট ভরবে না সে দুর্ভাগা। তাছাড়া নিষেধাজ্ঞা তার, কিছুতেই যাওয়া চলবে না চন্দনপুরের কারখানায়। ও হল কালিঝুলি মাখা অলক্ষ্মীর পুরী। মেয়েরাও ওখানে গেলে চিরকালের জন্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা হয়। 'পাটকাম' করতে যাওয়া চলবে, চলবে গোবর বা দুধ বিক্রি করা, সাবধানে থাকতে হবে। বনওয়ারী এই যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-বিন্যাসটিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে তার উদ্দেশ্য বলাবাহুল্য, সমাজ। ভারতের চিরকালের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ছবিটি তার কাছে আদর্শ—ধর্মসম্মত।

যেমন ভাবেই ধরি, বনওয়ারীর প্রবণতা রক্ষণশীল। এই প্রবণতায় সে পরমকে সমাজে অর্থহীন করে দিয়েছে। পরমের স্ত্রী কালোশশী—তার প্রণয়িনী। তাকে ঘিরে তীব্র দ্বন্দ্ব ঘটল মিত্র গোপালপুর থেকে ফেরার পর। তারপর পরম পরাস্ত হয়ে পড়ে রইল মাঠে—বনওয়ারী গেল কালোশশীর কাছে। কালোশশী আর বনওয়ারী কোপাইয়ের জলে জ্যোৎস্না-প্লাবিত পরিবেশে গান গাইছে, এমন সময় এল পরম! তাকে দেখে পালাতে গিয়ে মরল

কালোশশী। আর পরম চিরকালের জন্য গ্রাম ছেড়ে গেল। পরমের এক্তিয়ারে থাকা আটপৌরেরা বনওয়ারীকে মাতব্বর হিসাবে মেনে নিল। আটপৌরে কাহাররা এইভাবে বনওয়ারীর নেতৃত্বকে প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নিল। মিলনের চিহ্ন হিসাবে কালোশশীর বোনঝি সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়ে হল। 'এমন ক্ষেত্রে আটপৌরে ঘরের মেয়ে সর্বপ্রথম তারই ঘরে আসা উচিত।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) পরমের পরাজয়, অবান্তর হয়ে যাওয়া—একদিক থেকে বনওয়ারীর সামাজিক শক্তির বিজয়। পরমের তুলনায় বনওয়ারী অগ্রসর সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় বহন করে। পরম ছিল উৎকেন্দ্রিক অনিশ্চিত পেশার মানুষ—food gatherer বনওয়ারী হল ভূমিকেন্দ্রিক নিশ্চিত পেশার মানুষ—food producer তাই বনওয়ারী অগ্রসর।

ধনগর্বী চন্দনপুরে গড়ে উঠল রেল স্টেশন, কারখানা। অর্থনৈতিক সচলতা সৃষ্টি হল, গতিশীলতা এল জীবনে। স্থাবর জীবন জঙ্গল জীবনকে আয়ত্ত করল। করালী এই নতুন ছন্দ নিয়ে এল। সে ছিল তার বাধ্যতা। মাইতো ঘোষ তাকে প্রবল অত্যাচার করে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে চন্দনপুরে। একাজে বনওয়ারীও সাহায্য করেছে সেদিন। করালীর ভূমিকাটি কিন্তু আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে মানানসই। বনওয়ারীর শত চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও গ্রামীণ আর্থিক পরিবেশটি রক্ষা করতে পারল না বাঁশবাদির কাহাররা। কখনো আত্মসম্মানের প্রশ্নে, কখনো অর্থনৈতিক বাধ্যতায় নতুন পরিস্থিতিকে মানতেই হল নতুন ব্যবস্থা। বনওয়ারীও একসময় কাহার সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছে, আত্মসম্মানের বোধ তারও ছিল। একসময় জাঙলের সদগোপ-গন্ধবণিক-ভদ্রজনের বাড়িতে কুকুর বেড়াল মারা গেলে কাহারদের ফেলতে হত; নর্দমা পরিষ্কারও করতে হত তাদের। বনওয়ারীর নেতৃত্বে একাজ তারা আর করতে চায়নি। বনওয়ারী সুচাঁদকে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছে কীর্তিটি তার—'আমারই কীর্তি বটে। তা অন্যায়টা কোনখানে? আমরা মেথর, না মুদ্দ ফরাস?' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী এই প্রশ্নের উত্তর সুচাঁদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। সমাজ তখন যে অবস্থায় ছিল—বনওয়ারীর নেতৃত্ব তার সঙ্গে ছিল সঙ্গতিপূর্ণ।

করালী যখন সদ্‌গোপদের অনুষ্ঠানে বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চায়নি, তখন বনওয়ারী বুঝতে পারেনি করালীর এত আপত্তি কিসের! হেদো মণ্ডল তাকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করলে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে করালী! বনওয়ারী তখনও বোঝেনি কেন করালীর এই আপত্তি। নিত্য তারা তাদের কৃষি শ্রমিকদের এভাবেই ডাকা হয়। তাই করালীর কথা—'মুরুব্বির কাছে উ সব তো অন্যায় লাগবে না, উসব ওদের গা-সওয়া হয়ে গেয়েছে।' (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বনওয়ারী যে পর্যন্ত এসেছে—করালী তার চেয়ে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে। এর কারণ কৃষি-শ্রমের বৃত্ত ও বৃত্তিকে সে অস্বীকার করেছে।

বনওয়ারীর পুত্রহীনতার জন্য গভীর বেদনাবোধ প্রকাশ করেছেন তারাশঙ্কর। এর পিছনে কারণ সামান্য হলেও নৈতিক। বনওয়ারী যখন কর্তার চড়কপাটায় শুয়ে মূল ভক্ত হবার কথা ঘোষণা করে, সমস্ত কাহার সমাজ একই সঙ্গে সন্ত্রস্ত ও গৌরবান্বিত হয়েছে। নীলকুঠির আমলে 'গণ্ডার কাহার' এরকম চড়কপাটায় শুয়েছিল। এবার দ্বিতীয় বারের জন্য কাহার পাড়ায় চড়কের পাটা নামল। রীতিমতো গৌরবের কথা। কিন্তু গণ্ডার কাহার 'দশাশয়ী পেরকাণ্ড চেহারা'র মানুষ, কাহারদের মাতব্বর—তার 'বংশ' নেই। কাহারদের লোকসংস্কৃতিতে এর কারণ বিশ্লেষিত হয়েছে। 'গণ্ডার সেবার চেপেছিল চড়কের পাটায়। মদ খেয়ে পাটায় চড়েছিল বলে বংশটাই শেষ করে দিয়েছিল বাবাঠাকুর।' (৩য় পর্ব, এক

পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীর আচরণ সাধারণভাবে সংযত, নীতি নিষ্ঠায় কোনো ত্রুটি কেউ দেখাতে পারে না। কিন্তু মনে মনে সে জানে তার ত্রুটি—কর্ত্তা বাবার আসনে প্রদীপ দিতে এসে আদিম জৈবিক আকর্ষণ সে উপেক্ষা করতে পারেনি। কালোশশীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। করালীর অন্যায়কে সে প্রশ্রয় দিয়েছে। কর্তার বাহনটিকে হত্যা করেছে করালী, নয়ানের বিবাহিত বউ পাখির সঙ্গে রীতিসম্মত 'ছাড়বিড়' হবার আগেই করালীর সঙ্গে সাঙা-র অনুমতি দিয়েছে বনওয়ারী। এ-নিয়ে মাঝে মাঝে বাসিনী বউ তীব্র অভিশাপ দিয়েছে বনওয়ারীকে। বনওয়ারীর নেতৃত্ব অবশ্যই প্রশ্নহীন আনুগত্যের নয়—তবে খুব কম সময়ই তাকে অসমর্থন করেছে কাহার সমাজ। নৈতিক প্রশ্নে বাইরের সমালোচনা অপেক্ষা আত্মদীর্ণ হয়েই বিধুর হয়েছে বনওয়ারী। গণ্ডার কাহারের অপরাধ বাহ্যত স্পষ্ট—বনওয়ারীর ত্রুটি তার মনের মধ্যেই তোলাপড়া হয়েছে।

করালীর প্রতি পুত্র স্নেহ বোধ বনওয়ারীর মনের একটি স্তরকে স্পষ্ট করে। তার ইচ্ছা করালীকে পুত্র হিসাবে 'কোলগত করে নেয়'। (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) 'তার পুত্ত-সন্তান নাই। ডান হাত থেকে বঞ্চিত করেছেন ভগবান। বনওয়ারীর ইচ্ছে, বিধাতা যা তাকে দেন নাই—নিজের কর্মফলের জন্যে—সে তা এই পৃথিবীতে অর্জন করে!' (ঐ) ভাবনাটি হাহাকার ভরা। বনওয়ারীর ইচ্ছা করালীকে স্নেহ দিয়ে, 'কোলগত' করে রেখে 'অনুগত' করে শেষ পর্যন্ত 'মাতব্বর করে যাবে পাড়ার'। (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কাজটা কঠিন ছিল। করালীও প্রথম প্রথম বনওয়ারীকে মানলেও শেষ পর্যন্ত তার সামাজিক বৃত্ত অতিক্রম করে গেছে। করালীর প্রতি বনওয়ারীর সংঘাত তাই শুধু প্রজন্ম-ব্যবধানের দ্বন্দ্ব নয়—এর পিছনে আছে প্রতিহত স্নেহবৃত্তির টানাপোড়েনও।

সুবাসীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে বনওয়ারীর যুক্তিগুলি বোঝা যায়। (১) সুবাসী কালোশশীর বোনঝি। দেখতেও একই রকম। এমনকি শান্ত মুখচোরা গোপালীবালাও জানে—'ইউ সি' বলছে সুবাসীকে বিয়ে করার মূল কারণ তাকে দেখতে কালোশশীর মতোই। রঙের খেলার সাথীকে জন্মান্তরেও ভুলতে পারে নি বনওয়ারী। এ হল তার চরিত্রের আবেগাত্মক দিক।

(২) এই বিয়ে এক অর্থে আটপৌরে আর কাহারদের বড় অংশ (কোশকেঁধে—যাদের সাধারণ নাম) মধ্যে মিলন ঘটার প্রতীকী ঘটনা। এধরনের বিয়ে যাকে বলা যেতে পারে ethnic marriage, তাতে মোড়ল-মাতব্বরের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। এইখানে যুক্তিটি সামাজিক। এখানে আবেগের ভূমিকা কম।

(৩) বনওয়ারী অপুত্রক। গোপালী বন্ধ্যা কিনা তা বলা হয়নি, কিন্তু তার বয়স গেছে। সন্তান লাভের ইচ্ছায় গোপালী থাকা সত্ত্বেও সুবাসীকে বিয়ে করতে হল বনওয়ারীকে। এই যুক্তি বংশধারা রক্ষায় উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে মনের আবেগ আর পরিবার গঠনের চিরকালের যুক্তি।

উক্ত বিবাহের অন্য আর একটি যুক্তি ভেবে নিতে পারি। সাধারণত কাহার-নারীরা সতীনকে সহ্য করতে চায় না। তাদের সমাজ একটু স্বেচ্ছাবিহারী নারীদের প্রকৃতিকে স্বীকার করেছে। 'অঙে'র খেলাকে তারা প্রাধান্য দেয়। সমাজের ভয়ে মনের ভাব গোপন করে না তারা। এইজন্য কাহার মেয়েরা সতীন সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চায়। বনওয়ারী ব্যতিক্রম। এক-পত্নীক পরম, দ্বি-পত্নীক বনওয়ারীকে মনে হয় নারীর অপ্রতিরোধ্য প্রাকৃতিকতাকে অস্বীকার করার রীতির দিকে একটু এগিয়ে যাওয়া। বনওয়ারীকে তাই মনে

হয় নতুন যুগের প্রতিনিধি—culture hero. স্বেচ্ছাবিহারী নারীকে পরিবারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার রীতি প্রতিষ্ঠা করল বনওয়ারী। রীতিটি নতুন। প্রবল নারী প্রাধান্যের প্রতিক্রিয়ায় প্রবল পুরুষ প্রাধান্যের সূচনা হিসাবে সমাজ বিকাশের একটি প্রান্তবিন্দু।

বনওয়ারী কতকটা যেন স্বার্থপর। নয়ানের মা বাসিনী বউ। ঘরভাঙাদের মাতব্বরির সময় বাসিনী বউয়ের পা জড়িয়ে ধরে প্রার্থনারত থাকত নাকি বনওয়ারী। সামান্য লোকশ্রুতি আছে এ ব্যাপারে। সুচাঁদ বলেছে : ' নয়ানের মায়ের সঙ্গে তোর গুজু-গুজু আর কেউ না জানুক আমি জানি। লদীর ধারে একদিন উয়োর পায়ে ধরেছিলি, আমি দেখেছিলাম।' (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) বিষয়টি নিয়ে তারাশঙ্কর খুব অগ্রসর হননি—বিস্তারেও যান নি। কেবল 'সুচাঁদের কাহিনীও সত্য'-জাতীয় বাক্যার্ধ ব্যবহার করে বনওয়ারীর লজ্জাবোধ প্রকাশ করেছেন। নয়ানের পিতা দাঁতাল কুঞ্জ যখন 'চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে' ঘুরত—তখন ঈর্ষা করত সে। 'বনওয়ারী ছিল কুঞ্জের বন্ধু, কিন্তু তাকে ঈর্ষা না করে পারত না।' (ঐ) এসময় 'বনওয়ারী প্রতারণা করেছিল নয়ানের মার সঙ্গে।' (ঐ) নয়ানের মা বিষয়টি স্মরণে রেখেছিল কিনা কে জানে। তার তীব্র বিস্বাদ ও লালিত্যহীন ভাষা, কোন্দলের নিরতিশয় বিকার—উপন্যাসে একটি বেদনাদীর্ণ পরিণতির রূপ প্রদর্শিত করেছে। সেই বিষাদ ও বিস্বাদই প্রধান হয়েছে।

বনওয়ারীর লজ্জাবোধ এরপরও অল্পবিস্তর থেকে গেছে। নয়ানের প্রতি অন্যায় আর বাসিনী বউয়ের প্রতি অন্যায়—এই দুটি তার ইচ্ছাকৃত হলে বনওয়ারীকে কূট চরিত্রের মানুষ বলতে হবে। এই দুটি অভিঘাতে ঘরভাঙাদের মাতব্বরির সম্ভাবনার মূলোৎপাটন হয়েছে। অন্যদিকে ভাঁজোর দিনে বনওয়ারী বাসিনী বউকে তার সঙ্গে নাচার জন্য আহ্বান করার সময় সমবেদনাপূর্ণ মানসিকতার পরিচয়ই লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন : 'হঠাৎ তার নজরে পড়ল ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে নয়ানের মা। বড় মায়া হল তার উপর। আহা, সব হারিয়ে নিরানন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।...সে এগিয়ে গিয়ে ধরলে তার হাত! বললে—এস তুমি আমি আগে নাচব।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) ভাঁজো—আনন্দের উৎসব। শরতের স্বচ্ছতা চারপাশে—এদিন নরনারীর মিলনে কোন বাধা বন্ধন থাকে না। এদিনকার প্রস্তাব কেউ সাধারণত অস্বীকার করে না। তা সত্ত্বেও 'বনওয়ারীর হাত ছাড়িয়ে' ছুটে গেল বাসিনী বউ। তার মধ্যে তখন প্রেম বা আনন্দ নয়—বড় হল পুত্রস্নেহ আর নয়নকে হারাবার চরম বেদনা। 'গোটা কাহারপাড়াকে অভিসম্পাত' দিতে থাকল সে।

বনওয়ারীকে তারাশঙ্কর নায়ক হিসাবে গড়ে তুলতে চান। তার বীরত্বব্যঞ্জক ব্যবহার, ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ আর সর্বরিক্ত একাকীত্ব উপন্যাসের শেষ দিকে স্পষ্ট করেছেন তারাশঙ্কর। করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলার সময় পাখির ভয় ছিল—'তাকে আজ এই মুহূর্তে সে কখনই রেহাই দেবে না। ধর্ম সমাজ কিছু মানবে না।' (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) আদি সাহিত্য তথা মহাকাব্যের এরকমই চলন। নারী আর ভূমিকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব সেখানে—অবারিত উদ্দাম। বৃহৎ ও মহতের এক উল্লাসপূর্ণ জীবনের কাহিনী মহাকাব্যে ধরা পড়ে। বনওয়ারীর মধ্যে তেমনি উপাদান ধরা পড়ে। 'কাহার পাড়ার শ্রেষ্ঠ পুরুষ' বনওয়ারী যখন পরাজিত—'বাবাঠাকুরের পরিত্যক্ত স্থানটিতে 'অরণ্য বানরের মতো' হাহাকার করে, তখন পাঠকের মনে নির্বেদ জাগে। এই হল মহাকাব্যের অঙ্গীরস। বিশেষত তারাশঙ্কর কাহারপাড়ার প্রতিবেশে বনওয়ারীর অচেতন হয়ে পড়ে থাকার যে বিবরণ দিয়েছেন সেখানে মহাকাব্যিক কল্পনাশক্তির পরিচয় স্পষ্ট। মাদুলী খুঁজতে গেল বনওয়ারী—নেই! কবচকুণ্ডলহীন কর্ণের

মতো অবচেতনের রহস্যে মৃত্যু-চিহ্নিত হেমন্ত রাত্রের শীতার্ত আচ্ছন্নতায় বনওয়ারী শুয়ে পড়ল। তার চারপাশে অস্পষ্ট কুয়াশা—'হেমন্তের শেষ রাত্রে কোপাইয়েব জলের বুকে শরতের হালকা সাদা মেঘের মত কুয়াশা জেগে উঠেছে'; 'চরভূমিতেও' কদিন আগে হওয়া ভয়াবহ 'সাইক্লোনের প্রচণ্ড বর্ষণসিক্ত গলিত পত্রজঞ্জাল ভরা' মাটি থেকেও জেগে উঠেছে 'কুয়াশার এক-একটা পুঞ্জ'। বনওয়ারী এই প্রাকৃতিক রহস্যালোকে হারিয়ে গেল। 'তেমনি একটি কুয়াশার আস্তরণ হাঁসুলীবাঁকের বীর কোশকেঁধে বনওয়ারীর বিশাল দেহখানিকে ঘিরে ক্রমশ জেগে উঠতে লাগল।' (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) এই রহস্যালোকে অবগাহন করে বনওয়ারী একটি চলে যাওয়া সময়ের চিহ্ন হয়ে তারাশঙ্করের দরদী কলমে ধরা পড়েছে।

শেষ পর্বে বনওয়ারীর কথাবার্তায় আদর্শ যতটা স্পষ্ট আচরণের বিস্ময় ততদূর লক্ষিত হয় না। ষাটদিন শয্যাশায়ী থাকার পর বনওয়ারী সুস্থ হয়ে উঠেছে। নসুবালার কথায় ইঙ্গিতে বুঝেছে রমণ পালিয়েছে, সুবাসীও তাকে ছেড়ে—সংসার ছারে খারে দিয়ে করালীকে নিয়ে সংসার পেতেছে। বনওয়ারীর খেদ—'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তার বেঁচে লাভ কি?' তার হাহাকার পাঠককে স্পর্শ করে। বাঁশ কাটা হয়েছে বাঁশবাদিতে—হাঁসুলীবাঁকের চিরকালের অন্ধকার দূর হয়েছে—আলো এসে চোখে লাগে। আধুনিকের এই প্রসারিত অভিঘাত থেকেই বনওয়ারী বাঁশবাদিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। পারে নি।

পাগল কাহারকে নির্দেশ দেয় বনওয়ারী—কোপাইয়ের কূলে তাকে যেন অন্তর্জলি দেওয়া হয়। তারাশঙ্কর এখানে বনওয়ারীকে আদর্শায়িত করতে চেয়েছেন। কাঁদড়া গ্রামের পথে দুপুরে গাছতলার ঠেস দেওয়া এক 'জাতহারা' বোষ্টম—চলেছিল কাটোয়ার দিকে। তাকে গঙ্গায় নিয়ে এসে বনওয়ারী প্রশ্ন করেছিল কেমন করে বুঝলেন, দিন শেষ? সেই বোষ্টম-বাবা তাবে বলেছিল : ...'আমাব বাইরের নেশা ছুটছে ভাই। আমি ভিতরের মনের কথা শুনতে পেছি রে। বলছে—আমি যাব।' বনওয়ারীও তেমনি ডাক শুনেছিল—তাকে মা-কোপাইয়ের কূলে এনেছিল নসু আর পাগল। করালী 'পাকা শাল কাঠ আর ঘি' এনে চিতা সাজিয়ে—পুত্রের মতোই বলেছিল : 'যাও, চলে যাও সগ্‌গে।' বনওয়ারীর এই শেষ যাত্রা—উচ্চবর্গের হিন্দু সমাজের মৃতাশৌচের আদলে তৈরি হল। সমর্থ-পঞ্চম সে, এমনই হবার কথা।

হাঁসুলীবাঁকের প্রাণ এর নারী সমাজ। তাদের নাকি প্রাকৃতিক instinct প্রধান; চরিত্র তাদের নেই। সভ্যতার যে পর্যায় পার হলে প্রকৃতি (nature) উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হয়—যে সংস্কার (culture) আয়ত্ত করতে পারে নারীরা—হাঁসুলীবাঁকের মেয়েরা তেমনি কোনো সভ্যতার সীমায় প্রবিষ্ট হয়নি। তারাশঙ্করের সূত্র তারা ঠিক যেন কোপাই নদী। কোপাইয়ের দুকূলপ্লাবী হড়পা বান আসে। এদের জীবনেও আসে আবেগের উৎসার। যখন আসে আবেগ, তখন তাকে লুকোতে এরা শেখেনি। 'কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে' 'সাক্ষাৎ ডাকিনী' হয়ে পড়ে তারা। বিশেষত প্রণয়াবেগের সময়। প্রণয়াবেগকে তারা বলে 'অঙ' 'অঙের খেলা'। সুচাঁদ এই কাহার সমাজের লোক-স্মৃতির আগার। তার ঝুলিতে এমন কত বিচিত্র 'অঙের খেলা'র কাহিনী জমে আছে। 'রঙই বটে। গাঢ় লাল রঙ। এক ফোঁটার ছোঁয়াতে অন্যরঙের চেহারা পাল্টে দেয়।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এ-হল প্রেম—'ভালবাসা'। 'সে ভালবাসা লজ্জা বল, ভয় বল, পাড়া পড়শীর ঘৃণা বল, কোন কিছুর জন্যই ঢাকতে জানে না কাহারেরা।' (ঐ) এই হল কাহারদের নারী চরিত্র।

ভালোবাসার দুটি প্রান্ত—পুরুষ আর নারী। পুরুষদের কথাও হাঁসুলীবাঁকে কিছু আছে। প্রেমের মানুষ তাদের—সবাই কাহারপল্লীর সদস্য, এমনও নয়। পরমের প্রণয়িনী এক মুচি মেয়ে 'নফর দাসের বোন'—পানুর প্রণয়িনী অন্য পাড়ায় থাকে। ভিন্ন সমাজের পুরুষদের ভালোবেসে কাহার মেয়েরা ঘর ছাড়ে। কখনো কলমা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়। করালীর মা যেমন। চিরকালের জন্য ছেড়েছে কাহার সমাজ। বৈষ্ণব রাজমিস্ত্রির সঙ্গে অঙের সম্পর্ক হবার পর পাগলের মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। সে অবশ্য অন্য কোথাও যায় নি। বিশেষ করে কাহার মেয়েদের সঙ্গে সম্পর্ক হয় ভদ্র লোকদের বাড়ির তরুণদের। এ কাহারদের 'শাক ঢাকা মাছ'। জানে শোনে সবাই—বেশি উচ্চ বাচ্য করে না। বন্যার সময়—সবাই আশ্রয় নিয়েছিল গাছে। 'নিমতেলে পানুর ঠাকুরদাদার বাবার তৃতীয় পক্ষের পরিবার রঙ লাগালে আটপৌরেদের পরমের কত্তাবাবার সঙ্গে।'—এ হল সুচাঁদের উপকথা। পরমের কত্তাবাবা তখন তরুণ—ছোকরা বয়স ; 'ছুঁড়ীরও তখন অল্প বয়েস, বুড়ো স্বামী—ইংলি-বিংলি সতীন পোর ঝাঁক'—ছেড়ে চলে গেল, জলে জলময় অবস্থায়, এ গাছ থেকে অন্য গাছে। 'ওই গাছের উপর বসেই চোখে চোখে অঙ খেললে'—ওরা। (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এসব ক্ষেত্রে নৈতিকতা, পরিবার-সংগঠনের রীতি, সংযম, কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একমুখী জলের স্রোত যেন—নদী প্রবাহ। তারাশঙ্কর ঠিকই লিখেছেন—'কোপাই নদী ঠিক যেন কাহার কন্যে।' বিপরীতভাবে বলা যায় 'কাহার কন্যে ঠিক যেন কোপাই নদী।'

তবু, এর মধ্যেও নারীসত্তার অপূর্ব বিস্ফার লক্ষ করি। হাঁসুলীবাঁকের নারীরা এই আদিম রহস্যময় আবেষ্টমীতেও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তারাশঙ্করের দরদী কলম, জীবন অভিজ্ঞতার অপার সীমানায় খেলে যায় তারা—তাদের একমুখী ব্যবহারও তখন অপরূপের উন্মোচনে ঝলসিতও হয়ে ওঠে। পাখির মা বসন্তের কথা একসময় কাহারদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিল। তাকে নিয়ে 'পালাগান হয়ে গিয়েছে'—একদা। গান বেঁধেছিল লোকে, 'ও—বসন্তের অঙের কথা শোন।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) চৌধুরীদের বাড়ির ছেলেকে ভালোবেসেছিল বসন্ত। পাখি সেই ভালোবাসার ফল। পাখি যখন গর্ভে তখন এক অথর্ব খোঁড়া কাহারকে পাখির পিতৃত্বের দায়িত্ব দিয়ে বসন্তের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। পাখির রূপ কিন্তু চৌধুরীদের তরুণটির মতোই। সেই প্রেমের স্মৃতি বসনের সারাজীবন ধরে আচার ব্যবহারকে প্রভাবিত করেছে। কালের নিয়মে রঙ ঘুচে গেছে চৌধুরীর। বিয়ে হয়েছে। সেই সদগোপ গৃহিণী বিন্দুমাত্র পছন্দ করে না বসনকে। তবু বসন চৌধুরী বাড়িতে যায়। কাজকর্ম করে আসে—মজুরি নেয় না। দিয়ে আসে দুধ—দাম চায় না! বসনের রঙ চৌধুরীর মতো হালকা ছিল না—গাঢ়ই ছিল। চৌধুরী মারা যাবার পর বসন একেবারে ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ের মতোই—বিধবার মতো করে কাটিয়েছে বাকি জীবন। 'চিরকালের ভাল মানুষ'—বসন্ত। 'কাহারপাড়ার বিচিত্র মেয়ে বসন্ত।' (শেষ পর্ব) তার প্রেম পদ্মকলির স্বভাব—'উদয়াস্ত সূর্যের দিকেই চেয়ে থাকে'—চৌধুরীদের ঐ ছেলের 'দিকেই ছিল মন প্রাণ চোখ সব।' সেই প্রেমিকের মৃত্যুর পর 'সৎজাতের গৃহস্থ ঘরের বিধবার মত'।

সুচাঁদ চলে গেছে চন্দনপুর—নাতিন জামাই করালীর সংসারে। পা ভেঙে কিছুদিন থেকেছে হাসপাতালে। পাখি করালীর সংসারে সতীন সুবাসীকে সহ্য করেনি—ফিরে এসে আত্মহত্যা করেছে। বসন্ত এরপর চৌধুরীদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। 'এটোকাঁটার প্রসাদ খায়'। 'আর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় পড়ে থাকে'। বসন্তের অবস্থা অনেকটাই যেন নাচনীদের মতো। পুরুলিয়ার নাচনীরা রসিকদের ভালোবেসে আসে—সংসারে সসম্মান সদস্য তারা নয়। মৃত্যুর অপেক্ষা

করা ছাড়া তাদেরও বিশেষ কিছু করার থাকে না। তারাশঙ্কর এই শ্রেণীর আর এক নারীকে এনেছেন তাঁর উপন্যাস সাহিত্যে। *কবি*-র কথা বলছি। সেই নারী ব্যক্তিত্বময়ী ; তার ব্যবহার হাঁসুলীবাঁকের বসনের মত নয়। তবে নামটিতে মিল আছে।

বসন্ত অত্যন্ত কোমল-স্বভাব। পাখি করালীকে ভালবাসে—তার আগে হেঁপো রুগী নয়ানের ঘর ছেড়ে এসে উঠেছিল বসনের কাছে। বসন তাকে প্রসাধিত করে দিত, করালীর সঙ্গে মিলিত হবার ব্যাপারে ছিল সস্নেহ প্রশ্রয়। সুচাঁদ মাঝে মাঝে আসর জমিয়ে তাকে কে খেতে দেবে বলে চিৎকার করলে স্বল্প ও মৃদুভাষী বসন্ত এসে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। করালী কোঠাবাড়ি গড়তে চাইলে সম্ভব মতো বাধা দেয়; তার বিচিত্র ধার করার কথা শুনে ভয় পায় প্রচণ্ড। অসুস্থ বনওয়ারি-র কাছে খবরটা দেবার চেষ্টা করে। বসন্ত স্নেহার্দ্র, মৃদুভাষী—চৌধুরীর ছেলেটিকে সে কেবল ভালোই বাসেনি, হয়ে উঠতে চেয়েছে সত্যিকার সৎজাতের মতোই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখক সত্তা এইভাবে কাহার-সমাজের instinct আর মানবিক সংস্কৃতি বা culture-এর মিশ্রণে গড়ে তুলেছেন বসন্তকে। তার প্রেম একদা বিখ্যাত হয়েছিল। সে হয়তো উপন্যাসের কথা-শরীর সূচনার আগেকার কথা। একটি পালাগানের একটি মাত্র পংক্তি হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু সেই বিখ্যাত রঙের খেলা তার জীবনকে কেমন বর্ণিল করেছিল, তার পরিচয় তার চরিত্র-ব্যাখ্যানে স্পষ্ট হয়।

বাসিনী বউ হাঁসুলীবাঁকের আর একটি চরিত্র। ঘরভাঙাদের বংশের শেষ প্রদীপ—নয়ান, বাসিনী বউ তার মা। নিঃস্ব রিক্ত নারী বাসিনী। স্বামী সংসার নেই—একমাত্র পুত্র অসুস্থ। নয়ানের 'বিয়োলো' বউ পাখি, তাকে ছেড়ে করালীকে বিয়ে করছে। এই বিয়ে কাহারদের রীতি নিয়মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। রীতি হল এসব ক্ষেত্রে বিয়ে ভাঙতে হয়—'ছাড়বিড়' করতে হয়, তারপর 'সাঙা' বা দ্বিতীয় বিয়ে হতে পারে। বনওয়ারী সেই রীতি অমান্য করেছে। বাসিনী বউ-এর শেষ অস্ত্র তীব্র হাহাকার, অভিসম্পাত আর কোন্দল পরায়ণতা। তার খর-জিহ্বায় যাকে পারে তাকেই আক্রমণ করে। 'একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে আর একজনের ঘর গড়ার নাম মাতব্বরি'—নয়। এই তার অভিযোগ। (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) ঘরভাঙাদের পূর্ব গৌরব এখন নেই। অথচ এক সময় ঘরভাঙারাই ছিল মাতব্বর—তখন তামাম বাঁশবাদির কাহাররা এই ঘরে এসে বসে থাকত—প্রার্থী হয়ে। ('এই বাড়ির উঠোনে উবু হয়ে বসে লোকের বাপ-ঠাকুরের হাঁটুতে পাছায় কড়া পড়েছে।') এই অহঙ্কার তার। আর তার পাশে এই ভয়ঙ্কর বাস্তব। বাসিনী বউ-এর মধ্যে ব্যাহত মাতৃত্ব আর প্রতিহত নারীত্বের উপাদান একাকার। একসময় সে ছিল 'মাতব্বরের পরিবার'। নয়ানের বাবা—কত্তাবাবার হাঁকডাক বিক্রম ছিল দেখার মত। 'অহঙ্কার' ছিল সব থেকে বেশি। 'সে অহঙ্কার ভেঙে গেল যখন তখন থেকে সে অত্যন্ত কটূভাষিণী।' (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

বিশেষ করে বনওয়ারীর উপর তার ক্ষোভের কারণ যথেষ্ট। আজ সে নয়ানের বিবাহিত স্ত্রী পাখিকে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এক সময় সে বাসিনী বউ-এর পা ধরে অনুরোধ করেছিল—সে তো সুচাঁদের চোখে দেখা। তার কথা : 'লয়ানের মায়ের সঙ্গে তোর গুজু-গুজু আর কেউ না জানুক আমি জানি। লদীর ধারে একদিন উয়োর পায়ে ধরেছিলি, আমি দেখেছিলাম।' (২য় পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) এই ইতিহাস স্পষ্ট বিস্তৃত করে লেখেন নি তারাশঙ্কর। নয়ানের বাবা দাঁতাল কুঞ্জকে ঈর্ষা করত যুবক বনওয়ারী, 'সেই

সময় বনওয়ারী নাকি 'প্রতারণা করেছিল নয়ানের মার সঙ্গে।' (ঐ) নয়ানের মা সে-কথা ভোলে নি। তার যুক্তি—কোশকেঁধেরা চিরকাল ঘরভাঙাদের শত্রু। আর বনওয়ারী যখন ধর্ম কথা শোনায়, প্রতিজ্ঞা ('পিতিজ্ঞে') করে—নয়ানকে সাঙা দেবে সে, বিশ্বাস করে না। উল্টে জিজ্ঞাসা করে—'মনে আছে? পায়ে ধরেছিলে নদীর ধারে'। বনওয়ারীর হাত চেপে ধরে সে। ভীত দুর্বল হয়ে বনওয়ারী কোনক্রমে বাসিনী বউ-এর কাছ থেকে মুক্তি পায়। বস্তুত, বাসিনীর এই প্রতিহত অহঙ্কার আর বাস্তব সব-হারানো পরিস্থিতি তার চরিত্রটিকে একমুখী কটূভাষী প্রতিহিংসাপরায়ণ করেছে।

নয়ান যেদিন মারা গেল, পঞ্চায়েতের সবাইকে চিৎকার করে ডাকে বাসিনী বউ। নয়ানকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয় কাহারদের মজলিশের ওখানে। তখন রাত্রিকাল। 'কাহারপাড়া নয়ানকে ঘিরে বসে' থাকল—আলো নেই। যুদ্ধের সময়—কেরসিন তেলের অভাব চূড়ান্ত। 'হঠাৎ আলোটা নিবে গেল। তেল নেই আর।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) 'নয়ানের বুকে হাত দিয়ে তার মা বসে কাঁদছে।' বুক থামলে জানান দেবে চিৎকার করে। পাগল গান শোনায়—

অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে!

এই প্রথম, কোশকেঁধে আর আটপৌরেরা একসঙ্গে শ্মশান যাত্রা করবে। আজ বাসিনী বউ স্তব্ধ—'সব অভিসম্পাত আজ নীরব হয়ে গিয়েছে। নিভে গিয়েছে তার সব তেজের আগুন।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) বাসিনী বউকে পুত্রশোকের সুতীব্র বেদনায় মুড়ে দিলেও তার চরিত্রটিকে তারাশঙ্কর বদল করেন নি।

ভাঁজোর দিন—যে যার সঙ্গে চায় রঙের নেশায় মাতে। বনওয়ারীর সামনেই গোপালীবালাকে নিয়ে নাচ করেছে পাগল। বনওয়ারী বাসিনী বউয়ের নিঃস্ব রিক্ত মানসিকতাকে সমবেদনার সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করেছিল। তার প্রস্তাব ছিল—'এস তুমি আমি আগে নাচব।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) বাসিনী বউ কিছুতেই ভোলে নি তার পুত্রকে। 'কাল গিয়েছে জিতে যষ্টি! আজ কি নয়ানের মা নয়ানকে ভুলতে পারে?' মনে পড়ে তার। বনওয়ারীর হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে যায় নিজের ঘরের দিকে। ডাকে নয়ানকে। 'ফিরে আয়, সবাই নাচছে, তুই নাই শুধু। ফিরি আয়।' (ঐ) এই তীব্র বেদনার হাহাকার দিয়েই মোড়া বাসিনী বউ চরিত্রটি।

একদিক থেকে দেখলে বাসিনী বউ উপন্যাসের মূল সুরটির সঙ্গে মিশে আছে। একটি জনগোষ্ঠীর সব হারানোর কাহিনী হাঁসুলীবাঁকের উপকথা। সেই বড় Set-এর মধ্যে ঘরভাঙাদের উৎসন্ন হবার কাহিনী—Subset হিসাবেই গণনীয়। কাহার সমাজের সব হারানোর বেদনার সুরটি নয়ানের মায়ের হাহাকারের তীব্রতা দিয়ে বুঝে নিতে হয়।

বাসিনী বউ-এর মৃত্যুর বর্ণনা তারাশঙ্করের রচনাশৈলীর উচ্চস্তরের পরিচয় বহন করে। বনওয়ারী তখন অসুস্থ। করালীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। বাসিনী বউ-এর মৃত্যুর কথা বলেছে নসুবালা। গত নবান্নের সময়—'নয়ানের মা জাঙলে সদগোপ মহাশয়দের চার বাড়িতে আকণ্ঠ খেয়েছিল এঁটোকাঁটা। তারপর 'দমবন্ধ হয়ে হাঁসফাঁস করে' মারা গেছে! (শেষ পর্ব)। নড়তে পারে নি, কথা বলতে পারেনি—'স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে মরেছে।' নসুর পক্ষে যতটা সম্ভব—তাকে সাহায্য সে করেছে। মুখে জল দিয়েছে। খেয়েছে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে গেছে জল। সেবার কাহারপাড়ায় নবান্ন হবার কোন কারণ ছিল না। জাঙলের সদ্‌গোপ-রা সামন্ততন্ত্রের সব

রীতি নিয়ম ভেঙে দিয়েছে তখন। কাহারপাড়া উৎসন্নে গেছে। এসময় ঘরভাঙাদের বাড়ির বউ—একদা যারা মোড়ল মাতব্বর ছিল, তাদের গরবিনি বউ, এঁটোকাঁটা খেয়ে মারা গেল! কৃষি শ্রমিকদের উপর শেষ ধাক্কা হিসাবে এই প্রতীক-প্রায় ঘটনাটিকে দেখা সম্ভব। কাহার সমাজের সঙ্গে চৌধুরী-ঘোষ পরিবারগুলির নিবিড় বন্ধন ছিল একদা। হাঁসুলীবাঁকের পলেন আর দয়েম জমিতে উৎপন্ন হত ধান—সেই ধান্যলক্ষ্মী নিঃশেষিত হয়েছে প্রকৃতির প্রবল অকরুণ ধাক্কায়; কৃষি শ্রমিকদের সঙ্গে পুরোনো সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছে সদ্‌গোপ প্রভুরা। বাসিনী বউ-এর ভয়ঙ্কর মৃত্যু এক বিকৃত বীভৎস নবান্নের ফল হিসাবে প্রদর্শিত হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর আসলে কৃষক সমাজের পেলব-মাধুর্যের আড়ালে থাকা প্রকৃত সত্য।

গোপালীবালা বনওয়ারীর ঘরনি। সন্তানহীন। নম্র স্বভাব। তার লক্ষ্মীমন্ত স্বভাব, বিশেষ করে বনওয়ারীর গো-সম্পদ প্রতিপালন, দুধ-দোয়ানো আর সায়েবডাঙার জমি তৈরি করার সময় লক্ষ করা গেছে। নিস্তরঙ্গ এক নারী। কখনো কারো সঙ্গে উঁচু স্বরে কথা বলে না। বাড়ির 'চারসের' দুধকে 'কোপাইয়ের বালি-খোঁড়া পরিষ্কার জল মিশিয়ে বনওয়ারীর বউ পাঁচ সের' করে; দুধ যারা নিয়ে যায় চন্দনপুর—সাবি বেনোদা বলে : 'গেরস্তরা বলছে বেজায় জল দিছস দুধে। জল একটুকুন কমিয়ো কাকী।' গোপালীবালার সরল উত্তর : 'জল তো সেই এক মাপেই দি মা। বেশী তো দিই না।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) সরল মৃদুভাষী গোপালী।

কৃষিকর্মে গোপালী যার পর নাই সাহায্য করে। জমি কোপায় বনওয়ারী। সুচাঁদ ঝুড়ি ভরে মাটি ফেলে। সুচাঁদ কেনা শ্রমিক। 'নগদ চোদ্দ পয়সা' আর 'জল খাবারের মুড়ি' তার প্রাপ্য। গোপালীর নিজের জমির কাজ—'ছুটে ছুটে বইছে ঝুড়ি ভর্তি মাটি।' সুচাঁদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক ঝুড়ি ফেলে আসতে না আসতে দু-তিনটি 'ঝুড়ি ফেলে আসছে'। 'তার গরজের তুলনা' কারো সঙ্গেই চলে না। জল খাবার নিয়ে আসে গোপালী। বনওয়ারী খেয়ে সামান্য যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ রাখে পাতে—অন্যদিকে ঘুরে গোপালী তা খায়। সহধর্মিণী সহকর্মিণী গোপালী। শুধু কি শ্রম দান? গোপালীর নজর আছে সব দিকে। বাবুরা সায়েবডাঙার জমিতে পুকুরের পাঁক আর সার দিয়েছিল—বনওয়ারী তা পারে নি। 'গোপালীবালা পথে ঘাটে যেখানে যত গোবর দেখেছে, কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে জমির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পেশাদার কৃষি শ্রমিক কখনই এরকম করবে না। জানা কথা। 'বনওয়ারী ছাড়া কেউ জানে না' আর এক কাজ করেছে গোপালী—'মাঠে লোকজন না থাকলে, সে বাবুদের জমিতে নেমে পাঁকের ঢেলা তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে বনওয়ারীর জমিতে।' (ঐ) কাজটি অন্যের চোখে অন্যায় বোধ হতে পারে—বনওয়ারীর চোখে এতে অন্যায় নেই। তার সিদ্ধান্ত 'গোপালীবালা তার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।' [ঐ]

বনওয়ারী জানে গোপালীই তার বাড়ির লক্ষ্মী। আটপৌরে পাড়ার সঙ্গে 'করণ' শুরু হবার পর সুবাসীকে বিয়ে করার আগে পরে বনওয়ারী লক্ষ করে যতটা সরল বলে ভাবত গোপালীকে সে আদৌ ততটা সরল নয়। কালোশশী একসময় তাকে 'দেখে হাসত' 'মুখ টিপে টিপে।' আটপৌরেদের মেয়ে বলেই সুবাসীকে বিয়ে করেছে—একথা তাকে বোঝানো যাবে না। কারণটা গোপালী ঠিক জানে—'কালোশশীর বুনঝি' 'কালোশশীর মতন দেখতে শুনতে তাই সুবাসীকে ঘিরেই তার রঙ্গ-এর খেলার প্রসারিত ব্যবহার। গোপালী বলে—'ই-উ-সি (এ-ও-সে) পাঁচজনায়' বলাবলি করে এসব নিয়ে। আর তাছাড়া, যতই 'বোকা

হোক' গোপালী তো মেয়ে—'মেয়ে লোক ঠিক বুঝতে পারে'—এসব সম্পর্কের মায়া। (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) গোপালীবালা এই সংলাপের পর সহসা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যেন। তার চরিত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ পায়।

সুবাসীকে বিয়ে করতে যাবার আগে বনওয়ারীকে কিছুমাত্র আপত্তি জানায় নি গোপালী। তার কথা—'তা কর, সাঙা কর, আমি যাব না। তবে তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না। তোমার বেটা-ছেলে হোক, আমি মানুষ করব।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কিছুমাত্র স্বাভাবিক নয়। কাহার মেয়েরা 'সতীনের সঙ্গে ঘর' করে না কিছুতেই। কোনো কাহার পুরুষ যদি স্ত্রী থাকতে থাকতে অন্য বিয়ে করে, 'তবে স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শাঁখা আর নোয়া খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে স্বামীকে গাল দিতে দিতে চলে যায়—অন্য কোন কাহার-মরদের ঘরে গিয়ে ওঠে।' গোপালীবালা যেন ব্যতিক্রম। এরকম হবার কারণ তার চরিত্র ধর্মে। বনওয়ারী অনুভব করে—কালোশশীর মতো উদ্দাম স্রোত নেই গোপালীর। কালোশশী যদি কোপাই নদী হয় গোপালী 'নীলের বাঁধের জল'। নিস্তরঙ্গ—সাড়া নেই ধারা নেই চুপচাপ ঠাণ্ডা 'শেতল'। এই অস্তিত্ব বনওয়ারীর মনে দোলা দেয় না কিন্তু একে অস্বীকারও করতে পারে না।

অবন্ধনা স্বেচ্ছাবিহারী কাহার নারীদের স্বভাব গোপালীবালার ক্ষেত্রে বদলেছে। এর কারণটি বুঝে নেওয়া দরকার। কৃষিকর্মের বিকাশের সঙ্গে নারীকে পরিবারের দায়-দায়িত্ব নিয়ে ঘরোয়া হবার দাবি ক্রমশ বাড়তে থাকে। স্বামীকে 'ভাত দিতে হয় না', নিজেরাই 'খেটে খায়'—রূপ যৌবন আর 'গতরের' তথা 'পরিশ্রমের ক্ষমতা' তাদের আছে—এই পরিস্থিতি ক্রমেই বদলাতে থাকে। গোপালীবালা এই অবস্থার প্রান্তিক সীমানার চিহ্ন বলেই মনে হয়। তাই তাকে সম্ভবমতো আদর্শায়িত করেন তারাশঙ্কর।

বিয়েতে বের হবার সময় এল সংকট। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকল গোপালীবালা। বনওয়ারী প্রবল সংকটাপন্ন। পাগলকে বলল। পাগল অনেক ভেবে যে সমাধান দিল তা কাহার সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। তার প্রস্তাব গোপালীকে সাঙা করবে। ('গোপালী যদি আজী থাকে, তবে আমিও ওকে মাথায় করে আখব।') বনওয়ারীর মুখ থম থম করে। পাগল তাকে বোঝায়—এর চেয়ে সহজ সমাধান কিছু হতে পারে না। নতুন 'করণ' হবে আটপৌরেদের সঙ্গে, তার 'ছেলে পুলে ঘর-সংসার হবে, সাধ মিটবে' আর 'গোপালী-বউকেও সতীন নিয়ে ঘর করতে হবে না।' প্রস্তাবটি শোনার পর গোপালী মানে নি বলেছে—না। কেন যে কেঁদেওঠা, আর পাগলের প্রস্তাবে আপত্তি—বোঝা কঠিন। এজন্যই লিখেছি গোপালীকে তারাশঙ্কর খাদ্য-সংগ্রাহক, লুণ্ঠনজীবী অসংস্কৃত অরণ্য আদিম কাহার-সমাজের কৃষি-নির্ভর স্থায়ী সংস্কৃতিতে প্রবেশের একটি প্রতীক-চরিত্রে রূপান্তরিত করতে চান। বনওয়ারী যখন গোপালীকে বলে—'যদি অভাব অনটন পড়ে, লোক তোমার কাছে চেয়ে খাবে। তুমিই তো ঘরের গিন্নী, তুমিই তো লক্ষ্মী আমার, তোমার দৌলতেই তো সব। আমি তো ভিখিরি, খাঁটি, খাই।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ)—তখন বাংলার কৃষি-সংস্কৃতির একটি প্রত্ন-প্রতিমা (Archetypal Image) স্পষ্ট হয়। অন্নপূর্ণার কথা বলছি। বিশ্ব সংসারের অন্ন হরণ করার ক্ষমতা, ধারণ ও পূরণ করার ক্ষমতা তাঁর। বনওয়ারী যেন কৃষি-শ্রমিক 'শিবায়ন'-এর শিব। প্রকৃত বিবেচনায় এই প্রত্ন-প্রতিমা অবশ্য হাঁসুলীবাঁকে আপতিত হয়েছে তারাশঙ্করের হস্তক্ষেপেই। তিনি তাঁর সংস্কারকে আরোপ করেছেন—এমনও হতে পারে। তবে একমাত্র বনওয়ারীকে স্বামী বলে স্বীকার করা, ঘুণাক্ষরেও অন্য কারো প্রতি ভালোবাসা বা প্রণয় প্রদান (রঙের খেলা) গোপালীর নেই। বসন্তের মতোই সতীত্ব সংস্কার ও সেই

আদর্শ রক্ষার জন্য আন্তরিক সংঘর্ষ করার সক্ষমতা গোপালীর মধ্যে সঞ্চারিত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে সন্দেহ কি। তাই আক্ষিপ্ত হোক, আপতিত হোক—গোপালীকে কৃষিলক্ষ্মী অন্নপূর্ণা হিসাবে ভাবার পরিসর সামান্য তৈরি হয় বলেই মনে হয়।

সুবাসীকে বিয়ে করার জন্য বনওয়ারী যখন চলেছে—গোপালী কেঁদে উঠেছে, তখন কূটবুদ্ধি নিমতেলে পানু অদ্ভুত ভাবে সমস্যার সমাধান করেছে। আলাদা করে ডেকে এনেছে সে বনওয়ারীকে। বলেছে, 'দশ টাকা কাকীর হাতে দিয়ে তাকে বলুক বনওয়ারী—ঘর কর, সংসার কর, পাড়ায় ধার দাও, মহাজনী কর। তুমিই ঘরের আসল গিন্নী, যেমন ছিলে তেমনি রইলে'। মন্তব্য তার—'টাকাতে বলে পুত্তুশোক ভোলে, তা এ তো—।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বনওয়ারী 'গোপালীবালার দুই হাতের আঁজলা টেনে তার উপর ভ'রে ঢেলে দিয়েছিল'—এক কুড়ি টাকা। সে টাকা পেয়ে তার মন শান্ত হয়েছিল। আর একটুখানি আবদার জুড়ে দিয়ে বলেছিল 'দুটি সোনার কান ফুল'—চাই তার। বনওয়ারী সোনা একটু সস্তা হলেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার স্তোক দিয়েছিল। কথা রেখেছিল গোপালী—আর কোনো অশান্তি করে নি। 'ঘর-দুয়ার গরু বাছুর হাঁস মুরগী নিয়ে আছে, ঘুঁটে দিচ্ছে, গোবর কুড়িয়ে আনছে, ধান ভেনে চাষ করছে।' (৫ম পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) গোপালীবালার সন্তান হয়নি—বয়স গেছে, তাই কি সে এমন সহজ ভাবে শ্রম দান করে যায়? সুবাসীকে বিয়ে করতে যাবার আগে গোপালী যে বলেছিল : 'তোমার বেটা-ছেলে হোক, আমি মানুষ করব। তোমরা দুজনায় 'রামোদ-রাল্লাদ' করবা। আমি দেখব, হাসব।' তা হয়তো অনেকটাই ঠিক। তবে বনওয়ারী অনুভব করে—'গোপালী কেমন হয়ে গিয়েছে, সে কথা কয় না তেমন ভাল করে।' এই ক্ষীণ অভিমানের ঈঙ্গিত খুব স্পষ্ট করেন না তারাশঙ্কর, তবে বোঝা যায়।

গোপালীকে মদ খাইয়েছিল নিমতেলে পানু। আটপৌরে পাড়ায় সুবাসীর সঙ্গে বনওয়ারীর বিয়েতে যাবে সবাই, এসে বলেছিল—'একটি ঢোক মাল খাও খুড়ী এইবার। নাচতে হবে তোমাকে।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই প্রবল উৎসাহ অনেকটাই লোক-দেখানো হয়তো। টাকার নেশা আর মদের নেশা—জীবনে প্রাপ্য যা তা না পাবার দুঃখ সামান্য কিছুদিনের জন্য গোপালীকে আচ্ছন্ন রেখে থাকবে। ভাঁজো-র রাতে 'বয়সওয়ালা মেয়েরা' নাচে—'অঙের খেলা যার যা খুশি'—করার পরব, সুখের পরব। পাগল গিয়ে গোপালীকে ধরে আনে। তার সঙ্গে নাচতে হবে। 'গোপালীবালার নেশা ধরেছে' তখন, 'তবুও লাজুক মানুষ'—ক্রমাগত 'না না' বলে গেল। পাগল যে এক সময় তাকে সাঙা করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাই আজ মনে মনে লজ্জা পেল সে। 'মুখে অঙ ধরেছে লজ্জাতে।' (৫ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) অবচেতনের দোলা লাগল হয়তো। মাত্র এই একদিনই। সবাই বলল 'বলিহারি ভাই—বলিহারি ভাই!' কিন্তু গোপালীবালার এই যে অস্পষ্ট আত্মপ্রকাশ, তাও তার ক্ষীণ অভিমানের মতোই খুব স্পষ্ট হল না। তারাশঙ্কর ইঙ্গিতে সারলেন এই প্রসঙ্গও। ভাঁজোর পরই সামান্য কয়েকদিনের রোগ ভোগ করে মারা গেল গোপালীবালা। 'হঠাৎ তিন দিনের দিন' এই আকস্মিক মৃত্যু দেবরোষ ছাড়া হতে পারে না।

গোপালীবালার মৃত্যুর নানান ব্যাখ্যা যোজিত হতে থাকল। তাতে তার ভূমিকাটি বহুমাত্রিক বর্ণাঢ্য হয়ে উঠল মনে হয়। এসব ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে চরিত্রটি স্পষ্ট হতে থাকল। দেবরোষ যে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু গোপালীর মতো নিঃশত্রু সতী সাধ্বীর উপর দেবতার কোপ পড়বে কেন? কী দোষে? বাসিনী বউ-এর মন্তব্য : 'নয়ানের ঘর ভেঙে পাখির সঙ্গে করালীর বিয়ে দেওয়া' অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ—সেই দোষেই বনওয়ারীর ঘর

ভেঙে দিলেন সর্বশক্তিমান বাবা ঠাকুর। 'বাবা ঠাকুর ওরও পাতানো ঘর ভেঙে' দিয়েছেন! এ-ব্যাখ্যা সবার মনঃপুত হল না। কারণ স্বাভাবিক। বনওয়ারীর ঘর তো সত্যি সত্যি ভাঙে নি। গোপালী যাক সুবাসী তো আছে। পাল্টা যুক্তি বাসিনী বউ-এর : 'গোপালী বউ ছিল ভাগ্যবতী' তাই কলির পেথম সমজে'-তেই চলে গেল সে। সুচাঁদ এসে বলল, আসলে 'ছমাস সতীন-কাঁটার দুখ ভোগ' করতে চায় নি গোপালী—তাই তার মৃত্যু হয়েছে! এই ব্যাখ্যা কেউ আর অস্বীকার করতে পারে নি। নসুবালা এসে হাহাকার করতে থাকল : 'গোপালী কাকী আমার মাটির মানুষ, সোনার পিতিমে' তার মুখে ছিল 'অমিত্তি'-র কথা, সেকথা শুনে সবার 'পরাণ জুড়াত'। [৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ]

বনওয়ারী বিশ্বাস করত গোপালীর প্রেতাত্মা তার চারপাশে ঘুরে ফিরছে। শুধু গোপালী নয় কালোশশীও প্রেতিনী হয়েছে! গোপালীর সঙ্গে 'কুমকলসী'-র প্রসঙ্গ যুক্ত হয়ে বনওয়ারীর ভয় আরও বেড়েছিল। মৃত্যু-চেতনা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল এসময়। কাহার লোকবিশ্বাস—সতীসাধ্বী বউ, বিয়ের 'কুম কুলসী' বয়ে বেড়ায় স্বামীর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত। যখনই বোঝে স্বামীর মৃত্যু আসন্ন, সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় সেই কলসী। কান খাড়া করে থাকে বনওয়ারী। প্রতিবেশীদের ঘরে বাসন পড়ার শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভয় পায়। এই বুঝি গোপালী কুম কলসী ফেলে দিল! এই ভয়—একটি জনগোষ্ঠীর fear psychosis সন্দেহ নেই। গোপালীবালা এই সমাজের প্রাণ-প্রতিমা হয়েই থেকে গেছে।

গোপালীর শেষযাত্রায় একটা নতুন কাপড় দিতে পারে নি বনওয়ারী। রেশন—দুর্মূল্য—কালোবাজারি—যুদ্ধের এত সব চক্করে পড়ে গোপালীকে বনওয়ারী গ্রামের তাঁতীবাড়ি থেকে আনা গামছা পরিয়ে বিদায় করেছে। চার পাশে অজস্র সম্পদ—'হাতি ঠেলা ধান'—তার মাঝখানে কৃষি শ্রমিকদের গোষ্ঠীপতি গামছা পরিয়ে নিজের স্ত্রী-কে শেষ বিদায় দিতে বাধ্য হল, একেও প্রতীক হিসাবেই গণ্য করতে হচ্ছে। প্রতিষ্ঠার আগেই তার বিসর্জন হয়েছে। এরকমই হবার কথা। সমাজ ভেঙে গেছে। কৃষিক্ষেত্রের উপর নেমে এসেছে কালের অঙ্কুশ। এ পরিস্থিতিতে কৃষিলক্ষ্মী অন্নপূর্ণার বিসর্জন—প্রতিষ্ঠার আগেই বিসর্জন, এতো অনিবার্যই ছিল।

দ্বিতীয় বিয়ের পর পাগল গাজনে যে সঙ সেজেছিল তা বেশ মজাদার। নিজে সেজেছে মহাদেব, দু-পাশে দুটো ছেলেকে সাজিয়েছে দুর্গা আর গঙ্গা। একজন বয়সালো মেয়ে আর একজন যোবতী। বড়কী আর ছুটকী।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীকে নিয়ে এই তামাসা—সবারই ভালো লেগেছে, 'বনওয়ারীরও বেশ ভালই' লেগেছে। গোপালীর পাশে কালোশশী নয় সুবাসী। কালোশশীকে বিয়ে করতে পারে নি বনওয়ারী। অবহ্মনা সেই নারী। নদীর মতোই তার সাড়া আর ধারা—নদীর ভয়ঙ্কর রহস্যময় কালিদহে তার মৃত্যু। বনওয়ারীর জীবন-রহস্যের চাবিকাঠি কালোশশী। বনওয়ারীর প্রেমিকা কালোশশী।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় কালোশশী অত্যন্ত প্রভাবী চরিত্র। যতদিন বেঁচে ছিল বনওয়ারীকে প্রভাবিত করেছে। মৃত্যুর পরও বনওয়ারী তার প্রভাব সীমার বাইরে যেতে পারে নি। কাহার-সমাজের নারীদের মধ্যে যে স্বাধীন ভাবে চলাফেরার অধিকার বার বার লেখক দেখাতে চেয়েছেন, কালোশশী তার পূর্ণ প্রতিমা মনে হয়। বনওয়ারীকে যদি কৃষ্ণ-কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয় কালোশশীকে রাধার সঙ্গে তুলনীয় বলে মনে হয়। পরকীয়া প্রেমের এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি। তবে পুরাণ-প্রতিমাকে যেমন দূরত্বের বিস্ময় আর কালচিহ্নহীন অস্পষ্টতা—কালোশশীর ক্ষেত্রে তেমন দূরত্ব তো নেই। সে কাহার সমাজের

ধূলি মলিন পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছে। ফলে তাকে পবিত্র ভাবা কঠিন। আমৃত্যু সে বনওয়ারীর প্রেমিক সত্তাকে সুতীব্র ভাবে আকর্ষণ করেছে। ধর্ম-সমাজ-নীতি-সংযম একদিকে আর কালোশশী একদিকে। এই তীব্রতার কারণ কালোশশীর জৈবতা।

তারাশঙ্কর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় যে রহস্যালোক তৈরি করতে যান কালোশশী তার মধ্যে, আদিম জৈবতার সমস্ত উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছে যেন। বনওয়ারী স্পষ্ট বোঝে—'কালোশশীর মধ্যে নেশা আছে, সে নেশার ঘোর কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। ক্ষিদের সময় মুখের অন্ন ছেড়ে উঠে আসা যায়, কিন্তু কালোশশীর কাছে গিয়ে মাতাল না হয়ে ফিরে আসা যায় না।' (২য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) আছে তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তার চোখকে 'কোপাই নদীর দহ' মনে হয় বনওয়ারীর—'তলাতে কিছু যেন খেলা করছে, উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক কিছু বুঝতে পারা যায় না।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ) রহস্যময়তা শুধু নয়—সুতীব্র আকর্ষণ। উপন্যাসের শেষ-পর্বে কোপাইকে বার বার মা-কোপাই বলে উল্লেখ করেছে বনওয়ারী। মাতৃভাবে কোপাইকে দেখার কারণ হয়তো এই নদীই কাহারদের জীবন রেখা। কিন্তু উপন্যাসের শুরুতে কোপাইকে কাহার কন্যে আর দ্বিতীয় পর্বে কালোশশীকে কোপাইয়ের সব থেকে দেবধর্মী, রহস্যময় কালিদহের অনুষঙ্গে ভাবনার মধ্যে নিশ্চয় মাতৃভাব নেই। নারী তার আদিম রহস্যের আবডালে কখন যে দয়িতা কখন যে জননীর মতো প্রতিবাৎসল্যে উচ্ছ্বসিত তা নির্ণয় করা কঠিন। আমাদের দেশের তন্ত্রে এর সমাধান আছে—দেবী একই সঙ্গে মাতৃমূর্তি আর প্রেমিকার মতো তীব্রতম আকর্ষণীয়; আরোপ-সাধনায় প্রেমিকা একই সঙ্গে দয়িতা ও জননী। তারাশঙ্করের উচ্চ কল্পনাশক্তির প্রভাবে কালোশশীর উপর তন্ত্রের ছায়া লক্ষ করি। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে একে ইদিপাস-সংকট (Idipus-Complex) বলা হয়ে থাকে। তবে দেবস্থলে শিব বা শিবকল্প Patriarch দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদীপ দেখিয়ে ধুমুল দেবার সময় কালোশশীর আবির্ভাব—তার চোখে মদের মতো নেশার তীব্রতা দেখানো—মিলিত হবার প্রসঙ্গ, সর্বোপরি কালিদহে দেবতার রহস্যময় চলনের সঙ্গে কামনামদির কালোশশীর চোখের চাহনিকে অনুভব কবাব বিষয়গুলি তান্ত্রিকতার অনুষঙ্গে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

বলে রাখি বাংলা সাহিত্যে প্রসঙ্গটি বিভিন্ন সাহিত্য-উপাদানে স্পষ্ট হয়েছে। শ্রীমন্ত সদাগর যে দেবীকে শমনে প্রার্থনা করে ডেকে আনে উদ্ধার পায়--তাঁকেই তো ধনপতি দেখেছেন কমলে কামিনী রূপে, হ্যাঁ কালিদহে। এই সেই কালিদহ যেখানে চাঁদ সদাগর দেবীর কামনা নদীর রূপে ভ্রান্ত না হয়ে ভরাডুবিতে পড়েন! ইনি সুন্দরের দেবী কালিকা—বিদ্যার শরীরে যাকে আবিষ্কার করেন এই রাজকুমার। বাংলার নিজস্ব সাহিত্যধারায় এইভাবে কাশ্মীরের চৌরপঞ্চাশিকা নতুন রূপ ধারণ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের তীর্থ পর্যটনশীল সৌন্দর্যাভিসারী নবকুমার যখন পথ হারিয়ে ফেলে তখনই এসে উপস্থিত হয় সেই নারী। প্রশ্ন তার : "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?" আর নবকুমার অনুভব করে—'এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ, কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষ বিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্ম্মরিত হইতে লাগিল; সাগর নাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী: রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রী মধ্যে সৌন্দর্য্যের লয় মিলিতে লাগিল।' নবকুমার এই শব্দের মূর্চ্ছনায় হারিয়ে ফেলল তার চেতনা। মনে হল 'সংসার যাত্রা' যেমন করে চলমান শব্দ প্রবাহে মাত্র একটি 'রমণীকণ্ঠ সম্ভূত স্বরে সংশোধিত' হয়ে যায়—'সকলই লয় বিশিষ্ট হয়।' এ যেন তেমনি একটি শব্দ।

'কপালকুণ্ডলা'র মৃন্ময়ীতে রূপান্তরিত হওয়া আর নবকুমারের ঘরনি হয়ে জীবনের একটি রম্য পরিসর কাটানো, সবার শেষে সেই কপালকুণ্ডলাই দেখতে পায় আকাশে— 'নবনীরদনিন্দিত মূর্ত্তি! গল বিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত!'—আর সেই 'ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।' এই রূপ ও রূপাতীত, এই মাধুর্য ও ভয়ঙ্করকে তুল্য মূল্য করে দেখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষত *চতুরঙ্গ*-এ সেই রূপ খানিকটা প্রকট হয়েছে। কখনো তা বৈষ্ণবীয় আবহ :

> শচীশ যে মুল্লুকে বাস করে সেখানে ঘটনা বলিয়া কোনো উপসর্গই নাই; সেখানে হ্লাদিনী ও সন্ধিনী ও যোগমায়া যাহা ঘটাইতেছে সে একটা নিত্যলীলা, সুতরাং তাহা ঐতিহাসিক নহে—সেখানকার চির যমুনাতীরের চিরধীর সমীরের বাঁশি যারা শুনিতেছে তারা যে আশপাশের অনিত্য ব্যাপার চোখে কিছু দেখে বা কানে কিছু শোনে হঠাৎ তাহা মনে হয় না।

কখনো আবার শৈব শাক্ত বা এমনকি ব্রাহ্ম তথা বৈদান্তিক ভাব সত্যকে আয়ত্ত করতে থাকে যেন। শচীশের সেই দিব্য ভাব :

> ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া! বন্ধন আমার নয় বলিয়াই কোনো বন্ধনকে ধরিয়া রাখিতে পারি না, আর বন্ধন তোমারই বলিয়াই অনন্তকালে তুমি সৃষ্টির বাঁধন ছাড়াইতে পারিলে না। থাকো, আমার রূপ লইয়া তুমি থাকো, আমি তোমার অরূপের মধ্যে ডুব মারিলাম।

চোখের বালি-তে বিষয়টি কতকাংশে সহজ প্রতীকের কারুকাজ ছিল। সেখানে ছিল মহেন্দ্র বা শিব আর বিহারী বা কৃষ্ণমূর্তি (icon)-র দ্বান্দ্বিক সমাপতন। এলাহাবাদের ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে বিনোদিনী যে রাধিকার মূর্তি (icon) হয়ে বিহারীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, সেখানে উপন্যাসের ভাষা মোটেই পাশ্চাত্য-প্রভাবিত আধুনিক থাকে না। দেখাই :

> পদাবলীর বর্ষাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যমুনার ঐ তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া।...নদীর পরপারে অন্ধকারে সেই অভিসারিণী বহুদূরে; তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই, তাহার বয়স নাই, সে চিরন্তন গোপবালা, কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল—সে এই বিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভার লইয়া তখনকার কাল হইতে সে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখানকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে—আজিকার এই জনহীন যমুনাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। [৫১ পরিচ্ছেদ]

শরৎ-সাহিত্যে *দেনাপাওনা*-য় এই প্রাগাধুনিক তথা লৌকিকের অভিসার লক্ষ করা যায়। এমনকি *শ্রীকান্ত* উপন্যাসে অন্নদাদিদি-রাজলক্ষ্মী-অভয়ার মধ্যে হরপার্বতী বা কৃষ্ণ-কথার আশ্চর্য সমাপতন তন্নিষ্ঠ পাঠকের নজর এড়ায় না।

তারাশঙ্কর-পরিকল্পিত কালোশশীতে এই রকম পরিকল্পনাই লক্ষ করি। কর্তার কাছে প্রদীপ নিয়ে যাচ্ছিল বনওয়ারী, গোপালীবালা এনে দিল একটি 'টোকা' অর্থাৎ চুপড়ি। 'প্রদীপটিকে টোকার আড়াল দিয়ে' চলতে থাকে বনওয়ারী। এমন সময় কালোশশীর 'ফোঁস ফোঁস করে' কান্না। সাদামূর্তি হয়ে গাছতলায় বসে আছে সে। তাকে দেখেই বনওয়ারীর

'বুকের ভিতর যেন ঢাক বেজে উঠল।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীর মন তখন 'মদ্যসিক্ত নরম'—ঠিক যেমন তান্ত্রিক সাধকের হয়। কালোশশী মৃত্যুকামনা করেছে—কর্তার কাছে, সন্তান নেই বলে বেদনা প্রকাশ করেছে বনওয়ারীর কাছে। এসময় বনওয়ারীর হাতের প্রদীপ যদি নিবেই যায়—যদি সেই দেবস্থলে নেমেই আসে 'পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকার' তাহলে দোষ দেওয়া যায় না। 'প্রদীপটা নিবে যেতেই অন্ধকার ছুটে এল যেন কোপাইয়ের মুখ থেকে হড়পা বানের মত।' আর 'সেই তমসার মধ্যে মদের নেশায় উত্তেজিত বনওয়ারী এবং কালোশশী বিলুপ্ত হয়ে গেল।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) প্রকৃতির উদ্দীপন বিভাবে বনওয়ারী আর কালোশশীর এই মিলন—আদি পাপ বলে গোটা উপন্যাসে বনওয়ারীকে আত্মদীর্ণ করেছে। যে সংযমকে সে আয়ত্ত করতে চায়—তা মাতব্বর বনওয়ারীর দায়িত্ববোধ, অন্যপক্ষে কালোশশীর আকর্ষণ তা তাকে অবারিত অবন্ধন-ব্যক্তি মানুষে পরিণত করে। কালোশশীর এই তীব্র আকর্ষণ প্রাকৃতিক ও মনোহর, *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় সব থেকে রম্য উপাদান আর আকস্মিকতার চমকে ভরপুর।

আটপৌরে পাড়ায় করালীকে পরম ডেকে নিয়ে গেছে লাঠি খেলার মহড়া দেবার জন্য। বনওয়ারীর ভয় ওই লাঠি খেলার ছলে রেলে ডাকাতির ষড় করবে পরম। গেল আটপৌরে পাড়ার দিকে। আখাড়া থেকে পরমের অট্টহাসি শোনা গেল। আর আটপৌরে পাড়ায় আসার সঙ্গে বনওয়ারীকে দেখে যন্ত্রচালিতের মতো এলো কালোশশী। 'হঠাৎ একটা ঢেলা এসে তার গায়ে পড়ল!' কালোশশী বনওয়ারীর উপস্থিতি ঠিক টের পেয়েছে। বাঁশবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে সঙ্কেত করার জন্য মেরেছে ঢিল। 'এ ঢেলা কথা বলে'। বনওয়ারী বুঝতে পারে। তার মনে হয় কালোশশী—'সাক্ষাৎ ডাকিনী! কামরূপের ডাকিনীর মত যেমন সাহস তেমনি মোহিনী।' (২য় পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) কালোশশীকে বুঝে নেবার জন্য যে তান্ত্রিক-ভাষ্যের সূত্র আমরা সন্ধান করেছি—বনওয়ারী আর তার স্রষ্টা তারাশঙ্কর তা অল্পাধিক প্রকাশ করেছেন এখানে।

কালোশশী অবশ্য ধর্মিষ্ঠ। বিশেষত কত্তাবাবার প্রতি আর ভক্তি কম নয়। পরম আপত্তি করবে জেনেও কত্তার পুজোয় গোপনে বলি পাঠিয়েছে। পরম জানতে পেরে প্রবল প্রহার করা সত্ত্বেও, তেমন অত্যাচারের ভয় থাকা সত্ত্বেও কত্তাবাবার প্রতি শ্রদ্ধা কমে নি তার। এতদিন দেখা নেই কেন কালোশশীর প্রশ্ন—বনওয়ারী তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল। কারণ 'আটপৌরে পাড়ার ঘেঁটু গান'। বনওয়ারী-কালোশশীর রঙ নিয়ে সমালোচনামূলক সেই ঘেটু গান। কালোশশী আজ মদ্যপান করেছে। 'চোখ দুটি টল টল করছে'। তার বিদ্রুপ কটাক্ষ—'ওকে তা হ'লে ভয় কর?' ওকে 'অর্থাৎ পরমকে।' বনওয়ারী বলল ভয় তার বাবা ঠাকুরকে। এবার 'বাবা ঠাকুরের আদেশে' কালারুদ্দুর চড়কে চাপবে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে কালোশশী শিউরে উঠল—'কপালে হাত ঠেকিয়ে' 'প্রণাম জানালে দেবতাকে।' কালোশশী বনওয়ারীর হাত ছেড়ে দেয়। এই ভক্তি আর ভয়—আদিম যৌনতা আর ধর্মভাব—কালোশশী এইরকম বিপরীতের সন্নিবেশে গঠিত।

শিলা বর্ষণের সময় নীল বাঁধ থেকে হাঁস তুলে আনতে গিয়েছিল কালোশশী। মিত্র গোপালপুরে কাহারদের ডাক পড়েছে। পালকি বহন করতে যাবে কোশকেঁধেরা—পরমরা যাবে রাইবেঁশের দল নিয়ে। কালোশশীর সঙ্গে দেখা হবে পরমের সঙ্গে খবরটা দেবার অছিলায়। কিন্তু নীল বাঁধ থেকে হাঁস তুলে যাবার পথে 'বক্র-কটাক্ষ করে' গেল কালোশশী। রাগ করেছে বনওয়ারীর উপর। রাগ হবার কথা। আত্মসংযম আর ধর্মিষ্ঠতা দেখাবার মাত্রাধিক প্রবণতা তার—কালোশশীর ভালো লাগার কথা নয়। 'দিবানিশি কুলকাঠের

'আঙেরা'র মত ভালবাসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলুক'—তবু, বনওয়ারীর ইচ্ছা এ-জন্মে আত্ম সংবরণ করে চলতেই হবে। কালোশশী তো তার মতো মাতব্বর নয়—তার উপর এই ধর্মতেজ খুব বেশি কাজ করে নি সম্ভবত। বরং তার আকর্ষণে বনওয়ারীই চঞ্চল হয়েছে। এই আকর্ষণ অস্বীকার করার ক্ষমতা তার নেই।

জৈবিক আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে টিকে থাকার সমস্যাও আছে। পরম যখন জেলখানায় তখন 'চন্দনপুরের বড়বাবুদের দারোয়ান ভূপসিং মহাকায়ের সঙ্গে লোক জানাজানি করেই ভালোবাসা করেছিল' কালোশশী। টিঁকে থাকার পাশাপাশি এ ছিল তার প্রতিবাদও। কালোবউ উঁচু গলায় পরমকে বলেছে—'বেশ করেছি, তোর খুশি তু সনজে বেলা জাগুলে যেথা খুশি যাস, আমারও যা খুশি তাই আমি করি।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এখানে কালোশশীকে তারাশঙ্কর আদিম মাতৃপ্রধান সমাজ-বন্ধনীর মধ্য থেকে দেখতে চান। দেখাতে চান সেই সময়কার মুক্ত—অবন্ধনা নারীদের। যারা কোনো একজন পুরুষের অধিকারে থাকতে চায় না। যাদের সংসারে বাঁধা অসম্ভব। কাহার পল্লীর যে নারীরা বসন বা গোপালীবালার মতো একজন পুরুষের প্রেমকে চিরস্থায়ী করে জীবনচক্রের আবর্তনকে শ্রেয় ভাবে (এই বর্গেই আছে বাসিনী বউও—তার ঘরভাঙা পরিবার সম্পর্কে অহঙ্কারের উৎসও তো ঐ রকম এক পতিত্বের সংস্কার)—কালোবউ তাদের মতো নয়। তাকে বিবেচনা করতে হবে হাঁসুলীবাঁকের অরণ্য আদিম প্রাকৃতিকতায়। তার মৃত্যুর পর সুচাঁদ যখন বলে কালোশশীর শরীরে যৌবনের অনন্ত রহস্যরূপ ছিল—'কি যে দল মলে, মেয়ে ছিল,—আই চুল, অ্যাই বু্ক, যেমন চোখ তেমনি দাঁতগুলি—কে বলবে যে যোবতি মেয়ে লয়—বয়েস হয়েছে।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই জৈবতা—আকর্ষণী ক্ষমতা, কালোশশীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মহাকাব্যে যেমন এক একটি নারীর আকর্ষণে দেশ জাতির ভাঙাগড়া তৈরি হয় কালোশশীকে কেন্দ্র করে তেমনি হল। পরম বনওয়ারীর দ্বন্দ্ব এই সংঘর্ষের একটি দিক। বাবা ঠাকুরের আটনে মিলিত হয়েছে—অশুদ্ধ কাপড়ে ধুমুল দিয়েছে—এই অভিযোগ ছিল বনওয়ারীর বিরুদ্ধে। পানু বেঁধে ছিল তীক্ষ্ণ সমালোচনামূলক গান—ঘেঁটু গান। সবটা ঠিক ছিল না। বনওয়ারী কাপড় ছেড়েছিল। তবে স্নান করেনি—করা উচিত ছিল। মিত্র গোপালপুর থেকে ফেরার সময় পরম সে-কথা মনে করিয়ে তাকে আক্রমণ করল। এই দ্বন্দ্বে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বনওয়ারী বিজয়ী। বিজয়-গৌরবে সে গেল পরমের বাড়ির উঠোনে। কালোশশীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়। মহাকাব্যের নায়কের ঢংটি তারাশঙ্কর এই ক্ষেত্রে মনে রেখেছেন। এই দ্বন্দ্ব সংঘাতের পরিণতিতে কোশকেঁধে আর আটপৌরে—কাহারদের দুটি পাড়ার মধ্যে ব্যবধান ঘুচে গেল। হতে পারে ট্রয়ের যুদ্ধের মতো ধ্রুপদি সাহিত্য হয়নি হাঁসুলীবাঁক—কিন্তু প্রবণতার বিচারে ইলিয়াড মহাভারত ওডেসি রামায়ণের সঙ্গে হাঁসুলীবাঁকের উপকথার যথেষ্টই মিল খুঁজে পাই। মধ্যবর্তিনী এক মহিমময়ী ব্যক্তিত্বশালিনী অনন্ত যৌবনবতী এক নারী—তার দুপাশে দেশ জাতি গোষ্ঠী বর্গের ভাঙাগড়া চলছে।

পরাভূত পরমকে ঝাকড়া বটতলায় রেখে বনওয়ারী এসে দাঁড়ায় কালোশশীর কাছে। চতুর কালোশশী তার উপস্থিতি ঠিক টের পায়। 'গোটা কয়েক ছোট ঢেলা তুলে নিয়ে পরমের উঠোন লক্ষ্য করে' তার ছুঁড়ে দেওয়া—'টুপ, টুপ টুপ'। কালোশশী বুঝতে পারে। এসে বলে 'ঠিক বুঝেছি আমি, সেই বটে।' বনওয়ারী জানায় 'পরমের সাথে হয়ে গেল

একহাত।' সেই তীব্র সংঘাতের ফল কি হয়েছে বুঝে নিল কালোশশী। 'বিন্দুমাত্র ব্যস্ত কি উৎকণ্ঠিত হ'ল না।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) কালোশশী ক্ষত-বিক্ষত বীর বনওয়ারীকে দেখল 'মুগ্ধ দৃষ্টিতে'। বলল—'রক্তটক্ত ধুয়ে ফেল আগে।' বনওয়ারীর ইচ্ছা, কোপাইয়ের কাচের পারা জলে' স্নান করে ধুয়ে ফেলবে। আজ কাহারপাড়া মাতোয়ারা। উৎসব আনন্দ চারপাশে। Carnival পরিস্থিতি সেই রাতে। মিত্র গোপালপুর থেকে বহুদিন পর রায়বেঁশে নেচে আর পালকি বয়ে এসে মদ্যপান করেছে সবাই, পাওনা গণ্ডা কম হয়নি—মেয়েদের সবাই মদ পেয়েছে। এই পরিবেশেই অভাবিতপূর্ব মিলন হয়। বাখতিন তেমনি ভেবেছেন। 'কালো বউকে সবচেয়ে বেশি মনোরমা মনে হচ্ছে'—বনওয়ারীর। প্রকৃতিও আহ্লাদিত—'কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে, যেন খিল খিল করে হেসে ঢলে গড়িয়ে পড়েছে।' বনওয়ারীর অনুরোধে গান গেয়ে উঠল কালোশশী—সে-গানের কথা প্রচলিত, বহুদিন ধরে হাঁসুলীবাঁকের মানুষ এই গানে তাদের প্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করে। বনওয়ারীর প্রতি মুগ্ধতা আর এই গানের কথায় একাকার হয়ে গেল। কালোশশীর রোমাণ্টিক মন এই চন্দ্রালোকিত উৎসব রাত্রিতে স্পষ্ট হয়ে আসে।

আদিম মন কালোশশীর—পাগল কাহারের মন্তব্য—'অঙের খেলায় যাই বলিহারি। জেবন দিলেও দিতে পারি, তবু তো ছাড়তে পারি না মনের মানুষে' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কাহারদের উপকথায় সুচাঁদের স্মৃতিভাষ্যে উজ্জ্বল হয়ে দেখা যাবে কালোশশীর মৃত্যুত্তীর্ণ ভালোবাসার কথা। তার চির তারুণ্য, তার কূল-ছাপানো কোপাই নদীর হড়পা বানের মতো আশ্চর্য ভালোবাসার কথা।

লিখেছি, কালোশশী হাঁসুলীবাঁকে প্রবল প্রভাবী চরিত্র। মৃত্যুর পরও তার প্রভাব বহুমাত্রায় উপস্থিত। যেমন :

(১) পরম যখন বুঝল কালোবউ মারা গেছে—তখন বনওয়ারীর আস্ফালনের কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করে নি। 'তার আক্রোশ মিটে গেছে।' (৩য় পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) আর ফিরল না সে। কালোশশীর মৃত্যু পরমের নিরুদ্দেশ হবার ভূমিকা হয়ে দেখা দিল। এর ফলে আটপৌরেদের নেতৃত্বহীন হয়ে পড়া আর রমণের নেতৃত্বে কোশকেঁধেদের মাতব্বর বনওয়ারীকে নিঃসন্দেহে মেনে নেওয়ার ঘটনার দিকে এগিয়ে গেল।

(২) বনওয়ারীর স্থির বিশ্বাস কালোশশী প্রেতিনী হয়েছে। এরপর তার মনোজগতে নানা ভাঙাগড়া চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতেই আকস্মিক ভাবে তার সঙ্গে দেখা হয় সুবাসীর সঙ্গে। রমণের শ্যালিকার কন্যা—বিধবা মেয়ে সুবাসী। কালোশশীর বোনঝি। 'মেয়েটির মধ্যে যেন কালোশশীর ঢঙ আছে। অবিকল কালোশশীর মতই দেখতে।' বনওয়ারীর হঠাৎ দেখে মনে হল—'কালোবউ কি মোহিনী রূপ ধরে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে!' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) কালোশশীর প্রভাব এইভাবে হাঁসুলীবাঁকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সুবাসী এক অর্থে কালোশশীর ছায়া—প্রসারিত রূপ। তার চেহারা যে কালোশশীর মতো, ধূর্ত পানুর নজরে ধরা পড়েছে। 'কালোশশীর রঙ ছিল কালো—এ মেয়েটির রঙ মাজা।' (৪র্থ পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)। এক সন্তানের জননী, বিধবা যুবতী সুবাসী, সন্তানটি মারা যাবার পর মায়ের কাছে এসেছিল—সাঙার অপেক্ষায় ছিল। 'কিন্তু তার আগেই মা গেল ম'রে।' রমণের ঘাড়ে পড়েছে কালোশশীর বোনঝি। পানুর প্রস্তাব—'তোমার যে শালীর

বিধবা কন্যেটি এসেছে অমন কাকা, তার সঙ্গে বনওয়ারীর সাঙা হোক।' বনওয়ারীকে খুশি করার বাসনা আজ পানুর বিশেষ ভাবেই দেখা গেল। করালীর কোঠাবাড়ি ভেঙে দেওয়ার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছে বনওয়ারী। ভাঙা গড়ার মাঝখানে জেগে উঠছে এক নায়ক—প্রসারিত হচ্ছে মৃত্যু অতিক্রম করে এক মহিমময়ী নারী—মাটি মাখা তার রূপ ; আদিম সমাজের স্বেচ্ছাবিহারী প্রবণতা তার—সে কালোশশী।

সুবাসীকে এই উপন্যাসে কালোশশীর ছায়া বলে মনে হলেও ক্রমে তার স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট হয়েছে। সুবাসীর মধ্যে বনওয়ারী প্রথম প্রথম কালোশশীর রূপই দেখেছিল—'মেয়েটা অবিকল কালোশশী—তেমনি বিলাসিনী, তেমনি ঢঙ, তেমনি হাসি, তেমনি ঢলে পড়া'—তবু 'মধ্যে মধ্যে বনওয়ারীর মন খাপ্পা হয়ে ওঠে।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কেন বনওয়ারীর মন খাপ্পা হয় মাঝে মাঝে? নবান্নের সময় বনওয়ারী লক্ষ করে সুবাসীর আচরণে লক্ষ্মীশ্রী নেই—আছে লোভ, রীতি না-মানা অদ্ভুত স্বভাব তার। 'কালোশশীর ভাঙা ঘরের' উঠোনে বনওয়ারী দেখে 'ভাঙা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কার সাদা মূর্তি' ! বনওয়ারীকে দেখে 'অতিমৃদু খোনা' স্বরে সেই মূর্তি বনওয়ারীকে বলছে—'পালাও—তুমি পালাও—আমার লোঁভ লাঁগছে তোমার ওপর'। ভয় পাবার কথা। বনওয়ারী এক মুহূর্ত ভয় পেয়েওছিল। তারপরই বুঝেছে ও আসলে সুবাসী! চেপে ধরার পর বলল সে—লুকিয়ে সন্দেশ খাচ্ছিল! কারণ 'দিদি—মোটে দুটি দিয়েছিল'! তাই লুকিয়ে অন্ধকারে মৃত মাসীর পরিত্যক্ত ভিটেতে এসেছে। বনওয়ারী সিদ্ধান্ত করে—'যে লোভের বশে দেবতার কথা না ভেবে স্বামীকে বঞ্চিত করে চুরি করে ভূতুড়ে ঘরে বসে পেট পূরণ করে, সে তো ভাল মেয়ে নয়।' (৫ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) লোভী সে—ভয় নেই, হয়তো তেমন সংস্কারও নেই। দেবতাকে দেবার উদ্দেশে আনা হয়েছিল ঐ সন্দেশ। স্বামীও খায় নি। এ-মেয়েকে দিয়ে কল্যাণ নেই। বনওয়ারী সেদিনই ভেবেছিল।

আটপৌরেদের স্বভাব উঞ্ছবৃত্তি—লোভ। সেইভাবেই তারাশঙ্কর অঙ্কন করেছেন। সুবাসীর চরিত্রের নিহিতার্থ লোভ। শুধু ভালোমন্দ খাওয়া নয়—ভালো পোশাক পরিচ্ছদ ভালোভাবে জীবন কাটানোর লোভ। তার পূর্ব-জীবনের সংবাদ হাঁসুলীবাঁকে খুব বেশি নেই। রমণ একবার জানিয়েছে ও নাকি এক সময় 'চাষী মশায়দের বাড়িতে তিন চার বছর ধান ভানানী ছিল।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) হয়তো ছিল, কিন্তু চাষী মশায়দের সংস্কার তাকে স্পর্শ করেনি। হিসেব করতে জানে সে—আটপৌরেরা যা কখনো জানত না। কিন্তু বনওয়ারীর ধান কত হবে সে হিসেব সম্পূর্ণ করার মতো স্থিরতা তার নেই। সেই হিসেবের ফল বলার দরকারই বোধ করে নি সুবাসী। 'হিসেব শেষ করে হঠাৎ পা ছড়িয়ে বসে হাসতে হাসতে বলে—এইবার আমি কাঁদব। হ্যাঁ।' (ঐ) কান্নাহাসির দোলায় ছন্দ-স্পন্দিত ব্যবহার তার, জীবন্ত। বনওয়ারীর বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু এই বিচিত্র ব্যবহারের উদ্দেশ্য বনওয়ারীর সম্পদ বৃদ্ধিতে আনন্দ প্রকাশ নয়, 'এবার পূজোতে আমি খুব ভাল কাপড় লোব'—এই তার দাবি, ঐ ব্যবহারের তরঙ্গভঙ্গের আসল লক্ষ্য। তাই বনওয়ারী তার সাধ্যাতীত দাম দিয়ে চন্দনপুরের দত্তবাবুর কাছ থেকে কাপড় এনেও দেয়। কিন্তু সুবাসীর মন ওঠে না। তার চাই 'পাখির মত কাপড়'—উড়োজাহাজ পাড় শাড়ি। কি করবে এ কাপড় পরে? উড়োজাহাজের মত 'ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবে সুবাসী। তাজ্জব বনওয়ারীকে আশ্বস্ত করে—'একা যাব না, তোমাকে সমেত নিয়ে যাব পরীর মতন পিঠে ক'রে।' পরীর কথা শুনে বনওয়ারী আশ্বস্ত কতটা হল তা বিস্তারিত বলেন নি তারাশঙ্কর। কারণ খুব

স্বাভাবিক। বাংলার লোকজীবনে পরী মোটেই শুভ চিহ্ন নয়। মধ্য প্রাচ্যের জিন-পরীর মতোই—এই ধারণায় পরী যার উপর ভর করে তাকে নীরক্ত করে মারে! সুবাসী হয়তো তেমন কোনো ভয়ঙ্কর সংবাদই ইঙ্গিতে উপস্থিত করেছে।

সুবাসীর মধ্য দিয়ে অকল্যাণ ছাড়া কিছু হবার নয়—বনওয়ারীর এই বোধ অনেক আগেই জন্মেছিল। তা সত্ত্বেও সুবাসীকে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। কারণ কালোশশীর প্রতি নিবিড় আসক্তি, আটপৌরে সমাজের উপর অধিকার স্থাপনের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা—আর কালোশশী আর গোপালীবালার অতৃপ্ত প্রেতের ভয় তার এতই তীব্র ছিল যে সুবাসীকে ত্যাগ করার কথা সে ভাবতে পারে নি। সুবাসী একথা জানত, সম্ভব মতো সেই দুর্বলতাকে ব্যবহার করেছে। কখনো তা নিয়ে তামাসা করতেও ছাড়ে নি। বনওয়ারীর মনে স্থির বিশ্বাস—'মেয়ের প্রেতাত্মার হাত থেকে বাঁচাতে পারে মেয়ের ভাগ্যি—মেয়ের এয়োত।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) সুবাসীকে সে বিশ্বাস করে না—আবার ত্যাগ করতেও পারে না।

লোভই সুবাসীকে টেনে নিয়ে গেছে করালীর সংসারে। বনওয়ারীর অসুস্থতার সময়—'বনওয়ারীর চিকিৎসার খরচের অজুহাতে গরু-বাছুরগুলি বিক্রি' করে 'সেই টাকাকড়ি সব নিয়ে বনওয়ারীকে ফেলে গভীর রাত্রে অদৃশ্য' হয়ে যায়। যা সম্ভব ছিল, যা অনিবার্য ছিল—তাই ঘটল। 'দুপুর নাগাদ খবর এল, সুবাসী চন্দনপুরে—করালীর বাসায়।' (শেষ পর্ব) সুবাসীর সঙ্গে করালীর সম্পর্ক কতদিনের? ভাঁজো উৎসবের দিন ছাতিম ফুল উপহার দেবার দিন এর সূচনা—অন্তত প্রতীকী সূচনা বলে মনে করি। সন্দেহ শুধু বনওয়ারীর মনে ছিল না—এ সন্দেহ পাখিকেও চঞ্চল করেছিল। গোপালীর মৃত্যুর পর শ্মশানে গেছে সবাই; করালী এসে বলেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিচিত্র গল্প। 'সান কেড়ে বসেছে সুবাসী—নিতান্ত অকারণে এই লজ্জা বিনম্র ঘোমটা টানা। শ্মশান থেকে ফিরে বনওয়ারী করালীর কথাবার্তা আর সুবাসীর ভঙ্গিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। সুবাসীর 'সান কেড়ে' বসাটা ছলনা। গোপালীর মৃত্যু তাকে ব্যথিত করে নি। সোৎসাহে করালীর কথা শুনছে এটা আড়াল করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। সাইক্লোন যখন কাহারপাড়াকে তছনছ করে দিচ্ছে যখন তখন সেই ভয়ঙ্কর রাত্রিতে যুবক বলদর্পী করালী বেরিয়েছিল সবাইকে সাবধান করতে, তখন তাকে দেখে সুবাসী তার মনোভাব লুকিয়ে রাখে নি। ঝড় আসছে—'পে-ল-য় ঝড়', 'ঘর থেকে বেরিয়ো না। খবরদার! গায়ে একটা তেরপলের লম্বা জামা আর মাথায় টুপি পরে হেঁকে বেড়াচ্ছে করালী।' (৫ম পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) 'সুবাসী ঝপ করে দাওয়া থেকে নেমে পড়ল। বনওয়ারীর ভয়ার্ত নিষেধ মানে নি। কে কি বলছে—জানার আকাঙ্ক্ষা তার। কে এই দুঃসাহসী কাজ করছে? 'সেই ডাকাবুকো। নইলে আর এত সাহস কার হবে?' (ঐ) বোঝা যায়, সুবাসী এই তরুণের প্রতি তার আগ্রহ আর আড়াল করতে চায় না তখন। বনওয়ারীর প্রশ্ন—কে? যাচ্ছে? উত্তরে সুবাসীর ছলনা-মিশ্রিত তামাসা—'ওই যে, নাম করলে তুমি রাগ করবা।' করালীর নাম উচ্চারণ করেনি সুবাসী। 'এই ঝড়ের মধ্যেও' 'মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে লাগল।' আকর্ষণের এই তীব্রতা সুবাসীর পরিণতিকে সম্ভাবিত করে। কালোশশীর মতোই মন তার—লুব্ধ, পাপ-পুণ্যের ধারণাকে তোয়াক্কা না করা, জৈবিক আকর্ষণকে অকপটে প্রকাশ ও স্বীকার করায়। কাহার পল্লীর আদিম উপাদান সুবাসীর মধ্যে স্পষ্ট।

•

পাখীর মধ্যে জৈবিক আকর্ষণ স্পষ্ট হলেও তার পরিসর বৈচিত্র্যপূর্ণ। নতুন প্রজন্মের

মেয়ে সে। কাহার সমাজের বিধি নিষেধ সে মানবে না খুবই স্বাভাবিক। উপরন্তু তার মনের মানুষ করালী। ফলে তার মধ্যে কাহার সমাজের বিভিন্ন বিধি নিষেধের বিরুদ্ধাচরণের সাহস আর যুক্তি লক্ষ করি। আঠারো বছর তার বয়স—স্বামী নয়ান হেপো রুগী, মুখে অসম্ভব দুর্গন্ধ—তাকে ত্যাগ করে মায়ের কাছে থাকে সে। সে তার মা বসনকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে—বসনের প্রেম যেমন একদা গ্রাম বিখ্যাত হয়েছিল, পালাগানের বিষয়, পাখির প্রেমও তেমনি একমুখী, তেমনি তীব্র, তেমনি দুকূল-প্লাবী নদীর বন্যার মতো ভয়ঙ্কর—অপ্রতিরোধ্য। তারাশঙ্কর তাকে 'তাল চড়ুই'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'আষাঢ় মাসে ঘনঘটা করে মেঘ এলে তাল চড়ুই যেমন নেচে নেচে ওড়ে, ভাবে উড়ে যেতে যেতে ইচ্ছা করছে'—পাখিরও তেমনি, যে-কোনো অছিলাতেই হোক—'সে যাবেই করালীর বাড়ি।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) পাখি করালীকে নিয়ে কেমন অলঙ্কৃত—তার প্রমাণ পাই নানা পর্যায়ে। শিসের ভয়ে গ্রাম আচ্ছন্ন, নানারকম আধি ভৌতিক বা আধি দৈবিক কার্যকারণ নিয়ে চিন্তিত, তখন করালী আবিষ্কার করে শিস দিচ্ছে একটি প্রমাণ আকারের চন্দ্রবোড়া। বাঁশবনে আগুন দিয়ে সেই সাপটিকে মেরে ফেলেছে সে। পরে গোটা গ্রামকে চমকে দিয়ে দারোগার কাছে জানা গেল অদ্ভুত সংবাদ—করালীকে থানা থেকে পাঁচ টাকা বকশিস দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামকে অহেতুক ভয় থেকে নিবারণ করেছে সে! এ-সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে পাখি মজলিশকে পাশ কাটিয়ে 'কাপড়ের দোলায়' ঝলক তুলে ছুটে বেরিয়ে গেল। বসন্ত ডাকল, নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল, কিন্তু ছুটল সে—'যার ওপর আমার মন পড়েছে, আমি তারই ঘরে চললাম।' (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) আকর্ষণের এই তীব্রতা 'অঙের খেলা'য় স্বাভাবিক—কাহার মেয়েরা সে মানসিকতাকে লুকাতে জানে না।

করালী যখন বলে তার সঙ্গে দ্বন্দ্ব তো নয়ানের। নয়ান আসুক লাঠি নিয়ে। পারলে নিয়ে যাক পাখিকে। ঠিক যেন আদিম কালের বীর নায়ক। এসময় পাখি অন্যরকম বলে। তার কথা যদি করালীকে কোন রকমে শক্তিতে বশ করে নয়ান সক্ষমতা দেখায়, তবু সে তো যাবে না তাকে ছেড়ে! পাখি ঝঙ্কার দিয়ে বলে—'মব, মুখ পোড়া, তোকে লাঠিসোঁটা মেরে আমাকে লিয়ে যেতে চাইলেই আমি যাব নাকি?' (২য় পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ) এসময় নসুবালা বলেছিল কাহারদের পুরোনো রীতি। পুরুষ যদি সক্ষম হয়, তার অধীনেই যাবে নারী।—এই তার কথা। 'মরদের কিলে' 'অঙের লোক' ভুলে যায় সবাই। পাখি এই রীতি মানে না। তার কথা—'অঙ যার পাকা হয়, অঙের নোকই পিথিবীর মধ্যে ছেষ্ট।' (ঐ) বস্তুত পাখির মধ্যে একটু নতুন সংবাদ এখানে। তার অভিমত : 'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপনজন,—ইয়ের আবার শাসনই বা কি মাতব্বরিই বা কি?' পাড়ার রীতি সংস্কার—পুরোনো বিয়ে অস্বীকার করার বিধিবদ্ধতা ('ছাড় বিড়') কোন কিছুতেই মন নেই তার। মন নেই পুরুষের শারীরিক শক্তির অজুহাতের দিকেও। ব্যক্তিগত প্রেমকে প্রাধান্য দেবার এই সাহস পাখিকে স্বতন্ত্র করেছে। জাঙলের চৌধুরী বাড়ির যে ছেলের সঙ্গে বসন্তের অঙ ধরেছিল, তার সঙ্গে পাখির চেহারার মিল আছে। সুচাঁদের ভাষ্য : 'পাখির মুখ অবিকল তার মত। তেমনই তারই মত গোরা রঙ।' একসময় চৌধুরী বাড়ির ছেলে নাকি নিজে বলত একথা—'সবুজ গাদা গাছে হলুদ রঙের গাঁদা ফুল'-এর মতোই 'কালো বসনের কোলে' 'ফরসা রঙ পাখিকে চমৎকার মানাত।' (২য় পর্ব, তিন পরিচ্ছেদ)। জাঙলের চৌধুরীদের ছেলের সঙ্গে বসনের প্রেম ছিল একমুখী। পাখির মধ্যে সেই প্রেমের উত্তরাধিকার—শুধু রূপে নয় স্বরূপেও।

সাপ কখনো বাবা হয়—প্রশ্ন করেছে পাখি। সে মোটেই বিশ্বাস করে নি চন্দ্রবোড়া সাপটি কত্তাবাবার বাহন বা ঐরকম দৈব কিছু। তার ভূমিকা এখানে যুক্তির—আধুনিকতার। পাখি করালীর কোঠাবাড়ি তোলার সময়ও যথেষ্ট যুক্তিবোধের পরিচয় দিয়েছে। গোটা গ্রাম যখন কোঠাবাড়ি গড়ার বিপক্ষে—সুচাঁদ বলছে, যা কেউ কখনো করে নি, তা করতে নেই।—মা বসন্তও ব্যাপারটা মানতে পারছে না।—তখন পাখি অকুতোভয়। করালীর পক্ষে তার যুক্তি 'চন্মনপুরের বাউরীরা কোঠাঘর করছে—হারু বাউরী, শম্ভু বাউরী, কানাই বাউরী।'—তাদের তো কিছু হয়নি! সুতরাং তাদের নিরস্ত করা কেন। উপন্যাসের কথকের ভাষ্য 'যেমন একালের ছেলে তেমনি একালের মেয়ে।' (৪র্থ পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) পাখির মধ্যে কাহার সমাজের নতুন সময়ের ইঙ্গিত এভাবে স্পষ্ট হয়েছে।

জীবন দেখে পাখি সহজ সাহসী যুক্তি আর দৃষ্টিতে। তার সঙ্গে তার পর্যবেক্ষণশীলতা লক্ষ করি বিভিন্ন সময়। আনন্দ কৌতুক বোধ করা আর রমণীয় ভাবে তা পরিবেশন পাখিকে বেশ স্বতন্ত্র করেছে। চন্দনপুরে সাহেব মেমদের দেখে নিখুঁতভাবে নকল করার মধ্যে পাখির এই চরিত্র লক্ষণ স্পষ্ট হতে পারে। কাহাররা একে বলে 'ভিকনেস'—নকল করে কথা বলা। তারাশঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন রীতিমত আসর জমিয়ে দিয়েছে পাখি, উপস্থিত সকলকে সাহেব-মেমদের কথা নকল করে। 'সরু গলা করে ইংরিজি বাক্য নাকি সে অবিকল তুলে নিয়েছে—গুড্-মুনিং-বুড-টিংটং; অনুস্বার লাগিয়ে অনর্গল ব্যঞ্জনে বর্ণগুলি উচ্চারণ করে যাচ্ছে সে।' (২য় পর্ব, নয় পরিচ্ছেদ) এই জীবনভঙ্গি পাখিকে শুধু জীবন্ত করে নি করেছে আধুনিকও।

করালীর বৈভব তাকে গরবিনি করলেও বিনয়ের অভাব তার নেই। বনওয়ারীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে সে। বনওয়ারী না থাকলে তাদের প্রেম স্বীকৃতি পেত না—চন্দনপুরে থাকতে থাকতে কখন যে কি করে বসত। তার সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি—'তুমি এই যে আমার ঘর করে দিলে, নইলে আমি চলে যাচ্ছিলুম চন্দনপুরে ওর সঙ্গে। তা' পরেতে নিকনে কি ঘটত কে জানে! হয়তো আবারও কারুর সঙ্গে চলে যেতাম বিদ্যাশ বিভুঁয়ে।' (২য় পর্ব, সাত পরিচ্ছেদ) বনওয়ারীকে সম্ভব মতো প্রতিদানও দিয়েছে করালী। পাখি নিজে তার আনা রেল কোম্পানির গাইতিগুলি পৌঁছে দিয়ে এসেছে।

করালীর সহধর্মিণী পাখি। কাহারদের রেল কোম্পানির কাজে টেনে আনার চেষ্টা সেও কম করে নি। 'বট গাছতলায় দাঁড়িয়ে কয়েকজন অল্পবয়সী ছোকরার সঙ্গে খুব কথাবার্তা' বলতে দেখেছে বনওয়ারী। 'মুখ হাত-পা নাড়ছে।' (৫ম পর্ব, ছয় পরিচ্ছেদ) এই সক্রিয়তা বনওয়ারীর ভালো লাগে নি। পাখির মধ্যে সংস্কার-রাহিত্য আর সংকটকালে জীবিকার প্রয়োজনে নতুন পরিবেশে পা ফেলার সাহস অবশ্যই লেখকের সংযোজন। পাখি এই উপাদানটি ভাল মতই আত্মস্থ করেছে।

এহেন পাখির পরিণতি ভয়াবহ—ভয়ঙ্কর। সুবাসীর মাথার ছাতিম ফুল তাকেও সন্দিগ্ধ করেছিল। বনওয়ারী বাঁশ ঝাড়ে বসে একা একপাত্র মদ খাচ্ছিল। শোনা গেল ওদের কথোপকথন। সুবাসী পাখিকে দেখে যখন জিজ্ঞাসা করেছে—'তোমাকে ছাতিম ফুল কে দিলে হে?' শুধু কি তাই, 'সুবাসীর ঘরের উঠানে কেন ছাতিম ফুল পড়ে আছে?'—এসব থেকে স্পষ্ট বুঝেছে সে। করালীর অহঙ্কৃত কথা : 'বুঝেছিস, বুঝেছিস। জানিস, পোষ মাসে একটা ইঁদুরে দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পৌষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি।' (৫ম পর্ব, আট পরিচ্ছেদ) শুধু কি তাই—'সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা' করার কথাও ঘোষণা করে

করালী। এরপর পাখি কিছু বলার আগেই ভয়ঙ্কর লড়াইতে মাতল বনওয়ারী আর করালী। সে দ্বন্দ্বের পরিণতি, বনওয়ারীর পরাজয়, আর অসুস্থ বনওয়ারীকে ফেলে সুবাসী কেমন করে তার গবাদি পশু বিক্রি করে পালিয়েছে আমরা জানি। পাখি এই ব্যাপার স্বীকার করেনি। নসুর বর্ণনা স্মরণ করা যাক।—'আঃ, সোনার বরণ 'হলুদ মণি' 'বেনেবউ' পাখি গো—...যেমনি সুবাসীকে নিয়ে গেল করালী, পাখি বুক চাঁপড়ে কাঁদতে লাগল।' (শেষ পর্ব)। পাখির কান্না সহ্য করতে পারে নি নসু। নসু চলে এসেছে। সন্ধ্যায় এল পাখি—'কাপড় অক্তে আঙা' 'পাখির চোখ জ্বলছে'। একখানা কাটারি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে গিয়ে হঠাৎ ঠিক করে নিজে মরবে না—করালীকেও মারবে। করালীর মাথায় আঘাত করতে গিয়েছিল। 'শুধু করালীর মত পুরুষ আর তার হাত ধরে ফেলেছিল বলেই বেঁচেছে করালী, নইলে তাকে বাঁচতে হত না।' মারতে পারে নি, তবে গভীর আঘাত করেছিল। 'করালীর কপালে' 'চিরস্থায়ী দাগ' এঁকে এসেছিল পাখি। রক্তমাখা কাপড় নিয়ে পাগলিনী পাখি বাঁশবাদিতে ফিরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। করালীকে ভালো বেসেছিল—করালীকে আঘাত করে চলে এসে আত্মহত্যার মাধ্যমে 'পাখিকে ভুলবার পথ রাখে নাই'। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* গণ মানুষের কথা। তার আড়ালে চাপা-পড়া ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার যে কাহিনীগুলি আছে—পাখির অঙের কথা আর অন্তর্গত। খুশিতে উচ্ছল আর বেদনায় মলিন এই কাহিনী। পাখিকে যথেষ্ট তৎপর—চলৎচঞ্চল জীবন্ত নারী বলেই মনে হয়।

সুচাঁদ কাহার পল্লীর মুখপাত্র। কাহারদের উপকথার ধাত্রী আর বক্তা সুচাঁদ। উপন্যাসের মৌখিক পরম্পরার প্রায় সবটুকু সুচাঁদকে ঘিরে পুঞ্জীভূত—আবর্তিত। প্রত্যেকটি ঘটনার ব্যাখ্যা তার উপকথায় আছে। আর সে কেবল নীরব কথক নয়—তার ব্যাখ্যা এর সঙ্গে যোজিত হয়। Narrative-কে function-এ পরিণত করা, function-কে ritual-এ পর্যবসিত করার মাধ্যমে সুচাঁদ হয়ে উঠেছে একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ঘটনার নিয়ন্ত্রণ আর ব্যাখ্যান, প্রতিটি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ঐতিহ্য দিয়ে শাসন ও নিরূপিত করার এই সক্ষমতা *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র জীবন্ত প্রতিনিধি করেছে তাকে। বস্তুত তার মধ্য দিয়েই কাহার সংস্কৃতি কথা বলে। উপন্যাসের কথক জানাচ্ছেন—'কাহারপাড়ার আদ্যিকালের যত বিধান সুচাঁদের কাছে। সেই বিধানই চিরদিন বলবতী হয়েছে এখানে'। (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) কত্তার বাহন হল ঐ মৃত চন্দ্রবোড়া সাপ—সুতরাং 'বাবা ঠাকুরের পূজো'—প্রতিবিধান করতে হবে। বনওয়ারী—কাহারদের দোর্দণ্ড প্রতাপ মাতব্বর সুচাঁদ পিসির পরামর্শ অমান্য করে না। সেদিক থেকে সুচাঁদকে হাঁসুলীবাঁকের উপকথার সাংস্কৃতিক নেত্রী বলেই মনে হয়। রীতিমত আদিম ডাকিনী বিদ্যা বা নারী নেত্রীত্বের ভূমিকা তার; যদিও তার ভূমিকা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ হয়েছে। সুচাঁদের পর তার সাংস্কৃতিক নেত্রীত্ব গ্রহণ করার মতো কেউ উঠে আসে নি। নতুন নতুন পুরাণ-প্রভাবিত ধ্যান-ধারণার দ্বারা শাসিত হতে থেকেছে কাহার সমাজ। সুচাঁদ-কথিত অসুরের-কাঁড়ি বা ঐ রকম বিচিত্র লোক-বিশ্বাস হারিয়ে গেছে—ধান্যলক্ষ্মী, নবান্ন, দুর্গোৎসব প্রভৃতির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র দু-তিনটি প্রজন্মের ব্যবধানে সুচাঁদ-কথিত সংস্কৃতির বুনটটি ভেঙেচুরে গেছে। তা হোক *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় সুচাঁদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কাহার সমাজ—এ কাহিনীর প্রায় কোন স্তরেই—সুচাঁদকে অস্বীকার করতে পারে নি।

সুচাঁদ একটি প্রতিষ্ঠান। তার ভিত্তি কথা। কথা গল্প কাহিনী। কথা—ইতিহাস। কথা—এক বিশেষ ভঙ্গিকে আয়ত্ত করে যখন, তখন কথা একটি ভাষিক চারিত্র্য হয়ে ওঠে। এ নিয়ে কিছু আলোচনা উপযুক্ত অবসরে করেছি। ঝগড়ার ভাষা তার, তারাশঙ্করের ভাষায়—'সার্বক ভেদে মন্ত্রের সিদ্ধি—এই সত্য অনুযায়ী সুচাঁদ এই বৃদ্ধ বয়সেও সর্বশ্রেষ্ঠা।' (২য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) উপলক্ষ—করালী সুচাঁদের গায়ে ব্যাঙ দিয়েছে। মৃত্যুদূতের মতো ব্যাঙকে ভয় করে সুচাঁদ। তা জেনে শুনেও করালীর এই কাজ! সুতরাং অভিসম্পাত তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। 'যে হাতে' ব্যাঙ দিয়েছে, 'যে হাতে' 'বাঁশ বনে আগুন লাগিয়ে মা-মনসার বিটীকে পুড়িয়ে' মেরেছে—সেই হাত দুটি 'কাঠের মত শুকিয়ে যাবে।' ভয়ঙ্কর অভিশাপ। দেবদেবীকে সাক্ষী রেখে বলে যায় সুচাঁদ। 'হে বাবা কত্তা, হে মা মনসা, হে বাবা জাঙলের 'কলেরুদ্দু', হে মা চন্ননপুরের চণ্ডী, হে মা বাকুলের বুড়ী কালী, হে বাবা বেলের ধম্মরাজ, তোমরা এর বিচার ক'রো—বিচার ক'রো।' (ঐ) মধ্যযুগের সাহিত্যে যাকে দিগবন্দনা বলা হয়েছে, এ যেন ঠিক তেমনি। সুচাঁদ যে কাহার সমাজের লোকধর্মের নির্ণায়ক শক্তি—তার প্রমাণ এখানে।

সুচাঁদের নিয়ন্ত্রণ শক্তি অবশ্য ক্ষয়িষ্ণু। কাহার সমাজ ধর্মানুষ্ঠানে অংশ নেবার সঙ্গে সঙ্গে সুচাঁদ তার প্রসঙ্গ-কথা—Narrative বলতে থাকে। বর্ণনা থেকে মনে হয় সুচাঁদের কথা আগেকার জাদু শক্তি (magic power) যেন হারিয়ে ফেলেছে। 'লোকে শুনুক না-শুনুক গল্প সে বলে যায়।' তার একান্ত অনুরোধ—'তোরা শুনে আখ্, বুড়ী হলে বলবি। গাজন ছেরকাল আছে, গল্প ছিল না। হয়েছে, বলি তাই আছে, না বললে থাকবে না।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) উপকথা গড়ে ওঠার বিকাশ কাল আর অবক্ষয়ের সংকটের পর্যায়গুলি এখানে বেশ স্পষ্ট হয়ে আসে। সত্যি, গাজন যদি প্রাকৃতিক ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকে—সূর্যের অয়নান্ত আর পরিক্রমাকে বোঝাতে চড়ক-চক্র শব্দটি প্রযুক্ত হয়, তাহলে মানুষ থাক বা না-থাক—ব্যাখ্যান হোক না-হোক, গাজন তো থাকবেই। এমনকি অনুষ্ঠান না থাকলেও গাজন-চক্র চলবে। কথা মানবিক। মানুষের স্মৃতি ভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত এক অবসর। কথায় মোড়া জীবন। সুচাঁদের মতো আন্তরিক কথক না থাকলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। সুচাঁদ তাই গাজনের উপকথা বলে—না বলতে পারলে অনুভব করে অপার্থিব ব্যথা। 'গল্প না বলে চুপচাপ বসে থাকতে হলে সুচাঁদের মনে হয়, সে যেন কত কাঙাল দুঃখী হয়ে গিয়েছে, লোকে তাকে হেনস্তা করছে।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় সুচাঁদ অবিভাজ্য অপরিহার্য অনিবার্য সত্তা হয়ে উপস্থিত। উপকথা তাকে বাদ দিয়ে নিষ্প্রাণ নীরক্ত, অপূর্ণ হয়ে পড়ে।

সুচাঁদ 'আদ্যিকালের বুড়ী' হাঁসুলীবাঁকের অতীতের দীর্ঘশ্বাস—অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস। হাঁসুলীবাঁকের কথক জানিয়েছেন—উপকথার বুড়ীর মতো ওর 'কাঁদি-কাঁদি' মন করে, কেঁদে না আত্তি মেটে—এই অবস্থা সুচাঁদের। বস্তুত কেন কাঁদে তা স্পষ্ট জানে না—কারণে অকারণে কাঁদে। কান্নাটাই ওর সত্তা। যা অনিত্য—যা নেই তার জন্য স্মৃতিকাতরতা সুচাঁদের বেঁচে থাকার অন্যতম চালিকা-শক্তি। তাই, গাজনের উৎসবের বিস্তৃত আনন্দ, নাতি পাখির সঙ্গে করালীর ধুম ধাম করা অনুষ্ঠানে তার মনে পড়ে যারা থাকলে এই আনন্দানুষ্ঠান আরও পূর্ণাঙ্গ হত, তাদের কথা। বাবার বাহন সাপটির কথা মনে পড়ছে সুচাঁদের, মনে পড়ে তার বাবার কথা। আসলে স্মৃতিকাতরতা একটি সমাজের মানবিক অস্তিত্বের অভিমুখ। এই স্মৃতিকাতরতা না থাকলে ঐতিহ্য মূল্যহীন—সংস্কৃতি তাৎপর্যহীন। সুচাঁদের মধ্যে

হাঁসুলীবাঁকের স্মৃতির জগৎটি অভিব্যক্ত হয়েছে। হাঁসুলীবাঁকের বর্তমান চলনটি তার ভাষ্যে অনুমোদন পেতে থাকে—অতীতের জল ছাপ ফুটে ওঠে প্রত্যেকটি ঘটনায়, পরম্পরার অন্তর্গত হতে থাকে যে-কোনো ঘটনা। ফল কোন ঘটনাই বর্তমান থাকে না—অতীতের অনুবৃত্তি হয়ে পড়ে। সুচাঁদের সমর্থ বিশ্লেষণ, স্মৃতিধৃত ও রক্ষণশীল আবেষ্টনীর তাৎপর্য এখানে।

চিত্রকর তার ছবির মধ্যে বাস্তব আর আদর্শের সমন্বয় ঘটায়—যা আছে তার চেয়ে যা ঘটা সম্ভব তার প্রতিও নজর থাকে তার। এই প্রক্রিয়ায় ছবিতে রেখা ও রং সামান্য অতিশয়নকে আশ্রয় করে। সুচাঁদ কথাশিল্পী বলে প্রায় সর্বদাই তার আচার আচরণের সঙ্গে নাট্যগতি, আকস্মিকের সমাপতন, অতিশয়নের টানাপোড়েন দেখা যায়। আনন্দ উচ্ছ্বাস তার সব চেয়ে বেশি, বেদনার সারাৎসার তার সবচেয়ে অনিরুদ্ধ। হাঁসুলীবাঁকের কথক জানাচ্ছেন—পিসী হল 'অরণ্য' অর্থাৎ অরণ্যের মতো, অরণ্যে যেমন জল পড়লে ঢেঁকি হয়, পাতা পড়লে কুলো হয়, অরণ্য যেমন মাতালে ঝড় ওঠে; কাঁদলে বর্ষা নামে, তেমনি পিসী তিলকে করে তাল, উই ঢিপিকে করে পাহাড়, কাঁদলে গগন ফাটিয়ে চেঁচায়, হা-হা করে হাসে, ধেই ধেই করে নাচে।' (৩য় পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) এই অতিশয়নের জন্যই সুচাঁদ হয়েছে উপকথার ভাণ্ডারী। উপকথা কেবল যা ঘটে যায় তার বিবরণ (documentation) নয়—যা ঘটা উচিত তার ব্যাখ্যান-ও। ফলে ঘটমানতার সঙ্গে ঔচিত্য, যোজ্যতা আর ব্যাখ্যান সহ উপকথা হয়ে ওঠে এক প্রতিবেদন। এজন্যই সুচাঁদকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়।

সুচাঁদ বদ্ধ কালা। অধিকাংশ কথাই সে শুনতে পায় না। এতে সম্ভবত ভালই হয়েছে। চলমান শব্দের জগৎ তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। তার ভাষ্য তার বিন্যাস তাই অতীতের এক বিশেষ সময়ের সঙ্গে যুক্ত করে। সুচাঁদ বর্তমানে বাস করলেও তার প্রবণতা অতীতের। এর কারণ সে শোনে কম। তার স্মৃতির অতলে তরঙ্গ ওঠে কম। সে যা বলে তা অনেককাল আগেকার কথাই থেকে যায়। সুচাঁদের মুখে যখন উচ্চারিত হয়—'দেবতার পুজো-আচ্চা করাবি, না গাড়ে পাড়ে পরি?' তখন তা কেবল একটি প্রশ্ন থাকে না—হয়ে পড়ে নির্দেশ। যখন বলে সে—'ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।' তখন—মনে হল, 'সুচাঁদের মুখ দিয়ে যেন দেবতাই ওই কথাগুলি বললেন—ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনও ভাল লয়।' (১ম পর্ব, এক পরিচ্ছেদ) কথা তো নয় এ হল দৈব আদেশ। সুচাঁদ এই ভাবে হাঁসুলীবাঁকে ছায়া ফেলেছে। এক অতীত সংস্কৃতির প্রতিধ্বনি তার ভাষ্যে পরিবেশনে স্পষ্ট হয়।

কাহার সমাজের মন্বন্তরের সাক্ষী সুচাঁদ। কেমন করে নীল কুঠির সাহেব-মেমরা হারিয়ে গেল—চৌধুরীরা হল জাঙল বাঁশবাদির মালিক, সে ইতিহাস 'থোকা জমা ওয়াসিল বাকি'-র কাগজে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় সুচাঁদের বিবরণে। সুচাঁদের বিবরণে কত্তাবাবার খড়ম পায়ে দাঁড়ানো আশ্চর্য রূপটি ঐ জমিদারি কাগজ পত্তরে থাকা সম্ভব নয়। 'খড়ম পায়ে, দণ্ড হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষ আর ধবধবে পৈতের শোভায় বুক ঝলমলিয়ে, ন্যাড়া মাথায় যিনি রাত্রে চারিদিকে ঘুরে বেড়ান' (১ম পর্ব, দুই পরিচ্ছেদ)—তাকে প্রতিষ্ঠা করেছে সুচাঁদের উপকথা। এই কত্তাবাবা ছাড়া কাহার-জীবন অনুশাসনহীন—উদভ্রান্ত—অনিশ্চিত।

সুচাঁদের কাহিনীর সবটাই গম্ভীর বা আধ্যাত্মিক এমন নয়। কখনও সে বলে মানুষের চেনা ব্যবহার বিধির কথাও। কে কেমন স্বভাব—কেন এমন স্বভাব, বলে সেসব কথা।

করালী সম্পর্কে ছড়া কাটে—'বেগুন কেন খাড়া? না বংশাবলীর ধারা।' (১ম পর্ব, চার পরিচ্ছেদ) বলে 'মজার 'মনস্তরা'র' কথা—যখন 'নিম তেলে পানুর ঠাকুরদাদার বাবার তৃতীয় পক্ষের পরিবার রঙ লাগালে আটপৌরেদের পরমের কত্তাবাবার সঙ্গে'! (১ম পর্ব, পাঁচ পরিচ্ছেদ) এভাবে কাহার সমাজের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সময়ের স্মৃতি পুঞ্জিত হতে থাকে সুচাঁদের কথায়।

সুচাঁদ বয়স্ক মহিলা। কন্যা বসন আর নাতনি পাখি! নাতিন জামাই করালী। তবু, সম্ভবমত নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেয় সে। কখনো মোষডহরির বিলে ঘাস কাটে, কখনো বনওয়ারীর মতো কারো মাঠে কাজ করে। অনিশ্চিত—শ্রমসাধ্য কষ্টকর জীবন সংগ্রাম তার। এতশত করেও তার ক্ষুধা সর্বদা নিবৃত্ত হয় না—বস্ত্র শতছিন্ন—লজ্জা নিবারণ করে কোনরকমে। এরকম পরিস্থিতিতে কিসের টানে যে সে হাঁসুলীবাঁকের উপকথাকে আগলে রাখে তা বোঝা কঠিন। লোকসংস্কৃতির ধারাবাহিকতা (folk continuuam) এভাবে স্পষ্ট হতে থাকে।

প্রবল এক ঝড় এসেছিল হাঁসুলীবাঁকে। তার সংবাদ পাওয়া যায় চন্দনপুরে—কলকাতা থেকে আসা টেলিগ্রাফ মারফৎ। করালী সে খবর এনে দিয়েছিল। সুচাঁদ সেই প্রবল ঝড়ে বাইরে বেরিয়ে উল্টে পড়ে। পা ভাঙে। এর একটু আগেই করালীর মুখে সে শুনেছিল 'বাবা ঠাকুরের ডিঙে উল্টাচ্ছে।' (৫ম পর্ব সাত পরিচ্ছেদ) দুটি ঘটনাকে একই বাস্তবের দুটি দিক বলতে হয়। দেবতা, দেবাশ্রিত গাছ আর দেবতার উপকথা বলা এই বৃদ্ধা—সবাই এক প্রবল ঝড়ের ধাক্কায় তছনছ হয়ে গেল। ঝড়টিকে যদি আধুনিকতা বলি—বলি পাশ্চাত্যের অভিঘাত খুব ভুল হবে না। ট্রাজিডি এই—আধুনিকতার প্রতিনিধি করালীর আশ্রয়ে হাসপাতালে ভাঙা পায়ের চিকিৎসা করার জন্য যেতেই হল সুচাঁদকে। সমাজের বাইরে এক রেল স্টেশনে পরিত্যক্ত অবস্থায় কাটল তার শেষ দিনগুলি।

সুচাঁদের এই পরিণতি কতকটা আদর্শায়িত বোধ হয়। তারাশঙ্কর এখানে কথকের খোলস অনেকটাই খুলে ফেলেছেন যেন। বহুবার অংশটি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তবু আর একবার উল্লেখ করা উচিত মনে হচ্ছে। 'রেলের হাসপাতালের আশ্চর্য চিকিৎসায়' সুচাঁদের পা ঠিক হয়েছে—কাটতে হয় নি। 'লাঠি ধ'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেড়ায় ভিক্ষে ক'রে।' (শেষ পর্ব) আধুনিক জীবনপ্রবাহে এই ভাবে ভাঙা গড়ার দুই সীমায় কেঁপে যায় সুচাঁদের টিকে থাকা। তার মধ্য দিয়ে একটি ক্ষীণ রেখা যেন তৈরি হতে থাকে। 'চন্দনপুরের ভদ্রলোকদের বাড়ি' আর 'ইস্টিশানের গাছতলায় বসে'—'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' বলে সে—'কেউ থাকলেও বলে, না থাকলেও বলে, বলেই যায়'। তার এই বলার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা হাঁসুলীবাঁকের অন্যতম চালিকা-শক্তি। যা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে—তার সশব্দ অনুধ্যান এইখানে। কেউ এই মৌখিক পরম্পরায় আগ্রহ বোধ করে না। করার কথাও নয়—'বাঁশবনে ঘেরা তন্দ্রা-মাখা স্বপ্নসুলভ ছায়াচ্ছন্ন হাঁসুলীবাঁকের কত্তাবাবার মতো অভিভাবক দেবতা (guardian deity) আর সর্বোপরি হাঁসুলীবাঁকের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী ছাড়া এই উপকথা শব্দচিত্র মাত্র। আর তাই যখন সুচাঁদ হাহাকার করে বলে : 'বাবা, ছেলেবেলায় শুনেছি, হিয়ের জিনিস যা—তা মাথায় রাখলে উকুনে খায়, মাটিতে রাখলে পিপড়ে ধরে, হাতে রাখলে নখের দাগ বসে, ঘামের ছোপ লাগে! তাই হিয়েতে রেখেছি। হিয়ের জিনিস নিয়ে হিয়েতে যদি কেউ রাখত—তবে থাকত।' বস্তুত, উপকথা জীবন্ত থাকত যদি তার প্রেক্ষাপট হাঁসুলীবাঁকের কাহার জীবন জীবন্ত থাকত। তা না হলে যতই মাথায় রাখা হোক

মাটিতে ফেলা হোক কিংবা ধরা থাক হাতে—তার ক্ষীয়মাণতা চলতেই থাকে—প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক শক্তিতে ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকে উপকথার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। এই সচেতনতা সুচাঁদের থাকার কথা নয়। তারাশঙ্কর এই কথাগুলি তার মুখে যোজিত করে সুচাঁদকে আদর্শায়িত করেছেন। বিশেষত এরপর সুচাঁদ যখন বলে : 'তা (হিয়ের জিনিস হিয়েতে রাখা—অ. বি.) তো কেউ নিলে না, রাখলে না। আমার সাথে সাথেই ও উপকথার শেষ। তবে পার তো নিকে রেখো।'—তখন মৌখিক রীতিতে চলমান বিবর্তমান ক্ষীয়মাণ উপকথা পারলে লিখে রাখতে হবে, এই অনুরোধ সম্পূর্ণ আদর্শায়ন। তারাশঙ্কর এই উপকথা হৃদয়ে ধারণ করে লিখে রেখেছেন—এমনও ভাবা যেতে পারে। তবে সেই রকম পরিস্থিতিতেও উপকথা বেঁচে থাকতে পারে না—বড়জোর উপন্যাস রচিত হয়, এইমাত্র। সুচাঁদ নয় তার স্রষ্টাই ক্রমে ছায়া ফেলতে থাকেন কথিত সংস্কৃতির উপর—তা কতকটা কৃত্রিমও হয়ে পড়ে।

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-র পত্রিকা সংস্করণে হাঁসুলীবাঁকের উপন্যাসের মাত্রা কেমন করে তারাশঙ্করের হাত ধরে উপকথার মৌখিক পরম্পরায় প্রবেশ করছে তার প্রমাণ স্পষ্ট ছিল। সেখানে ছিল—'সুচাঁদ এই উপকথা বলেছে আমাকে।' আর শেষে বলত সুচাঁদ—'আমি যতকাল আছি শুনতে পাবা। আমি ফুরুলে এ উপকথার শেষ। পারতো 'নিকে একো' (লিখে রেখো)।' খুব স্পষ্ট ছিল এই বিনিময়। তবে সুচাঁদ প্রসঙ্গে উপন্যাসের পরবর্তী সংস্করণ গুলিতে এই স্পষ্ট বিনিময় সামান্য আড়াল করেছেন তারাশঙ্কর—তাতে উপন্যাসের গঠন সামান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। চরিত্র হিসাবে সুচাঁদ বাস্তব থেকে শিল্পের ভুবনে প্রবেশাধিকারও পেয়েছে কতকটা।

১৯

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা : পাঠ বিবর্তনের তথ্যবিচার

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ১৯৪৬ সালের শারদীয়া 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়। সে-বছর দাঙ্গার কারণে কলকাতায় অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শারদীয়া সংখ্যাটি দেরি করে প্রকাশ পায়। সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। (পশ্য : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *আমার সাহিত্য জীবন*; দ্বিতীয় আকাদেমি সংস্করণ; ২০০৭; ২৯৪ পৃ.) এরপর পুস্তকাকারে *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের আষাঢ় নাগাদ। প্রকাশক—মনোজ বসু। প্রকাশক সংস্থা বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা. লি.। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবৎকালে বেঙ্গল পাবলিশার্সের নটি সংস্করণ প্রকাশ পায়। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে পত্রিকা-সংস্করণের বিপুল পাঠ পার্থক্য লক্ষিত হয়--পঞ্চম সংস্করণ পরবর্তী (আষাঢ়, ১৩৬৪) সংস্করণগুলিতে তারাশঙ্কর তেমন পাঠ-বদল করেন নি। চতুর্থ সংস্করণ (আশ্বিন ১৩৬২)-এ একটি মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এর আগে করালী চন্দনপুরে কাহারদের শ্রমিক হিসাবে ভাগ্য পরিবর্তন করার চেষ্টায় নেতৃত্ব দিয়েছে। চতুর্থ সংস্করণে দেখা গেল করালী গ্রামে ফিরে আসছে। এই পরিবর্তনটি মৌলিক। সাধারণভাবে পত্রিকা-সংস্করণ থেকে গ্রন্থ সংস্করণের পাঠ বিবর্তনটি প্রকৃতিগতই শুধু নয় আকৃতিগতও বটে। বিশেষত দ্বিতীয় সংস্করণ (আশ্বিন, ১৩৫৫)-এর সঙ্গে পত্রিকা-সংস্করণেও (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯) একই প্রবণতা লক্ষ করি। 'পর পর দুটি সংস্করণেই তারাশঙ্কর গ্রন্থটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* প্রথম সংস্করণের পরে পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণে দশ ফর্মা বেড়ে গিয়েছিলো।' (চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় ও সনৎকুমার গুপ্ত-কৃত গ্রন্থপরিচয় : *তারাশঙ্কর রচনাবলী*; সপ্তম খণ্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি.; কলকাতা; চতুর্থ মুদ্রণ-ভাদ্র ১৪০০; ৪২০-২৮ পৃ.) মনে করিয়ে দিই, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত প্রথম সংস্করণটি ছিল ২৮ ফর্মার সামান্য বেশি। ৪৫২ পৃ.। এর পর দশ ফর্মা বা ১৬০ পৃষ্ঠা বেশি হওয়া! রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। জীবৎকালের শেষ তথা নবম সংস্করণেও পরিবর্তন করেছেন তারাশঙ্কর। বদল হয়েছে স্বরচিত গানগুলির ক্ষেত্রেও।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় 'প্রকাশকের নিবেদন' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত রচনায় মনোজ বসুর প্রদত্ত তথ্য উল্লেখ করছি।

(১) প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের (আষাঢ়, ১৩৫৪) সামান্য কিছু পরেই ১৩৫৪ শেষ হবার মাসে—বইখানি সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়। 'অতিঅল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত' হবার পর 'রসিক পাঠকবর্গের তাগিদে' 'বিব্রত' হয়ে প্রকাশক দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করেন আশ্বিন ১৩৫৫ নাগাদ।

(২) দ্বিতীয় সংস্করণে পরিবর্তনের আসল তাগিদ ছিল তারাশঙ্করের। তাঁর মতো অতৃপ্ত লেখক বাংলাদেশে বিরল। ফলে দ্বিতীয় সংস্করণটি হয়ে উঠেছে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন। 'সংস্কার করতে বসে বইখানিকে তিনি প্রায় নূতন করে লিখেছেন।'

(৩) পরিবর্তনের কারণ—'কাহার জীবনের যে সব কথা পূর্বে ছুট পড়েছিল' তারাশঙ্কর তা বলেছেন। তাছাড়া 'চরিত্রগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করে' তোলাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

বর্তমান পরিচ্ছেদে সংস্করণ পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সন্নিবেশ করা সম্ভব হচ্ছে না। সম্ভবমতো আমরা পাঠ-বিবর্তনের মূল ধারাগুলিকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছি। পাঠক সেই ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হলেই হাঁসুলীবাঁকের বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন।

আনন্দবাজার-পাঠের সঙ্গে গ্রন্থিত হাঁসুলীবাঁকের প্রধান পার্থক্য পর্ব ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসে : পত্রিকা-পাঠে পর্ব-বিভাজন ছিল না। পত্রিকার ২০ পৃষ্ঠায় 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' আরম্ভ হয়েছে। শেষ হয়েছে ৭৮ পৃষ্ঠায়। এর মধ্যে ১৪টি পরিচ্ছেদ ('এক', 'দুই',..........' চৌদ্দ'—এইভাবে) রচিত হয়েছিল। পর্ব-বিন্যাস প্রথম সংস্করণের পর থেকে শুরু হয়েছে। প্রথম গ্রন্থিত সংস্করণে পর্ব-বিন্যাস ছিল এইরকম :

১ম পর্ব	:	১—৫ পরিচ্ছেদ	:	১—৮৮ পৃ.
২য় পর্ব	:	১—১২ পরিচ্ছেদ	:	৯১—১৯৭ পৃ.
৩য় পর্ব	:	১—৫ পরিচ্ছেদ	:	২০১—২৬৬ পৃ.
৪র্থ পর্ব	:	১—২ পরিচ্ছেদ	:	২৬৯—৩১২ পৃ.
৫ম পর্ব	:	১—৮ পরিচ্ছেদ	:	৩১৫—৪২৭ পৃ.
শেষ পর্ব	:	পরিচ্ছেদ বিভাজন নেই	:	৪২৯—৪৫২ পৃ.

পরবর্তী সংস্করণগুলিতে প্রায় অনুরূপ পরিচ্ছেদ ও পর্ব-বিন্যাস দেখা যায়। পর্বগুলির আগে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি আর পরিচ্ছেদের শুরুতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম পর্ব ব্যতিক্রম। এটি 'এক' পরিচ্ছেদ চিহ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে। আনন্দবাজার সংস্করণে পর্ব-বিভাগ ছিল না। পরিচ্ছেদের সূচনায় এক, দুই, তিন প্রভৃতি মুদ্রিত হয়েছে।

পত্রিকা সংস্করণে গান বেশি নেই। গান যা ছাপা হয়েছিল—উল্লেখ করছি।

১. নয়-পরিচ্ছেদ, মিত্র গোপালপুর থেকে পাল্কী নিয়ে আসার সময় :

সরাসরি আল পথে.....
জোর পায়ে চলিব
প্লো হিঁ প্লো হিঁ
— জেরাটাকে বাঁয়ে ভাই।
— প্লোহিঁ— প্লোহিঁ......

২. নয়-পরিচ্ছেদ, বনওয়ারীর অনুরোধে কালোশশী কোপাই-এ চাঁদনি রাতে গেয়েছে :

আমার মনের 'অঙের'র ছটা
তোমায় ছিটে দিলে না—
পদ্ম পাতায় কাঁদিলাম হে—
সে জল পাতা নিলে না....

—মাত্র এই দুটি গান! পরবতী সংস্করণ-গুলিতে গানের সংখ্যা বেড়েছে। শুধু বাড়ে নি, উপন্যাসের সঙ্গে নিবিড় বুনটে সন্নিবেশিত এ-গানগুলি হাঁসুলীবাঁকের জীবন রসধারার বৈশিষ্ট্যটি চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে।

আনন্দবাজার সংস্করণের ভাষা বৈশিষ্ট্যটি সামান্য পৃথক ছিল। তারাশঙ্কর সম্ভবত এই আখ্যানের ভাষাটিতে যে আঞ্চলিকতার লক্ষণ সঞ্চার করেছিলেন, তার প্রয়োগ-সাফল্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা তখনও তৈরি হয় নি তাঁর। পত্রিকা সংস্করণে বন্ধনীভূক্ত প্রচলিত মান্য ভাষার প্রতিশব্দ জুড়ে দিয়ে তিনি যেন পাঠককে সহায়তা করতে চেয়েছেন। পরবর্তী

কালে রীতিটি প্রায় সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। গ্রন্থিত সংস্করণে পাঠককে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। এই পরিবর্তনের কারণ নিশ্চয় তারাশঙ্কর তাঁর Narrative-টিকে ততদিনে বাংলার উপন্যাস পাঠকদের উপযোগী বলে আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছেন। স্বভাবতই কমে এসেছে ধরিয়ে দেবার অতিরিক্ত উদ্যম। আনন্দবাজার সংস্করণের কিছু শব্দ ও বন্ধনীভুক্ত অর্থ উল্লেখ করার ব্যাপারটি দেখাতে চাই।

এক-পরিচ্ছেদ।। 'হদের' (হ্রদের), 'রপমান' (অপমান) 'যেয়েছিল' (গিয়েছিল), 'পিতিবিধেন' (প্রতিবিধান), বানাসরে (বাসরে), 'পেয়োজন' (প্রয়োজন), অতিদিন (রাতদিন), আতে (রাতে), 'সমপ্যন' (সমর্পণ), 'পভু' (প্রভু), এঁটে (কন্দ), 'ঘেরানে' (ঘ্রাণে), সামাজ (সমাধি), অতন (রতন), 'পিতুল' (প্রতুল), 'ধোব' (ধ্রুব), আগ (রাগ), মেজাপ (মেজাজ), 'ছেয়রে', (শিয়রে) 'রোপোদ্দরণ' (উপদ্রব), 'কেত্তনের' (কীর্ত্তনের), 'এখো' (রেখো), 'থেয়াটারটায়' (থিয়েটারে), 'ব্যান্নন' (ব্যাঞ্জন), 'অমরেতো' (অমৃত), 'বেঙ্কে' (ব্যাঙ্কে), কেরাচি (কেরোসিন)।

দুই-পরিচ্ছেদ।। 'আতে' (রাতে), আশ্চয়ে (আশ্রয়ে), পে-কা-শু (প্রকাণ্ড)।

তিন-পরিচ্ছেদ।। পেশস্ত (প্রশস্ত), আখ (রাখ), ফেরেম (ফ্রেম), লারব (নারব), 'নেবারণ' (নিবারণ), 'পেচণ্ড পেহার' (প্রচণ্ড প্রহার), ত্র্যাল লাইনে (রেল লাইনে), লটবর (নটবর), 'রজগর' (অজগর), 'ঘেত্য' (ঘৃত), 'জিভ্যা' (জিহ্বা), 'অসনা' (রসনা), 'থান' (স্থান), পব্বত (পর্বত), 'পাসরন' (ভুল), 'পিতুল' (প্রতুল), অক্ত (রক্ত), 'বেবরণ' (বিবরণ), ওজকারের (রোজগারের), রন্ন (অন্ন), 'ছেরায়ু' (চিরায়ু)।

চার-পরিচ্ছেদ।। দব্য (দ্রব্য), 'থানটি' (স্থনটি), 'মনন্তর' (মন্বন্তরা), 'ভেষণ' (ভীষণ), দুগ্যতি (দুর্গতি), যেয়েছিল (গিয়েছিল), পেসব (প্রসব), 'শোগে' (শোকে), ওদ (রোদ), দুগ্যন্ধ (দুর্গন্ধ), অক্ষে (রক্ষা), ওগ (রোগ), নিব্যুনেদ (নির্বুনেদ), যেয়েছে (গিয়েছে), 'ভদ্দ শুদ্দদের' (ভদ্র-শুদ্র -Sic), তিভুবন (ত্রিভুবন), 'নেনো' (নত), 'আন্না বান্না' (রান্না বান্না), 'আতে' (রাতে), 'ওষ' (রোষ), 'ট্যান' (ট্রেন), 'অবিবার' (রবিবার), শ্যাল (শেয়াল), সতর (সতর্ক), 'কুকড়েটা' (মুরগী), 'দব্য' (দ্রব্য), নিশেষে (নিঃশ্বাসে)।

পাঁচ-পরিচ্ছেদ।। 'অক্তের' (রক্তের), ত্যাজে (তেজে), 'গিহিনী' (গ্রহণী), ওগ (রোগ), 'ছেরউগী' (চিররোগী), 'কালারুদ্যু' (কালারুদ্র শিব), আত (রাত), 'আঙা' (রাঙা), 'অক্তের' (রক্তের), যেয়েছে (গিয়েছে), 'সোমকালে' (সকালে), সিজিয়ে (সিদ্ধ করে), আঁতের (আত্মীয়তার), 'তরাস' (ত্রাস), 'অল্যায়' (অন্যায়), আজা (রাজা), আত্য লষ্ট (রাজ্যনষ্ট), নিচ্চয় (নিশ্চয়), পরিজনকে (স্ত্রীকে), 'সব্যাগ্যে' (সর্বাগ্রে), গজালছে (গজিয়েছে), পিতিকার (প্রতিকার), 'খিটকাল' (কেলেঙ্কারী), যেয়েছে (গিয়েছে), লারলাম (নারিলাম), বাগ মানাতে (শাসন করতে), 'এগে' (রেগে), 'জাওন' (কাদা মাটি), যেছে (যাচ্ছে), 'পাট' (কাজকর্ম), ত্যাজ (তেজ), 'বেপয্যয় ত্যাজ' (বিপর্যয় ঘটাবার মত তেজ), লেঙুড়ে (লেজে), 'আজী করালছি' (রাজী করিয়েছি), 'বাখার' (ধানের গোলা), দু-পসুরী (দশ সের), 'সালপেট আলুমিনি' (সালফেট অব এ্যামোনিয়া), 'হলছিল' (হয়েছিল), 'মোষের কোধ' (মহিষের ক্রোধ), 'লাল বন্ন' (লালবর্ণ), 'কেডামাতন' (উন্মত্ত নাচন), 'জাওন' (কাদামাটি), 'স্তেঁহ' (স্নেহ), 'আষিড়ে কিল' (আষাঢ়ে কিল), পারা (মত), সাতে (সাথে), মিচ্ছি মহাশয় (মিশ্র মহাশয়), লগন্দ (নগেন্দ্র)।

ছয়-পরিচ্ছেদ॥ সতর গমনে (সত্ত্বর গমনে), 'নেবেদনটা' (নিবেদন), 'পিতিপুরুষে' (পিতৃপুরুষ), 'আশ্চয়' (আশ্রয়), 'সোঁগুষ্ঠীর' (স্ব-গোষ্ঠীর), প্যাট (পেট), কর্তা বাপের (ঠাকুরদাদার), এখে (রেখে), 'অদেষ্টের লীলেনেকন' (অদৃষ্টের লীলা লেখন), 'বিক্কম' (বিক্রম), 'আমুতির লড়াইয়ে' (অম্বুবাচীর দিনে কুস্তি প্রতিযোগিতা), 'সখা সম্পাদা' (সখা সম্পদ), সটক্যাস (সুটকেস), 'বেছনা' (বিছানা), 'নাইন' (লাইন), 'সিলিপাট' (শ্লিপার), পেবাতী (প্রভাতী), নিম্মলা (নির্মলা), সিধু (সিদ্ধেশ্বরী), 'জগধাত্তি' (জগদ্ধাত্রী), কন্যে (কন্যা), অঙের খেলা (রঙের খেলা), 'চিলোকে' (স্ত্রীলোকে), 'খানিক অর্ধেক' (অল্প স্বল্প), 'মিত্যু' (মৃত্যু), বাবুরি গাছের (বনতুলসীর), 'মোট ঘাট' (মালপত্র), বডা (বড়), লেগে (জন্য), 'উগীর' (রুগীর), ক্ষ্যামতা (ক্ষমতা), 'রবশ্যাষে' (অবশেষে), 'হেন সেলে' (হেঁসেলে), পিথিমীর .(পৃথিবীর), ছেষ্ট (শ্রেষ্ঠ), কোধ (ক্রোধ), 'বেপযায়' (বিপর্যয়), 'ডাটো মরদ' (শক্তিশালী জোয়ান), 'কত্তব্য' (কর্তব্য), 'আজলক্ষ্মী' (রাজলক্ষ্মী), 'পলেনের মাঠে' (পলিপড়া মাঠে)।

সাত-পরিচ্ছেদ॥ সওয়ারী (পাল্কী), 'ঐশ্বর্য্যের' (ঐশ্বর্যের), 'লয়তো' (নয়তো), 'রজ' (আওয়াজ), 'অক্ষে' (রক্ষে), 'রোপোকথায়' (উপকথায়), মযোদা (মর্যাদা), বুল্লে (বুঝলে), 'লালা' (নালা), ভিনু (ভিন্ন), তেপেখে (তিন পক্ষীয়), 'দ্যালে' (দেয়ালে), 'ধয্য' (ধৈর্য) 'স্যা-না' (সেয়ানা), 'লিস' (নিস), থা (রা), পাথর (শিলাবৃষ্টি), বিধেতা (বিধাতা), 'কালারুদ্দু' (কালরুদ্ধ), 'রিন্দ ভোবন' (ইন্দ্র ভুবন), ফেলালছে (ফেলেছে), 'ছেরাদ' (শ্রাদ্ধ), 'বেড়াইছিলাম' (বেড়াচ্ছিলাম), রইছে (রয়েছে), 'বিক্কয়' (বিক্রয়), লাগালছি (লাগিয়েছি), 'মিনি' (বিনা), 'ব্যাভে' (জিভে), 'নিদ্দুষীকে' (নির্দোষকে), 'নিকে' (লিখে), 'পস্তুত' (প্রস্তুত), 'পিতি বিধান' (প্রতিবিধান), 'ফেলাইছে' (ফেলেছে), 'ওজগারই' (রোজকার), 'ডরে' (ভয়ে), বাঁশের 'মুড়োর' (শিকড় শুদ্ধ বাঁশ)।

আট-পরিচ্ছেদ।। 'মন্বন্তরা' (মন্বন্তর), 'শোশান' (শ্মশান), 'লীল' (নীল), 'বাগাল মান্দের' (রাখাল মাহিন্দার), 'দুপরের শ্যাল' (দুপরের শেয়াল), আপন 'কাবেজে' (হাতের কব্জায়), 'শুকুনি' (শকুনি), 'পেছুতে' (পিছনে), 'চরণ-দোক' (চরণোদক), যেছিস' (যাচ্ছিস), 'আ' (রা), 'ক্যা' (কে), লরমকে (নরমকে), পাপ্য (প্রাপ্য), 'লোকের' (লোকের), 'মিনি' (বিনা), 'ক্রধে' (রেঁধে), হা-'টে' (গো), বেপার (ব্যাপার), 'অয়েছেন' (রয়েছে।

নয়-পরিচ্ছেদ ॥ 'ব্যাল' (বেল), 'নেপোট' করে (নিঃশেষ করে), 'নামতে' (নীচে), পচি (পশ্চিম), বাগে (দিকে), 'বারজালা' (জানালা), নোহার (লোহার), তিভঙ্গ মুরারি (ত্রিভঙ্গ মুরারি), 'দি-নি' (দিকিনি), ল (নয়), 'আস্তা' (রাস্তা), 'শুদিয়ে আবিয়ে' (জিজ্ঞাসাবাদ করে), 'রনুমতি' (অনুমতি), 'লেয়া' (লওয়া), 'কাপ' (সঙা), সবে না (সহ্য হবে না), 'বেলাতী বাজনা' 'গড়ের বাদ্যি' (ব্যাগু-ব্যাগপাইপ), 'বশকিশ' (বকশিশ), 'সোর' (সাড়া), লারায়ণ (নারায়ণ), 'চ' 'চ' (চল-চল), 'মার' করবি? (মারামারি করবি)? সি, (সে), ' খেল' (গেল), 'টিটে' (টিট্রিভ)।

দশ-পরিচ্ছেদ।। গভ্যে (গর্ভে), 'পাট' (কাজ), 'যোবতী' (যুবতী), কালারুদ্দু (কালারুদ্র), 'মার্জনা' (মার্জনা), 'অক্ষা' (রক্ষা), 'বাতের চাষ' (সরস মাটিতে ঠিক সময়ে চাষ), 'খানিক আদেক' (একটু আধটু), 'বেজুত' (অসুস্থতা), 'সুকুমোরী' (সুকুমারী), শলা পরামশ্য

(পরামর্শ), 'লেয়ম' (নিয়ম), 'হলছে' (হয়েছে), 'টায়েম' (টাইম), 'অঙ' (রঙ), 'তুটি' (ত্রুটি), 'হা' (নাকি)?, 'বেপার' (ব্যাপার), 'লইলে' (নইলে), 'মিত্যু, (মৃত্যু), 'মার' (মারামারি), 'উবদণ্ডী' (উগ্রভাবে উদ্যত), ডারয়েছিল (ভয় পেয়েছিল), 'জাগায়' (জায়গায়, 'পিতুল' (প্রতুল), 'বিদ্ধ' (বৃদ্ধ), ড্যার বছর (দেড়), 'ত্যাল' (তেল), 'আমও' (রামও), 'অযুধ্যে' ও (অযোধ্যা)।

এগারো-পরিচ্ছেদ।। 'অক্ষে' (রক্ষে), 'মানুষ' (মিনষে), 'দুমুড়ে' (দুমড়ে), 'পশ্চিমে' (পশ্চিমা), 'আস পূন্নিমে' (রাস পূর্ণিমা), 'আজবাড়ীতে' (রাজবাড়ীতে), 'আদাড়' (বন), 'ঠেঙানাটি' (ঠেঙালাঠি), শোশাঁনের (শ্মশানের), দেওয়াল 'বারুইয়ে' (মাটির দেওয়ালের কারিগরে)', 'রনুমতি' (অনুমতি), 'রাদেশ' (আদেশ), 'হ' (হাওয়া), 'বারজালা' (জানালা), 'মুনিষ' (মজুর), 'অগ্নভাগ' (অগ্রভাগ), 'স্তেঁহ' (স্নেহ), 'এলেম' (কৃতিত্ব), একপাই (আধসের), ভাবোনা (ভাবনা), 'কায্যটি' (কার্যটি), 'বিক্ষ' (বৃক্ষ), 'আজী' (রাজী)।

বারো-পরিচ্ছেদ॥ 'উপসী' (রূপসী), 'চাকি' (আস্তোন্মুখ সূর্য), 'কাঁড়' (রামধনু), 'থাকা করে থাকে' (বসবাস করে), পাউটি পাউটি (ধাপে ধাপে), 'ট্যাঁ-ফোঁ' (প্রতিবাদ), 'যোগসাজস' (ষড়যন্ত্র), 'পুত্ত' (পুত্র), 'ঝলছে' (ঝলক দিচ্ছে), আঙনাতে (অঙিনায়), 'ফুলিয়েছে' (ফুল ফুটেছে), 'উয্যুগ' (উদ্যোগ), 'লালি' (লালচে আভা)।

তেরো-পরিচ্ছেদ।। 'শিরভক্ত' (প্রধানভক্ত), 'পিথিমীর' (পৃথিবীর), 'এল' (রেল), লোব (নেব), থোড় শুদ্ধ ধান (গর্ভে শীষ সমেত ধান), পাললছে (পালিয়েছে), 'পত্ত' (পত্র), 'এতে' (রাত্রে), 'লেকগো' (নিক গিয়ে), 'আগ' (রাগ), 'আ' (রা), 'লিছে' (নিচ্ছে), দিলা (দিলে), 'দেলাম' (দিলাম), 'পেরমাইয়ের' (পরমায়ুর), 'রটাব্যা' (গুজব রটনা), 'সান' (সাড়া), 'বলা-ক' (বলা-কওয়া), 'চেতামুনি' (চেতাবনি), 'কাতিক আগন' (কার্তিক-অগ্রহায়ণ), 'চেহ্নত' (চিহ্ন), শির-শির (শীত শীত), 'লাগবে' (নাগবে), 'লাই'-ও (কলহও), 'গোঙাল' (সুড়ঙ্গ)।

চৌদ্দ-পরিচ্ছেদ।। 'সোর' (চেতনা), 'দেনমণিকে' (দিনমণিকে), যেছে (যাচ্ছে), 'জীউ'টা (জীবন), 'উপো' (রূপো), 'নিকে একো' (লিখে রেখো)।

গ্রন্থিত-সংস্করণে এরকম নেই। সেখানে অন্যভাবে আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে উপন্যাসের ভাষার সম্পর্ক নির্ণীত হয়েছে।

পত্রিকা সংস্করণে তারাশঙ্করের পরিকল্পনা নানা দিক থেকেই অসম্পূর্ণ অস্পষ্ট ছিল। গ্রন্থিত সংস্করণে ক্রমশ হাঁসুলীবাঁক রাঢ় বাংলার অবদমিত সমর্থপঞ্চম সমাজের ভাষামুখ হয়ে উঠেছে। পত্রিকা-সংস্করণের জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্র ছিল না, তাদের নাম ও বৃত্তি সম্পর্কেও তারাশঙ্কর অনিশ্চিত ছিলেন মনে হয়। পরবর্তী অংশে কিছু পাঠভেদ দেখাচ্ছি, সে-সবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মিলবে।

১. গ্রন্থের প্রথম পর্বের এক পরিচ্ছেদের শুরুতে তিনটি বাক্য। তৃতীয় বাক্যে আছে শিস শুনে 'বিশেষ করে কাহারেরা' সন্ত্রস্ত হয়েছে। পত্রিকায় 'কাহার'-সহ বাক্য তিনটি ছিল না। ছিল 'কাহার-বাউড়ী'। অন্যান্য জাতি সম্পর্কেও পত্রিকা-পাঠের সঙ্গে গ্রন্থিত-পাঠের পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি।

পত্রিকা-পাঠ	গ্রন্থ-পাঠ
১.১. কাহার-বাউড়ীর বসতি (২০ পৃ.)	কাহারদের বসতি (১/১ = ১ম পর্ব ১ পরিচ্ছেদ)
১.২. ব্রাহ্মণ-সদগোপ (ঐ)	কুমার-সদ্‌গোপ, চাষী-সদগোপ এবং (ঐ)
১.৩. নাপিত কলু (ঐ)	নাপিতকুল (ঐ)
১.৪. কাহার বাউরীরা (ঐ)	অর্থাৎ হাঁসুলীবাঁকের কাহারেরা (ঐ)
১.৫. কাহার বাউরীদের (২৩ পৃ.)	কাহারদের (১/১)
১.৬. কাহার বাউরিদের (ঐ)	কাহারদের (১/১)
১.৭. কাহার বাউড়ীদের (২৪ পৃ.)	বেচারী কাহারদের (১/১)
১.৮. ভদ্র মহাশয়দেরই কি একটা পূজার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল না। কাহার বাউড়ীদের...(ঐ)	তবু একদিন সন্ধ্যায় ওরাই বসালে মজলিস। কিন্তু কাহারদের (১/১)
১.৯. 'বেহারা'-পাড়া আর 'আটপৌরে' পাড়া। (ঐ)	'কাহার'-পাড়া আর 'আটপৌরে' পাড়া। (১/১)
১.১০. কাহার-বাউরীর (২৭ পৃ.)	কাহারদের (১/১)
১.১১. বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহার-বাউড়ীরই (ঐ)	......কাহারদের (১/২)
১.১২. কাহারেরা নীলের জমি চাষ করত এবং প্রয়োজন মত সাহেব মেমদের পাল্কী বইত। (২৮ পৃ.)	কাহারদের দিয়ে (১/২)
১.১৩. চৌধুরী কর্তাদের আমলেও কাহার বাউরীরা বেহারার কাজ করেছে। (ঐ)	..........কাহাররা.....(১/২)
১.১৪. হাড়ি, বাউড়ি, ডোম কাহারের মেয়েরা আঁস্তাকুড় ধোয়,....(৩৯ পৃ.)	এদের মেয়েরা.....(১/৪)
১.১৫. বামুন-বাড়িতে (৪৩ পৃ.)	সদ্‌গোপ বাড়িতে (১/৫)
১.১৬. অজ্ঞান ছোট লোক (জাত) (৪৩ পৃ.)	'অজ্ঞাত জাত (১/৫)
১.১৭. পরম আটপৌরেদের বললে (৫৯ পৃ.)	পরম দুদলকেই বললে... (৩/৫)
১.১৮. তোর খুশি.....মুচী বাড়ি যাস (৬৩ পৃ.)	তোর খুশি তু সমজে বেলা জাগুলে যেথা খুশি যাস...(৪/১)
১.১৯. বাউড়ী তো। কি যে চন্ননপুরের কারখানার ছোঁয়াও নিয়ে এল। বসন্তের উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কার সীমা নাই। (৬৪ পৃ.)	তাই বসন্ত এসে বসে আছে বনওয়ারীর কাছে। সুযোগ পেলেই বনওয়ারীকে বলবে। করালীকে এক সে-ই নিবৃত্ত করতে পারে। তাছাড়া আর একটা আশঙ্কা আছে তার। করালী যাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, তারা নিশ্চয় সাতখানা করে বনওয়ারীর কাছে করালীর বিরুদ্ধে লাগাবে। বনওয়ারীকে বুঝিয়ে সে আগে থেকেই ঠাণ্ডা করে রাখতে চায়। বনওয়ারী মাতব্বর বিরূপ হলে করালীর কি হবে, সে কথা ভেবে বসন্তের অনেক আশঙ্কা। (৪/১)

পত্রিকা-পাঠ	গ্রন্থ-পাঠ
১.২০. গুপীর....হয়েছিল মুচী পাড়ার...স্বপনে বাবা মুচী ঘরের গরু মারা বিষ.... (৬৪ পৃ.)	গুপীর কত্তামায়ের অঙ হয়েছিল ওই পাড়ার একজনার সাথে। বাবা স্বপন দিলে—মেরে ফেলাও বিষ দিয়ে। স্বপনে বাবা ইয়েদের গরু মারা বিষ হাতে দিয়ে বললে—এই লে। (৪/১)
১.২১. হতভাগার মা পালিয়ে গেল ওই চন্নপুরের লাইনের এক মিস্ত্রীর সঙ্গে অতি অল্প বয়সে ফেলে; লোকের এঁটোকাঁটা খেয়ে মানুষ হল। (৬৮ পৃ.)	(নেই। শুধু আছে :) ওই চন্নপুরের রেল লাইনে ওর মায়ের কেলেঙ্কারি.....(৪/২)
১.২২. আটপৌরেরা লাঠি নিয়ে আটপৌরে হয়েছিল, তারা পাল্কী কাঁধে কাহার হয়েছিল (৬৯পৃ.)	পরমের লাঠি নিয়ে....., বনওয়ারীরা পাল্কী কাঁধে......(৪/২)
১.২৩. সাধারণ নিয়মে তাদের জাতের মেয়েরা সতীন নিয়ে ঘর করে না। (৭০ পৃ.)	সতীনের সঙ্গে ঘর কাহার-মেয়েরা করে না। (৫/১)

পত্রিকা-পাঠে কাহাররা প্রায় সর্বত্রই কাহার বাউরি। তারা যেন বাউরিদেরই একটি অংশ। বাউরি বানানটি অবশ্য অস্থিতশীল। কোনো নির্দিষ্ট বানান রক্ষিত হয় নি। বাউড়ী (১.১,১.৮, ১.১১, ১.১৯), বাউড়ী (১.৪, ১.৫, ১.১০, ১.১৩), বাউড়ি (১.৬, ১.১৪), বাউরি (১.১০)—সম্ভাব্য সব বানানই হাজির পত্রিকা-পাঠে। অনেক সময়ই বাউরি অন্য কোনো জাতের সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে। কাহার বাউড়ি (১.১., ১.৪., ১.৫, ১.৬, ১.৭, ১.৮, ১.১০, ১.১১, ১.১৩)-র প্রয়োগ বেশি; কখনো হাড়ি, ডোম, কাহার আর বাউড়ি একাকার (১.১৪)। মুচিদের উল্লেখ আছে কখনো কখনো—গ্রন্থিত-পাঠে এসব বর্জিত হয়েছে।

উচ্চবর্ণের ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষ করি। পত্রিকা সংস্করণের ব্রাহ্মণ-সদগোপ বদলে গেছে— কুমার-সদ্‌গোপ আর চাষি সদ্‌গোপে। নাপিত কলু বদলে হয়েছে নাপিতকুল। এটি ছাপার ভুল না হলে বলতে হবে সদ্‌গোপদের সমাজের দুটি অভিব্যক্তির মতো তেলি-তিলী-কলু—বাংলার তৈল-প্রস্তুতকারী জাতিগোষ্ঠীগুলির ব্যাপারে তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে তাঁর আগ্রহ সামান্য পরিত্যাগ করলেন। একটি পাঠে দেখা গেল 'বামুন-বাড়িতে' বদলে হয়েছে 'সদ্‌গোপ বাড়িতে' (১.১৫)। বস্তুত তারাশঙ্কর উপন্যাসটিতে বামুনদের সঙ্গে কাহার (বা বাউড়ি)-দের সম্পর্ক না দেখিয়ে সদ্‌গোপদের সঙ্গে কাহারদের সম্পর্ক দেখাতে চেয়েছেন। সমাজের চালচিত্র হিসাবে এ অনেক বাস্তব হয়েছে। অস্পৃশ্য কাহারদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের সম্পর্ক ছিল প্রায় অসম্ভব; ভূম্যধিকারী ব্রাহ্মণরা উপন্যাসের কালপর্বে কৃষি-নির্ভর পুঁজি শিল্প-পুঁজিতে নিয়োগ করেছে। কৃষিক্ষেত্রে বহু দেরিতে প্রবিষ্ট শ্রমবাহিনী কাহারদের সঙ্গে সদ্‌গোপদের সম্পর্কই অধিকতর বাস্তবসম্মত।

কাহার সমাজের অন্তর্গত দুটি থাক বা clan—আটপৌরে আর কোশকেঁধেদের কথা পত্রিকা-পাঠের চেয়ে গ্রন্থ-পাঠে অনেক স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে।

২. পত্রিকা-পাঠের আঞ্চলিক পটভূমি গ্রন্থ-পাঠে অনেক বিস্তৃত বিশিষ্ট—বাস্তবসম্মত। এক্ষেত্রে একটি কথা লিখতে হচ্ছে। বাস্তবের ভূগোল আর সাহিত্যের ভূগোল অনেকাংশে এক মনে হলেও সম্পূর্ণ এক হতে পারে না। তারাশঙ্কর তেমন চানও নি। পত্রিকা পাঠের ভূগোল আর গ্রন্থপাঠের ভূগোলের তুলনা করলে তারাশঙ্করের মনোভূমির ভাঙা-গড়াটি স্পষ্ট হয়ে আসতে পারে।

পত্রিকা-পাঠ	গ্রন্থ-পাঠ
২.১ জাঙলের সীমানা বড়; হাসিল পতিতে প্রায় দেড় হাজার বিঘা (২০ পৃ.)	....হাঁসিল জমিই প্রায় তিন হাজার বিঘা, পতিতও অনেক—(১/১)
২.২ শব্দটা আসছে—বাঁশবাদির দক্ষিণ গাঁয়ের বাঁশবন থেকে (২৩ পৃ.)	শব্দটা আসছে—বাঁশবাদি গাঁয়ের দক্ষিণের বাঁশবন থেকে (১/১)
২.৩. জাঙলের পশ্চিম দিকে উঁচু গঙ্গার উপর এখনও কুঠী-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এবং. হ্রদের পুকুর বলে একটা পুকুর দেখা যায়। ওই হ্রদের......(২৭ পৃ.)	.....উঁচু ডাঙার উপর.....এবং হ্রদের পুকুরের জলা....(১/২)
২.৪. ছোট রেলের একটা লাইন চলে গিয়েছে চন্দনপুরে একটা স্টেশন আছে চন্দনপুর (৩১ পৃ.)	রেলের লাইনটা চলে গিয়েছে গাঁয়ের পুবদিক দিয়ে। চন্নপুর স্টেশন...(১/২)
২.৫. ......লাইনটা কোপাই নদীর উপর ব্রিজ বেঁধে পার হয়ে চলে গিয়েছে কাটোয়ার দিকে। (ঐ)	...চলে গিয়েছে। (ঐ)
২.৬. নীলের বাঁধের উত্তর পাড় থেকে সরু আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে নামছে জাঙলে যাবার মাঠের পথে। (৪৫ পৃ.)	নীলের বাঁধের উত্তর পাড় থেকে সরু আঁকাবাঁকা.....জাঙলে যাবার মেঠো পথে। (২/১)
২.৭. নীলের বাঁধের উত্তর পূর্ব কোণের পথটা বেয়ে পাড় থেকে করালী নামছে, কথাটা সে শুনেছিল; সে হেঁকে জবাব দিয়ে মাঠের যে আলপথটা এদের পথের খানিকটা পূর্বদিকে উত্তর মুখে জাঙলকে বাঁহাতি অর্থাৎ পশ্চিমে রেখে চন্দনপুর চলে গিয়েছে সেই পথে নামল। তার সঙ্গে চলেছে পাখী পাখীর পিছনে নসুদিদি। সারা অঙ্গ হেলিয়ে দুলিয়ে হাত নেড়ে ভঙ্গী করে কথা বলতে বলতে চলেছে। অবশ্য ওই তার অভ্যাস। নসুরামের মেয়েলী ভঙ্গী মেয়েদেরও হার মানায়।	নীলের বাঁধের উত্তর পূর্ব কোণের পথটা বেয়ে ঘাটে করালী উঠছে। চন্নপুর থেকে আসছে নিশ্চয়। সেই সেদিন রাত্রে পালিয়েছে পাখিকে নিয়ে, ফিরছে আজ সকালে। সম্ভবত কোন জিনিসপত্র নিতে এসেছে। দাঁড়িয়ে হাসছে। সঙ্গে তার পাখী (Sic) ও নসু দিদি। (২/১)

	পত্রিকা-পাঠ	গ্রন্থ-পাঠ
	চুল রেখেছে চিরুনী দিয়ে বেলকুঁড়ি দিয়ে সাজিয়ে দস্তুরমত খোঁপা বাঁধে। (৪৬ পৃ.)	হাঁসুলীবাঁকে বোশেখ মাসে দ্বাদশ সূর্যের উদয়।
২.৮.	হাঁসুলীর বাঁক যে অঞ্চলটায় সে অঞ্চলে বোশেখ মাসে দ্বাদশ সূর্যের উদয়। দু পহর পর্যন্ত কোনরকমে খাটনি খাটা যায়, তারপর একটা প্রহর পৃথিবী যেন 'অগ্নিগড়' হয়ে ওঠে। সঁওতালেরা বারোটা বাজলেই ঝুড়ি কোদাল নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। (৫৩ পৃ.)	এখানে গ্রীষ্মের দিনে খাটুনীর সময় সকাল ছটা থেকে দশটা। আবার ও-বেলায় তিনটে থেকে ছটা। (২/৬)
২.৯.	হাঁসুলীবাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহুবিস্তৃত—আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, দেশ থেকে দেশান্তর পর্যন্ত। (৬৭ পৃ.)	হাঁসুলীবাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহুবিস্তৃত— আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত। (৪/২)
২.১০.	পানার বউ এখন চন্নপুরে একজন পশ্চিমের কাছে আছে। —কিন্তু আর সবাই? কই—তারা কোথায় গেল? পাড়া যে খাঁ খাঁ করছে রে। ও হরি! নসু কথাটা তলিয়ে বুঝতে পারে নাই এতক্ষণ। এইবার বুঝেছে। বললে তারা সব আছে। সেই সন্ধ্যের কাছাকাছি সব ফিরবে। সে কাহার পাড়া আর নাই। সেদিন— সে কাল সব ফুরিয়ে গিয়েছে। বাঁশবাদি থেকে জাঙলে যাবার আলপথে—এই শীতকালেও পায়ের চিহ্ন ঢেকে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দূর্বা এবং মথো ঘাসের কণা বেরিয়েছে। চন্নপুরের আলপথ ঝকঝক তকতক করছে। (৭৮ পৃ.)	নসু বলে—পানার বউ এখন চন্দনপুরে আঙামুখো উড়োজাহাজের আস্তানায় খাটে। খাটুনি, না মাথা। ওজকার খুব; ফেশান কি! বনওয়ারী উদাস হয়ে রইল। চোখ গিয়ে পড়ল তার চন্দনপুরের রাঙা পাকা পথের উপর। রাস্তাটা ঝকঝক তকতক করছে। (শেষ পর্ব)
২.১১.	হাঁসুলীবাঁকের বেড়ের কুলে কুলে ছড়িয়ে যাচ্ছে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। বিগত হয়ে গিয়েও আবার এগিয়ে আসছে। হয়ত হাঁসুলীবাঁকের অতীত কালের কল্পে শব্দের আঘাত থেকে তৃপ্তি পাচ্ছেনা—ফিরে এসে ভাবী কালের দিকে ছুটে চলেছে। (৭৮ পৃ.)	...ছড়িয়ে যাচ্ছে দূর-দূরান্তরে; কোপাইয়ের পুলে ঘা খেয়ে আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। হয়তো হাঁসুলীবাঁকের ভাবীকালে দেশ দেশান্তরের দঙ্গে তার ঘোষণা ক'রেও তৃপ্তি হচ্ছে না—প্রতিধ্বনির মধ্যে দিয়ে ফিরে এসে অতীত কালের কল্পে কল্পে যেন আঘাত হেনে চলেছে। (শেষ পর্ব)

জাঙল-বাঁশবাদির ভূগোলটি গ্রন্থ সংস্করণে আরও স্পষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে। অনিশ্চিত (যথা 'বাঁশবাদির দক্ষিণ গাঁ'—২.২) পটভূমি স্পষ্ট হয়ে এসেছে। আবার এর বিপরীত ব্যাপারও দেখতে পাচ্ছি। সে সম্ভবত হাঁসুলীবাঁকের বাইরের দূরবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে। পত্রিকা পাঠে লাইনটি যে একমাত্র (ডবল লাইন নয়) তা স্পষ্ট করে বলেছেন লেখক; সে লাইনের পূর্ব-সীমায় যে কাটোয়া স্টেশন, তাও পত্রিকা-সংস্করণে স্পষ্ট। ভূগোলের বাস্তব আর সাহিত্যের বাস্তব এখানে মুখোমুখি। গ্রন্থসংস্করণে কল্পনার ভূগোল বিস্তৃত, অনুপুঙ্খ হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি বাস্তব ভূগোলকে অস্পষ্ট করে এঁকেছেন লেখক। পত্রিকা সংস্করণে রীতিটি খুব স্পষ্ট হয় নি।

বৈশাখ মাসের অবস্থা বর্ণনার ক্ষেত্রে পত্রিকা সংস্করণে কিছু অনুপুঙ্খ, কিছু বিস্তার ছিল (২.৮), গ্রন্থসংস্করণে তা সংক্ষিপ্ত হয়েছে। পানার বউ-এর পরিণতি দু-ক্ষেত্রেই এক, তবে গ্রন্থের উড়োজাহাজের আস্তানা সম্পর্কে ভাবনাটা তারাশঙ্কর পরে গড়ে নিয়েছেন। চন্নপুরে যাবার আলপথ একসময় ছিল কেবল করালীর বিদ্রোহী স্বভাবের অহঙ্কারী পদাঙ্ক—ক্রমে সে পথ ('আলপথ') ঝকঝক তকতক করছে—পত্রিকার ভূগোল এতটুকু বৈচিত্র্য এনেছিল। গ্রন্থে বিস্তার কম—কিন্তু বর্ণনায় শিল্পায়ন উন্নয়নের 'রাস্তা'-এসে অন্য ভূগোলের ইঙ্গিত হয়েছে। এক সময় বনওয়ারী ঐ আলপথ বন্ধ করেছিল—আজ তার ব্যর্থতা সর্বাতিশয়ী।

আর একটা বিষয়ে পত্রিকার পাঠ কেমন পুনর্গঠিত হয়েছে, তা স্পষ্ট। হাসুলীবাঁকের অলৌকিক জগৎ 'দেশ থেকে দেশান্তরে' ছড়ানো, পত্রিকার পাঠে ছিল তাই। অন্যপক্ষে গ্রন্থ সংস্করণে এই অতিজগতের যথার্থ ভূগোল শনাক্ত করেছেন তারাশঙ্কর। 'প্রেতলোক থেকে নরলোক পর্যন্ত বিস্তৃত এই জগৎ। বলা বাহুল্য বাস্তব ভূগোল এখানে পরাবাস্তবকে ছুঁয়ে আছে। হাঁসুলীবাঁকের মূল তাৎপর্য ভূগোলের বাস্তব অপেক্ষা এই রকম মনোভূমির আন্তরিক সংবাদে ধরা পড়েছে।

পত্রিকা পাঠে কয়েকটি উপকথা অতিরিক্ত। গ্রন্থপাঠে এগুলি অনুপস্থিত, অবিস্তৃত বা ইঙ্গিত মাত্র। দেখাই:

৩.১. বসন্তের সঙ্গে চৌধুরীদের 'সম্বন্ধ আজও ঘোচেনি'। বসন্ত সে বাড়িতে দুধের রোজ দেয়, টাকার তাগাদা করে না। গ্রন্থ-সংস্করণে এই বর্ণনার অতিরিক্ত সামান্য কথা পত্রিকা-পাঠে ছিল। 'কিন্তু বেটার বিধবা বউ সেই এখন বাড়ীর গিন্নী— সে বসন্ত কি পাখীকে বাড়ি ঢুকতে দেন না।' (২৮ পৃ.) মনস্তত্ত্বের বিচারে চৌধুরী গিন্নীর ঐ ব্যবহার যথেষ্ট স্বাভাবিক। তারাশঙ্কর তবু এই বিবরণ বর্জন করলেন, কারণটি বোঝা দরকার। বসন্তের একমুখী প্রেম—কাহারদের চরিত্রহীনতার যাবতীয় অভিযোগ দুর্নামের আশ্চর্য উত্তর। এ কামনা-বাসনার সীমানা অতিক্রম করে জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়েছে। সেই মনোভঙ্গিই হাঁসুলীবাঁকের প্রেক্ষণ-বিন্দু। 'তারাশঙ্কর অন্যদিকে নজর দিতে চানি নি। সদ্‌গোপ চৌধুরীদের দৃষ্টিভঙ্গি, বসন্তের ক্ষেত্রে বর্জন করেছেন।

৩.২. চন্দ্রবোড়া সাপটি মারার পর করালীর ইচ্ছা চন্দনপুরে সেটি নিয়ে যাবে। বনওয়ারী নিষেধ করে। গ্রন্থ-পাঠে নেই এমন অতিরিক্ত সামান্য অংশ পত্রিকা পাঠ থেকে উল্লেখ করি;

> —'বনওয়ারী এসেছিল। তবে আড্ডা গেড়ে বসে নাই, আসা-যাওয়া করেছে। বিকেলবেলার দিকে করালী ওটাকে নিয়ে চন্দনপুর যাবার ব্যবস্থা করেছিল; চন্দনপুর রেল লাইনের কুলীগ্যাংয়ে কাজ করে সে, স্টেশনের মাস্টারবাবু, গার্ডবাবু, লাইনের মিস্ত্রীমশায় এদের দেখবার জন্য নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছিল। বনওয়ারী এসে বললে—জাঙলের

ঘোষ-বাড়ী হয়ে যেতে হবে করালী। মেজবাবু বলে পাঠিয়েছেন।' (৩৪ পৃ.) একথায় করালী বিরক্ত হয়েছে। তার কারণ উপন্যাসের গ্রন্থ-পাঠেও বলা হয়েছে। পত্রিকা-পাঠে সামান্য অতিরিক্ত আছে :

'জাঙলের অধিবাসীদের ধার সে ধারে না। তাছাড়া—ঘোষবাবুদের সঙ্গে করালীর সম্বন্ধটা ভাল নয়। বনওয়ারী খুড়োই তাকে ছেলে বয়সে ঘোষদের বাড়ী গরুর রাখালী চাকরীতে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওই সেজ ঘোষের ছোট চামড়ার সুটকেস আর বিছানার বাণ্ডিল মাথায় বয়ে নিয়ে যাওয়ার উপলক্ষ্যেই চন্দনপুর রেল স্টেশনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। তারও আগে নেহাত ছেলে বয়সে সে মায়ের সঙ্গে ইষ্টিশানে আসত। তখন ইষ্টিশান তৈরীর সময় সে সময়ের আসা-যাওয়াকে পরিচয় বলে। সে একটা আবছা আবছা মনে আছে করালীর—অনেক লোক, অনেক ইট, অনেক মাটি, অনেক ধোঁয়া—অনেক গোলমাল। মা তার চলে যায় ইষ্টিশানের একটা লোকের সঙ্গে।' (৩৪ পৃ.)

গ্রন্থ-পাঠে এই বর্ণনা সামান্য সংক্ষিপ্ত।

৩.৩. করালীর সঙ্গী কয়েকজন আছে, করালীর সমবয়সী জন' দুয়েক, আর জন' চারেক বয়সে করালীর চেয়ে কম। সমবয়সীদের একজন রতনের ছেলে—তার নাম লটবর (নটবর), সে আবার বাপের সঙ্গে ভিন্ন; অন্যজনের বাপ নাই—সে নিজেই ঘরের মালিক, তার আসল নাম 'আখাল' অর্থাৎ রাখাল, ডাকনাম 'মাথলা'; দেহের অনুপাতে মাথাটা অস্বাভাবিক রকমের মোটা বলে কাহার বাউড়ীদের ভাষাজ্ঞান ও ব্যাকরণ অনুযায়ী মাথার উত্তরে কোন প্রত্যয় যোগ করে 'মাথলা' করেছে। হয়তো বা মাথার সঙ্গে ওয়ালা যোগ করে—অথবা পাতার মত ক্ষীণ বলে যেভাবে পাতলা হয়েছে—তেমনি কোন ভাবেই হয়েছে 'মাথলা'। ওরা দুজনেই বর্তমান কুলকর্ম 'কৃষাণী' করে। এই জাঙল গাঁয়ের সদ্‌গোপদের কৃষাণ চাকর তারা। করালীর চেয়ে যারা ছোট—তাদের দুজন জাঙলে 'মাহিন্দারী' অর্থাৎ গরুর সেবা করে; রাখালের সঙ্গে মাহিন্দরে পার্থক্য—মাহিন্দার গরুর গোয়াল সাফ করে না এবং গরু নিয়ে মাঠে যায় না। জনবাড়ীতেই কাজকর্ম করে এবং আপন আপন বাপের সঙ্গে চাষে শিক্ষানবিশী করে। আর থাকে একজন তার নাম 'নসুরাম' পাড়ার লোকে তাকে বলে 'নসুবালা'। নসু সত্যিই নসুবালা। ভাবে ভঙ্গিতে, কথায়—একেবারে মেয়েদের মত। মেয়েদের মত কাপড় পরে, মেয়েদের সঙ্গেই চন্দনপুরে মজুরনী খাটতে যায়, মেয়েদের সঙ্গে ব্রত পার্বণ করে, হাতে চুড়ি পরে, মাথায় চুল রেখে খোঁপা বাঁধে। নসুবালার কণ্ঠস্বরটিও ভারি মিষ্টি, তার উপরে সে নাচতে পারে, নাচে গানে শখও খুব। করালীর সংসারে ওই নসুবালাই গৃহিণীর কাজকর্ম করে, রাঁধে-বাড়ে, ঘর নিকোয়, ঝাঁট দেয় সন্ধ্যার পর এই সব সঙ্গী-সাথীরা এসে জমায়েত হয়। তামাক খায়, মদ খায়, ঢোল বাজায়, নসুবালা নাচ গান করে দলের কেউ কোনদিন খাল-বিল নদী বা কারও পুকুরে একটা আধটা মাছ ধরে আনে—কখন কালে কস্মিনে 'শুশুড়ে' অর্থাৎ খরগোশ কিংবা বুনো শূয়োরের বাচ্চা মেরে আনে—নসুবালাই কেটে কুটে ধুয়ে, রান্না করে। নসুবালা কাল থেকেই গ্রামে নাই—সে গিয়েছে তার মাসীর বাড়ী—সেখানে একটা বিয়ে আছে। বিয়ের বাসরে তাকে নাচতে গাইতে হবে। থাকলে বিপদ হত। সে মেয়ের মতই করালীকে একাজ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করত, কালুয়া কুকুরটার জন্য বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদত। আবার সাপটা মারার পর গোটা কাহার পাড়া জাঁকিয়ে ফিরত গল্প করে। [৪০ পৃ.]

—এই দীর্ঘ অংশ অতিরিক্ত। গ্রন্থ পাঠে এর নির্যাস নানাখানে ছড়ানো আছে।

৩.৪. কর্তার থানে সন্ধ্যায় প্রদীপ দিতে গিয়ে কালোশশীর সঙ্গে বনওয়ারীর দেখা। তারপর বনওয়ারীর ব্যবহার পত্রিকা পাঠে অন্য রকম—'বনওয়ারী অনেক কাঁদলে। আজ আর তার কোন উপায় নাই। সে বললে—তার স্ত্রীকে সে কখনই কালোশশীর মত ভালোবাসে না। কিন্তু কি করবে সে? তার স্ত্রী আজ ছোট ছোট সন্তানের জননী। তাদের মধ্যে সাঙার রেওয়াজ আছে। কিন্তু ছেলেপুলের মাকে পরিত্যাগ করে। তাছাড়া (অন্য কেউ হলে তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল এমন কাজ। সে যে বনওয়ারী—পাড়ার মাতব্বর)।' [৪১ পৃ.]

—কাহার সমাজের রীতি এখানে সামান্য অন্য রকম। গ্রন্থ সংস্করণে কাহার মেয়েরা সাধারণভাবে সতীনের ঘর করে না। বনওয়ারীর পক্ষেও তার স্ত্রীর 'ছোট ছোট সন্তানের' কথা তারাশঙ্কর পরিকল্পিত উপন্যাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। করালীকে 'কোলগত' রাখার বাসনা সেক্ষেত্রে সত্য হত না। উপন্যাসে উত্তরাধিকারীহীন মোড়ল চরিত্রের পাপ বোধবোধ আর ট্রাজিডিও এই বর্জিত অংশটি রাখলে অনেকটাই তাৎপর্য হারাত।

৩.৫. নয়ানদের বলা হত 'ঘর ভাঙা'। এসম্পর্কে অতিরিক্ত সামান্য পাঠ আছে পত্রিকা সংস্করণে।

'প্রথম প্রথম বছর কয়েক মেরামত করেছিল ওরা, শেষবার পুরনো ঘর ভেঙে নতুন করে মজবুদ ঘর করেছিল, কিন্তু বর্ষায় বানের জলে ডুবে সে ঘরেরও দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটা ধ্বসে গেল—তখন পাড়া প্রতিবেশীরা বললে—গোটা ঘরে বাস তোর অদেষ্টে নাই, খানিকটা ভাঙা এখে (রেখে) দে। তাহলে হয়তো—আর নতুন করে ভাঙবে না। কথাটা নয়ানের পূর্বপুরুষেরও মনে হয়েছিল—দশের মুখে সেই কথাটা শুনে সে অদেষ্টের 'লীলে লেকন' (অদৃষ্টের নীলা লেখন) বুঝতে পারলে এবং দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটা আধখানা তুলে বাকীটা তালপাতার বেড়া দিয়ে ঘিরে দিলে। আশ্চর্যের কথা—এরপর পাঁচবছর আর বড় বান হল না কোপাইয়ে; ঘরেও আর হাত দিতে হল না। ছ'বছরের বছর বান এল, ঘরের ভিত পর্যন্ত ডুবল কিন্তু দেওয়াল পড়ল না। পরের বছর সাহস পেয়ে ফের দেওয়ালটাকে পুরো করে ফেললে। সেই বছর আবার বান—এমন তেমন বান নয়, ঘরে জল ঢুকল; কাহার পাড়ায় সর্বাগ্রে পড়ল নয়ানের পূর্ব পুরুষের সেই দক্ষিণ দিকের দেওয়াল—তারপর পড়ল গোটা ঘর। তারপর যে ঘর গড়লে তার আর দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ওরা সম্পূর্ণ করলেনা ওপরটা সেই তালপাতা দিয়ে ঘিরে রাখলে।' [৪৯ পৃ.]

৩.৬. ঘর ভাঙাদের মাতব্বরি চৌধুরীদের আমলের ব্যাপার। 'চৌধুরী বাড়ির পতন হল, সঙ্গে সঙ্গে ঘরভাঙা কাহারবাড়ির মাতব্বরি গেল।'—এই বাক্যটির পরিবর্তে পত্রিকা পাঠে অতিরিক্ত অনেকখানি।—

শুধু তাই নয় নয়ানের ওই ঠাকুরদাদার আমলেই ওদের বাড়ীর নাম 'ঘর ভাঙাদের বাড়ী' বদলে গিয়ে নাম হল 'দাঁতাল কুঞ্জর বাড়ী'। নয়ানের ঠাকুরদাদা কুঞ্জর দাঁত ছিল বড় বড়, কিন্তু ঠিক সেই কারণেই তাঁর নাম 'দাঁতাল কুঞ্জ' হয় নাই, দাঁতের জন্য হলে নাম হত 'দেঁতো কুঞ্জ'। দাঁতাল শূয়োরের মত গোঁ, তারই মত শক্তি এবং তাঁরই মত দাঁত বেরিয়ে আছে এই জন্যই নাম হল 'দাঁতাল 'কুঞ্জ'। চৌধুরী মহাশয়দের ভাগজোতদার; পেয়ারের লোক, গায়ে ওই ক্ষমতা, ওই গোঁ—কুঞ্জ কাহার মেরে ঠাণ্ডা করে রাখত কাহার পাড়া। তারই আমলে ওই আটপৌরে পাড়ার 'বিক্কম' (বিক্রম) চুরমার হয়েছিল। 'আমুতির লড়াইয়ে' (অম্বুবাচীর দিনে কুস্তির প্রতিযোগিতা) দাঁতাল কুঞ্জ আটপৌরে পাড়ার মাতব্বর

এবং সবচেয়ে সেরা জোয়ান, পরমের বাপ রঘুনাথ আটপৌরেকে চিৎ করে দিলে, পর পর তিন বছর চিৎ করে দিলে। শেষের বছর সে মারাত্মক লড়াই। রঘুনাথ বেআইনী করে দাঁতাল কুঞ্জের বাঁ হাতের আঙুল মুচড়ে ভেঙে দিয়েছিল, কুঞ্জ ক্ষেপে গিয়ে কনুইয়ের কাছে ডান হাতখানি উল্টো দিকে মোচড় দিয়ে জন্মের মত জখম করে দিয়েছিলো। দাঁতাল কুঞ্জের ছেলে নয়ানের বাপও ছিল জবরদস্ত জোয়ান। কিন্তু হলে কি হবে, চৌধুরীবাবুদের তখন কপাল ভেঙেছে, মা লক্ষ্মী যাই যাই করছেন, নয়ানের বাপের ভাগ্য ভাল থাকবে কি করে। চৌধুরীবাবুর ছেলে তখন দিন রাত্রি মদ খায়, রাত্রিকালে গাঁয়ের বাইরে বাগানের ঘরে পড়ে থাকে, দাঁতাল কুঞ্জের ছেলে নয়ানের বাপ বাবুর প্রায় সমবয়সী—সে হল বাবুর অনুচর। হাঁস মুরগী কাহারপাড়া থেকেই জবরদস্তি করে নিয়ে যায়, নদীর ধারে মদ চোলাই করে জোগায়, কাহারপাড়ার থেকে মেয়েদের নিয়ে গিয়ে বাবুদের দরবারে হাজির করে দেয়। ওই নয়ানের বাপ ভীমই পাখীর মা বসন্তকে জুটিয়ে দিয়েছিল চৌধুরীবাবুর ছেলের সঙ্গে। লোকে বলে, পাখীর চোখ রঙ সবই চৌধুরীবাবুর ছেলের মত; আরও বলে নয়ানের বাপ ঘটকালি করেছিল বলে বসন্ত মেয়ে পাখীর সঙ্গে নয়ানের বিয়ে দিয়েছিল। বসন্তের ভুল হয়েছিল। চৌধুরীবাবুদের সঙ্গে ভীমের ভাগ্যও যে ভেঙেছে সে-টুকু বুঝতে পারে নাই সে। চৌধুরীবাবুর ছেলে মল অল্প বয়সে মাথায় বিকার হয়ে, ভীমও মল ছমাস পরে ওই কাঁচা বয়সে 'প্যাটে' (পেটে) জল হয়ে। নয়ান তখন পাঁচ-সাত বছরের। এদিকে তখন ঘোষেদের লক্ষ্মীর পায়ের ধূলো কুড়িয়ে বনওয়ারীর বাপের অবস্থা ভালো হয়েছে, বয়সেও সে প্রবীণ, নয়ানের ঠাকুরদাদার চেয়ে ছোট কিন্তু ভীমের চেয়ে বয়সে বড় জোয়ান ও জবরদস্ত—সেই হল কাহারপাড়ার মাতব্বর। ভীমের মৃত্যুর পর কয়েক বছর অবশ্য কেউ কাউকে মানত না, সবাই বলত আমি মাতব্বর। শেষ ভাগ্যেরই জয় হল। ওদিকে ঘোষেরা জাঙলে চৌধুরীদের সঙ্গে মস্ত মামলা করে জিতলেন ঘোষেরা। কাহারপাড়ায় হয়ে গেল মস্ত একটা হাতাহাতি ফাটাফাটি। সামান্য দুটো কথা থেকে ঝগড়া হয়ে গেল, ওই পানার বাবা, রতনার বাবা আরও জনকয়েক একদিক, আর প্রহ্লাদের বাপ, গুপীর বাপ এরা একদিক। বনওয়ারীর বাপ এল থামাবার জন্য। দুপক্ষেই গালাগাল দিলে বনওয়ারীর বাপকে, তবু সে গিয়ে মাঝখানে দাঁড়াল। দুপক্ষই এল তেড়ে মারতে। আর যায় কোথা, রেগে দাঁত কড়মড় করে বনওয়ারীর বাপ এক গাছা লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বনওয়ারী এবং আরও ক'জন তার মধ্যে ছিল ওই হারামজাদা করালীর বাপ। ভারী অনুগত ছিল সে বনওয়ারীর বাপের, বনওয়ারীর সঙ্গেও তার মিতালী। যাকে বলে 'সখা সম্পদা' (সখা সম্পদ)—তাই ছিল সে। সকলে মিলে দুই পক্ষকে মেরে একেবারে আপন আপন ঘরে ঢুকিয়ে দিলে। তারপর সন্ধ্যায় মদের আসর পেতে সকলকে ডাকলে বনওয়ারীর বাপ। দুপক্ষের ঝগড়া মিটিয়ে দিলে। বললে—এবার ঝগড়া করলে আস্ত রাখব না। সেই দিন থেকেই (মাতব্বর হল বনওয়ারীর বাপ)। [৪৯ পৃ.]

—বলা বাহুল্য, এই বিস্তারিত অতীত বর্ণনা *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র মূল সুরের সঙ্গে মেশে নি। তারাশঙ্কর তাই এটি বর্জন করেছেন। তবে নয়ানের সঙ্গে পাখির বিয়ের কারণটি উপন্যাসের কাহিনী গঠনে সাহায্য করত। তারাশঙ্কর তা মনে রাখেন নি।

৩.৭. চন্দনপুর রেল স্টেশন সম্পর্কে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা ছিল পত্রিকা-পাঠে। ('নাইন' তো তৈরি হয়েছে সেদিন—বনওয়ারীর চোখের সামনে হল এসব।) মাটি ফেলা হল, সড়কের মত রাস্তা তৈরি হল, কোথাও মাটি কাটা হল, তার উপর শালকাঠের 'সিলিপাট'

(স্লিপার) পাতা হল, তার উপর বসল 'নাইন'। চন্দনপুরের খানিক আগেই মা কোপাইয়ের বুকে শাহী শাহী থাম গেঁথে তার উপরে লোহার কড়ি বরগা ছাঁদাছাঁদি করে পুল বন্ধন করলে। সেই সব কাজের জন্য এসেছিল সায়েব, সেই সায়েবের আড্ডা হয়েছিল এই চন্নপুরে। দেশ দেশান্তর থেকে এল কত কুলি কামিন। ইটখোলা হল, ইট পুড়ল, ঘরদোর তৈরী হল—সে এক সমারোহ ব্যাপার। তাদেরও খাটবার জন্য ডেকেছিল সায়েব। কিন্তু বনওয়ারী রাজী হয় নাই। চন্নপুরের লোকে বলে—যাঃ ভাগ। কিন্তু বনওয়ারী জানে পিপীলিকার যখন পাখা ওঠে, তখন পাখীতে ধরে খাবে বললে—তারাও বলে—যাঃ ভাগ। ওই পুল গাঁথনী যখন হয়, তখন এ-দিক ও-দিক গ্রামের চার পাঁচটি ছেলে হারিয়েছে। কেউ বলে—এ গাঁয়ের এর ছেলে কেউ বলে ও গাঁয়ের তার ছেলে, কেউ বলে—না ওদের নয়, ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, ওদের ছেলেচুরি যায় নাই, গিয়েছে সে গাঁয়ের আর হোই গাঁয়ের অমুক তমুকের ছেলে। যার হোক, যেখানের হোক, ছেলে যে গিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বনওয়ারীর আনন্দ—তার তৃপ্তি সে নিজের পাড়াকে বাঁচিয়েছে। তার পাড়ার কেউ এদিকে হাঁটে নাই। কেবল চারটি মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে (এই লাইন পাতার হিড়িকে।) [৪৯—৫০ পৃ.]

লাইন তৈরি বা সেতুবন্ধনের সময় এরকম জনরব বহু জায়গাতেই শোনা যায়। তারাশঙ্কর জনমনস্তত্ত্বে ভীতি সন্ত্রাসের ইঙ্গিত হিসাবে বিষয়টি এনে থাকবেন। পরে হাঁসুলীবাঁকের কথায় তাকে খুব স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় বোধ করেন নি বলে মনে হচ্ছে।

৩.৮. বনওয়ারীর সম্পর্কিত বোন সিধু। চন্দনপুরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছে বনওয়ারী। সে প্রসঙ্গে খানিকটা বর্জিত পাঠ আছে পত্রিকা সংস্করণে।

(সিধু তার নিজের খুড়োর কন্যে (কন্যা), সিধুকে সে ভারী ভালবাসত।) কিন্তু তা হলে কি হয়? মাতব্বর হয়ে সে কি করে এমন হুকুম দেবে? নিজেদের পাড়ায় ঘরে মেয়ে পুরুষের মধ্যে 'লুকিয়ে চুরিয়ে' 'অঙের খেলা' (রঙের খেলা) হয়, চিরকাল হয়ে আসছে সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। লুকানো থাকলে কথাই নাই, প্রকাশ পেলে ঝগড়াঝাটি হয়, হাতাহাতিও হয়। রঙ যদি পাকা হয়, তবে 'চিলোকে' (স্ত্রীলোকে) স্বামীর ঘর ছাড়ে, পুরুষে পরিবার ছাড়ে—ছেড়ে দুজনে সাঙা করে। রঙ কাঁচা হলে কথাই নাই, বছর দুয়েক গেলেই ওই দু বছরের রোদে জলে-বাতাসে সে রঙ উঠে সাদা হয়ে যায়। এ ওকে দেখলে হাসে এই পর্যন্ত, দিব্য মন পাতিয়ে আপন আপন ঘর সংসার করে।

জাঙলের সদগোপ মশায়দের সঙ্গে দু চারজন মেয়ের বয়স কালে মনের রঙ ধরে। চন্দনপুরে বাবু ভাইয়েরা কখনও দুটাকা দিয়ে দুচারদিন 'খানিক আধেক' (অল্প স্বল্প) খেলা করে। বাবুদের চাপরাশীদের সঙ্গেও দু-একজনের—ওই কলো বউয়ের মত রঙ খেলা হয়। তার আর উপায় কি? এ-সব 'পিতিপুরুষেও' সহ্য করে এসেছে সেও করে। এও চিরকাল হয়ে এসেছে। এসব নিয়ে গোলমাল করতেও বারণ। কিছুদিন গেলেই এ রঙ ছুটে যায়। ওই 'কালোবউ' চন্দনপুরে বাবুদের চাপরাশী সিং মহাশয়ের কাছে ছিল। বসন্ত নিত্য রাত্রে যেত চৌধুরীবাড়ীর ছোট চৌধুরীর কাছে। রঙ ছুটে গিয়েছে—এখন দিব্য তারা ঘরণী গৃহিণী হয়ে ঘর সংসার করছে। 'যুবোককালটাই' হল ক্ষ্যাপামীর কাল। ও-সব মার্জনা করে নিতে হয়। কিন্তু তাই বলে যে ক্ষেপে ঘর ছাড়লে—পাড়া ছাড়লে—গায়ে কাদা মাখলে—আস্তাকুঁড়ে গড়াগড়ি দিলে—পরণের কাপড় ফেলে দিয়ে দিগম্বরী হল—তাকে কি পাড়ায় ঘরে স্থান দিতে আছে! 'রন্ন যে রন্ন' (অন্ন যে অন্ন) যা হল সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—যা থেকে জীবন—সে

অন্ন আস্তাকুড়ে যদি পড়ে যায় কোন রকমে—তবে সে অন্ন কি আর তুলে আনা যায়? সে তুলে যে মুখে দিলে অবধারিত 'মিত্যু' (মৃত্যু)। জাত জ্ঞাতের অন্ন এ ওর খায়, সে তার খায়, জাঙলের সদগোপ মহাশয়দের—চন্দনপুরের বাবুদের ভোজে কাজে এঁটোপাত চিরকাল তারা কুড়িয়ে খেয়ে আসছে।

তবে সিধুর জন্য আজও তার মন 'বেথা' (ব্যথা) পায়। আপন খুড়োর মেয়ে, কোলে পিঠে করে মানুষ ক'রেছে। ইচ্ছে হল—একবার সিধুকে দেখে যাবে না কি?' [৫০ পৃ.]

বনওয়ারীর মাতব্বরির আদর্শগত ভিত্তি ও তার সীমাটি বোঝানোর জন্য এই অংশটি লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। পরবর্তী গ্রন্থ-পাঠ তৈরির সময় এতটা স্পষ্ট ভাষা সম্ভবত অপ্রয়োজনীয় ঠেকেছিল।

৩.৯. করালীর সঙ্গে পাখির নতুন সংসার দেখে বনওয়ারীর 'মনটা ভারি খুশি হয়ে' উঠেছিল। তারপর পত্রিকা পাঠে খানিকটা নতুন, অতিরিক্ত পাঠ পাচ্ছি। '***' চিহ্নিত শূন্য স্থানের পর, অতিরিক্ত সেই রচনা উদ্ধার করছি।

'বনওয়ারীর কৃপাতেই করালীর ঘর এমন হেসে উঠেছে।

হাঁসুলীবাঁকের জীবনে দুটি মাস চলে গিয়েছে; তার উপকথায় হাসি-কান্না অনেক হয়ে গিয়েছে; নয়ান কেঁদেছে, তার মা কেঁদেছে, সুচাঁদ কেঁদেছে দৈনন্দিন জীবনের দুঃখে সকলেই কেঁদেছে। তবে নয়ান, নয়ানের মা এবং সুচাঁদের মত নয়। হাসিও অনেক এবং হাসিই বেশী। দৈনন্দিন জীবনে হাসতেই মানুষ বেশী চায়, হাঁসুলির (sic) বাঁকের মানুষগুলিও দুঃখকে যথাসাধ্য উপেক্ষা করে—হেসেছে বেশী, তারজন্য আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, পূর্ব পুরুষেরা করে গিয়েছে। তাছাড়া আছে নিয়ম চক্রের বাইরে থেকে সমাগত আনন্দ; সে আনন্দের হেতু উপস্থিত হলে ওরা সকলে মিলে তার আয়োজন করে। যেমন এসেছিল ওই চন্দ্রবোড়া সাপটার শিষের আতঙ্ক এবং সেটাকে মারার উপলক্ষ্য নিয়ে কর্তার পূজা। তারই আর একটি সূত্র অবলম্বন করে এই দুমাসের মধ্যে এসেছিল করালী এবং পাখীর সাঙা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ। প্রচুর আনন্দ হয়ে গিয়েছে। করালী নগদ দেড় কুড়ি টাকা খরচ করেছে। এছাড়া পাখীকে শাঁখা-শাড়ী সিন্দুর নোয়া ছাড়াও দিয়েছে রূপোর চুড়ি, সরু একছড়া 'গোট' এবং গলার গিল্টীর সুত্ হার কানে গিল্টীর পার্শী মাকড়ী নাকে সোনার নাকছাবী। বসনও খরচ করেছে বেশ। জামাই মেয়েকে যা দেবার দিয়ে 'জ্ঞাত' মহাশয়দের (জ্ঞাতি) ভোজনের জন্য করালীর টাকার সঙ্গে পনের টাকা জুড়ে দিয়েছে। কাহারপাড়ার দিন তিনেক যে আনন্দ চলেছে, হলুদে রঙে নাচে গানে মদে মাতনে দিন-রাত্রি ছিল না। সুচাঁদও মদ খেয়েছিল, লোকে তাকে ধরে হলুদ এবং রঙও দিয়েছিল, রঙ হলুদ মেখে মদ্য পান করে সে প্রাণভরে কেঁদেছে। ঘরে অবশ্য কাঁদে নি অকল্যাণের ভয়ে এবং পাখী ও বসনের দুঃখ হবে বলে—তার সঙ্গে বনওয়ারী শাসন করবে এ ভয়ও ছিল। সে কেঁদেছে দিনে বাঁদবাদির বাঁশবনের ছায়াতে বসে। একটা ঘটিতে মদ এবং আঁচলে মুড়ি লঙ্কা নিয়ে যেতে ভুলে যায় নি। শুধু নয়ান এবং নয়ানের মা এর মধ্যে যোগ দেয় নি। তারা চোখে কেঁদেছে মুখে শাপ শাপান্ত করেছে। তার বেশ খানিকটা অংশ বনওয়ারীর উদ্দেশেই উচ্চারিত এবং নিক্ষিপ্ত।

'বনওয়ারী মাতব্বর, মাতব্বরের এই কি বিচার? এমন মাতব্বর যেখানে—সেখানের মঙ্গল নাই। একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে আর একজনার ঘর গড়ার নাম মাতব্বরি? শত্রুর শত্রু, চিরকালের শত্রু ওই কোশকেঁধেরা এই ঘরভাঙাদের বাড়ীর। এই বাড়ী ছিল একদিন

মাতব্বরের বাড়ী, এই বাড়ীর উঠানে উবু হয়ে বসে লোকের বাপ ঠাকুরের হাটুতে পাছায় কড়া পড়েছে। তারপর অনাথা ছেলের কালে উড়ে এসে জুড়ে বসল। 'হালে উঠতি' ঘোষ বাবুদের দেমাকে বড়কে বড় মানলে না, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' হয়ে পড়ল। বিধেতা (বিধাতা) এর বিচার করবেন।'

বনওয়ারী উদ্যোগী হয়ে করালীর সঙ্গে পাখীর বিয়ে দিয়েছে। করালী এখন বনওয়ারীর খুব অনুগত হয়েছে। পাখী তো মামা বলতে অজ্ঞান। বনওয়ারীর উপদেশেই করালী ঘর দোর ভাল করে মেরামত করেছে, পাখীকে আর চন্দনপুর ইষ্টিশানে নিয়ে যায় না। সে কাহারদের ঘরনী গৃহিণীর মত বাঁশবাদিতেই থাকে। নসুবালাও খুব আনন্দ করেছে। নেচেছে-গেয়েছে। সাঙা উপলক্ষ্যে তো নেচেছেই তাছাড়া এবার গোটা চৈত্র মাসটি ঘেটুগানের আসর জমজমাট করে রেখেছে।

চৈত্র মাসে ঘেটু পূজো। গোটা চৈত্র মাসের সন্ধ্যায় ঘেটু গানের দল গান করেছে, পাড়ায় গান করেছে, জাঙলে মণ্ডল মহাশয়দের বাড়ী বাড়ী গান শুনিয়ে চাল সংগ্রহ করেছে; সেই চাল থেকে সেও একটা খাওয়া দাওয়া হয়ে গিয়েছে।

চৈত্র মাসের শেষে নীল সংক্রান্তিতে গিয়েছে গাজন। গাজনের ধুম জাঙলে, বাবা 'কালারুদ্দু' (কালরুদ্র) ঠাকুরের থানে। বনওয়ারী চিরকাল গাজনের ভক্ত হয়ে আসছে। এবার সে 'চড়কের পাটায়' শুয়েছিল। আগের মত বাণফোড়া আর নাই। আছে কেবল একখানা গজাল কণ্টকিত তক্তা। সেইটার উপরে ভক্তদের মধ্যে প্রধান যে সেই শোয়। সেই পাটা দশজন কাঁধে করে গোটা গাঁ ঘুরিয়ে আনে। এতে শুতে বড় কেউ চায় না। কিন্তু এবার প্রধান ভক্ত মারা যেতে পাটায় কে শোবে এই সমস্যা উঠেছিল। বনওয়ারী নিজে থেকে শুতে রাজী হয়েছিল।

একটু কারণ আছে। বনওয়ারীর মনের মধ্যে কিছুকাল থেকেই একটা অপরাধবোধ খচ খচ করছিল। কালোবউকে নিয়ে অপরাধবোধ। কর্তার পূজার সেই সন্ধ্যার পর আরও দুদিন সন্ধ্যায় নির্জনে তার কালোবউয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে। করালীর সাঙার সময় একদিন। হয়তো কেউ কেউ জেনেছে বলেও মনে হয়েছে বনওয়ারীর। বিশেষ করে নিমতেলে পানা আর পেল্লাদ ওরা যেন ইসারায় ইসারায় হাসাহাসি করে এই কথাটাই তাকে জানাতে চেষ্টা করে। এতে অবশ্য লজ্জার কিছু নাই, মাতব্বরদের আগে তো রীতিকরণই আলাদা ছিল। ওই নয়ানের বাবা সেকি শুধু চৌধুরীবাবুর ছেলের বৈঠকখানাতেই এ-পাড়ার মেয়েদের পৌছে দিত? সে নিজেও তো ওই কাজের কাজী ছিল। "বাঘে ধান খেলে তাড়ায় কে?" মাতব্বর ওকাজ করলে বলবে কে কি? কিন্তু বনওয়ারীর কথা তা'নয়। বরাবরই সে চাপা ধরণের মানুষ। বয়স কালে সেও কি এসব কাজ করে নাই। ওই নয়ানের মায়ের সঙ্গেই সে এক সময় বহুদিন রঙের খেলা খেলেছে। নয়ানের বাবা থাকত চৌধুরীবাবুর বৈঠকখানায়, গভীররাত্রে দরজায় টোকা দিয়ে গিয়ে বনওয়ারী ইসারা দিত। কালোবউ তো ছিলই। পরম জেলে থাকতে কালো বউ থাকত চন্দনপুরে বাবুদের বাড়ীতে, বরকন্দাজ ভূপ সিং মহাশয় তখন তার মালিক। সে সময় বনওয়ারী মধ্যে সন্ধ্যায় চলে যেত চন্দনপুরে। ভূপ সিং মহাশয়ের ছুটি রাত্রি বারোটায়; বনওয়ারী আটটা নাগাদ বাড়ী ফিরত কালোবউয়ের সঙ্গে দেখা করে।

কিন্তু আর সে ছেলে মানুষ নয়, সে করালী নয়, এখন আর লোকে রসিকতা করবে না—লোকে গালাগাল করবে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে, শাপ-শাপান্ত করবে, উঁচু মাথা হেঁট

হবে। এই পাপে অন্যকে শাসন করতে গেলে সে শাসন মানবে না। তাই সে তার পাপের খণ্ডনের জন্যই চড়কের পাটায় শুয়েছিল। আবার সামনে আসছে 'ধরমপূজো' ধরম পূজোতেও সে উপবাস করে, এবার সে বাবার মাথায় 'ফুল' অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার দুহাতের আঁজলায় ভরে আঙ্গিনা থেকে বাবার ঘর পর্যন্ত বিছানো অঙ্গারের উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে দেবতার মাথায় দিয়ে আসবে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক। লোকে বুঝুক দেখুক। [৫৪—৫৫ পৃ.]

বনওয়ারীর অপরাধবোধ ক্ষালন ছাড়াও উপন্যাসে পানুকে শাসন করার যে অবকাশ ছিল প্রধান ভক্ত হবার পিছনে যুক্তি—পত্রিকা-পাঠে তা স্পষ্ট হয় নি। তারাশঙ্কর এখানে কাহারদের লোকউৎসব সম্পর্কে কিছু বিস্তৃত আলোচনা করেছেন—উপন্যাসের ভাষ্যের প্রয়োজন সিদ্ধ না করে এই বিবরণ। তাই তারাশঙ্কর প্রয়োজন বর্জন করেছেন এই লোক-উৎসব প্রসঙ্গ।

৩.১০. পাড়ার সবাইকে ঝড়ের ব্যাপারে সতর্ক করে বেড়ায় বনওয়ারী। কার চালের অবস্থা কেমন জেনে ফেরে। করালীর ঘরের 'ঝকমকে' অবস্থা দেখে খুশি হয়। পাখীকে বলে যায় কিছু কথা। গ্রন্থ-পাঠে এই বর্ণনা বর্জিত হয়েছে।

—'সনজে বেলায়' করালীকে খেতে বলিস। ঘরের মধ্যে আলাদা মজলিস করে—সেটা কেমনতর লাগে। বু—ঝ্লি (বুঝলি)

করালীর ওই একটা দোষ এখনও গেল না। এখনও সেই আলাদা মজলিস করে—সেটা কেমনতর লাগে। মন না মতিভ্রম। তার উপর আবার ছেলে ছোকরার মন। কত খারাপ কাজে মন যায় তার ঠিক আছে? মুরুব্বিদের কোলের কাছে শুধু শুধুই কি বসতে বলে গিয়েছে সে কালের লোকে? যত ছোকরার দল এখন করালীর ঘরে গিয়ে জুটছে নির্বিবাদে। নসুবালা নাচে গায়, করালী ঢোলক বাজায়। ছোকরার গুণ অনেক, ঢোলকের হাতটি বড় মিঠে। আর ছোঁড়া নাকি লুকিয়ে মদ চোলাই করছে। এটা ভাল নয়। পালে পার্বণে তারা 'পচুই' লুকিয়ে তৈরী করে সে এক আর দস্তুরমত চোলাই করে মদ তৈরী করা সে এক। ও হল সর্বনেশে জিনিস। উঁহু—সে হতে দেওয়া হবে না। অনেক কষ্টে তিন পুরুষ দুঃখভোগ করে—এই একপুরুষ কাহার পাড়া নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে বাঁচছে; আটপৌরে পাড়ায় এখনও নিত্য চৌকীদার পরমকে হাঁকে— পরম পরম! দুচার দিন অন্তর থানার লোক আসে—এ পরমোয়া? মাঝে মাঝে ছোটবাবু কি খোদ দারোগাবাবু আসেন—এরে—পরমা। এক ডাকে সাড়া না পেলে জানলায় টর্চ ফেলে ডাকেন—এ-রে—শালা পরমা। শুধু পরমই নয়—আটপৌরে পাড়ার দশজন মরদের মধ্যে ছ'জন এখনও দাগী। কাহারপাড়ায় আর দাগী নাই। শেষ দাগী ছিল—গুপীর দাদা কালাচাঁদ। সে মরেছে আজ আট বছর।' [৫৫ পৃ.]

—নির্দিষ্টতা, বয়স—চরিত্র-বিষয়ক নির্দিষ্টতাকে পাশে সরিয়ে রেখে তারাশঙ্কর আটপৌরে আর কাহারদের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চেয়েছেন। এই চেষ্টার সাফল্য এই রকম বর্ণনায় ব্যাহত হতে পারত। তাই এই পাঠ বর্জন করেছেন তারাশঙ্কর।

৩.১১. পানুকে জব্দ করার যুক্তিতে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করার প্রসঙ্গ গ্রন্থ পাঠে আছে। পাকু মোড়লকে মৃত নয়ানের বাঁশবন বিক্রি করার সংবাদ সংগ্রহ করেছে বনওয়ারী। সে প্রসঙ্গে বনওয়ারী আর পাকু মণ্ডলের বর্ণনা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সে বর্ণনার পরে নয়ানের মা আর গোপালীবালার ঝগড়ার একাংশ পত্রিকা-পাঠে অতিরিক্ত। উপন্যাস পাঠে অংশটি নেই।

(পাড়ার লোককে বাঁচাতে হবে আগে।) ত' ছাড়া প্রাণকৃষ্ণ—আজকের এই ঘটনায় আগে পর্য্যন্ত তার নিতান্ত অনুগত হয়েই চলে আসছিল। নয়ানই বরং একটু অকৃপার পাত্র তার কাছে। যদিও এক সময়ে সামান্য কিছুদিনের জন্য নয়ানের মায়ের সঙ্গে তার গুপ্ত রঙের খেলা চলছিল—তবুও নয়ানের বাপের মৃত্যুর পর 'ঘরভাঙাদের' মাতব্বরী 'কোশকেঁধেরা' দখল করায় তাদের সঙ্গে বিরোধই চলে আসছে। মধ্যে মধ্যে নয়ানের মা কাঁদতে বসে এক নামহীন শত্রুর উদ্দেশ্যে শাপ-শাপান্ত করে—''ভগমান বিচার করবেন। হে কত্তাঠাকুর তুমি তো বাবা দিন 'আত' (রাত) চোখ কান খুলে 'অয়েছ' (রয়েছে—sic)—তুমি তো সব দেখছ, বাবা তুমি বিচার করো। পাথরের মত গতর যেন পড়ে যায়। পাথর হয়ে যায়, লয়তো বানের জলে 'পলেন' (পলি) মাটীর মত গলে যায়।''

ওদিকে বনওয়ারীর বউ উত্তর দেয় নামহীন অভিশম্পাতদাতা বা দাত্রীকে—ভগবান কারু একার বাবা লয়। কত্তাবাবা কারুর স্বোয়ামী নয়—তিনি সবাইকার। 'মিনি' (বিনা) দোষে যিনি গাল দেবেন তার ব্যাতে (জিভে) পোকা পড়বে। যে গাল 'নিদ্দুষীকে' (নির্দোষকে) দেবেন—সেই গাল তাকে গিয়ে লাগবেন। [৫৮ পৃ.]

৩.১২. পানু যে ভাবে নয়ানের জমি পাকু মণ্ডলকে গোপনে দিয়েছে, তা হাঁসুলীবাঁকের রীতিসম্মত নয়। বনওয়ারী পাকু মণ্ডলের কথোপকথনের এক অংশ গ্রন্থ-পাঠে বর্জিত হয়েছে।

'(তোকে ভাবতে হবে না।) এবং সেই দখল পর্বের ভূমিকা স্বরূপ পাকু মণ্ডল দলিলখানা পাড়ার মাতব্বর বনওযারীকে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছেন। তার মধ্যে এ ইঙ্গিতও নিহিত আছে যে সে বাঁশ ঝাড়টায় আর যেন কেউ হস্তক্ষেপ না করে। বনওয়ারী কাহার পাড়ার মাতব্বর হলেও মণ্ডল মহাশয়ের বুদ্ধির জট ছাড়িয়ে আসল সত্য বুঝতে পারে নাই।

সত্যটা প্রকাশ করে দিল পানু। সমস্ত মজলিস ক্ষেপে উঠেছে তার উপর। কাহারেরা চোর ছিল একদা, মিথ্যা কথা চিরকালই বলে আসছে নিজেদের ঘরে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে গুপ্ত প্রণয়ও তাদের ঘটে, কিন্তু এধরণের অপরাধ পরস্পরের প্রতি কেউ কখনও করে না।' [৫৮ পৃ.]

৩.১৩. কৃষক হিসাবে জমির সঙ্গে কী গভীর সম্পর্ক কাহারদের, তার একটি প্রমাণ পত্রিকা পাঠে উপস্থিত। মনিবের জমির পাশের 'সরকারী পতিত জমি' কিংবা 'জলা' অথবা হয়ত 'জলনিকাশী নালা', 'গোপথ' তারা 'কেটে কুটে ভরাট করে আলবন্ধন দিয়ে' 'মনিবের জমির সঙ্গে চাষ করে।'—এই বিবরণের পর এই অংশ পত্রিকা-পাঠে অতিরিক্ত।

প্রথম দু চার বৎসর নিজে নেয় ধান—তারপর একদা মনিব রেগে ধরেন এবং সব কয় বৎসরের উৎপন্ন হিসাব করে কৃষাণদের কাছে পাওনা ধরে কেটে নেন। তবু ওদের এই স্বভাব। পতিত দেখলেই আলবন্ধন দিয়ে চাষ করবার জন্য ওদের জিভ দিয়ে জল পড়বে।

বনওয়ারী ঘোষদের জমি ভাগে করে। সে নালা ভেঙে প্রায় পনের কাঠা জমি তৈরী করেছে। জমিটুকুর ধান সে এখনও নিজেই ভোগ করছে। তার সে সুবিধা আছে। সে কৃষাণ নয়—ভাগীদার। এবং ঘোষেদের চাষের তদ্বির করে কর্মচারীতে। কিন্তু একদিন বাধবে ঘোষেদের সঙ্গে। বাধতে অবশ্য দেবে না বনওয়ারী। জমিটা সে ভাঙলেও দেশ নিয়মে মনিবেরই পাপ্য (প্রাপ্য)। কিন্তু দেশ নিয়ম হলেও মনটা খুঁত খুঁত করে। সে তো জানে নালার জমিটা মনিব মহাশয়ের জোতের সামিলও নয়—টাকা দিয়ে কেনাও নয়—নালা জমিদারের খাস—নালা ভেঙ্গে জমি তৈরী করার মেহনত তার। [৫৮ পৃ.]

৩.১৪. সুচাঁদের বিচিত্র দাবি—তাকে কে ভাত দেবে, মেটালো করালী। তাকে পাঁজা কোলা করে নিয়ে গেল সে। আসর ছেড়ে ছোকরার দল চলল করালীর বাড়ির দিকে। মজলিসে বনওয়ারী সকলকে আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা আর সে সময়কার কর্তব্য বিষয়ে পরিকল্পনা বলল। এ অংশটি গ্রন্থ-পাঠে বর্জিত হয়েছে।

বনওয়ারী বললে—বস-বস-বস। আসল কথাই হয় নাই হে। অতন পেল্লাদ—আজ যা বুঝলাম—তাতে বেপার (ব্যাপার) খারাপ। বড় একটা ঝড় হবে বলে লাগছে। তা চাল দেখলাম তো অনেক লোকেরই খারাপ। কাল সকালে সব পাড়ার চালে লাগ।

—তা কি করে হয়? মুনিবের কাজ 'অয়েছেন' (রয়েছে)।

—তবে দুপুরের পরে লাগ।

বনওয়ারী বলতে লাগল—ঝড়ের লক্ষণ সে যা যা দেখেছে—সেই সব কথা। মজলিসের প্রবীণদের সকলেই জানে এসব লক্ষণের কথা। ঝড়—বান—অতিবৃষ্টি—অনাবৃষ্টি.....এসবের লক্ষণ ওরা পুরুষানুক্রমে জানে। হাঁসুলীবাঁকের—বাঁশবাদির বাঁশবনের অন্ধকারের মধ্যে এগুলি ওরা আবিষ্কার করেছে। পিঁপড়েতে ডিম মুখে নিয়ে উঁচুতে বাসা বাঁধে কাক পক্ষীতে খড়-কুটো ঠোঁটে কুড়িয়ে বাসা মেরামত করে, টিকটিকিগুলো বেশী ডাকে—সাবধান করে দেয় মানুষকে, গরু বাছুরে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়, হরিয়াল পাখীগুলো হাঁসুলীর বাঁকটাকে বেড় দিয়ে পাক দিয়ে ক্ষান্ত থাকে—দূর দূরান্তরে ভোরবেলাতেই উড়ে যায় না।

তাই ঠিক হল কাল দুপহরের পর সব লাগবে চাল মেরামতে। সমস্যা দেখা দিল—মাথলা এবং পাগলার চাল মেরামত নিয়ে। আজই হঠাৎ প্রকাশ পেলে—মাথলা এবং পাগলা দুজনে চাষকর্মে জবাব দিয়ে করালীর রেল লাইনে খাটতে যাচ্ছে। যায় ভোর বেলা—ছুটি চারটের সময়। বর্ষার সময় নাকি মালগাড়িতে লাইন বরাবর ঘুরতে হবে। দুদিন চারদিন বাড়ীই ফিরতে পাবে না।

বনওয়ারী একটু হেসে বললে—এই হ'ল।

(নয়)

ঝড় পার হয়ে গেল। সত্যই বড় একটা কালবৈশাখীর ঝড়। চারটে তালগাছ পড়ল কোপাইয়ের বাঁধে। বাঁশ শুয়ে পড়ল অগুন্তি; অশত্থ বট শিরীষের ডাল ভাঙল ছোট বড় অনেক; সাহেব ডাঙাটা সব চেয়ে উঁচু—সেখানে হুমড়ি খেয়ে উপড়ে পড়ল এক বহুকালের প্রকাণ্ড বট। জাঙলের ধারে আমবাগানটার আমের গুটি আর রইল না। শিলাবৃষ্টিও হয়েছিল—বহুকাল এমন শিলাবৃষ্টি হয় নাই, মাঠ, ঘরের চাল—সাদা হয়ে গিয়েছিল—গাছের পাতা ঝরিয়ে প্রায় শেষ করে দিয়ে গিয়েছে, যেগুলো আছে—সেগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে। বনওয়ারীর বাড়ীতে একটা স্থলপদ্মের গাছ আছে— সেগুলির পাতা খুব চওড়া, সেগুলি এবং নীলের বাঁধের পদ্ম পাতাগুলি ছিদ্র করে দিয়ে গিয়েছে—গুলীর মত।

হাঁসুলীর বাঁকে বান আসে—ঝড় আসে—ঘর পড়ে—চাল ওড়ে। এবার মাথলার ঘর উড়েছে ঝড়ে, সব চেয়ে আশ্চর্য—করালীর ওই নতুন ছাওয়া কারখানার চাল ঝড়ে হাওয়াই জাহাজের মত গোটা তুলে নিয়ে গিয়ে মাঝ মাঠ বরাবর ফেলে গিয়েছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, অনেকেই দেখেছে। বারকতক উত্তর পশ্চিম কোনটা যেন চাড় দিয়ে তুলতে লাগল— হঠাৎ চালাটা ভেসে উঠল দেওয়াল ছেড়ে—তারপর চলল তীর বেগে ভেসে—হঠাৎ একটু কাৎ হল—তারপর পুরো কাৎ বার তিন চার ঘুরপাক খেয়ে নীচে নেমে এক

সময় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাঠে। পাখী মরে নাই এই ভাগ্য। করালী একটা খাটিয়া করিয়েছিল সখ করে তারই তলে পাখী ঢুকে উপুড় হয়ে পড়েছিল।

নয়ান—নয়ানের-মা দুহাত তুলে ভগবান থেকে কত্তাঠাকুরকে আশীর্বাদ করছে। পাপপুণ্যের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছে। ভগবানকে হরিকে বলছে—তোমার জয়-জয়কার হোক; কত্তাঠাকুরকে বলছে তোমার বিচার 'সূক্ষ্ম' (সূক্ষ্ম) বিচার। বেঁচে থাক—ওই 'ব্যাল' (বেল) গাছে অচলা হয়ে থাক বাবা।—তত্ত্ব হিসেবে বলছে—পরের ঘর ভেঙে দিয়ে নিজে ঘর বাঁধতে গেলে সে ঘর থাকেনা—উড়ে যায়—পুড়ে যায়—বজ্জাঘাত (বজ্রাঘাত) হয়।

সুচাঁদ এবার তারস্বরে নয়ান এবং নয়ানের মায়ের তত্ত্বব্যাখ্যার প্রতিবাদ করছে—ইঙ্গিতে গালাগালও দিচ্ছে। আর তার পাখী কি করালীর উপর রাগ নাই; মনের ময়লামাটী ধুয়ে গিয়েছে; তার ইচ্ছে নয়ানের মা এবার এদের নাম ধরে গালাগাল দিক' তাহলে সে সাধ মিটিয়ে ওদের সঙ্গে ঝগড়া করে। দুপুর বেলা সে মাঠে গিয়ে চীৎকার করে কাঁদে—তার সোনার পাখীর সাধের করালীর ঘর উড়ে যাওয়ার দুঃখে।

করালী কিন্তু বেপরোয়া। প্রথম দুদিন একটু বিমর্ষ হয়েছিল অবশ্য—কিন্তু তারপরেই সে সত্যই বলেছে—কুছ পরোয়া নেই। গিয়েছে—আবার হবে।

হওয়া তো হওয়া—সে এমন তেমন হওয়া নয়। শাশুড়ী বসনের ঘরেই সে উঠে ছিল; (নতুন বাঁশ কেটে দড়ি কিনে খড় কিনে...) [৫৯-৬০ পৃ.]

নানা কারণে এই অতিরিক্ত অংশটি গুরুত্ব বহন করছে। এর নির্যাস উপন্যাসের নানা অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। ঝড়ের পূর্বাভাস লক্ষণ, ঝড়ের, শিলাবৃষ্টির বিস্তৃত বিবরণ তারাশঙ্কর সংক্ষেপিত করে নিয়েছেন।

৩.১৫. করালীর নতুন বাড়ী করার পরিকল্পনা সবাইকে আশ্চর্য করেছে। বিশেষত রেলপথের মহাজনের কাছে ধার করার ব্যাখ্যা শুনে বসন্ত তাজ্জব বনেছে। এমন লেনদেনের কারবার তার কাছে 'পরমাশ্চর্যের কথা'। আর তারাশঙ্করের ভাষ্যে 'পৃথিবীতে যা আশ্চর্য, তাই হাঁসুলীবাঁকে ভয়ের বস্তু।'—এই উপন্যাস-পাঠ পত্রিকায় ছিল না। পরিবর্তে ছিল সামান্য ভিন্ন পাঠ।

'আশ্চর্যই বা কি—কলিকালের ধারাই এই—কালে কালে আরও কতই না হবে! সায়েবরা এসে 'আস্তা' (রাস্তা) বানালে—লোহার লাইন পাতলে—কলের গাড়ী আনলে—ঘোড়া নাই গরু নাই—ভস ভস করে ধোঁয়া ছেড়ে গড়গড়িয়ে—ছুটে চলল—কাটোয়া দুদিনের পথ, দু ঘণ্টায় চলে গেল। চন্দনপুরের বাবুরা আবার মটর গাড়ী এনেছে। সেও দেখেছে বসন্ত। সে আবার ধোঁয়া ছেড়ে বিনা লাইনেই রাস্তার উপর তীর বেগে ছুটে যায়। কালে কালে আরও কত হবে, এইতো কলির প্রথম সন্ধ্যে।

হাঁসুলীবাঁকের মানুষগুলি বাঁশবনের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এতকাল চন্দনপুরের ইস্টিশানের সিগনালের হাতাটা দেখেছে, গাড়ীর ধোঁয়া দেখেছে, মা কোপাইয়ের পুলের উপর ঝমঝমিয়ে গাড়ী পার হতে দেখেছে, রাত্রে লাল নীল আলোর ইসারা দেখেছে, কোপাইয়ের পুলে গাড়ীর জানালায় জানালায় আলো দেখেছে, মধ্যে মধ্যে জাঙলের মণ্ডল মশায়দের মোট-ঘাট বয়ে নিয়ে যায়, কালে কস্মিনে এক-আধবার নিজেরাও গাড়ীতে চাপে; কিন্তু তাতে এই কলিকালের বিচিত্র কারখানার অভিনব ধারা ধরণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। গাড়ীতে চাপলেই গাড়ীর কল কব্জা যেমন জানা যায় না, তেমনি আর কি। এতকাল পর্যন্ত হাঁসুলীবাঁকের লোকেদের আনাগোনা জাঙল পর্যন্ত। আগে ছিল সাহেবডাঙার মা-বাপদের কুঠী

পর্যন্ত—এখন জাঙলের সীমানার জমি জেরাতের আল বন্ধন পর্যন্ত। চন্দনপুরে দু চার জন মেয়ে মজুরনী খাটতে যায়—পুরুষেরা যখন চুরি করে জেলে যেত তখন থেকে এর রেওয়াজ—কিন্তু তার সঙ্গেও কলির এই নূতন কারখানার সম্বন্ধ নাই। জাঙলের সদ্‌গোপ বাড়ী—আর চন্দনপুরে বাবুভায়েদের কারখানা একই—ছোট আর বড়। তা ছাড়া আজও পর্যন্ত কোন কাহার পুরুষ চন্দনপুর খাটতে যায় নাই। করালীই এই প্রথম ওই কারখানার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছে। বনওয়ারীর দাদা দুহাত মেলে হাঁসুলীর বাঁকের লোকেদের পথ আগলে বারণ করেছে—আটক করে রেখেছে—যাস না—ওখানে যাস না।

কারখানা যখন প্রথম হয়—তখন কজন মেয়ে ছট্‌কে গিয়েছে। বনওয়ারীর দাদা তাদের ফিরতে দেয় নাই। 'সিধু' তার খুড়তুতো বোন—তাকে পর্যন্ত না। করালীর মাও—তো-ওই কারখানার ইসারায় রাত্রে বেরিয়ে গেল—আর ফিরল না। কোলের ছেলে করালীকে ফেলে গেল। মায়া হল না—মমতা হল না। তাই তো বসন্তের বুক ভয়ে গুর-গুর করছে; করালীর এত কথা শুনেও গুর-গুর করছে—না জানি এর পর কি হবে?

এই হাঁসুলীর বাঁকে বাঁশবনের ছায়ায় গ্রাম—ঘরে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী, চারিপাশে হাঁসুলীর বাঁকের নদীর বেড়ের মধ্যে 'পলেনের' (পলিপড়া) মাঠ, জাঙলে মনিব বাড়ি, এসব যেন ভারি মিষ্টি পাঁচালীর গান। আর ওই কলির কারখানা ঠিক যেন বাবুদের থিয়েটারের পালা; ঝকমকে আলো, বাড়ীঘর গাছপালা আঁকা পট, কত সব বক্তৃতা, কত মিষ্টি কথার গান, কখনও কাটাকাটি মারামারি যুদ্ধ, চোখ ধেঁধে যায়, মধ্যে মধ্যে দম-বন্ধ হয়ে আসে—এ কারখানা যেন ঠিক তাই।

আসুক—বনওয়ারী দাদাই ফিরে আসুক—তারপর যাহয় হবে। বনওয়ারী গিয়েছে দল নিয়ে মিত্তির গোপালপুরের বিয়েতে পাল্কী নিয়ে। ষোল বেহারার দুখানা পাল্কী গিয়েছে। ধূম ধামের বিয়ে। বরের পাল্কী আলাদা—কনের পাল্কী আলাদা। আটপৌরে পাড়া থেকে গিয়েছে—রায়বেঁশের দল। আসুক সে ফিরে তাই বসন্ত বললে করালীকে।' [৬০—৬১ পৃ.]

৩. ১৬. মিত্রগোপালপুরে কাহারদের পাওনা সম্পর্কে গ্রন্থ পাঠ আর পত্রিকা-পাঠের ফিরিস্তি ভিন্ন। 'কাহারদের কপাল ভাল—বিয়ে রেল রাস্তায় নয়—গাঁয়ের পথে।' এই বাক্যের পর পত্রিকা পাঠ :

আট আট ষোল বেহারার দুখানা পাল্কী নিয়েছে। লুচি মিষ্টি-পোলাও-মাছ-মাংস পেটপুরে খাওয়া—থম থমে নেশার 'চরণ ঠিক রাখা' মদ বিড়ি সিগারেট—প্রতিজনে একখানা লাল গামছা, পাঁচটাকা কনের বাড়ী(র) 'বশকিশ' (বকশিশ) তাছাড়া বরের বাড়ী (র) বিদায় জনাহি একটাকা। কনের বাড়ীর বকশিশের ভাগ নিয়ে হয়েছে পাঁচসিকে, বাড়তি আছে একটাকা—সে টাকায় মদ কিনে যারা যেতে পায় নাই বিয়েতে—তাদের দেওয়া হবে। আটক্রোশ করে ষোল ক্রোশ পথ। খানিকটা পাকা—ক্রোশ ছয়েক কাঁচা গরুর গাড়ীর পথ—মাঝখানে খানিকটা আলপথ। [৬১ পৃ.]

৩.১৭. কালোশশীর মৃত্যুর পর বনওয়ারীর জ্বর। জ্বর থেকে উঠে বসনের সঙ্গে কর্তাবাবার কাছ থেকে ফেরার পথে বসনের কিছু মানবিক ভাবের বিবরণ পত্রিকা-পাঠে অতিরিক্ত :

'বসন্ত সুযোগ বুঝে কথাগুলি বলতে আরম্ভ করলে। চৌধুরী মশায়ের ছেলের সাহচর্যে যখন সে ছিল—তখন সে দিন কতক ও বাড়ীর চব্বিশ ঘণ্টার ঝি হিসেবে ওই বাড়ীতে থাকত। সেই সময় সে বেশ ভাল গুছিয়ে মিষ্টি করে কথা বলতে শিখেছে। কথাগুলি হিসেব

করে গুছিয়ে গুছিয়ে বললে। বললে তুমি ছাড়া করালী কারু কথা শুনবে না। তোমাকে ভারী মান্যি করে। বলে মামা ছাড়া কাহার পাড়ার মানুষ কে আছে। এই পেল্লাদ দাদা অতন দাদা ইয়েদিগে মুখের ছামনে বলেদিলে সেই কথা। ওই ওর মহাদোষ—লঘুগুরু জ্ঞান নাই। গুরুর মধ্যে এক তুমি।

বনওয়ারী অন্যমনস্কভাবে বললে—হুঁ। তার মনটা যেন দাঁড়াতে পারছে না। দুলছে। বাইরে দূরের একটা ছবি তার চোখ দুটোকে আকৃষ্ট করে রেখেছে। মনটা কখনও কালো বউয়ের দিকে ঝুঁকছে তখন তার চোখ দুটো মধ্যে মধ্যে ফিরছে সেই আটপৌরে পাড়ায় বটগাছটার দিকে, কখন বাইরের ওই ছবিটার দিকে ঝুঁকছে তখন কালো বউকে ভুলে যাচ্ছে কিছুক্ষণের জন্য। দূরে দেখা যাচ্ছে সাহেবডাঙা। সাহেবডাঙায় চন্ননপুরের বাবুদের মজুররা টামনার কোপ মারছে। চৌকো চৌকো জমি তৈরী হচ্ছে। তারই কাজটা পিছিয়ে গেল। পরমের পাঁচ বিঘে জমির কথাও ভাবছে। ইচ্ছে করলে নিজেই নিতে পারে ওটা। কিন্তু আটপৌরেদের সঙ্গে যদি চলন হয় তাদের, তবে সে একটা তার কীর্তি।

বসন্ত অনেক বলে গেল। চৌধুরী বাড়ীতে সে গিয়েছিলো, সেখানেও সে শুনেছে—পাকা বাড়ীর জন্য ইট পুড়িয়ে 'খ্যানত' হয়েছিল চৌধুরীবাড়ীতে। [৬৬ পৃ.]

৩.১৮. 'কালীর থান থেকে মাদুলী নিয়ে সে ফিরল।'—সে, বনওয়ারী। এরপর কতকটা পরিবর্তিত পাঠ :

'এক একজন 'অশুভক্ষণে' কালে কস্মিনে জন্মায়—যার স্বভাবই হল মন্দদিকে যাওয়া। যতই তাকে ভালবাস—ক্ষমা কর, সে 'মন্দমতি' ছাড়বে না। একবার সে তাকে ক্ষমা করেছে—আর সে তাকে ক্ষমা করবে না। ছোড়ারা যারা রেল লাইনে খাটতে যাচ্ছে তাদের যাওয়া বন্ধ করতে হবে। এর ফল কি বুঝছে না। হয় রেলে কেটে মরবে, না কোন দেশে খাটুনির লোভে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে বসে থাকবে; যদি ফিরেই আসে—তখন এখানে আর খাপ খাবে না। হাঁসুলীর বাঁকের মানুষ চন্দনপুরের রেল লাইন—ওই কলির কারখানায় গেলেই গেল।

এই তো সেদিন—রাত্রিকালে—যেদিন ঘরছাওয়ানোর কথা হয় মজলিসে, সেদিন কথাটা শুনবা মাত্র বনওয়ারী বলেছিল—এই হল! এইসব ভেবেই বলেছিল।

শাসন করতে হবে, পথ আগলে দাঁড়াতে হবে। পিতিপুরুষে যা করে নাই তা করতে নাই—যা করে গিয়েছে—তা না করলে জাতিপাত হয়, পূব্ব পুরুষের নরক হয়, পিতিপুরুষ যে পথে হাঁটে নাই— সে পথে হাঁটতে নাই, যে পথে হেঁটেছে সেই ধূলো সর্বাঙ্গে মাখলে ইহলোক তো ইহলোক ওপারের পথের সন্ধান মেলে।

* * *

মজলিসে ডেকে করালীকে 'নরম-গরম' করে বুঝিয়ে দেবে এটাই যে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলে। [৬৭ পৃ.]

৩.১৯. আটপৌরে আর কোশকেঁধেরা এক হল। 'আজ আবার তার উপর নতুন বাঁধ পড়ল দুই পাড়ায়।'—পত্রিকা-পাঠে এই ভাবে আছে। গ্রন্থপাঠে গোপালীর কান্না, পানুর পরামর্শ এইসব আছে। সে প্রসঙ্গের পরিবর্তে পত্রিকাপাঠে সামান্য অতিরিক্ত :

(বারো)

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় এর পরে বেজে উঠল অন্য সুর অন্য গান। গাজনে ধরম পূজোয় ঢাক শিঙের বাজনার পর নিঝুম হাঁসুলীবাঁকে পাখীর ডাকে—মাঠে ছেলেদের বাঁশীর

সুরে, মধ্যে মাঝে বাছুর দূরে গেলে গাই গরুর ডাকে— যে সুর—যে গান বাজে—যেমন আরাম আরাম ভাব জাগে—হাঁসুলীর বাঁকে তেমনি সুর তেমনি গান শান্ত মন্থর গতিতে মেয়েরা যেমন সারি বেঁধে জল নিয়ে আসে কোপাইয়ের ঘাট থেকে—একটু বেঁকে—একহাত দুলিয়ে তেমনি গতিতে চলতে লাগল হাঁসুলীবাঁকের উপকথা।

বনওয়ারী দুটি বেলা প্রণাম করে কর্তা ঠাকুরকে—কালরুদ্রকে—মা কালীকে—ভগবান হরিকে সবই তাঁদের দয়া। তবে খুসী সে—সুখী সে। সে জানে—কাহার পাড়ার উন্নতির সময় এটা। দুপাড়ায় এক হয়েছে, সে সাঙা করেছে—রমণ আটপৌরের ভাইঝিকে। হ্যাঁ 'উপসী' (রূপসী) মেয়ে বটে। বনওয়ারী এখন দুপাড়ার মাতব্বর। বড় বউটি কান্নাকাটি করেছিল, বনওয়ারী তাকে বুঝিয়েছে অনেক করে। বড়বউ মানুষটি ভাল। সে বুঝেছে। সাধারণ নিয়মে তাদের জাতের মেয়েরা সতীন নিয়ে ঘর করে না। তারা চলে যায় অন্য পুরুষকে সাঙা করে। এ কিন্তু বুঝে ঘরেই আছে। তার মান বাড়িয়েছে বনওয়ারী।—নিজে তাকে মান্য দেখিয়ে। নেহাত সাদা লোক সে। নতুন বউটিকে বুঝতে পারে নাই এখনও। তবে চতুর মেয়ে। বনওয়ারীর ঘরেই এখন রমণ থাকে। তার সংসারে ওই ভাইঝি ছাড়া কেউ নাই। সুতরাং ভাইঝির সঙ্গে এখানে ছাড়া যাবেই বা কোথায়। তাতে বনওযারীর আক্ষেপ নাই। খাক-দাক-থাকুক, গরু বাছুর দেখুক। চাষের সময় একটা শক্ত বাঁশের খুঁটোর দাম কত, এতো একটা মানুষ।

বর্ষা নেমেছে, চাষ চলছে। বাঁশবাদির বাঁশবন বট পাকুড় শিরীষ গাছের মাথায় ছাই রঙের মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক যাচ্ছে, এক আসছে—কেউ ফুলছে—ফাঁপছে—ক্রমশ আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে—কাহারপাড়ার চালে—চালে-বড় বড় গাছের গায়ে গায়ে—বাঁশবনের ঘন পল্লব কাহারবাড়ীর উনোনের ধোঁয়া হাল্কা কুণ্ডলী পাকিয়ে জমে রয়েছে, যেন পেঁজা শিমুল তুলোর রাশি ছড়িয়ে রয়েছে। কখনও আকাশ জোড়া মেঘ কেটে ছিঁড়ে নীল আকাশ বেরিয়ে পড়ছে। রোদ উঠছে—এখানে ওখানে মেঘ ছড়িয়ে থাকছে— মাটীর বুকে ছড়ানো এ গ্রাম ও গ্রামের মত, অথবা মাঠের মধ্যে ছড়ানো সেচের পুকুর, পতিত টুকরো, ঝোঁপ জঙ্গলের মত। কাহারেরা উঠছে রাত্রি থাকতে, প্রাতঃকৃত্য সেরে সেই রাত্রি থাকতেই যাচ্ছে মনিববাড়ী, হেলে গরুগুলোকে পেটভরে খাইয়ে হাল বলদ নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। ফিরছে সন্ধ্যায়। বনওয়ারীর বাড়ীতে হাল, শেষ রাত্রে উঠে গরু দুটিকে খাইয়ে বনওয়ারীও খায়, রমণও শেষরাত্রে উঠে বনওয়ারীর সঙ্গে তামাক খায়। বনওয়ারী চলে গেলে সেই গাই গরুগুলিকে বার করে। বড় বউ বার করে শুধু মুর্গী—হাঁস—ছাগল। রমণের ভাইঝি ঘর নিকোয় বাসন মাজে। মধ্যে মাঝে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে। গোটা কাহার পাড়া এখন মাঠে পড়েছে। হাঁসুলীর মাঠে জল লেগেছে। কোপাই বইছে—কানায়—কানায়—ঘোলাটে রাঙা জল। আর 'কত্তার দহ' চেনা যায় না। শুধু শিমূলতলা ইসারা দিয়ে জানায় দহের নিশানা। লালচে সোনার বরণ। হাঁসুলীর মধ্যে ধবধবে মেয়ের বুকের মত হাঁসুলীর বাঁকের চষা মাঠ। কিছুদিন পর ও মাঠ হবে সবুজবরণ। নীলের বাঁধের চারপাশে ঘাসে ভরে উঠেছে। নদীর ধারে কোপাইয়ের বাঁধে বেনা ঘাস কাশ শরগুলি হাত খানেকের উপর লম্বা হয়েছে—বাতাসে লুটোপুটি খাচ্ছে। বাঁশের বনে নতুন বাঁশের ফোঁড় বার হচ্ছে—সাঙখুঙি ভরা খুঙিতে ঢাকা—সূচালো মাথা নিয়ে দিন দিন বাড়ছে। নতুন চারা গজিয়েছে হরেক রকম। সাদা কাঞ্চনের বনে কুল ধরেছে অজস্র। উঁচু মাঠের আল

গুলিতে কেউ সবুজ মখমল বিছিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। কেবল জাঙল যাবার আলপথটিতে ঘাস গজায় নাই।' [৭০ পৃ.]

বিচ্ছিন্নভাবে রচনাংশটির সাহিত্যমূল্য যথেষ্ট। তারাশঙ্কর এই বর্ণনাংশ বর্জন করেছেন—হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের তখন উন্নতির অবস্থা নয়, হয়তো তাই এই সমৃদ্ধ কৃষিক্ষেত্রের বিবরণ রাখতে চাননি।

৩.১৯. গোপালীবালার মৃত্যুর কথা গ্রন্থ-পাঠে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় উপস্থাপিত। পত্রিকা-পাঠে প্রসঙ্গত সামান্য অতিরিক্ত কথা আছে।

জাঙলের সদ্‌গোপদের এক ঘর চিরকাল কবিরাজ বলে পরিচিত, তিন পুরুষ কবিরাজী করে—তাদের চিকিৎসাও করিয়েছিল বনওয়ারী। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

শরৎকাল পড়েছে। পিত্তবৃদ্ধির সময় এটা। ভাদ্র মাসে যতটুকু রোদ গায়ে লাগবে ততটুকু পিত্ত হবে দেহে। শিউলী পাতার রস, পলতা লতির ঝোল খেতে হয় এসময়। বড় বউ এবার তা খায় নাই। নিজে রেঁধেছে। সকলকে দিয়েছে, কিন্তু নিজে মুখে দেয় নাই। ছোটকা সুবাসী বললে—কথাটা।

বনওয়ারী বললে—সময়ে বলতে পারে নাই?

সুবাসী বলেছে—কি দায় আমার?

তা বটে। কি দায় সুবাসীর। অনেক কাঁদলে বনওয়ারী। বড় দুঃখ পেল সে। তার দৃঢ় ধারণা হল বেশ বুঝতে পারলে সে বউ মরতেই চেয়েছিল সতীনের দুঃখে বন্ধ্যাত্বের লজ্জায়। শুধু বনওয়ারী কেন গোটা কাহার পাড়ার লোকের কাছেই কথাটা জলের মত পরিষ্কার। ভাদ্র আশ্বিন মাসে জ্বর চিরকাল ওঠে, লোকে ভোগে, ভাল হয় আবার পড়ে আবার ওঠে। কিন্তু মরে না কেউ। জ্বরে ভুগে দুর্বল হয়ে মানুষের মরবার সময় শীতকাল। তাও বুড়ো ধারাই মরে। লোকে বললে ভাগ্যবতী বউ। এমন ভাগ্যমানি কজন হয়? [৭১ পৃ.]

কেন তারাশঙ্কর এই অংশ বর্জন করলেন খুব স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। পত্রিকা-পাঠে এখানে স্ববিরোধ আছে। আগে গোপালীবালার সন্তান থাকার কথা লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। এখানে বন্ধ্যাত্বের প্রসঙ্গ আছে। গোপালীর মৃত্যুকে নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত আকস্মিক বলেই নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর, তাই, খুব সম্ভব এই বর্ণনা বাদ পড়েছে।

৩.২০. মরতে চায় না বনওয়ারী। স্বাভাবিক। এই মনোভাবের সঙ্গে সুবাসীর চাতুর্যের বিবরণ পত্রিকা-পাঠে অতিরিক্ত।

(নতুন বিয়ে করেছে।) 'ছেলেপুলে হবে। মানুষ করবে। গোটা কাহার পাড়ায় শান্তি। সব আপন আপন কাজ করছে। চাষবাস নিয়েই রয়েছে। এক করালী বাগ মানে নাই। তাকে নিয়ে বনওয়ারীর ক্ষোভ খুব নাই। তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়াই এক রকম বন্ধ। সন্ধ্যেবেলা আসে ছোঁড়া পাখীকে সঙ্গে নিয়ে। সে একরকম সয়ে গিয়েছে। শুধু সে নজর রাখে সুবাসিকে। সুবাসি বড় চতুর; কিন্তু সে যখন বনওয়ারীর সঙ্গে চাতুরী করে—তখন ভারি ভাল লাগে বনওয়ারীর।

পূজোর কাপড় নিয়ে ভারী চাতুরী খেললে সে। ষষ্ঠীর দিন বনওয়ারী দোকানে দুপুরে গিয়ে ফিরল সন্ধ্যায়। গোটা পাড়ার লোকই তার সঙ্গে গিয়েছিলো। সেই জামীন হয়ে—দু-টাকা চার-টাকা ধার দিইয়েছে। মাতব্বরের এটা একটা কর্ম। তবে কাপড়ের দর আগুন। যুদ্ধ লেগেছে। শুধু কাপড় কেন—সব জিনিষেরই দর খুব তেজী। ধান চালও চড়ছে হু-হু করে।

হলপে হলপে খবর আসছে যুদ্ধের—গেজেট মারফতে—চন্ননপুরের বাবুদের কাছে। তা নিয়ে অবশ্য হাঁসুলীর বাঁকের লোকদের কিছু দরকার নেই। কাপড়ের দর বাজারের দরের কথা কইতে কইতে তারা বাড়ী ফিরল। আকাশটা থম থমে হয়ে রয়েছে। মেঘ ঘুরছে। মায়ের পূজোতে এবার জল হবে। মা বোধহয় গজে আসছেন এবার। কাপড় এনে বসল বনওয়ারী। সুবাসি তেল মাখিয়ে লঙ্কা মরিচ পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি দিলে। এক ঘটি জল খেয়ে বনওয়ারী উঠতেই তামাক দিলে। ভারী ভক্তি আজ সুবাসির। তামাক টানতে বসল বনওয়ারী। হঠাৎ সুবাসি তার সামনে পা ছড়িয়ে বসে এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ করে ছোট খুকীর মত নকল কান্না কাঁদতে লাগল।

—কি হল?

—আমি কাঁদছি। খিলখিল করে হেসে উঠল সুবাসি।

—যা মলো। সে আবার কি?

—এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ। আমি পাখীর মত কাপড় লোব (নেব)। এ্যাঁ এ্যাঁ বলে খুকীর মত পা ছুঁড়তে লাগল।

—থাম থাম। হেসেই বললে বনওয়ারী। কি কাপড়? তাই দোব। থাম।

হঠাৎ উঠে নাচতে লাগল সুবাসি, নেশা লাগিয়ে দিলে বনওয়ারীর। পরদিন সকলে উঠে দেখে একটা বাদলা নেমেছে আকাশে। সপ্তমী পূজার ঘট এল। বনওয়ারী দোকানে যাবার জন্য উঠল। পাখীর মতই কাপড় আনবে। বদলে নয় আর একখানা নতুন। সেকি করালীর চেয়ে কম? হঠাৎ শোনা গেল করালীর গলা—হেঁকে হেঁকে বলছে সে, ঝড় 'পেলয়' ঝড় আসছে 'পেচণ্ড' বিষ্টি; কলকাতার তার এসেছে ইষ্টিশানে।

বনওয়ারী নিষ্ঠুরভাবে গর্জন করে উঠল—এ্যাই ও! ঝড় ঝড়, ঝড় আসছে তা এমন করে শুনছিস কি?

সুবাসি মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বলল মর মর বুড়ো কোথাকার। কথাটা তার ঝড়ের এক ঝাপটায় ঢাকা পড়ল। প্রচণ্ড ঝড়ই বটে। প্রলয় বললেও হয়।' [৭২—৭৩ পৃ.]

৩. ২১. নসুবালা বনওয়ারীকে বাঁচিয়ে তোলার পর কাহার পাড়ার যাবতীয় খবর দিতে থাকল। সবাই এখন চন্দনপুরে যায়। রতন-প্রহ্লাদ-গুপী সবাই। এর পর নসুবালার বর্ণনা পত্রিকা-পাঠে অতিরিক্ত।

পেটের জন্যই তো পৃথিবী বনওয়ারী কাকা! পেটের জন্যই কাহারেরা সাহেব মহাশয়দের পাল্কী বয়েছে, কোথা কোনখান থেকে এসে এই নীলবাঁধের পাড়ের উপর বাঁশ বনে ঘেরা—বড় বড় গাছের পল্লবের তলে বসতি বেঁধেছিল, সাহেবরা গেলে পেটের জন্য ধরেছিল চুরি ডাকাতি—তারপর তাতে জাত গেল—পেট ভরল না দেখে জেলের তাড়নায় তারা চাষ কর্ম ধরেছিল—আবার চাষে পেট ভরছে না—আগুন জ্বলল হু হু করে পেটে—তারই তাড়নায় তারা ছুটছে চন্দনপুরে। রেলের খাটুনী খাটতে। এবার চাষে ধান হয় নাই। হয়েছে খড় আর তুষ, ভাগে কেউ কিছু পায় নাই, পৌষ মাস—লক্ষ্মী মাস—সেই পৌষ থেকেই কাহারদের ঘরে ভাত নাই। ধানের দর দশ টাকা—চালের দর ষোল—কাল হয়তো হবে—বারো—আর আঠারো। সরকার থেকে কার ঘরে কতধান আছে হিসেব নিচ্ছে, তালা বন্ধ করছে; সদগোপেরা সেই ভয়েও বটে আর টাকা করবার জন্যও বটে—যে যেমন পারছে লুকিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে ধান। কৃষাণদের পৌষ মাস থেকেই বা ধান দেবে কি করে? তা ছাড়া তারা রস বুঝেছে। বলে—নিজেরা

লাগব—বাকী যা থাকবে নগদ মজুর দিয়ে চাষ করাব। যুদ্ধের নাকি 'পেথম সাঝ'—এখনও অনেক চলবে। সদগোপেরা দালান কোঠার হিসেব করছে। ভাবে যারা জমি রেখেছিল—তারা ছাড়িয়ে নিয়েছে।' [৭৮ পৃ.]

গ্রন্থ-পাঠে এই যুদ্ধ সংকট অনেকটাই কথকের ভাষ্য। নসুবালার ভাষা অপেক্ষা তা-ই অনেক বাস্তবানুগ মনে হয়।

৪. ১. চরিত্র-ভাবনা স্বভাবতই হাঁসুলীবাঁকের গ্রন্থ সংস্করণে নতুন হয়েছে। পাগল কাহার পত্রিকা পাঠে অনুপস্থিত ছিল। এটি বেশ মৌলিক। তারাশঙ্কর পাগলের মারফৎ হাঁসুলীবাঁকের সাংস্কৃতিক ভাষ্যটি অত্যন্ত সুচারু রূপে উপস্থাপন করেছে। পাগল-নসুবালার সম্পর্ক—উপন্যাসের পরিণতিতে বেশ অভিনব মাত্রা যোজনা করেছে। পাগল ভিন্ন *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা* খসড়ার মতোই মনে হয়।

পত্রিকার ২৬ পৃষ্ঠায় একত্র আছে 'প্রহ্লাদ গোপীচাঁদ, পাগল, দুনম্বর পানু, রমণ, লটবর, সকলেই সম্মত হল,—হোক, পূজো হোক।' তবে এই পাগল আর গায়ক, বনওয়ারীর পরম মিত্র পাগল এক নয়। এই পাগলকে পত্রিকা-পাঠে আর দেখাও যায় নি। আর একবার—'পাগলা' নামে এসেছে মানুষটি।—৬০ পৃষ্ঠায়। না, পাগল-কাহার সে নয়।

৪.২. পত্রিকা-য় গোপালীবালার নাম নেই। প্রায়ই বড়বউ, বনওয়ারীর বউ—এইভাবে আছে। চরিত্রের ন্যায়ের দিক থেকে পত্রিকা আর গ্রন্থে খুব পরিবর্তন নেই।

৪.৩. করালীর প্রথমপক্ষের স্ত্রী সম্পর্কে সামান্য অতিরিক্ত তথ্য পত্রিকায়। 'করালীরও বউ আছে, ভিন্ন গাঁয়ের মেয়ে, করালী তাকে বড় আনে না, করালীও তাকে ছাড়ান দিক।' [৫১ পৃ.]

ভাবনাটি বনওয়ারীর।

৪.৪. বাসিনী-বৌ, নয়ানের মা। নামটি এসেছে গ্রন্থ সংস্করণে। তার অভিশাপ কোন্দল-পরায়ণতা প্রতিহিংসা সবই ছিল পত্রিকা সংস্করণে। গ্রন্থে তা অনেক বিস্তৃত হয়েছে। তার মৃত্যুর বর্ণনা—গ্রন্থসংস্করণের সন্নিবেশ। চরিত্রটি হয়ে ওঠার এই আশ্চর্য অবকাশ তারাশঙ্কর গ্রন্থ রচনার সময় নিয়েছেন। ভাঁজোর বর্ণনা গ্রন্থসংস্করণে নতুন সংযোজন। ভাঁজোর সময় বনওয়ারী বাসিনী-বৌকে নাচের প্রস্তাব দিয়েছে। বাসিনী সে প্রস্তাবে সায় দেয়নি। পুত্রের জন্য তীব্র বেদনায় হাহাকার করে উঠেছে। এখানেও চরিত্রটি স্পষ্ট বর্ণিল হয়েছে। পত্রিকা পাঠে তা নেই।

৫.১. *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র শেষে পত্রিকা-পাঠে ছিল একটি প্রতিশ্রুতি ও তা পূরণ না হবার কথা। 'শোনা যায় সরকার থেকে মজবুদ বাঁধ বেঁধে দেবে কোপাইয়ের বন্যা রোধের জন্য।' ছিল সামান্য আশার কথা—'পঞ্চাশ সালের সোনার ফসল ফলেছে—হাঁসুলীবাঁকে।' কিংবা 'শোনা যায় যারা যুদ্ধ বাঁধিয়ে হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় ছেদ টেনে সেখানে নিয়ে আসে ইতিহাসের ধারা—তারা কৃষাণদের জন্য মজুরদের নতুন ব্যবস্থা করবে। হলে তাদের কতক ফিরে যাবে হাঁসুলীবাঁকে—আবার গড়বে নতুন কালের ঘর—আবার করবে চাষ। মজুর যারা খাটবে এখানে তারাও পাবে নতুন জীবন। যদি সব ভুয়া হয় সেকি হয়—তবে—চন্নমনপুরের বাবুদের জন্য ফসল উৎপাদন করে—চেয়ে থাকবে—আকাশের দিকে চেয়ে। বন্ধ্যা মেয়ের মত হয়তো সন্তান সন্ততির জন্যে তপস্যা করবে।' পত্রিকা-পাঠের

শেষে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের বর্ণনা।—'আজ তেরশো তেপ্পান্ন সালের ভাদ্র মাস। ইংরেজী উনিশ শো ছেচল্লিশের সেপ্টেম্বর। আজও কিন্তু ইতিহাসের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় নাই। নতুন কাল আসে নাই। হাঁসুলীবাঁকের আকাশমুখী তপস্যা চলছে।'

বোঝা যায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় পাঠাবার ঠিক আগেই লেখা হয়েছিল এই অংশ। এই মন্তব্যে উপন্যাস প্রায় আত্মকথনের রূপ নিয়েছে। যাইহোক—পরবর্তীকালে গ্রন্থ-সংস্করণে এই আত্মকথন-রীতির বৈশিষ্ট্য আড়াল হয়েছে। তাতে উপন্যাস-সংরূপের—প্রথমপুরুষ কথকের বর্ণনাভঙ্গির শিল্প কাঠামোটি রক্ষা পেয়েছে।

৫.২. *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-র শেষ দিকে পত্রিকা-পাঠে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। 'সুচাঁদ এই উপকথা বলেছে আমাকে।' উপন্যাস পাঠে এমন নেই। সেখানে সুচাঁদ উপকথা বলে যায়, বলে—পারো তো লিখে রেখো। তারাশঙ্কর এখানে জনতার আড়ালে নিজেকে খানিকটা সরিয়ে রেখেছেন। সম্পূর্ণ আড়াল করতে পারেন নি। ফলে উপন্যাসের ন্যায় রক্ষিত হয়নি। বাস্তবের সম্ভাবতা ও উপন্যাস-সংরূপের দাবিও রক্ষা পায়নি।

৬.০ গ্রন্থসংস্করণে যে অংশগুলি নতুন তা অনুসরণ করলে উপন্যাসের ভাষ্য কেমন করে গড়ে উঠেছে বোঝা যায়। এবার সেগুলির কথা বলে নেওয়া যাক।

৬.১ কালুয়ার সমাধি দেবার সময় করালীর দৈহিক শক্তি আর রূপের বিস্তৃত বর্ণনা (১/৩) পরবর্তী সংযোজন। একই পরিচ্ছেদে নসুরামের পরিচয়, পাখির প্রেম, সুচাঁদের হাহাকার—সাপটি যে কর্তার বাহন, সেকথা স্মরণ করে। এই সমস্তই পত্রিকা-পাঠে ছিল না।

৬.২ দ্বিতীয় পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে করালী-পাখির বিয়ের সুবিস্তৃত বর্ণনা পরবর্তী সংযোজন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে হঠাৎ বৃষ্টি—গুড়ের প্রস্তুতিতে বিপর্যয় আর করালীর ত্রিপল আনার প্রসঙ্গ। আটপৌরে পাড়ার ঘেঁটু গানের কথা, রেললাইন পত্তনের সময়কার পুরোনো দিনে প্রচলিত মুকুন্দ ময়রা-র বাঁধাগান—ইত্যাদি প্রসঙ্গ। ছয় পরিচ্ছেদে পাখির নাকে কামড় বসানোর অপরাধে করালী নয়ানকে শাসন করেছে।—এসব পত্রিকায় ছিল না।

৬.৩ দ্বিতীয় পর্বে সপ্তম পরিচ্ছেদে সাহেবডাঙার মাঠে প্রথম ফসল তোলার স্বপ্নাচ্ছন্ন বর্ণনা আছে। আছে 'অসুরের কাঁড়ি'-র কথা। এসব পত্রিকা পাঠে ছিল না। বনওয়ারীর কপাল কেটে যাওয়া, রক্ত নিয়ে জমিতে মিশিয়ে দেওয়ার বর্ণনা গ্রন্থপাঠে নতুন।

৬.৪ দ্বিতীয় পর্বে অষ্টম পরিচ্ছেদে কালারুদ্রের গাজনের বিস্তৃত বর্ণনা উপন্যাস পাঠের সংযোজন।

৬.৫ দ্বিতীয় পর্বের অষ্টম পরিচ্ছেদে বনওয়ারী আটপৌরে পাড়ায় পরমের আখড়ায় দেখতে পেল করালীকে। পরম একাজটি করছে কেন, ভেবে নিল। এই প্রসঙ্গও নতুন সংযোজন।

৬.৬ দ্বিতীয় পর্বের নবম পরিচ্ছেদে করালী বনওয়ারীর জন্য রেল কোম্পানির গাঁইতি এনেছে। শোনা গেছে চন্দনপুরের দাঙ্গার কথা। মুসলমানদের বিপক্ষে করালী বীরত্ব দেখিয়েছে। এ বর্ণনা নতুন।

৬.৭ তৃতীয় পর্বের সূচনাতে কালারুদ্রের গাজনের কথা। তত্ত্বকথা—উপকথা : পত্রিকা-সংস্করণে ছিল না। বনওয়ারী প্রধান ভক্ত হয়ে চড়কের পাটায় উঠেছে। করালী তদারকি করে ফিরেছে। উপন্যাস-পাঠে এসব সংযোজন করেছেন তারাশঙ্কর।

৬.৮ তৃতীয় পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে হনুমানের দলের সংবাদ। মাইতো ঘোষের বাংলা বাড়ি তছনছ করে দেওয়া—বীর হনুমানের দলের কথা, উপন্যাসের প্রধান দ্বন্দ্বগুলিতে যে

বীর হনুমান প্রসঙ্গ বার বার এসেছে তার বর্ণনা এসেছে। পত্রিকা-পাঠে এক আধটি বাক্যে একথা ছিল তবে বীর হনুমান, হনুমানের সন্ন্যাসীদল সম্পর্কে বিবরণ আর তার নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-সম্ভাবনা, আমরা যার বিষয়ানুগ আলোচনা এই বইয়ে উপযুক্ত অবসরে করেছি তা পত্রিকা পাঠে ছিল না। বর্ণনাটি এখানে নতুন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে।

৬.৯ তৃতীয় পর্বের চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে কাহারদের পালকি বেহারাবৃত্তির বিস্তৃত বিবরণ। পত্রিকা-সংস্করণে আছে। তবে পাগল-কাহার না থাকায় সে-বর্ণনা আংশিক মনে হয়।

৬.১০ চতুর্থ পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আগা সাহেবের ঘটনা। পাগল কাবুলীওয়ালার কাছে ধার করেছিল। মাঠে তাকে দেখে পালাচ্ছিল ভয়ে। আগাসাহেব তাকে তাড়া করে তম্বি করতে থাকে। করালী আগা সাহেবকে শাসন করে। এরকম ব্যাপার এর আগে কাহাররা স্বপ্নেও ভাবে নি কখনো। বর্ণনাটি সম্পূর্ণ নতুন।

৬.১১ চতুর্থ পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে নয়ানের মৃত্যুর কথা। এর আগে করালীর কোঠাঘর ভেঙেছে বনওয়ারীর দল। নয়ানও গিয়েছিল। নয়ানের মৃত্যুর সময় আলোর অভাব। পাগল গান গাইল 'অন্ধকারের ভাবনা কেনে হয় রে!'—গ্রন্থ-পাঠের সংযোজন।

৬.১২ পঞ্চম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে গাজনের বর্ণনা। সুবাসীর সঙ্গে বিয়ে হবার পর পাগল মিতে নতুন গান ও সং তৈরি করেছে।

৬.১৩ নবান্নের বিস্তৃত বর্ণনা আছে পঞ্চম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদে। পত্রিকা-পাঠে ছিল নেহাৎ খসড়া মাত্র।

৬.১৪ পঞ্চম পর্বের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আছে ভাঁজোর বিবরণ। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদেও বাসি-ভাঁজোর বর্ণনা। পাগলের গানে এই বর্ণনার অংশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়েছে। বাসি-ভাঁজোর সময় বনওয়ারী আবিষ্কার করেছে সুবাসীর চুলে ছাতিম ফুল। এই সূত্রে উপন্যাসে করালী-বনওয়ারীর ভয়ঙ্কর নির্ণায়ক যুদ্ধ ঘনিয়ে এসেছে।

৬.১৫ শেষপর্বে বনওয়ারী পাগলের সঙ্গে কথায় কথায় বলেছে কাঁদড়ার কথা। একজন সাধু পুরুষ কেমন করে গঙ্গার দিকে যাচ্ছিলেন। তাদের নানা জ্ঞানের কথা বলেছেন মানুষটি। জ্ঞান গঙ্গা না হোক বনওয়ারী পাগলকে অনুরোধ করেছে—তার মৃত্যুর পর তাকে যেন কোপাইয়ের কূলে নিয়ে যাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গ পত্রিকাপাঠে ছিল না।

উপন্যাস-পাঠ কেমন করে পত্রিকা-পাঠকে অবলম্বন করে নতুন নতুন তাৎপর্যের দিকে সরে গেছে উপরের উদাহরণগুলিতে তার স্পষ্ট প্রমাণ বিবৃত আছে। উপন্যাস বাস্তবকে অবলম্বন করে ভাবসত্যে অখণ্ড নির্মাণে পরিণত হয়েছে। সেই পরিণতির প্রতি উৎকর্ণ উদগ্রীব এক অতৃপ্ত শিল্পীর অপূর্ব যাত্রার পরিচয় এই পাঠভেদের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*—তার পূর্ণতার পাঠটি গড়ে ওঠার রহস্যও রোমাঞ্চকর।

নির্ঘন্ট

খ. 'গ্রন্থ', 'পত্র পত্রিকা', "গল্প", "প্রবন্ধ নিবন্ধ",

গ. সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য

ঘ. ইংরেজী পারিভাষিক, প্রায়-পরিভাষিক শব্দ

ঙ. ইংরেজী ভাষায় রচিত 'লেখা' বা লেখক